বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে
পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত
গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক
তাপস অধিকারী

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মঞ্জুলা বেরা
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
সেপ্টেম্বর, ২০১৫

Declaration

I declare that the thesis entitled 'বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা' has been prepared by me under the guidance of Dr. Manjula Bera, Professor of Bengali, Department of Bengali, University of North Bengal. No Part of this thesis has formed the basis for the award of any degree or fellowship previously.

Date : 28.09.2015

Tapas Adhikary

(TAPAS ADHIKARY)
Department of Bengali
University of North Bengal

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

nbubangla@gmail.com
telephone 0353-2776 352

রাজা রামমোহনপুর, ডাকঘর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, থানা - মাটিগাড়া, মহকুমা - শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং - ৭৩৪ ০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

পত্র সংখ্যা .....

তারিখ ..... ২০ .....

Certificate

I certify that Sri Tapas Adhikary has prepared the thesis entitled 'বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা' for the award of Ph.D degree of the University of North Bengal, under my guidance. He has carried out the work at the Department of Bengali, University of North Bengal.

Date : 28/09/2015

Manjula Bera

(DR. MANJULA BERA)
Professor of Bengali
Department of Bengali
University of North Bengal

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

(Abstract)

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ (Abstract)

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রিঃ) উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনি এই উপন্যাসটি সহ বাংলা ভাষায় মোট চোদ্দটি উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নরনারীর জীবনালেখ্য স্থান পেয়েছে। তবে কিছু উপন্যাসে তিনি সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রেক্ষিতে মানব মনস্তত্ত্বের নানা রূপকে দেখিয়েছেন। বঙ্কিম সমকালে রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ উপন্যাসের চর্চা শুরু করলেও তাঁরা কেউই নিজেদের রচনায় বঙ্কিম সৃষ্ট ইতিহাস, সমাজ, পরিবার তথা গার্হস্থ্য নিয়ন্ত্রিত মানব জীবনালেখ্যের ধারাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর উপন্যাসগুলিতে শহুরে এবং সমাজের উচ্চকোটির মানুষেরাই প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্র সমকালেই বাংলা উপন্যাসের আঙিনায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আর্বিভাব ঘটে। পূর্বসূরীদের মত তিনিও উপন্যাসে সমাজের মূল স্রোতের মানুষদের জীবনালেখ্য তুলে ধরেছেন।

এরপর বাংলা উপন্যাস বিশের দশকে পদার্পণ করলে এতে নানা দিক থেকে নতুনত্ব আসতে শুরু করে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে দীনেশরঞ্জন দাস, গোকুল চন্দ্র নাগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মত যুবকেরা সাহিত্যে বাস্তবতা আনার জন্য এর উপাদান খুঁজতে মূল জনসমাজের বাইরে শহরতলি, বসতি প্রভৃতি নানা অঞ্চলে পাড়ি জমান। তবে 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের আগেই ১৩২৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'কয়লাকুঠি' নামে একটি ছোটগল্প রচনা করেন, যার পটভূমি আসানসোল–রানীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চল। এই অঞ্চলকে পটভূমি করে তিনি আরও কয়েকটি ছোটগল্প লেখেন। একই বিষয় নিয়ে তিনি লেখেন 'কয়লাকুঠির দেশ' উপন্যাসটি। এভাবেই প্রথমে বাংলা ছোটগল্পে এবং পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার সূত্রপাত ঘটে। ফলে মূল ধারার উপন্যাস রচনার পাশাপাশি ঔপন্যাসিকেরা অন্য আর এক ধারার উপন্যাস

রচনা শুরু করেন, যেখানে মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রকৃতি থেকে শুরু করে সেখানকার জনজীবনের নানা বৈচিত্র্যময় রূপ প্রকাশিত হতে থাকে। এই উপন্যাসগুলি আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেদের আলাদা জায়গা করে নিয়েছে।

মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অঞ্চলকে পটভূমি করে বাংলা সাহিত্যে অনেক উপন্যাসই রচিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু উপন্যাস পুরোপুরি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে, আর বেশ কিছু উপন্যাস আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। আমরা বিশ শতকে প্রকাশিত মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত উপন্যাসগুলির আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এগুলির কোথায়, কীভাবে আঞ্চলিক রূপ, সংস্কৃতি ও জনজীবনের জীবনচর্যার কথা শিল্পিত ও বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে তা অন্বেষণে প্রয়াসী হয়েছি। আর তা করতে গিয়ে আমাদের গবেষণার বিষয়কে পূর্ণতা দিতে নিম্নোক্ত অধ্যায় বিভাজন করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়
আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার অন্বেষণ করতে বসলে প্রথমেই আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় করতে হয়। এই অধ্যায়ে প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব ও বিবর্তনের একটি অতি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের বিবরণ দিয়ে বিশ্বসাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের আবির্ভাব ও বিকাশের একটি রূপরেখা অঙ্কন করে বিভিন্ন সাহিত্য তাত্ত্বিক, সাহিত্যের আলোচক ও সাহিত্য স্রষ্টারা আঞ্চলিক উপন্যাস সম্পর্কে যে সমস্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সেগুলি আলোচনা করে আঞ্চলিক উপন্যাসের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নিরূপণের প্রয়াস করা হয়েছে। এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলিও খুঁজে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কালে এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে মাপকাঠি ধরে আলোচ্য উপন্যাসগুলির আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সার্থকতা ও অসার্থকতা যাচাই করা হয়েছে। এখানে আঞ্চলিক উপন্যাসের যে কয়েকটি লক্ষণ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কয়েকটি হল—

- আঞ্চলিক উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির ভৌগোলিক পরিবেশের বাস্তবসম্মত বিবরণ থাকে।
- চরিত্রদের জীবন-জীবিকা তথা সমগ্র কার্যকলাপের সঙ্গে অঞ্চলটির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে।
- চরিত্রদের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যরুচি-খাদ্যতালিকার বাস্তব সম্মত বর্ণনা থাকে।
- উপন্যাসে ভাষায় ও চরিত্রদের কথোপকথনে আঞ্চলিক শব্দের বাহুল্য থাকে।
- জন্ম-মৃত্য-বিবাহ বা অন্য কোন আচার অনুষ্ঠানের বিবরণ থাকে। এজন্য অঞ্চলটির নিজস্ব লোকাচার, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতিকে তুলে আনা হয়।
- উপন্যাসে নায়ক-নায়িকা থাকলেও অঞ্চলটিই সবথেকে বেশি গুরুত্ব পায়, তাকে সরিয়ে নিলে এর উপন্যাস হয়ে ওঠার অনেক লক্ষণ চলে যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রকাশ ও বিস্তারের সাধারণ পরিচয় সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে বাংলা উপন্যাসে কিভাবে আঞ্চলিকতার প্রকাশ ও বিস্তার ঘটেছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর বাংলা সাহিত্যে কোনো বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে যে সমস্ত ঔপন্যাসিক উপন্যাস লিখছেন, তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় আসে এমন উপন্যাসগুলির সাধারণ পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। এরপর বিশ শতকে আঞ্চলিক পটভূমিকায় রচিত উপন্যাসগুলিকে সময়ক্রমের ভিত্তিতে বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা এবং বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা নামে দু'টি অর্ধে ভাগ করে দু'টি পৃথক তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা

বিশ শতকের বিশের দশক থেকেই বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার লক্ষণ প্রকটিত হতে শুরু করে। প্রথমে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাকুঠি বিষয়ক ছোটগল্পগুলিতে এই লক্ষণ দেখা যায়, যা তাঁর এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত 'কয়লাকুঠির দেশ' উপন্যাসেও থাকায় উপন্যাসটি এই অর্ধেই আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও এই অর্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী এবং সর্বোপরি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সমস্ত উপন্যাসে আঞ্চলিকতার লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির আঞ্চলিক লক্ষণ অন্বেষণ করা হয়েছে। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে কয়েকটি হল—

ঔপন্যাসিকের নাম	**উপন্যাসের নাম ও প্রথম প্রকাশকাল**
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	কয়লাকুঠির দেশ – ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	পদ্মানদীর মাঝি – ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ।
সরোজকুমার রায়চৌধুরী	নতুন ফসল – ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	আরণ্যক – ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	কালিন্দী – ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ।
	গণদেবতা – ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ।
	পঞ্চগ্রাম – ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ।
	কবি – ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ।
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	উপনিবেশ– ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	হাঁসুলী বাঁকের উপকথা – ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ।
সতীনাথ ভাদুড়ী	ঢোঁড়াই চরিত মানস (প্রথম চরণ)– ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
	ও (দ্বিতীয় চরণ)– ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।
	ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা উপন্যাসে যে আঞ্চলিকতার আবির্ভাব ঘটে, এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাতে আরও বেশি ব্যাপকতা আসে। এই অধ্যায় বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত উপন্যাসগুলির আঞ্চলিক লক্ষণ অন্বেষণ করে সেগুলি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পেরেছে কি না তা নির্ণয়ের প্রয়াস করা হয়েছে। এখানে যে সকল উপন্যাস আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি হল—

ঔপন্যাসিকের নাম	**উপন্যাসের নাম ও প্রথম প্রকাশকাল**
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	নাগিনী কন্যার কাহিনী – ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ।
অদ্বৈত মল্লবর্মণ	তিতাস একটি নদীর নাম ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।
সমরেশ বসু	গঙ্গা – ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।
প্রফুল্ল রায়	পূর্বপার্বতী – ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।
অমিয়ভূষণ মজুমদার	গড় শ্রীখণ্ড – ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।
সুবোধ ঘোষ	শতকিয়া – ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ।
প্রফুল্ল রায়	কেয়াপাতার নৌকো– ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ।
মহাশ্বেতা দেবী	অরণ্যের অধিকার– ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।
দেবেশ রায়	তিস্তাপারের বৃত্তান্ত – ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ।
	ইত্যাদি।

উপসংহার

পূর্বের আলোচনা থেকে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসগুলির একটি বিস্তারিত ছবি উঠে এসেছে। এই উপন্যাসগুলিতে বাংলার মূল ভূখণ্ডের মধ্যে থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া জনজীবনের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে এই উপন্যাসগুলি বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারাকে কীভাবে সমৃদ্ধ করেছে, এখানে তার আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি আবির্ভাব কাল থেকে বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার বিবর্তনের রূপচিত্রটিও ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাক্‌কথন

প্রাক্‌কথন

আমি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্মেছি ও বড় হয়েছি। আমার অঞ্চলটিকে সব অর্থেই মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা কারণে বিচ্ছিন্ন অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত করা যায়। হয়তো এরূপ একটি অঞ্চলে বর্ধিত হওয়ার কারণেই ছোটবেলা থেকে গল্প-উপন্যাসের প্রতি আমার আসক্তি থাকলেও অঞ্চলনির্ভর গল্প-উপন্যাস আলাদাভাবে আকর্ষণ করতো। তবে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে পড়াশুনা পর্যন্ত সেই আকর্ষণ 'পদ্মানদীর মাঝি', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বা 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু ছোটগল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে এই ধরনের গল্প-উপন্যাস পাঠের ভালো লাগার কথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষিকা অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরাকে জানালে তিনি আমাকে সমগ্র বিশ শতক জুড়ে রচিত বিস্তৃত অঞ্চল নির্ভর গল্প-উপন্যাসের সন্ধান দেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর আমি এই ধরনের উপন্যাস সংগ্রহ শুরু করি এবং এ বিষয়ে গবেষণার জন্য মনস্থির করি। তবে তখনও পর্যন্ত গবেষণা সংক্রান্ত কোনো কিছুই ঠিকমত জানতাম না — গবেষণা করতে গেলে কীভাবে পড়তে হয়, কীভাবে লিখতে হয় কোনোকিছুই ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছিলাম না। প্রথমদিকে অঞ্চলনির্ভর উপন্যাসের প্রাচুর্য দেখে আমি কিছুটা দিশাহীনও হয়ে পড়ি। যতই পড়াশুনা করছিলাম কোনো কিছুই যেন আত্মস্থ করতে পারছিলাম না। তখন তিনি আমার এ সংক্রান্ত সমস্ত অস্বচ্ছ ধারণাকে স্বচ্ছতা প্রদান করেন, দীশাহীনতা থেকে প্রকৃত দিশা দেখান এবং গবেষণা কর্মে উৎসাহ দেন। এভাবে উৎসাহ পেয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স ওয়ার্কে ভর্তি হই এবং সেখানে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বিশেষ করে ম্যাডামের নানা ধরনের ক্লাসে উপস্থিত থেকে গবেষণা বিষয়টি সম্পর্কে খানিকটা আন্দাজ পাই।

প্রফেসর ড. মঞ্জুলা বেরা শুধু আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়িকা নন, তিনি আমার উচ্চতর শিক্ষার পথ পদর্শকও। আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, আমার জীবনে তাঁর মতো একজন অনুকরণযোগ্য শিক্ষিকা ও সত্যিকারের ভালো মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি। গবেষণার মাঝে আমি অসুস্থও হয়ে পড়লে তিনি যে সহৃদয়তা ও

স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ও সর্বদা আমার শরীর-স্বাস্থ্যের বিষয়ে খোঁজ নিতেন তা কখনই ভোলার নয়। সত্যি কথা বলতে কি, পড়তে ও লিখতে ছোটবেলা থেকেই শিখেছি; কিন্তু কীভাবে পড়াশুনা করতে হয়, কীভাবে লিখতে হয় তা আমি তাঁর কাছেই শিখেছি। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাকে প্রচুর সময়, সুপরামর্শ, নির্দেশ দিয়ে সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এসব ছাড়া আমার পক্ষে এই গবেষণা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

বইপত্রের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি, ইসলামপুর কলেজ লাইব্রেরি, ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরি, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার, মালদা জেলা গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন হয়েছি। এই সমস্ত লাইব্রেরির আধিকারিক ও কর্মীদের যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যাদবপুর পোষ্ট অফিসের কর্মী আমার ভ্রাতৃসম প্রভাকর রায় কলেজ স্ট্রিট থেকে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ বই সংগ্রহ করে দিয়েছে। তার প্রতি রইল স্নেহপূর্ণ ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। ইংরেজি সাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনা করে ও বইপত্র দিয়ে আমার ভাই বর্তমানে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক বিবেক অধিকারী আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমার মা শ্রীমতী মিনা অধিকারী ও বাবা শ্রীবিপদ বরণ অধিকারী নিজেরা খুব বেশি পড়াশুনা করতে না পারলেও আমাদের ভাইবোনদের পড়াশোনার প্রতি সর্বদা যত্নশীল। আমার বোন প্রিয়াংকা অধিকারী (দাস) ও তার ছেলে-মেয়েরা আমাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছ। কর্মসূত্রে আমাকে বাড়ির বাইরে থাকতে হওয়ায় আমার স্ত্রী কাকলি যোগ্য সহধর্মিণীর মতো সংসার সামলে সমস্ত ব্যাপারে আমার পাশে থেকেছে। আমার মেয়ে শ্রুতিকে দেখে আমি যেমন কাজে উৎসাহ পাই, তেমনি সেও তার বয়সোপযোগী নানা কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। আমি অনেক সময় পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছি। এদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আরও অনেকের কাছে নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। এদের মধ্যে যাদের নাম করতেই হয় তারা হলেন ইসলামপুর কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসুজিৎ কুমার পাল, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. গৌর চন্দ্র

ঘোষ, পতিরাম যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রী নির্মল দাস, জলপাইগুড়ি কমার্স কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীমিঠুন দত্ত, ভ্রাতৃসম ছাত্র আজাদ মণ্ডল, গোষ্ঠ বর্মন, গুরুদাস চন্দ্র মাহাতো প্রমুখ। এদের সঙ্গে অনেকের নামই বাদ থেকে গেল। তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। গবেষণা সংক্রান্ত সমস্ত টাইপের কাজ আমি নিজে করেছি। তবে কম্পিউটার সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সমস্যায় পড়লেই আমার সহকর্মী ড. অতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েছি এবং তিনি তার সমস্ত কাছ ফেলে রেখে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার প্রায় প্রবাস জীবনে সমস্ত সুবিধা-অসুবিধাতেই আমি তাকে ও তার স্ত্রী মৌমিতা ও পুত্র অর্ণবকে পাশে পেয়েছি। আমার জীবনে তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

Tapas Adhikary

তারিখ : ২৮.০৯.২০১৫ **(তাপস অধিকারী)**

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়,

রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিঙ

ঃ সূচীপত্র ঃ

পৃষ্ঠা

ভূমিকা ১ - ৯

প্রথম অধ্যায়

আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ১০ - ৬৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রকাশ ও বিস্তারের সাধারণ পরিচয় সংক্ষেপ ৬৭ - ৯২

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা ৯৩ - ৩০০

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা ৩০১ - ৪৮২

উপসংহার ৪৮৩ - ৪৮৯

গ্রন্থপঞ্জী ৪৯০ - ৫১৭

ভূমিকা

ভূমিকা

আনুমানিক খ্রিস্টিয় নবম-দশম শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যের যাত্রা শুরু হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা উপন্যাস তার যাত্রা শুরু করে। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক উপন্যাস রচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিকের স্বীকৃতি দেওয়া হলেও বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জন্ম কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে অনেকেই উপন্যাস রচনার প্রয়াস করে যাচ্ছিলেন। শুধুমাত্র উপযুক্ত Form এবং ভাষার অভাবে সার্থক উপন্যাস রচনা করা সম্ভব হচ্ছিল না। মধ্যযুগের বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' বা দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী বা সতীময়না'র মত আখ্যান কাব্যগুলি উপন্যাসের আদলেই লেখা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় ইংরেজদের আধিপত্য কায়েম হলে নানা দিক থেকে বাঙালী জাতির মধ্যে পরিবর্তন আসতে থাকে। এই পরিবর্তনের ধারায় বাংলা গদ্যের জন্ম হয়। প্রথম দিকে ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনেই বাংলা গদ্যচর্চা শুরু করে। এইসময় খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য শ্রীরামপুর মিশন এবং ইংরেজ সিভিলিয়নদের বাংলা শেখানোর জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি ইংরেজ রাজত্বের সংবাদ জনমানসে পৌঁছানোর জন্য বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাংলা পদ্য ভাষার বদলে গদ্য ভাষাকে মাধ্যম করা হয়। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এতে বাংলা গদ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এইসময় রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, উইলিয়াম কেরী, গোলকনাথ শর্মা, রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত অনেকেই বাংলা গদ্যচর্চা শুরু করেন। তখন তেমন উন্নতমানের লিখিত গদ্যভাষা তৈরি হয়নি — একথা সত্য; কিন্তু ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে পদ্যের পাশাপাশি গদ্যভাষাও বাংলা সাহিত্যে নিজের জায়গা তৈরি করতে শুরু করে। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রমুখ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠরত ইংরেজ সিভিলিয়নদের জন্য ইংরেজি বা সংস্কৃত থেকে গদ্য আখ্যানধর্মী রচনা আগেই অনূদিত করেছিলেন। বাংলা সাময়িক পত্রগুলিতেও

মৌলিক আখ্যান জাতীয় রচনা প্রকাশিত হতে শুরু হয়। অর্থাৎ গদ্যভাষাকে ভিত্তি করে আখ্যান জাতীয় রচনা প্রকাশিত শুরু করে। উপন্যাসেরও প্রধানতম শর্ত হল, এখানে মানবজীবনের আখ্যান পরিবেশিত হয়। আসলে গদ্যভাষাকে ভিত্তি করে আখ্যান জাতীয় রচনা লেখা যেতে পারে এই ধারণা এঁরাই প্রথম দেন।

তবে উপন্যাসজাতীয় রচনা সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে স্মরণীয় হলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উনিশ শতকের বিশের দশকে নিজের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার পৃষ্ঠায় সমকালীন কলকাতার ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে প্রচুর কাঁচা টাকার মালিক হওয়া সদ্য গড়ে ওঠা 'বাবু সম্প্রদায়'–এর জীবনযাপন সংক্রান্ত কেচ্ছা–কাহিনি অবলম্বনে 'নববাবু বিলাস', 'নববিবি বিলাস' এবং 'কলিকাতা কমলালয়' নামক বাংলা গদ্যভাষায় তিনটি বাস্তবধর্মী, চরিত্রকেন্দ্রিক আখ্যান জাতীয় রচনা প্রকাশ করেন। এই রচনাগুলিকে বাংলায় উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস বলা যায়। তাঁর পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি আখ্যানধর্মী রচনা প্রকাশিত হয়। এগুলি হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষা থেকে অনূদিত হলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মৌলিক গ্রন্থ হিসেবেই স্বীকৃতি পায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই লেখাগুলি প্রকাশ করেছিলেন। এইসময় ইংরেজ মহিলা মিসেস হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্স 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ' (১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটিকে দীর্ঘদিন বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাসের স্বীকৃতি দেওয়া হলেও ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীচাঁদ রচনাবলীর ভূমিকায় জানিয়েছেন যে, 'দি উইক' নামে একটি ইংরেজি গল্পের ছাঁচে শ্রীমতি মুলেন্স এই গ্রন্থটি লিখেছিলেন। এই রচনাটি সমপর্কে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনার প্রসঙ্গ এনে সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ'কে উপন্যাস হিসেবে মেনে না নিয়ে গদ্যকাহিনীর বেশি কিছু বলতে চাননি।

এই সময় ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এখানে দু'টি কাহিনি আছে — 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' ও 'সফল স্বপ্ন'। এর মধ্যে 'সফল স্বপ্ন' Hobert Caunter–এর 'The Romance of History' গ্রন্থের 'The Traveller`s Dream' গল্পের হুবহু অনুবাদ। আর 'অঙ্গুরীয়

বিনিময়'–এর কাহিনি কাঠামো ঐ গ্রন্থের 'The Mahratta Chief' থেকে সঙ্কলিত। এই আখ্যান দু'টিতে উপন্যাস হয়ে ওঠার বেশ কিছু লক্ষণ আছে। কিন্তু পুরোটা মৌলিক রচনা না হওয়ায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'–এর অন্তর্গত আখ্যান দু'টিকে সার্থক বাংলা উপন্যাস বলা যায় না।

এরপর প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ) নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে সার্থক উপন্যাস হয়ে ওঠার অনেক লক্ষণ আছে। তাই অনেকে এই গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক উপন্যাসের স্বীকৃতি দিতে চান। কিন্তু সার্থক উপন্যাস হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে 'আলালের ঘরের দুলাল'–এর অনেক ত্রুটিও আছে। এজন্য বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসেবে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'–কে নিয়ে ঐক্যমত্য গড়ে ওঠেনি। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে। এখানে ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত আনুপূর্বিক কোনো কাহিনি নেই — কলকাতার 'বাবু সম্প্রদায়'–এর নানা কেচ্ছা কাহিনি নক্‌শার মধ্যে দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। অনেকে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'কে উপন্যাস বলতে চান।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এই 'দুর্গেশনন্দিনী'কে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক উপন্যাসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এরপর বাংলা উপন্যাস প্রায় ১৫০ বছর অতিক্রান্ত করে এখনও বাংলা সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ হিসেবে এগিয়ে চলেছে। এই দীর্ঘ সময়কালে বাংলা উপন্যাস চর্চায় বহু প্রতিভাধর লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে। ঔপন্যাসিকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের আঙ্গিক, বিষয়বস্তু নিয়েও নানা পরীক্ষা–নিরীক্ষা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় মোট চোদ্দটি উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি এই উপন্যাসগুলি ইংরেজি উপন্যাসের আদলে রচনা করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসে মূলতঃ ইতিহাস নির্ভর রোমান্স কাহিনি এবং সমাজ নির্ভর গার্হস্থ্যজীবন কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিকরা নিজেদের উপন্যাসকে শুধুমাত্র ইতিহাস, রোমান্স এবং সমাজের মধ্যে সীমবদ্ধ রাখেন নি — তাঁরা উপন্যাসের বিষয়, আঙ্গিক, Form প্রভৃতি নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেছেন। ফলে বাংলা উপন্যাসের বহু বিবর্তন ঘটেছে। এই

বিবর্তনের হাত ধরেই বাংলা উপন্যাসের অনেক ধারা তৈরি হয়েছে। ফলে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে রোমান্স, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস, সামজিক উপন্যাস, পারিবারিক উপন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস, চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, কারা উপন্যাস, নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের মত অজস্র ধারা জন্ম নিয়েছে। বাংলা উপন্যাসের এই বিবর্তনের ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস। বিশ শতকের বিশের দশকে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই ধারাটির যাত্রা শুরু হয়, যা নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এখনও সমানভাবে বহমান।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমকালে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, শিবনাথ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র দত্ত, ভুবনচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বাংলা উপন্যাস রচনায় এগিয়ে এসেছিলেন। তবে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে এঁদের প্রায় সবার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের অনিবার্য প্রভাব পড়েছিল। তাই প্রায় কেউ-ই ইতিহাস নির্ভর রোমান্স কাহিনি বা সমাজ সমস্যা নির্ভর সামাজিক আখ্যান রচনার বাইরে যেতে পারেননি। অনেকেই বঙ্কিমের অনুসরণে বাংলা উপন্যাসের চর্চা করলেও তার মধ্যে অবশ্যই ব্যতিক্রম ছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বাংলা উপন্যাসকে অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র হিসেবে পরিবেশিত হওয়ার কবল থেকে মুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাই 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটিতে তিনি এক গ্রাম্য একান্নবর্তী পরিবারে দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের কাহিনি পরিবেশন করেছেন। তারকনাথ বাংলা উপন্যাসে কিছুটা নতুনত্ব আনলেও তাঁর উপন্যাসে আঞ্চলিকতার কোনো লক্ষণ ছিল না। তাই বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা আলোচনায় তাঁর সম্পর্কে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই বলেই মনে হয়।

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমযুগের অবসান ঘটান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'করুণা'কে বাদ দিয়ে তাঁর মোট উপন্যাস হল ১২টি। এরমধ্যে বঙ্কিমের প্রভাবে 'বৌঠাকুরনীর হাট' (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ) এবং 'রাজর্ষি'র (১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ) মত ঐতিহাসিক রোমান্স যেমন আছে, তেমনি 'চোখের বালি' (১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ)-র মত মনস্তত্ত্বমূলক, 'নৌকাডুবি' (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ), 'দুইবোন' (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ)-এর মত গল্পপ্রধান, 'গোরা'র (১৯১০ খ্রিস্টাব্দ) মত

মহাকাব্যধর্মী, 'ঘরে বাইরে' (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ), 'চার অধ্যায়' (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ),–এর মত রাজনৈতিক, 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ)–এর মত তত্ত্বপ্রধান, 'যোগাযোগ' (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ)–এর মত সমস্যাপ্রধান এবং 'শেষের কবিতা'র (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) মত রোমান্টিক উপন্যাসও আছে। বাংলা ছোটগল্পের জনকও হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — তাঁর হাতেই বাংলা ছোটগল্পের জন্ম, বিকাশ ও ক্রমপরিণতি ঘটেছে। তবে উপন্যাস–ছোটগল্পের মত কথাসাহিত্যের শাখাগুলিতে অবাধে পদচারণা করলেও রবীন্দ্রনাথ আদ্যন্ত ছিলেন একজন রোমান্টিক গীতিকবি। তাঁর কবিধর্মের প্রধান অবলম্বন ছিল সৌন্দর্যবাদ। স্বাভাবিকভাবে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিধর্মের প্রভাব তাঁর ছোটগল্পগুলির পাশাপাশি উপন্যাসগুলিতেও পড়েছে। তবে তাঁর 'গোরা' 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা'র মত উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের কথা এসেছে। কিন্তু উপন্যাসগুলি কখনোই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষের জীবনচর্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই উপন্যাসগুলির গুরুত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গায়। তৎকালীন সমগ্র ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত 'গোরা' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস হিসেবে জনপ্রিয় হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে পটভূমি করে রচিত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটির রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। 'যোগাযোগ' উপন্যাস সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের লড়াইকে দেখানো হয়েছে। আর শিলং পাহাড়কে পটভূমি করে লেখা 'শেষের কবিতা' উপন্যাস মূলতঃ রোমান্সকে ভিত্তি করে লেখা। এজন্য রবীন্দ্রনাথের কোনো উপন্যাসকেই আঞ্চলিকতার সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। তাই বাংলা উপন্যাসের আঞ্চলিকতার আলোচনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর রচিত উপন্যাসগুলিকে বাদ দিয়েই করা হয়।

বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িককালে তবে কিছুটা পরে বাংলা উপন্যাস চর্চা শুরু করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বিশ শতকের প্রথম দশকটা বাদ দিয়ে পরের দু'টি দশককে (১৯১০–১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ) অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের এই অবিসংবাদী প্রভাবের কারণে অনেকেই এই সময়কালকে বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে 'শরৎযুগ' বলে অভিহিত করতে চান। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁদের অনুগামীদের রচনায় মূলতঃ শহুরে আভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষদের

জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গ্রামজীবনের কথা এলেও তা জমিদারের চৌহদ্দির মধ্যে সীমবদ্ধ থেকেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সেই শহুরে অভিজাত জীবন এবং গ্রাম্য জমিদারের প্রসঙ্গ থাকলেও সমাজের তথাকথিত প্রান্তিক মানুষজন একটা আলাদা জায়গা পেয়েছে। তাঁর 'পন্ডিতমশাই', 'বামুনের মেয়ে', 'পল্লীসমাজ', 'দেনাপাওনা'র মত উপন্যাসগুলি বাংলার কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষের জীবনচর্যাকে পটভূমি করেই রচিত। এই উপন্যাসগুলিতে আঞ্চলিকতার কিছু লক্ষণ পাওয়াও যায়। তবে এ সকল অঞ্চলকে কখনোই মূল জনসমাজের মধ্যে থেকে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় না। বাংলার যে কোনো স্থানে এইরকম অঞ্চল ও মানুষজনের অবস্থান সম্ভব। ফলে শরৎচন্দ্রের কোনো উপন্যাসকে মূলধারার উপন্যাস থেকে পৃথক করা যায় না। এজন্য সম্ভাবনা থাকলেও শরৎচন্দ্রের কোনো উপন্যাসই আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। তাই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর উপন্যাসগুলিকে বাদ দিয়েই বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার আলোচনা করা হয়।

শরৎযুগের শেষদিকে 'কল্লোল' (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) নামক সাহিত্য পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে আর একটি যুগের সূত্রপাত হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই যুগটি 'কল্লোল যুগ' নামে পরিচিত হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে এই যুগটির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে চেয়ে বলেছেন — '' ''কল্লোল'' বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।'' (পৃষ্ঠা ১৭) শুধু 'কল্লোল' পত্রিকাই নয়; এই আলোড়নে সামিল হয়েছিল তৎকালে প্রকাশিত 'কলিকলম', 'প্রগতি'র মত সাহিত্য পত্রিকাগুলিও। ফলে বাংলা কথাসাহিত্যে অনেক নতুন নতুন লেখকের আবির্ভাব ঘটে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও এযুগে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বনফুল, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, গোকুল নাগ, দীনেশরঞ্জন দাস, মনীশ ঘটক, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, নজরুল ইসলাম, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মত অসংখ্য সাহিত্যিক বাংলা কথাসাহিত্যের চর্চা শুরু করেন। অবশ্য পরবর্তীকালে নজরুল ইসলাম বা জীবনানন্দ দাশের মত কেউ কেউ কথাসাহিত্য ছেড়ে কাব্যসাহিত্যের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে নেন।

'কল্লোল যুগ'–এর শেষদিকে বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে পা রাখেন বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ী — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। উপরে উল্লিখিত কথাসাহিত্যিকেরা সকলেই যে 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন নয়। এঁদের অনেকেই 'কল্লোল যুগ'–এর প্রভাব থেকেও মুক্ত ছিলেন — অনেকেই 'কল্লোল গোষ্ঠী'র বাইরে থেকে সাহিত্য চর্চা করেছেন। সবাই ঔপন্যাসিক হিসেবে তেমন সাফল্যের ছাপও রাখতে পারেননি। তবে 'কল্লোল গোষ্ঠী' বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগ পরিবর্তনের যে ডাক দিয়েছিলেন, সেই ডাকে প্রায় সকলেই সাড়া দিয়েছিলেন। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন 'বিচিত্রা' পত্রিকায়, অথচ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁকে 'কল্লোলের কুলবর্ধন' বলেছেন। এই সময়ে প্রায় সমস্ত লেখকই বঙ্কিম–রবীন্দ্র–শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার অস্বীকার করতে চাইলেন। এজন্য এরা তাঁদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সর্বান্তকরণে চেষ্টা শুরু করে দেন। এঁরা বাংলা উপন্যাসে স্বতন্ত্র পথের সন্ধান দিতে প্রয়াসী হন। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে নানা নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হতে শুরু করে। এই নতুন দিকগুলির মধ্যে একটি হল বাংলা উপন্যাস তথা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার দিক।

'কল্লোল যুগ'–এর আগে বাংলা কথাসাহিত্যে নানা সময়ে আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ এলেও তা এসেছিল বিচ্ছিন্নভাবে — এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে কখনোই দানা বাধতে পারে নি। ফলে বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার দিকটি উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছিল। 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখকরাই প্রথম মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত অথচ নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার তথাকথিত প্রান্তিক মানুষজনের জীবনচর্যাকে অবলম্বন করে গল্প–উপন্যাস রচনা করতে প্রয়াসী হয়ে ওঠেন। এই বিষয়ে সর্বপ্রথমে এগিয়ে এসেছিলেন তিনজন — শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। এঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় বিশ শতকের বিশের দশক থেকে বাংলা কথাসাহিত্য আঞ্চলিকতার আবাহন ঘটে। ফলে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস রচনার পথ সুগম হয়। এঁদের পরবর্তীকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর

বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মন, সমরেশ বসু, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ, প্রফুল্ল রায়, আবদুল জব্বার, প্রভাত দেব সরকার, সুশীল রায়, শক্তিপদ রাজগুরু, সৈয়দ মুজতবা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, মহাশ্বেতা দেবী, অভিজিৎ সেন, গুণময় মান্না, দেবেশ রায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অনিল ঘড়াই, ভগীরথ মিশ্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নানা উপন্যাসে আঞ্চলিকতাকে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা সংক্রান্ত গবেষণায় এই সমস্ত ঔপন্যাসিকদের মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত থেকেও নানা কারণে বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চল এবং সেখানকার গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষগুলির জীবনচর্যার রূপ 'আঞ্চলিক রঙ্' সহকারে কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে সেটাই তুলে আনার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে বিশ শতকের বিশের দশক থেকে এই শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় আশি বছরের সময়কালকে ধরা হয়েছে। স্বভাবতই এই আশি বছরের দীর্ঘ সময়কালে বাংলা উপন্যাসের আঞ্চলিকতা এক জায়গায় থেমে থাকে নি — সেখানেও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বিবর্তন ঘটেছে। আমাদের গবেষণায় বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার বিবর্তনের সেই স্বরূপটিকেও ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণা-বিষয়টিকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। যেহেতু আঞ্চলিক উপন্যাস সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত না জানলে এ সংক্রান্ত কোনো আলোচনাই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই প্রথম অধ্যায়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পণ্ডিত-গবেষক, সাহিত্য তাত্ত্বিক, সাহিত্য স্রষ্টার আঞ্চলিক উপন্যাস সংক্রান্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টা রয়েছে। এই আলোচনা থেকে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলকে পটভূমি করে লেখা উপন্যাসের দু'টি শ্রেণী পাওয়া গেছে — সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস ও আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাস। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলা উপন্যাসের বিবর্তনের ধারায় বিশ শতকের বিশের দশকে আঞ্চলিকতার প্রকাশ ও বিস্তার সংক্রান্ত বিষয়টি উত্থাপন করে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলকে পটভূমি করে লেখা বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসগুলির সাধারণ পরিচয় সংক্ষেপ দিয়ে প্রকাশকালের ক্রমানুযায়ী বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা এবং বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা নামে দু'টি

পৃথক তালিকা তৈরি করা হয়েছে। পরের দু'টি অধ্যায়ে অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এই তালিকাভূক্ত উপন্যাসগুলি একে একে বিশ্লেষণ করে সেগুলির আঞ্চলিকতার স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই উপন্যাসগুলির আলোচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার বিবর্তনের দিকটিও উঠে আসে। এগুলির মধ্যে বেশ কিছু উপন্যাসে আঞ্চলিকতার দিকটি সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়ে সেগুলিকে সার্থক উপন্যাসের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তবে উপন্যাসগুলি সবই সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হতে পেরেছে এমন নয় — অনেক উপন্যাসেই আঞ্চলিকতার পটভূমি থাকলেও এর সমস্ত বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে অনুসৃত হয় নি, ফলে সেই উপন্যাসগুলি আঞ্চলিকতার লক্ষণসম্পন্ন উপন্যাসের মধ্যে সীমিত থেকেছে।

প্রথম অধ্যায়
আঞ্চলিক উপন্যাসের
সংজ্ঞা ও স্বরূপ

প্রথম অধ্যায়

আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

বর্তমানে বিশ্বসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয়তম শাখা হল উপন্যাস বা Novel. এটি একটি সৃজিত ও সৃজ্যমান সাহিত্য মাধ্যম হওয়ায় এর সংজ্ঞা এবং স্বরূপ নির্ণয় নিয়ে সাহিত্যের তাত্ত্বিক ও সমালোচক মহলে বিতর্কের শেষ নেই। এজন্য এখনও পর্যন্ত উপন্যাসের কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ণীত হয়নি। তবে সব ধরনের উপন্যাস পাঠ করার পর এই শিল্প-মাধ্যমটির একটি সাধারণ সংজ্ঞা নির্ণয়ে প্রয়াসী হলে মনে হয়, উপন্যাস হল মানুষের বাস্তবভিত্তিক সামগ্রিক জীবন কাহিনির গদ্য শিল্পরূপায়ণ। একটি সার্থক উপন্যাস লিখতে গেলে ঔপন্যাসিককে এর কাহিনি, চরিত্র, প্লট, বাস্তবতা, পটভূমি, ভাষাশৈলি, কথনরীতি, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রভৃতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। এগুলির যথাযথ উপস্থাপনা কোনো রচনাকে সার্থক উপন্যাসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে, অন্যথায় উপন্যাস হিসেবে রচনাটিতে ব্যর্থতার তিলক লাগে। যদিও বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটেছে আধুনিক যুগে গদ্যভাষাকে মাধ্যম করে; তবে গদ্যভাষাকে মাধ্যম করেই উপন্যাস রচিত হবে এই বিষয়টি অনেকেই স্বীকার করতে চান না। যারা এই মতবাদের শরিক সেই সাহিত্য-তাত্ত্বিক ও সাহিত্য-সমালোচকরা ‘উপন্যাস’ বা 'Novel' কথাটির উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করে, এই ধরনের রচনাকে ‘আখ্যান’ বা 'Fiction' নাম দিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হতে চান। এঁরা এই জাতীয় রচনার আবির্ভাবকাল বহু পূর্বে এগিয়ে দিতে চান। আখ্যান বা Fiction বলে তাঁরা পদ্যে বা গদ্যে রচিত যে কোনো কাহিনি-নির্ভর রচনাকে এই গোত্রের মধ্যে ফেলতে চান। তবে এই মত এখনও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। তাই এই ধরনের যে কোনো আলোচনায় এখনও ‘উপন্যাস’ বা 'Novel' শব্দটি নিয়ে অগ্রসর হতে হয়।

বিশ্বসাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পমাধ্যমটির আবির্ভাব সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করলে বোঝা যায়, কীভাবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, উপস্থাপনা প্রভৃতি সমস্ত দিক থেকে এর বিবর্তন ঘটেছে। বিবর্তনের এই ধারা বেয়েই

উপন্যাসের অনেকগুলি বিভাগের জন্ম হয়েছে। এই বিভাগগুলির মধ্যে একটি হল Regional Novel বা আঞ্চলিক উপন্যাস। এজন্য Regional Novel বা আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়কালে বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাস নামক শিল্পমাধ্যমটির আবির্ভাব থেকে শুরু করে এর বিবর্তনের ধারাটির উপর আলোকপাত করা একান্ত প্রয়োজন।

উপন্যাসে মানব জীবন-নির্ভর একটি কাহিনির অবতারণা করা হয়। একথা পাশ্চাত্যের ইংরেজি সাহিত্যে E.M Forster (১৮৭৯-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে শুরু করে আমাদের বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপক-সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ) সহ বিভিন্ন দেশের প্রায় সমস্ত প্রথম শ্রেণির সাহিত্য-তাত্ত্বিক ও সাহিত্য-সমালোচকেরা নিজেদের উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনায় স্বীকার করে নিয়েছেন। সাহিত্যের অন্যতম শিল্পমাধ্যম হিসেবে প্রকৃত অর্থে উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি তার জন্ম হয়েছে এযুগে — সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে। কিন্তু এর বহু পূর্বে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের নানা রচনায় উপন্যাসের বীজ প্রোথিত হয়েছে। প্রাচীনকালে রচিত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সবগুলি মহাকাব্য, পুরাণসহ সমস্ত ধরনের আখ্যান জাতীয় রচনায় চরিত্র নির্ভর কাহিনি আছে। উপন্যাসের উৎস সন্ধানে নামলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই সমস্ত রচনাগুলির প্রতিও দৃষ্টি দিতে হয়।

প্রথমেই প্রাচ্যের ভারতবর্ষের আলোচনায় আসা যেতে পারে। রামায়ণ ও মহাভারতের মত দু'টি মহাকাব্য ছাড়াও প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেকগুলি পুরাণ ও বেশ কিছু কাহিনি-নির্ভর সংস্কৃত গ্রন্থ লেখা হয়। মহাকাব্য দু'টি এবং পুরাণগুলি বাদ দিলেও সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাহিনি নির্ভর গদ্য-সাহিত্য গুলিতেও উপন্যাসের নানা লক্ষণ দেখা যায়। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে এই সংক্রান্ত আলোচনায় বলেছেন — ''সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্য — কথাসরিৎসাগর', 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'দশকুমারচরিত', 'কাদম্বরী' ইত্যাদির মধ্যেও বিশেষত্ববর্জিত, প্রথাবদ্ধ বর্ণনা-বাহুল্যের অন্তরালে উপন্যাসের মৌলিক উপাদানগুলি নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়।''[১] এই গ্রন্থগুলির সঙ্গে তিনি প্রাচীনকালে রচিত ঈসপের গল্প, সংস্কৃতে লেখা বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' এবং বৌদ্ধ জাতকগুলিতেও

উপন্যাসের অপরিহার্য উপাদান অর্থাৎ কাহিনি, চরিত্র এবং বাস্তবতার পরিচয় আছে বলে মন্তব্য করেছেন। গ্রন্থগুলি সবই ছোট ছোট গল্পে পূর্ণ। এই গল্পগুলি নীতিশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। এগুলিতে অনেকক্ষেত্রে মানুষের রূপকে চরিত্র হিসেবে পশুপক্ষীদের স্থান দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এগুলির মধ্যে বিশেষ করে বৌদ্ধ জাতকগুলির মধ্যে উপন্যাসের নানা লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন। তিনি ঈসপের গল্প, 'পঞ্চতন্ত্র' এবং বৌদ্ধ জাতকগুলির আলোচনাকালে 'পঞ্চতন্ত্র' এবং ঈসপের গল্পে কাল্পনিক অবস্থার চিহ্ন আছে মন্তব্য করেও বলেছেন — ''কিন্তু বৌদ্ধ জাতক সম্বন্ধে আমরা সেরূপ কোনো অসুবিধা ভোগ করিনা; আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার মধ্যেই তাহাদের মূল গভীরভাবে প্রোথিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উপন্যাস লেখকের মনোভাব (mentality) সম্পূর্ণভাবে প্রকট।''[২] আবার এক জায়গায় মহাকাব্যের সঙ্গে বৌদ্ধ জাতকগুলির তুলনা করে বলেছেন — ''মহাকাব্য জীবনের বীরত্বপূর্ণ, বৃহৎ বিকাশগুলিকেই ফুটাইয়া তোলে, প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনীগুলিকে, ঘরের ছোটখাটো হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখগুলিকে সাহিত্যের অযোগ্য বলিয়া অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া যায়। অথচ এই অতিপরিচিত ক্ষুদ্র বস্তুগুলিকে লক্ষ ও তাহাদের অন্তর্নিহিত রসটি উপভোগ করিবার প্রবৃত্তিতেই উপন্যাসের মৌলিক বীজ নিহিত আছে।''[৩]

বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এর সূচনা হয়েছিল কিছু গীতিকাবিতাধর্মী রচনার মধ্য দিয়ে। কারণ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত 'চর্যাপদ' গুলি সম্পর্কে যাই বলা হোক না কেন, এগুলি মূলতঃ গীতিকবিতা। এরপর বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে পদার্পণ করলে সাহিত্যিকেরা আখ্যান কাব্য রচনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। মধ্যযুগের প্রথম রচনা খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি একটি আখ্যান কাব্য। এখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনা আছে। তবে কাহিনি, চরিত্র, বাস্তবতার দিক থেকে এই কাব্যটির মধ্যে উপন্যাসের যথেষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পর পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ কাব্য রচনা শুরু হয়। অনুবাদ কাব্যগুলি মূলতঃ প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্যের অনুবাদ হওয়ায় এগুলিতে

মহাকাব্যের লক্ষণই বেশি প্রস্ফুটিত। তবে মঙ্গলকাব্যগুলি অনেকটাই উপন্যাসের আদলে লেখা। এই সংক্রান্ত আলোচনায় চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারার তথা সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রশংসা করে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''এই শ্রেণীর প্রধান কাব্য মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ-চন্ডী'তে স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তবচিত্রে, দক্ষ চরিত্রাঙ্কণে, কুশল ঘটনা সন্নিবেশে, ও সর্বোপরি, আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধস্থাপনে, আমরা ভবিষ্যৎকালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি। মুকুন্দরাম কেবল সময়ের প্রভাব অতিক্রম করিতে, অতীত প্রথার সহিত আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে, অলৌকিকতার হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই একজন খাঁটি ঔপন্যাসিক হইতে পারেন নাই। দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এযুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।''[৪]

এগুলি ছাড়াও মধ্যযুগে রচিত চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলিতে, আরাকান রাজসভায় রচিত সাহিত্যগুলিতে, নাথ-সাহিত্যে, ময়মনসিংহ গীতিকায় এবং বাংলার নানা লৌকিক গল্প ও রূপকথার মধ্যে উপন্যাসের অনেক লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের জীবনকে আধার করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনেকগুলি কাব্য রচিত হয়েছিল। এগুলিতে চৈতন্যদেবের জীবনের নানা দিক তুলে ধরে তাঁকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু কাব্যগুলিতে যেভাবে চৈতন্যদেবের জীবনের সঙ্গে তৎকালীন সমাজের রীতি-নীতি, চাল-চলন, রুচি আদর্শ, সাধারণ লোকের প্রতিদিনের জীবন পরিক্রমা, তীর্থপর্যটন, ধর্মবিষয়ক বিচার-বিতর্ক প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ উঠে এসেছে যে, এগুলিকে সমকালীন যুগের বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি বললে খুব একটা ভুল বলা হয় না। এই গ্রন্থগুলির অলৌকিক অংশসমূহকে বাদ দিলে এগুলিকে খুব সহজেই আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যায়। আরাকান রাজসভার সাহিত্যে বিশেষ করে দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী' বা 'সতীময়না' কাব্যে কাহিনি পরিকল্পনা, ঘটনা সংস্থাপন, চরিত্র চিত্রণ, বাস্তবতার মত উপন্যাসের উপযোগী অনেক উপকরণ আছে। সৈয়দ আলাওলের কাব্যেও বিশেষ

করে ‘পদ্মাবতী’তে উপন্যাস উপযোগী কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নাথ-সাহিত্যগুলিও কাহিনির উপকরণ নিয়ে সৃষ্ট। নাথ সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতাদর্শের সূচনা কবে তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে বাংলা সাহিত্য সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ধর্মমত সংক্রান্ত দু’টি কাহিনি প্রচলিত আছে — ‘গোরক্ষবিজয়’ ও ‘গোপীচন্দ্রের গান’। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাহিনিগুলির মধ্যেও বিচ্ছিন্ন ভাবে হলেও বাস্তবতার উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। এমনকি তিনি এই উপাদানগুলির সঙ্গে কিছু আধুনিক উপন্যাসের সাদৃশ্যও খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন — ‘‘মোটের উপর নাথ-সাহিত্যে বাস্তবতার যে বিচ্ছিন্ন উপাদান আবিষ্কার করা যায়, তাহা অতি আধুনিক ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর রচনার — যথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ বা সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’র ক্ষীণ পূর্বাভাস রূপে উপস্থাপিত হইতে পারে।’’[৫] পূর্ববঙ্গের নিরক্ষর কৃষকদের মুখ থেকে সংগৃহীত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ‘ময়মনসিংহ-গীতিকা’ বা ‘পূর্ববঙ্গ-গীতিকা’গুলিও উপন্যাসের উপাদানে পূর্ণ। এগুলিতে বাস্তবতার নিরিখে মানব জীবন সংক্রান্ত নানা কাহিনি স্থান পেয়েছে। মুসলমানী সাহিত্যের গল্পভান্ডার বিশেষ করে ‘আরব্য উপন্যাস’, ‘হাতেমতাই’, ‘লয়লা-মজনু’, ‘চাহার-দরবেশ’, ‘গোলে-বকাওলি’র মত আখ্যায়িকাগুলি বহুদিন পর্যন্ত বাঙালীর অত্যন্ত আগ্রহের সামগ্রী হিসেবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। তবে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এগুলির স্থায়ী প্রভাব তেমনভাবে পড়েনি।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে সমস্ত রচনার উল্লেখ করা হল সেগুলি কোনোটাই উপন্যাস নয়। কারণ এগুলির মধ্যে বেশিরভাগ রচনাই কল্পনা নির্ভর অলৌকিক বা অতিলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। অনেকগুলিতেই সরাসরি ধর্মীয় প্রভাব পড়েছে। শুধু এগুলির কাহিনি তথা আখ্যান ভাগের বাস্তবরস এই রচনাগুলিকে উপন্যাসের আলোচনায় টেনে আনে। উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়েও অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাহিত্য প্রকরণটির গল্প তথা আখ্যান অংশের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন — ‘‘গল্প বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি মানুষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম; এবং এই সর্বদেশ সাধারণ গল্পের মধ্যেই উপন্যাসের মৌলিক বীজ নিহিত ছিল। এই গল্প বলিবার বিশেষ একটি ভঙ্গীকে — গল্পের মধ্য দিয়া মানুষের

প্রকৃত জীবনের ছবি আঁকিবার চেষ্টা, ঘটনা-সংঘাতে তাহার চরিত্রস্ফুরণের উদ্‌যোগ, সামাজিক মানুষের মধ্যে যে অহরহঃ একটা আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহারই সূক্ষ্ম আলোচনা, ও এই দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্য দিয়া মনুষ্য-জীবন সম্বন্ধে একটা বৃহত্তর, ব্যাপকতর সত্যকে ফুটাইয়া তোলা — ইহাকেই উপন্যাস বলা যাইতে পারে।''[৬]

বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত সূচনা হয়েছে আধুনিক যুগে — ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে গদ্যভাষার জন্মের পর। বাংলা উপন্যাস রচনার এই প্রবণতায় প্রথমদিকে বাঙালী লেখকেরা বিশেষ করে প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ একটি স্বতন্ত্র রীতিতে যাত্রা শুরু করছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটলে সেই রীতি পিছু হটে; তিনি প্রথম পাশ্চাত্যের ইংরেজি রীতিতে সার্থক বাংলা উপন্যাস লেখেন 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ)। তখন থেকে বাংলা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে এই পাশ্চাত্যের রীতিই গৃহীত হয়। বাংলায় প্রথম সার্থক উপন্যাস রচিত হওয়ার পূর্বে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে একটি সফল শিল্প মাধ্যম হিসেবে উপন্যাসের আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটে গেছে। এজন্য উপন্যাসের আবির্ভাব ও বিবর্তনের রূপরেখা নির্ণয় করতে গেলে আমাদের পাশ্চাত্যের শরণাপন্ন হতে হয়।

উপন্যাসের আবির্ভাব সংক্রান্ত আলোচনায় ঢোকার পূর্বে বাংলা উপন্যাসের প্রখ্যাত সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে তিনি পদ্যে গাথা প্রাচীন মহাকাব্যকে উপন্যাসের 'সুদূর পূর্বপুরুষ' বলেছেন। কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন যে, এখানেও উপন্যাসের মত সেই সব কাহিনি আছে, যাতে ঘটনা-সংস্থান-কৌশল এবং চরিত্র প্রধান উপাদান। পাশাপাশি তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের বৌদ্ধ জাতকের গল্পগুলি এবং 'দশকুমারচরিত'-এর উল্লেখ করে জানিয়েছেন — ''এশিয়াতেও গদ্যে গাথা কাহিনীর মধ্যে বাস্তবকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রবণতা অনেক দিনের।''[৭] তবে উপন্যাসের আবির্ভাবের কথা বলতে গিয়ে এই গ্রন্থের অন্যত্র বলেছেন — ''কোনো কোনো ব্যক্তির মধ্যে যেমন কখনো কখনো সময়ের অগ্রবর্তী চেতনার উন্মেষ দেখা যায়,

কোনো কোনো রচনাতেও তার ছায়াই পড়ে। ছায়া লক্ষণের দ্বারা কোনো সাহিত্যের যুগ নির্ণয় হয় না। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে লেখা শ্রীমতি মুরাসাকির (Lady Shikibu Murasaki) 'গেন্‌জির কাহিনী' ('Genji Monogatari' বা 'A Tale of Genji) . . . জাপানি সাহিত্যে এবং বিশ্ব সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস এবং উপন্যাস-কল্প রচনা। যাই হোক না কেন এটা উপন্যাসের যুগারম্ভসূচক বলে গৃহীত হতে পারবে না।''[৮] এখানে তিনি মুরাসাকির 'গেন্‌জির কাহিনী'কে বিশ্বসাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে মন্তব্য করেও এটি রচনার সময়কালকে উপন্যাসের প্রারম্ভিক কাল বলে মানতে চান নি। বিষয়টি অনেকটাই স্বাভাবিক। বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃত যাত্রা শুরু হয় পাশ্চাত্যে — অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তবে পাশ্চাত্যের ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন প্রভৃতি দেশে উপন্যাস জাতীয় রচনার লেখার প্রবণতা শুরু হয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সূচনাপর্ব থেকেই বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকেরা নিজেদের রচনায় গল্প তথা আখ্যানকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। আনুমানিক সপ্তম-অষ্টম খ্রিস্টপূর্বাব্দে হোমার (Homer — আনুমানিক ৮ম খ্রি. পূ.) রচিত প্রাচীন গ্রিসের দু'টি মহাকাব্য ইলিয়াড (Iliad) এবং ওডিসি (Odyssey)-তে গল্প বা আখ্যান অংশ যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। রোমান কবিদের মধ্যে ভার্জিল (Publius Vergilius Maro — ৭০-১৯ খ্রি.পূ.)-এর 'ঈনিড' (Aeneid), ওভিদ (Publius Ovidius Naso — ৪৩ খ্রি.পূ.-১৭/১৮ খ্রিস্টাব্দ)-এর 'মেটামরফসিস' (Metamorphoses), দান্তে (Dante Alighieri — ১২৬৫-১৩২১ খ্রিস্টাব্দ)-এর 'ডিভাইন কমেডি' (Devine Comedy) প্রভৃতি রচনা হল মহাকাব্যের ধরনের লেখা আখ্যান কাব্য। তবে এই রচনা গুলিতে অলৌকিক বা অতিলৌকিক বিষয় প্রচুর পরিমাণে থাকায় উপন্যাসোচিত বাস্তবতা তেমন লক্ষিত হয় না। ইউরোপে উপন্যাস জাতীয় রচনা লেখা শুরু হয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এবিষয়ে যে দু'জনের নাম প্রথম উল্লেখ করতে হয়। তাঁরা হলেন গিওভানি বোকাচ্চিও (Giovanni Boccaccio — ১৩১৩-১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দ) এবং জিয়ফ্রে চসার (Geoffrey Chaucer — ১৩৪৩-১৪০০ খ্রিস্টাব্দ)। 'ডেকামেরন' (Decameron — ১৩৪৯-১৩৫২ খ্রিস্টাব্দ)-এর স্রষ্টা

বোকাচ্চিও ছিলেন ইতালির মানুষ। আর 'ক্যান্টারবেরি টেলস' (Canterbury Tales — চতুর্দশ শতকের শেষদিকে লেখা)-এর স্রষ্টা চসার ছিলেন ইংলন্ডের মানুষ। তবে এঁদের রচনাগুলিতে উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পের লক্ষণ বেশি প্রকটিত হয়েছে। পাশ্চাত্যে প্রথম উপন্যাস জাতীয় রচনা লেখা শুরু হয় জার্মাণ বিজ্ঞানী জোহানেস গুটেনবার্গ (Johannes Gutenberg — ১৩৯৫-১৪৬৮ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক ছাপাখানা আবিষ্কারের পর থেকে। ফরাসী সাহিত্যিক রাব্‌লে (Rabelais — আনুমানিক ১৪৯০-১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ) এবং স্পেনীয় সাহিত্যিক সার্‌ভ্যান্‌টিস্‌ (Miguel De Cervantes -- ১৫৪৭-১৬১৬ খ্রিস্টাব্দ)-এর রচনায় প্রথম উপন্যাসের লক্ষণ প্রকট হতে শুরু করে। রাব্‌লের 'পাঁতাগ্রুয়েল' (Pantagruel — ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ), 'গার্গাঁতুয়া' (Gargantua — ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দ) এবং সার্‌ভ্যান্‌টিসের 'ডন কুইকজোট' (Don Quixote — ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ) রচনাগুলিতে উপন্যাসের অনেক লক্ষণ আছে। এই প্রসঙ্গে দেবীপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'উপন্যাসের কথা' গ্রন্থে বলেছেন — ''১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে রাবলের মৃত্যু হয়। তাঁর জন্মের অর্ধশতাব্দী পরে দেখা দিলেন স্পেনীয় সমাজে নবোত্থিত বুর্জোয়া পরিবারের সন্তান সার্‌ভ্যান্‌টিস্‌ (১৫৪৭-১৬১৬ খ্রিস্টাব্দ)। স্পেনীয় সাহিত্যের পালে নবযুগের হাওয়া তিনি প্রবাহিত করলেন। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে যখন 'ডন কুইকসোট' (Don Quixote de le Mancha)-এর প্রথম খণ্ড বার হল তখনই আধুনিক উপন্যাসের পূর্বভূমিকা প্রসারিত হল বলতে পারি।''[৯] এই প্রসঙ্গে আর একজনের উল্লেখ করতে হয়। ইনি হলেন ইংরেজ কবি স্পেন্সার (Edmund Spenser — ১৫৫৩-১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দ)। ষোড়শ শতকের শেষ দশকে লেখা তাঁর 'ফেয়ারি কুইন' (The Faerie Queene — ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে লেখা) কবিতাটিতে রূপকের মধ্য দিয়ে সমকালীন জনজীবনের কথা বাস্তব সম্মত ভাবে উঠে এসেছে। তবে প্রকৃত উপন্যাস ধর্মী লেখা শুরু হয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে — প্রথমে ইংলন্ডে শুরু হয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

পাশ্চাত্যের সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর উপন্যাস বা উপন্যাস জাতীয় রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে ঢোকার আগে মধ্যযুগের দু'টি বিশেষ ধরনের রচনার দিকে দৃষ্টি

দিতে হয়। একটি হল মধ্যযুগীয় ইতালির ‘নভেল্লা’ (Novella) এবং অপরটি স্পেনের ‘পিকারেস্ক নভেল’ (Picaresque Novel)। ‘নভেল্লা’ শব্দটি থেকেই ‘নভেল’ কথাটির উৎপত্তি। এই ‘নভেল’-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ‘উপন্যাস’ শব্দটি প্রচলিত আছে। 'Novella' একটি ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ 'a little new thing' অর্থাৎ একটি ছোট নতুন জিনিস। বোকাচ্চিও-এর ‘ডেকামেরণ’ গ্রন্থের রচনাগুলি এক একটি ‘নভেল্লা’। ‘নভেল্লা’ হল আসলে আকারের দিক থেকে বড়গল্পধর্মী রচনা। ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনে নৈতিকতার দিক থেকে নিম্ন শ্রেণির অর্থাৎ চোর, গুন্ডা, বদমাইশ, লম্পট প্রকৃতির মানুষদের নিয়ে এক ধরনের বাস্তবধর্মী রচনা প্রকাশিত হতে শুরু করে। পরবর্তীকালে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ধরনের রচনা স্পেন ছাড়িয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও লেখা শুরু হয়। এমনকি ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতেও ইউরোপে এই রকম লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এই লেখাগুলিকে ‘পিকারেস্ক নভেল’ বলে। আর রোমান্স হল পদ্য বা গদ্যে রচিত প্রেম-শৌর্য-বীর্যের অতিলৌকিক বা অলৌকিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত শিশুমনের উপযোগী কল্প-নির্ভর একধরনের আখ্যান জাতীয় রচনা। এগুলি পড়ে বড়োরা আনন্দ পেলেও এগুলির মধ্যে বাস্তবরস তেমন থাকে না বললেই চলে। এজন্য মধ্যযুগের রোমান্সের সঙ্গে উপন্যাসের তেমন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রোমান্সের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিবর্তনের দিকে লক্ষ রেখে বলেছেন — ‘‘আধুনিক রোমান্সও বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যের কঠোর সংযম স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রোমান্সের জগতেও আর অতিপ্রাকৃত বা অবিশ্বাস্যের কোনো স্থান নাই।’’[১০]

বিশ্বসাহিত্যে প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসজাতীয় রচনা প্রকাশিত হতে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটেনে। এই প্রসঙ্গ দুইজনের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। এঁরা হলেন ডানিয়েল ডিফো (Daniel Defoe — ১৬৬০-১৭৩১ খ্রিস্টাব্দ) এবং জোনাথন সুইফ্‌ট (Jonathan Swift — ১৬৬৭-১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দ)। ডিফোর ‘রবিনশন ক্রুশো’ (Robinson Crusoe - ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দ) ও ‘মল ফ্লান্ডার্স’ (Moll Flanders - ১৭২২ খ্রিস্টাব্দ) এবং সুইফ্‌ট-এর ‘গালিভার্‌স্‌ ট্রাভেলস্‌’ (Gulliver`s Travels -

১৭২৬ খ্রিস্টাব্দ) রচনাটিতে উপন্যাসের অনেক লক্ষণ ফুটে উঠেছে। এর আগের শতকে লেখা জন বানিয়ান (John Buniyan — ১৬২৮–১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দ)–এর 'দি পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস' (The Pailgrim`s Progress - ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থটিকেও উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত রচনা বলা হয়। তবে প্রকৃত উপন্যাস বলতে যা বোঝায়, তার সমস্ত লক্ষণ 'রবিনশন ক্রুশো', 'মল ফ্ল্যান্ডার্স', 'গালিভার্স্ ট্রাভেলস্' বা 'পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস'–এ পুরোমাত্রায় নেই। উপন্যাসের লক্ষণ পুরোমাত্রায় প্রথম ফুটে ওঠে স্যামুয়েল রিচার্ডসন (Samuel Richardson — ১৬৮৯–১৭৬১ খ্রিস্টাব্দ)–এর 'পামেলা' (Pamela - ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ)–তে। এটি আসলে গদ্যভাষায় পত্রাকারে লেখা একটি আখ্যান জাতীয় রচনা হওয়ায় একে পত্রোপন্যাসও বলা হয়। এই 'পামেলা'কে ইংরেজি সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে স্যামুয়েল রিচার্ডসনের হাতে উপন্যাস নামক যে শিল্প মাধ্যমটির সার্থক সূচনা হয়, তাঁর সমকালেই অনেকের সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাতে নানাভাবে বিবর্তন আসতে শুরু করে। উপন্যাসের এই বিবর্তনে রিচার্ডসন তো বটেই, তাঁর সঙ্গে জর্জ স্মোলেট (George Smollett — ১৭২১–১৭৭১), হেনরি ফিল্ডিং, (Henry Fielding — ১৭০৭–১৭৫৪), লরেন্স স্টার্ন (Lawrence Stern — ১৭১৩–১৭৬৮) প্রমুখও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এতে এর বিষয়বস্তু, চরিত্রায়ন, প্রকাশভঙ্গি থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ফলে উপন্যাসের ক্ষেত্রে পত্রোপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের মত নানা বিভাগের জন্ম হয়। উপন্যাসের এই বিভাগগুলির মধ্যে একটি অন্যতম বিভাগ হল 'Regional Novel' বা 'আঞ্চলিক উপন্যাস'। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আইরিশ লেখিকা মারিয়া এজওয়ার্থের 'ক্যাসল র‍্যাকরেন্ট' উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে বিশ্বসাহিত্যে এই আঞ্চলিক উপন্যাস বিভাগটির শুভারম্ভ হয়।

ইংরেজি সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যে প্রথম আঞ্চলিক উপন্যাস লেখেন আইরিশ লেখিকা মারিয়া এজওয়ার্থ (Maria Edgeworth — ১৭৬৮–১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য (U.K)-এর অন্তর্গত আয়ারল্যান্ডের একটি বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে তাঁর 'ক্যাসল র‍্যাকরেন্ট' (Castle Rackrent) উপন্যাসটি রচনা করেন। এই উপন্যাসটিতে প্রথম মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চল এবং সেখানকার ভৌগোলিক প্রকৃতিসহ মানুষজনের জীবনচর্যার নানা রূপ পুরোপুরি আঞ্চলিক রঙ্ (local colour) নিয়ে প্রকাশিত হয়। মারিয়া এজওয়ার্থ আঞ্চলিক উপন্যাস লেখার যে পথ দেখান, সেই পথ ধরে তাঁর পরবর্তীকালে ইংরেজি সাহিত্যের অনেক ঔপন্যাসিকই আঞ্চলিক উপন্যাস রচনা করেছেন। ফলে ইংরেজি সাহিত্যে প্রচুর আঞ্চলিক উপন্যাস রচিত হয়েছে। এই ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্কটিশ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট (Sir Walter Scott — ১৭৭১-১৮৩২)। স্যার স্কট তাঁর 'ওয়েভারলি' ('Waverly' - ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ), 'রব রয়' 'Rob Roy' - ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ)-এর মত উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে পটভূমি হিসেবে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত স্কটল্যান্ডের সীমান্তবর্তী অঞ্চল, সেখানকার ভৌগোলিক প্রকৃতি এবং মানুষজনের জীবনচর্যার বাস্তবসম্মত বিবরণ তুলে এনেছেন। ফলে এই উপন্যাসগুলি একটি বিশেষ আঞ্চলিক রঙ্ বা local colour-কে প্রস্ফুটিত করে ইংরেজি সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে। স্যার স্কট-এর পরে আর এক স্কটিশ ঔপন্যাসিক জন গল্ট (John Galt — ১৭৭৯-১৮৩৯) তাঁর 'দ্য প্রোভোস্ট' ('The Provost' - ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসে স্কটল্যান্ডের আয়ারশায়ার (Ayrshire) অঞ্চল ও সেখানকার জনজীবনের বাস্তব ছবি তুলে এনে উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। ইংল্যান্ডের ব্রন্টে ভগ্নীদ্বয় (Emily Bronte — ১৮১৮-১৮৪৮ ও Charlotte Bronte — ১৮১৬-১৮৫৫) নিজেদের উপন্যাসে ইয়র্কশায়ারের তৃণভূমি আচ্ছাদিত (Yorkshire Moore) অঞ্চলকে তুলে এনে ইংরেজি সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। দু'জনেই ছিলেন স্বল্পায়ু। এঁদের মধ্যে ছোটবোন এমিলি লেখেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'উইদারিং হাইট্স' ('Wuthering Heights' - ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ)। আর বড়বোন শার্লট লেখেন 'শার্লি' (Shirley - ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ)। এই উপন্যাস দু'টিই আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বীকৃতি পেয়েছে। ইংরেজ ঔপন্যাসিক অ্যান্টনি

ট্রোলোপে (Anthony Trollope — ১৮১৫–১৮৮২) বারসেটশায়ার (Barsetshire) নামক ইংল্যান্ডের একটি কাল্পনিক গ্রামাঞ্চল (সম্ভবত ইংল্যান্ডের ডোরসেট (Dorset) কাউন্টি)–কে পটভূমি করে বেশ কয়েকটি উপন্যাস লেখেন। এগুলি হল — 'দ্য ওয়ার্ডেন ('The Warden' – ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ), 'বারচেস্ট টাওয়ার্স' ('Barchest Towers – ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ), 'ডক্টর থর্ন' ('Doctor Thorne' – ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ), 'ফ্রেমলি পার্সোনেজ' ('Framley Personage – ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ), 'দ্য স্মল হাউস ওফ অ্যালিংটন' ('The Small House of Allington' – ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ) এবং 'দ্য লাস্ট ক্রনিকল ওফ বারসেট' ('The Last Chronicle of Barset' – ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ)। এই উপন্যাসগুলিতে বারসেটশায়ার নামক সেই কাল্পনিক কাউন্টি এবং সেখানকার মানুষের জীবনচর্যা এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, উপন্যাসগুলি আঞ্চলিক উপন্যাসের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। আর একজন ইংরেজ ঔপন্যাসিক এলিজাবেথ গাসকেল (Elizabeth Gaskell — ১৮১০–১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ) ইংল্যান্ডের ক্রানফোর্ড (Cranford) অঞ্চলকে পটভূমি করে তাঁর 'ওয়াইভস অ্যান্ড ডটার্স' ('Wives and Daughters' – ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ) নামক আঞ্চলিক উপন্যাসটি রচনা করেন। ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জর্জ এলিয়ট (George Elliot — ১৮১৯–১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ) বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক উপন্যাস লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন। এর মধ্যে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের লোয়ামশায়ার (Loam shire) অঞ্চলকে নিয়ে তিনি লেখেন 'অ্যাডম বেদে' ('Adam Bede' – ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ) এবং 'ফেলিক্স হল্ট' ('Felix Holt' – ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাস দু'টি। আর মিডল্যান্ড (Midland) অঞ্চলকে নিয়ে তিনি লেখেন তাঁর 'মিডলমার্চ' ('Middlemarch' – ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি। এই তিনটি উপন্যাসেই মূল জনসমাজের মধ্যেও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করা কোনো অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ সহ সেখানকার সাধারণ নরনারীর জীবনচিত্র স্থান পেয়েছে। ইংরেজি উপন্যাসের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার অন্যতম রূপকার ছিলেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক রিচার্ড ব্ল্যাকমোর (R. D. Blackmore – ১৮২৫–১৯০০ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর অনেকগুলি উপন্যাস আঞ্চলিক উপন্যাসের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। যেমন — 'ক্র্যাডক নওয়েল : এ টেইল ওফ দ্য নিউ ফরেস্ট' ('Cradock Nowell : a tell of the

new Forest' - ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ), 'লোর্না দুন : এ রোমান্স অফ এক্সমুর' ('Lorna Doone : a romance of Exmoore' - ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ), অ্যালিস লর্য়েন : এ টেইল অফ দ্য সাউথ ডন' ('Alice Lorraine : a tale of the South Down' - ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ), 'ম্যারি অ্যানারলি : এ ইয়র্কসায়ার টেইল' ('Mary Anerley : a Yorkshire tale' - ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ), ক্রিস্টোয়েল : এ ডার্টমুর টেইল' (Christowell : a dartmoor tale (১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ), 'কিট অ্যান্ড কিট্টি : এ স্টোরি অফ ওয়েস্ট মিডলসেক্স' ('Kit and Kitty : a story of west Middlesex' - ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ), 'ডারিয়েল : এ রোমান্স অফ সারে' ('Dariel : a romance of Surrey' - ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি। এই উপন্যাসগুলির পটভূমি হিসেবে তিনি ইংল্যান্ডের বিভিন্ন কাউন্টি (County)-কে গ্রহণ করেছেন। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের উইল্টশায়ার (Wiltshire)-অঞ্চলকে পটভূমি করে রিচার্ড জেফারিস (Richard Jefferies — ১৮৪৮-১৮৮৭) তাঁর 'দ্য গেমকিপার অ্যাট হোম : স্কেচেস অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি অ্যান্ড রুরাল লাইফ' ('The Gamekeeper at Home : Sketches of Natural History and Rural Life' - ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি লেখেন। এটিও একটি আঞ্চলিক উপন্যাস।

এঁদের পর ইংরেজি সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন টমাস হার্ডি (Thomas Hardy — ১৮৪০-১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ)। ইংল্যান্ডের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত ওয়েসেক্স (Wessex) অঞ্চলকে নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস লেখেন। তাঁর এই উপন্যাসগুলিতে ওয়েসেক্স অঞ্চলটি এতটাই স্থান জুড়ে আছে যে, এই উপন্যাসগুলি একসঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে 'Wessex Novel' বলে নিজেদের স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে। হার্ডি রচিত এই 'Wessex Novel' গুলি হল — 'ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড' ('Far from the Madding Crowd - ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ), 'দ্য মেয়র অফ ক্যাস্টারব্রিজ' ('The Mayor of Casterbridge' - ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ), 'টিজ অফ দ্য ড'উর্বেভিল্লেস' ('Tess of the d'Urbervilles' - ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ), 'জুড দ্য অবস্কিয়র' ('Jude the Obscure' - ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি। এগুলির প্রত্যেকটিতেই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানাদিক থেকে বিচ্ছিন্ন ওয়েসেক্স অঞ্চল এবং সেখানকার

অধিবাসীদের জীবনচর্যা ‘আঞ্চলিক রঙ্’ (local colour) সহকারে পরিবেশিত হয়ে উপন্যাসগুলিকে অত্যন্ত সফল আঞ্চলিক উপন্যাস করে তুলেছে। ইংরেজ ঔপন্যাসিক কনস্ট্যান্স হল্‌ম (Constance Holme — ১৮৮১-১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর জন্মস্থান ইংল্যান্ডের ওয়েস্টমুরল্যান্ড (Westmorland) অঞ্চলকে পটভূমি করে ‘দ্য লোনলি প্লাউ’ ('The Lonely Plough' -১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ), ‘দ্য স্প্লেন্ডিড ফেইরিং’ ('The Splendid Fairing' -১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) এবং ‘দ্য ট্রাম্পেট ইন দ্য ডাস্ট’ ('The Trumpet in the Dust' -১৯২১ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাস তিনটি লিখেছেন। এই উপন্যাসগুলিও আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বীকৃতি পেয়েছে। উইনিফ্রেড হোল্টবাই (Winifred Holtby — ১৯৯৮-১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ)-এর ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের ইয়র্কশায়ার অঞ্চলকে পটভূমি করে লেখা ‘সাউথ রাইডিং’ও ('South Riding' -১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) একটি আঞ্চলিক উপন্যাস। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য (U. K)-এর অন্তর্গত ওয়েলস্ (Welsh) সীমান্তবর্তী অঞ্চলকে নিয়ে মেরি ওয়েব (Mary Webb — ১৮৮১-১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ), মার্গিয়াড এভানস্ (Margiad Evans — ১৯০৯-১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ) এবং জেরান্ট গুডউইন (Geraint Goodwin — ১৯০৩-১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ) বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

পাশ্চাত্যের আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলেন আমেরিকান ঔপন্যাসিক উইলিয়াম ফক্‌নার (William Faulkner — ১৮৯৭-১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি নিজ বাসভূমি আমেরিকার মিসিসিপির অন্তর্গত ‘ইয়োকনাপটফা কাউন্টি’ (Yoknapatawpha County) নামক একটি কাল্পনিক অঞ্চলকে পটভূমি করে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক উপন্যাস লিখে বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষিতে নিজের উজ্জ্বল নিদর্শন রেখে গেছেন। তাঁর এই ধরনের উপন্যাসগুলি হল — ‘সার্টোরিস’ ('Sartoris' -১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ), ‘দ্য সাউন্ড অ্যান্ড দ্য ফিউরি’ (The Sound and the Fury' -১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ), ‘অ্যাস আই লে ডায়িং’ ('As I lay Dying' -১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ), ‘অ্যাবস্যালম! অ্যাবস্যালম!’ ('Absalom! Absalom!' -১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি। এই উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটি আঞ্চলিকতার রঙ্-এ রাঙানো। এগুলি সবই সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের আঞ্চলিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত দিতে গেলে

আর একজন ইংরেজ ঔপন্যাসিকের নাম করতে হয়। ইনি হলেন এযুগের ঔপন্যাসিক অ্যালান সিলোটে (Alan Sillitoe - ১৯২৮–২০১০ খ্রিস্টাব্দ)। ইনি ১৯২০ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী নটিংহাম শহর (Nottingham city)–কে পটভূমি করে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক উপন্যাস লেখেন। এগুলি হল — 'স্যাটারডে নাইট অ্যান্ড সানডে মর্নিং' ('Saturday Night and Sunday Morning' - ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ), 'কি টু দ্য ডোর' ('Key to the Door' - ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ), 'দ্য ওপেন ডোর' ('The Open Door' - ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ), 'দ্য ডেথ অফ উইলিয়াম পোস্টারস' ('The Death of William Posters' - ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি।

পাশ্চাত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব নিয়ে আলোচনার পর, আমাদের বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা শুরু হয়। তখন থেকে বাংলা উপন্যাসের যে ধারার সূত্রপাত হয়, সেই ধারা বেয়েই বিশ শতকের বিশের দশকে পৌঁছে বাংলা সাহিত্যের ঔপন্যাসিকেরা আঞ্চলিক উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা শুরু করেন। তবে এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে বাংলায় মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) এবং তাঁর অনুগামীদের দ্বারা যে সকল উপন্যাস রচিত হয়েছিল, সেগুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইতিহাস নির্ভর রোমান্স কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে। অবশ্য এই সময়কালে রচিত কিছু উপন্যাসে বাংলার গ্রামজীবনের কথা এসেছে, তবে সেগুলিতে জমিদার নিয়ন্ত্রিত গ্রামসমাজের কাহিনিই প্রাধান্য পেয়েছে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬–১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ)–এর মত বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পাল সাহিত্যিকেরাও উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন বিশ্বকবি। তাঁর কিছু কবিতায় (মানসী, সোনার তরী প্রভৃতি কাব্যের বিভিন্ন কবিতা), চিঠিপত্রে (ছিন্নপত্রাবলীর নানা চিঠি), ছোটগল্পে (পোস্টমাস্টার, অতিথি, সমাপ্তি প্রভৃতি) পূর্ববঙ্গের পদ্মাতীরবর্তী শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রভাব পড়লেও তাঁর কোনো রচনাকেই 'আঞ্চলিক রচনা' বলে সীমায়িত করা যায় না। 'ঘরে বাইরে' বা 'শেষের কবিতা'র মত উপন্যাসের ক্ষেত্রে পটভূমি হিসেবে কোনো একটি বিশেষ অঞ্চল এলেও এর মধ্যে

একটিও আঞ্চলিক উপন্যাসের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় নি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই উপন্যাস দু'টির তাৎপর্য অন্যত্র। তুলনায় শরৎচন্দ্রের বেশ কিছু উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণ অনেক বেশি প্রকটিত হয়েছে। তিনি মূলতঃ বাংলার গ্রামাঞ্চল এবং সেখানকার মানুষজনের ছোট-বড় নানা সমস্যাকে কেন্দ্র করে তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর 'বড়দিদি' 'পণ্ডিতমশাই', 'চন্দ্রনাথ' 'দেবদাস' 'পল্লীসমাজ', 'অরক্ষণীয়া', 'বামুনের মেয়ে', 'দত্তা', 'দেনাপাওনা' প্রভৃতি উপন্যাসের পটভূমি বাংলার কোনো না কোনো গ্রামাঞ্চল। এই উপন্যাসগুলিতে সেই গ্রামাঞ্চলের বিশেষরূপও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু উপন্যাসগুলিতে বর্ণিত গ্রামাঞ্চলগুলি কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাংলার যে কোনো গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। ফলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে গ্রামজীবনের কথা থাকলেও আঞ্চলিক উপন্যাসে যে আঞ্চলিক রঙ্ (Local Colour)-এর উপর জোর দেওয়া হয়, তার একান্তই অভাব পরিলক্ষিত হয়। এজন্য শরৎচন্দ্রের কোনো উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাসের তক্‌মা দেওয়া যায় না। তবে শরৎচন্দ্রের জীবিতকালেই বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস রচনার প্রবণতা শুরু হয়েছে।

বিশ শতকের বিশের দশক থেকেই বাংলা উপন্যাস আঞ্চলিকতার দিকে বাঁক নিতে শুরু করে। এইসময় 'কল্লোল' (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) নামক সাহিত্য পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে বাংলা কথাসাহিত্যে দিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। তবে বাংলা সাহিত্যে অঞ্চল জীবন নির্ভর ছোটগল্প 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশের আগেই শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)-এর হাতে রচিত হয়েছে। তাঁর বিশিষ্ট অঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে লেখা 'কয়লাকুঠি' গল্পটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিকতার সূচনা ঘটে। শৈলজানন্দ ছাড়াও এইসময় বাংলা উপন্যাস তথা কথাসাহিত্যের দিক পরিবর্তনে যে দু'জন এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের কাউকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক হিসেবে গণ্য করা হয় না, ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁরা আপামর পাঠক সাধারণের কাছে তেমন পরিচিতও হয়ে ওঠেন নি; কিন্তু এঁরাই বাংলা উপন্যাসকে গতানুগতিকতার ধারা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এই দু'জন হলেন

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪–১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ) ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩–১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)। এঁদের রচিত যথাক্রমে 'পাঁক' ও 'বেদে' উপন্যাস দু'টিতে প্রথম গতানুগতিকতা ভেঙে বাংলা উপন্যাসে পটভূমি হিসেবে পরিচিত গন্ডীর বাইরে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র কোনো অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষের জীবনচর্যা স্থান পায়। এই উপন্যাস দু'টির একটিও সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে না উঠলেও এই উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হবার পর থেকেই বাংলা কথাসাহিত্যের পট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বাংলা কথাসাহিত্যের এই পট পরিবর্তনের ধারা বেয়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮–১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ), সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩–১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮–১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮–১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ), সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬–১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ)–দের মত অজস্র কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। এঁরা মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত থেকেও নানা ভাবে বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষের জীবনচর্যাকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলা উপন্যাস তথা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার যথার্থ আবাহন ঘটান, যা তাঁদের পরেও বিভিন্ন কথাসাহিত্যিকদের হাতে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজও বহমান আছে। অবশ্য সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারাতেও নানা বিবর্তন এসেছে। এই দীর্ঘ সময়কালে বাংলা সাহিত্যে অনেকেই আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন। ফলে বাংলা সাহিত্যে অনেকগুলি সার্থক ও জনপ্রিয় আঞ্চলিক উপন্যাস রচিত হয়েছে একথা সত্য, তবে কোনো বিশেষ অঞ্চলকে নিয়ে লেখা সব উপন্যাসই সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে এমন নয়। কারণ এর মধ্যে কিছু উপন্যাসে 'আঞ্চলিক রঙ্' পরিস্ফুট করলেও ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক উপন্যাসের সমস্ত লক্ষণগুলিকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি অথবা আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে গেছেন; সে ক্ষেত্রে এই উপন্যাসগুলি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস না হয়ে আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাস হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আমার গবেষণায় বিশ শতকে প্রকাশিত এই সমস্ত আঞ্চলিক উপন্যাস এবং আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত

উপন্যাসগুলির কথাই আসবে। তবে উপন্যাস ধরে ধরে আলোচনা শুরুর পূর্বে প্রথমেই আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে।

আমরা আগেই জেনেছি যে, বিভিন্ন দেশে উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা শুরু হলেও ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস লেখা হয়। ইংরেজি ভাষাতেই প্রথম Regional Novel বা আঞ্চলিক উপন্যাসও লেখা হয়। হয়তো এই কারণেই ইংরেজি ভাষাতেই আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও লক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনাও প্রথম শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে যাঁর কথা সবার আগে বলতে হয়, তিনি অবশ্য আমেরিকান। তাঁর নাম হল Meyer Howard Abrams, সংক্ষেপে M.H. Abrams (১৯১২ খ্রিস্টাব্দ)। শতাধিক বৎসর অতিক্রম করে আজও জীবিত থাকা এই সাহিত্য-তাত্ত্বিক তাঁর 'A Glossary of Literary Terms' (১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থে সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তাঁর এই আলোচনায় Regional Novel বা আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপের কথাও এসেছে। তিনি Regional Novel বা আঞ্চলিক উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনায় কোনো উপন্যাসে একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, ভাষা, সামাজিক গঠন ও রীতি-নীতির সমন্বয়ে এক ধরনের ‘আঞ্চলিক রঙ’ বা 'local color' ফুটে ওঠার কথা বলেছেন। তাঁর মতে এই ‘আঞ্চলিক রঙ’ বা 'local color' চরিত্রের মানসিকতা, ভাবনা-চিন্তা, অনুভূতি প্রকাশের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে যুক্ত। Regional Novel বা আঞ্চলিক উপন্যাস সম্পর্কে Abrams-এর বক্তব্যটি হল — "The regional novel emphasizes the setting, speech, and social structure and custom of a particular locality, not merely as *local color,* but as important conditions affecting the temperament of the characters and their way of thinking, feeling, and interacting."[১১] আঞ্চলিক উপন্যাসে বর্ণিত এই নির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে Abrams এই গ্রন্থেই Thomas Hardy-এর উপন্যাসের 'Wessex' এবং Faulkner-এর উপন্যাসের 'Yoknapatwapha County'-এর কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন — "Instances of such localities are "Wessex" in Thomas Hardy`s Novels, and "Yoknapatwapha County", Mississippi, in

Faulkner`s."[১২] শুধু তাই নয় Abrams তাঁর Regional Novel বা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় 'আঞ্চলিক রঙ্' বা 'local color'–এর উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই 'local color' সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি কোনো গদ্য আখ্যানে একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষজনের ভাষা, রীতি–নীতি, পোশাক–পরিচ্ছদ, চিন্তা–ভাবনা, আবেগ–অনুভূতি প্রভৃতির বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়াকে বুঝিয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি Thomas Hardy–এর "Wessex' এবং Rudyard Kipling–এর 'India'–এর কথা বলেছেন। পাশাপাশি আরও দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর Bret Harte, Mark Twain, George Washington Cable, E.M Howe, Hamlin Garlnd, Sarah Orne Jewett, Mary Wilkins Freeman, O Henry, Damon Runyon প্রমুখদের নানা আখ্যানধর্মী রচনায় 'আঞ্চলিক রঙ্' বা 'local color' উঠে এসেছে বলে উল্লেখ করেছেন — "The detailed representation in prose fiction of the setting, dialect, customs, dress and way of thinking and feeling which are distinctive of a particular region, such as Thomas Hardy`s "Wessex" or Rudyard Kipling`s India. After the Civil War a number of American writers exploited the literary possibilities of local color in various parts of America; for example, the West (Bret Harte), the Mississippi region (Mark Twain), the South (George Washington Cable), the Midwest (E.M Howe, Hamlin Garland), and new England (Sarah Orne Jewett and Mary Wilkins Freeman). The term 'local color fiction' is often applied to works which, like O Henry`s or Damon Runyon`s stories set in New York City rely for their interest mainly on a sentimental or comic representation of the surface particularities of a region; the term "regional fiction" is then used to distinguish those works which deal with more deep–seated, complex, and general human characteristics and problem."[১৩]

Walter Allen (১৯১১ –১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর 'The English Novel : a Short Critical History' (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ) নামক উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনা গ্রন্থে ইংরেজি সাহিত্যে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দটির গুরুত্বের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেছেন

যে, এই সময় একটি শতকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি আখ্যানধর্মী রচনা তথা সমগ্র বিশ্বের আখ্যানধর্মী রচনায় একটা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আসতে শুরু করে। কারণ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে Maria Edgeworth-এর 'Castle Rackrent' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। তাঁর মতে এই উপন্যাসটিতে লেখিকা আঞ্চলিক রূপ ও নামকেই শুধু তুলে আনেন নি, তার চেয়েও বেশি কিছু দেখিয়েছেন — সেই অঞ্চলটির প্রকৃতির সঙ্গে সেখানে বসবাসকারী অধিবাসীদের সম্পর্ককেও দেখিয়েছেন। Mr. Allen বলেছেন — "Significant changes, new directions, in literature are rarely so obliging as to coincide in their appearance with such convenient points in time as the turn of a century. The year 1800, however, is a date of the first importance in the history of English fiction, indeed of world fiction, for in that year Maria Edgeworth published her short novels Castle Rackrent . . . Maria Edgeworth gave fiction a local habitation and a name. And she did more than this : she perceived the relation between the local habitation and the people who dwell in it."[১৪] অবশ্য Mr. Allen শুধু একথা বলেই থামে নি। তিনি এই নতুন যুগের নতুন ধারার উপন্যাসের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে এই ধরনের উপন্যাসকে 'Regional Novel' বা ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ নাম দিয়েছেন। আর আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে Maria Edgeworth এটা আবিষ্কার করেছেন যে, দেশের মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো Countryside বা গ্রামাঞ্চল এবং সেখানকার প্রকৃতি ও মানুষজন এই ধরনের উপন্যাসে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসহ প্রাধান্য পায় — "She invented in other words, the regional novel, in which they very nature of the novelist`s character is conditioned, receives its bias and expression, from the fact that they live in a countryside differentiated by a traditional way of life from other country sides."[১৫]

Lee T. Lemon তাঁর 'A Glossary for the Study of English' (১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থে 'Regional and local color literature' বা আঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক রঙ্‌যুক্ত সাহিত্য নামে সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারাকে চিহ্নিত করেছেন। রোমান্টিসিজমের কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থেকে এই ধরনের সাহিত্য উদ্‌গত হয়েছে বলে

তিনি মনে করেছেন। এই ধরনের সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী অধিবাসীদের প্রকৃতি, নৈতিকতা, উপভাষা এবং সেই এলাকাটির দৃশ্যাবলী তুলে আনার দিকে জোর দেওয়ার কথা বলেছেন — "Regional and local color literature were logical outgrowths of some aspects of Romanticism. Both are concerned with an accurate depiction of the manners, morals, dialects, and scenery of a particular geographical area."[১৬] এই সংজ্ঞায় তিনি 'Regional' এবং 'local color' এই দু'টি বিষয়কে একসঙ্গে ব্যবহার করলেও বিষয় দু'টির পৃথকভাবে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। এরমধ্যে 'local color'-এর ব্যাখ্যায় তিনি শব্দটিকে কিছুটা নিন্দাসূচক বলে মন্তব্য করলেও শব্দটি দ্বারা যে, একটি এলাকার নিছক প্রকৃতি বর্ণনার কথা বোঝায় নি; তার চেয়েও কিছুটা বেশি মূল্য ধারণ করেছে সেকথা জানাতেও ভোলেন নি। তাই তিনি James Branch Cabell-এর 'Old Creole Days'-এর উদাহরণ সহ 'local color'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন — "Generally "local color" is a mildly pejorative term, describing works that, however pleasant, have little value other than the portrayal of life in a given area (James Branch Cabell`s Old Creole Days, 1879)."[১৭] আর Hardy এবং Faulkner-এর সাহিত্যিক কার্যাবলীকে মাথায় রেখে তিনি 'Regional' কথাটির বৃহত্তর তাৎপর্যের কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে, Hardy এবং Faulkner-এর সাহিত্যিক কার্যাবলী কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সেগুলি সেই অঞ্চলকে ছাড়িয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে — "Regional" usually implies a wider interest, and is occasionally used even for writers such as Hardy or Faulkner whose work tends to be centred in a particular geographical area but which also has a more general interest."[১৮] তবে তিনি 'local color' এবং 'Regional' এই শব্দ দু'টিকে সাহিত্য পদবাচ্য হিসেবে দাবী করার জন্য এগুলির উপর বাস্তবতা অর্থাৎ 'realism'-এর অবদান এবং প্রভাবের কথা জানাতে ভোলেন নি — "Both movements were influenced by and contributed to realism and its demand for literal accuracy."[১৯]

J. A. Cuddon (১৯২৮–১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব সংক্রান্ত অভিধানগ্রন্থ 'The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory' (১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ)–তে আঞ্চলিক সাহিত্যের লেখকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় তিনি জানিয়েছেন যে, একজন আঞ্চলিক লেখক একটা নির্দিষ্ট এলাকার উপর বেশি মনোযোগ দেন। তাঁর মতে সেই লেখক ঐ নির্দিষ্ট এলাকা এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষদের তাঁর গল্পের মুখ্য ভূমিকায় ব্যবহার করেন। তিনি ঐ নির্দিষ্ট এলাকা বলতে কোনো গ্রামাঞ্চল বা প্রাদেশিক এলাকার কথা বলেছেন — "A regional writer is one who concentrates much attention on a particular area and uses it and people who inhabit it as the basis of his or her stories. Such a locale is likely to be rural and/or provincial."[২০] Cuddon তাঁর গ্রন্থটিতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রথম দিককার আঞ্চলিক সাহিত্যের স্রষ্টা হিসেবে Maria Edgeworth (১৭৬৭–১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ)-এর নাম করেছেন। তিনি Maria Edgeworth-এর উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক উপন্যাসের মধ্যে 'ক্যাসেল রেকরেন্ট' ('Castle Rackrent' - ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ), 'বেলিন্ডা' ('Belinda' - ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ) এবং 'অ্যাবসেন্টেড' ('Absented' - ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ)-এই তিনটি উপন্যাসের কথা বলেছেন — "Among the erliest of regional novelist was Maria Edgeworth (1767–1849), an Anglo–Irish woman who was one of the first perceiving the possibilities of relating characters to a particular environment. Her most notable novels were Castle Rackerent (1800), Belinda (1801) and Absented (1812)."[২১] এছাড়াও তিনি Lady Morgan, John Galt, Sir Walter Scott, Mrs. Gaskell, George Elliot, Charles Kingsley, R.D. Blackmore, Richard Jefferies, Robert Louis Stevenson, J.M. Barrie প্রমুখকেও আঞ্চলিক সাহিত্যের স্রষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে চারজন বিখ্যাত আঞ্চলিক ঔপন্যাসিকের নাম বলতে গিয়ে তিনি Thomas Hardy, Arnold Bennet, D.H. Lawrence এবং William Faulkner-এর কথা বলেছেন — "The four outstandig regional novelist were : Thomas Hardy (1840–1928), who re–created the West Country (especially Dorest) in many of his novels and short stories and revived the name Wessex; Arnold Bennet (1867–1931),

who centred many of his stories on the Potteries — 'the five towns'; D.H. Lawrence (1885-1930), who evoked his native Nottinghamshire; and William Faulkner (1897-1962), whose main focus was Deep South in USA."[২২] Cuddon বিশ্বসাহিত্যের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক সাহিত্যের স্রষ্টা হিসেবে ইংল্যান্ডের Stanley Middleton, Stanley Barstow এবং Alan Sillitoe-এর নাম উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও স্পেনের Emila Pardo Bazan, সার্ডিনিয়ার Grazia Deledda, স্লোভানিয়ার Ivan Canker, বোসনিয়ার Ivo Andric এবং Jean Giano-এর কথা বলেছেন — "Other distinguish writers of this kind were Spanish Countess Emila Pardo Bazan, who wrote about Galician life in the 19th C.; Grazia Deledda (1871-1936) who wrote mostly about Sardinia and its people; Ivan Canker (1876-1918), the Slovene dramatist and of short stories whose native Slovenia was the scene of much of his work; Ivo Andric (1892-1975) a number of whose novels and short stories are about his native Bosnia, and in particular the small township of Tranik and Visegrad; and Jean Giano (1895-1970), who re-created the region of Provence in several of his books."[২৩]

এদিকে Martin Gray তাঁর সাহিত্য পরিভাষা সংক্রান্ত অভিধানগ্রন্থ 'A Dictionary of Literary Terms' (১৯৮৪)-এ Regional Novel বা আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কোনো উপন্যাসে একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলের ভূগোল, রীতি-নীতি এবং ভাষাভঙ্গিকে তুলে আনার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি মনে করেছেন আঞ্চলিক উপন্যাসের ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে তথ্য সরবরাহ করার চেয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলের ভূগোল এবং সেখানকার অধিবাসীদের রীতি-নীতি অর্থাৎ জীবনচর্যা এবং তাদের বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গির প্রতি বেশি করে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। তাঁর আরও মনে হয়েছে যে, এই ধরনের উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রায়শই উপন্যাসের চরিত্র অর্থাৎ সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। আঞ্চলিক উপন্যাস সংক্রান্ত তাঁর প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হল — "A novel which emphasises and documents the geography, customs

and speech of a particular place, with a more serious explanatory focus than for mere background information. The environment is often used to explain the character and actions of its inhabitants."[২৪] তাঁর প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটি যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য তিনি Mrs. Gaskell এবং Thomas Hardy-এর উপন্যাসের উদাহরণও দিয়েছেন — "Examples are Mrs Gaskell`s Mary Barton (1848) with its description of Manchester life, or the many 'Wessex' novels of Thomas Hardy."[২৫] Martin Gray তাঁর গ্রন্থটিতে আঞ্চলিক উপন্যাসের শুধু সংজ্ঞা ও উদাহরণ দিয়েই থেমে থাকেন নি, এসবের পাশাপাশি তিনি আঞ্চলিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ 'আঞ্চলিক রঙ' বা 'Local colour' সম্পর্কেও নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। 'আঞ্চলিক রঙ' বা 'Local Colour' সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা জায়গার অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি, খাদ্যাভ্যাস, আঞ্চলিক ভাষারীতি, আগন্তুক শব্দের ব্যবহারের মত বিষয়গুলিকে সামগ্রিকভাবে তুলে আনার কথা বলেছেন, যাতে উপন্যাসটি অঞ্চলটির প্রামাণিকতা তুলে ধরতে পারে। 'Local Colour' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল — "Details of a particular region or place, such as dress, customs, vegetation, dialect, foreign words, which are used in a work fiction to create a sense of authenticity."[২৬] তিনি Local colour বিষয়টি ভালোভাবে বোঝানোর জন্য Rudyard Kipling-এর উপন্যাসে উনিশ শতকের ভারতবর্ষের ছবি উঠে আসার কথা বলেছেন — "Kipling`s Kim (1901), for example, is full of local colour creating the exotic atmosphere of nineteenth-century India."[২৭]

Tom McArthur সম্পাদিত 'The Oxford Companion to the English Language' (১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থেও আঞ্চলিক উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, এখানে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অংশের মানুষের জীবনযাপন প্রণালী, ভাষাভঙ্গি, লোকসংস্কৃতিকে যথাযথভাবে তুলে আনার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি আঞ্চলিক উপন্যাসকে সামাজিক উপন্যাস থেকে বেরিয়ে আসা উপন্যাস বলেও এই গ্রন্থে উল্লেখ করা

হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, এখানে একটি নির্দিষ্ট এলাকার রীতি-নীতি, ভাষাভঙ্গিকে তুলে আনা হয় এবং সেই এলাকার অধিবাসীদের উপর স্থানীয় পরিবেশ কীভাবে প্রভাব ফেলে সেটাও দেখানো হয়। আলোচ্য গ্রন্থে আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে — "Represent accurately the habits, speech, and folklore of a particular geographical section. A derivative of the social novel is the regional novel, which delineates the life of a people in a particular place — focusing on customs and speech — to demonstrate how environment influences its inhabitants."[২৮] এই গ্রন্থে কিছু উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক উপন্যাসের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে গিয়ে Thomas Hardy-এর 'Wessex novels' এবং William Faulkner-এর 'Yoknapatawpha County' নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলির পাশাপাশি Ignazio Silone-এর ইতালির গ্রাম জীবনকে নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলির কথাও বলা হয়েছে — "Notable examples of this genre are Hardy`s "Wessex novels" and William Faulkner`s novels set in Yoknapatawpha County. The novels of Ignazio Silone, notably Bread and Wine (1936), are both social and regional — in a small Italian village Silone reveals a microcosm of Mussolini`s Italy."[২৯] আঞ্চলিক উপন্যাসে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানাদিক থেকে স্বতন্ত্র কোনো অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষের জীবনচর্যাকে তুলে আনতেই হয়। তবে আঞ্চলিক উপন্যাস নিছক একটি নির্দিষ্ট এলাকাকেই শুধু প্রতিফলিত করবে এমন নয়, আঞ্চলিক উপন্যাসকে সেই অঞ্চলের বিবরণকে ছাড়িয়ে গিয়ে যথার্থ উপন্যাসও হয়ে উঠতে হয় — "A regional novel is a novel that is set against the background of a particular area."[৩০]

Margaret Drabble সম্পাদিত 'The Oxford Companion to English Literature' (১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থে আঞ্চলিক উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনায় বলা হয়েছে যে, এই ধরনের উপন্যাসে শহর বা নগরের বাইরের কোনো জনবসতির মানুষ ও ভূপ্রকৃতিকে বর্ণনা করা হয়। এখানে Regional Novel বা আঞ্চলিক উপন্যাস

সম্পর্কিত আলোচনায় বলা হয়েছে — "regional novel, a novel describing people and landscape of an actual locality outside the metropolis."[৩১]

K.D.M Snell তাঁর 'The Regional Novel in Britain and Ireland' (১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থে ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের আঞ্চলিক উপন্যাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধের নাম হল 'The regional novel : themes for interdisciplinary research'. এখানে তিনি আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রদান করেছেন। 'Regional Novel' বা আঞ্চলিক উপন্যাস সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, এই ধরনের উপন্যাসের আখ্যানভাগ একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, সামাজিক সম্পর্ক, রীতি-নীতি, ভাষাভঙ্গি, কথ্যভাষা এবং সংস্কৃতিগত নানা বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ থাকে। এখানে আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন — "By 'regional novel' I mean fiction that is set in a recognisable region, and which describes features distinguishing the life, social relations, customs, language, dialect, or other aspects of the culture of that area and its people."[৩২] তিনি এর সঙ্গে আরও যোগ করেছেন যে, স্থানীয় ভূগোল, ভৌগোলিক অবস্থান অথবা ভূ-প্রকৃতি নিয়ে রচিত আখ্যানও এই আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। তাঁর মতে এই জাতীয় লেখায় একটি নির্দিষ্ট জায়গা অথবা আঞ্চলিক সংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে বসবাসকারী মানুষজনের উপর কতটা প্রভাব ফেলে সম্ভবত তার বিশদ তথ্যও প্রকাশিত হয় — "Fiction with a strong sense of local geography, topography or landscape is also covered by this definition. In such writing a particular place or regional culture may perhaps be used to illustrate an aspect of life in general, or the effect of a particular environment upon the people living in it."[৩৩] শুধু তাই নয়, তিনি আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে আরও বলেছেন যে, এই ধরনের উপন্যাসে একটি অঞ্চলের বিস্তারিত বিবরণ থাকে — অঞ্চলটি গ্রাম বা শহর যে কোনো কিছুই হতে পারে; তবে তা উপন্যাসে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ভাবে উঠে আসে। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও আঞ্চলিক উপন্যাসের চরিত্ররা সাধারণত খেটে খাওয়া মানুষজন বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হন। তাদের

ভাষাভঙ্গিও অঞ্চলটিতে প্রচলিত বিশেষ ভাষাভঙ্গির সঙ্গে এমনভাবে সাযুজ্য রাখে যে, তাকে সত্য বলেই মনে হয় — "And one usually expects to find certain characteristics in a regional novel : detailed description of a place, setting or region, whether urban or rural, which bears an approximation to a real place; characters usually of working or middle-class origin (although in some regional novels people of these classes may be absent, and in a few the focus may be on a family or lineage and its connection with local landscape or history); dialogue represented with some striving for realism; and attempted verisimilitude."[৩৪]

উপন্যাস সংক্রান্ত বিশ্বকোষগ্রন্থ 'The Encyclopaedia of the Novel' (২০১১ খ্রিস্টাব্দ)-এ Caren S Lambert তাঁর 'Regional Novel' প্রবন্ধে আঞ্চলিকতা, আঞ্চলিক উপন্যাস, আঞ্চলিক পরিচয়, প্রাদেশিক উপন্যাসের সঙ্গে আঞ্চলিক উপন্যাসের পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার শুরুতেই তিনি বলেছেন যে, আঞ্চলিক উপন্যাস এমন একটি ধারণার উপর দাঁড়িয়ে থাকে, যা একটি অঞ্চল এবং তা থেকে সৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ ঘটায় — "The Regional novel is based on the idea that there is a connection between a region and the literature it produce."[৩৫] এখানে তিনি আরও বলেছেন যে, 'Region' বা অঞ্চল কথাটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ *'regionem'* থেকে, যার অর্থ 'boundary' অথবা 'district' অর্থাৎ সীমানা বা জেলা। পাশাপাশি 'Region' কথাটির ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন এই শব্দটি দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশ অথবা কিছু বৃহত্তর রাজনৈতিক সত্তাকে বোঝানো হয় — "whether one understand region to mean a distinct physical environment (from the Latin *regionem,* "boundary or district") or a part of some larger political entity (from *regere* "to direct or to rule")."[৩৬] এই প্রবন্ধে 'Regional identity' অর্থাৎ আঞ্চলিক পরিচয় প্রসঙ্গেও তিনি আলোচনা করেছেন। এই সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল যে, 'আঞ্চলিক পরিচয়' কথাটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতীয় পরিচয়ের মধ্য থেকে উদ্ভূত একটি রাজনৈতিক দর্শন।

এটা আবহাওয়া, মাটির প্রকৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান, জাতীয় সম্পদের মত বস্তুগত পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত। এটা একজন মানুষের বেঁচে থাকার প্রকৃতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আচরণের নিদর্শন প্রকাশ করে। এই নিদর্শন একজনের জাতিসত্তা এবং সাংস্কৃতিক প্রকাশভঙ্গির সঙ্গেও যুক্ত — "The traditional understanding of regional identity is grounded in eighteenth century political philosophy concerning national identity, which assumes that material circumstances (climate, quality of soil, topography, national resources) shape individual in habitants in similar ways, producing patterns of socials, economic and political behaviour. These shared patterns of behaviour, in turn, from both the nation`s institutions and its cultural expressions.[৩৭] এই আলোচনায় তিনি আঞ্চলিক উপন্যাস ও প্রাদেশিক উপন্যাসের মধ্যে মিলকেও স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে আঞ্চলিক উপন্যাস ও প্রাদেশিক উপন্যাসের মধ্যে তিনি এমন পার্থক্যের কথাও বলেছেন, যা এই দুই ধরনের উপন্যাসকে দৃঢ়ভাবে আলাদা করে — "The regional novel resembles the provincial novel, but there are important distinctions between the two which keep the categories firmly separated."[৩৮] এই প্রবন্ধে তিনি Franco Moretti-এর মন্তব্য তুলে ধরে জানিয়েছেন যে, 'Provinces' অর্থাৎ প্রাদেশিক কথাটি নেতিবাচক সত্তা, যা নেই তার ব্যাখ্যা করে; তবে 'regions' অর্থাৎ অঞ্চল শব্দটি পুরোটাই নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক উপাদানে পূর্ণ। তাই প্রাদেশিক উপাদানগুলি বিনিময়যোগ্য হলেও আঞ্চলিক উপাদানগুলি নয় — "The Provinces are 'negative' entities, defined by what is not there, while regions are filled with highly specific cultural content. Hence provincial settings are interchangeable while regional settings are not."[৩৯]

এভাবে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সাহিত্য-সমালোচক এবং সাহিত্য-তাত্ত্বিকদের আঞ্চলিক উপন্যাস নিয়ে আলোচনা এবং প্রচুর সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ ও অভিধান থেকে আমরা আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে একটা ধারণা পাই। তবে বাংলা আঞ্চলিক সাহিত্য সবসময় যে, এই পাশ্চাত্যের আঞ্চলিকতার আদলেই গড়ে উঠেছে এমন নয়; অনেক ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র পথে এগিয়েছে। তাই এ সংক্রান্ত

ধারণাটিকে সম্পূর্ণতা দিতে গেলে বাংলা সাহিত্যের সমালোচক ও সাহিত্য-তাত্ত্বিককদের আঞ্চলিক উপন্যাস সংক্রান্ত মতামতগুলির আলোচনা করাও অত্যন্ত জরুরি।

এটা ঠিকই যে, বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাবের পেছনে পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব প্রবলভাবে কাজ করেছে। এজন্য উপন্যাসের তত্ত্ব সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনায় আজও আমরা পাশ্চাত্যের নানা পন্ডিত, তাত্ত্বিক ও সমালোচকের দ্বারস্থ হই। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশেও অনেক পন্ডিত, সাহিত্য-সমালোচক ও সাহিত্য তাত্ত্বিকের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা বাংলা ভাষায় সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের পাশাপাশি উপন্যাস সম্পর্কেও অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই এঁদের উপন্যাস ও তার তত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রসঙ্গ এসেছে। এঁরা আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে এমন সব মন্তব্য করেছেন, যেগুলি জানা না থাকলে আঞ্চলিক উপন্যাসের কোনো আলোচনাই সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগে উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনা-সমালোচনা একটু-আধটু করা শুরু হলেও তা ব্যাপক আকার ধারণ করে আরও অনেক পরে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় মূলতঃ ইতিহাস নির্ভর রোমান্স কাহিনি এবং সমাজ নির্ভর রোমান্টিক কাহিনি রচনার দিকে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুগামী ঔপন্যাসিকরা মনোযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু উপন্যাস একটি সৃজ্যমান শিল্পমাধ্যম। তাই শিল্প প্রকরণ হিসেবে উপন্যাস কখনোই এক জায়গায় থেমে থাকেনি। ফলে বাংলা উপন্যাস যখন উনিশ শতকের শেষার্ধের কয়েকটা দশক অতিক্রম করে বিশ শতকে পদার্পণ করে, তখন একদিকে যেমন প্রচুর প্রতিভাবান ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটে, তেমনি তাঁরা এই সাহিত্য-প্রকরণটি নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাও শুরু করেন। ফলে উপন্যাসের বিষয় থেকে শুরু করে রূপ-রীতিসহ বহু ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। বাংলা উপন্যাসে এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া আজও বহমান। বাংলা উপন্যাসের এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চালু হবার সময় থেকেই উপন্যাসের তত্ত্ব, স্বরূপ প্রভৃতি নিয়ে

বাংলায় বহু পণ্ডিত, তাত্ত্বিক ও সাহিত্য-সমালোচক উপন্যাসের রূপরীতি ও তত্ত্বকথা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তাদের আলোচনায় উপন্যাস সংক্রান্ত নানা বিষয়ের পাশাপাশি আঞ্চলিক উপন্যাসের কথাও বারবার উঠে এসেছে। বাংলা ভাষায় উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচকদের প্রসঙ্গে যাঁদের কথা সবার আগে মনে আসে, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অলোক রায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দেবেশ রায়, দেবীপদ ভট্টাচার্য, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, শুদ্ধস্বত্ত্ব বসু, হীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বাংলা সাহিত্যের এই পণ্ডিত, তাত্ত্বিক ও সাহিত্য-সমালোচকেরা নিজেদের সাহিত্যতত্ত্ব ও উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনা গ্রন্থে এবং নানা সাহিত্য-সমালোচনা মূলক প্রবন্ধে উপন্যাসের সাধারণ আলোচনার পাশাপাশি আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কেও অনেক কথা বলেছেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সাহিত্য-সমালোচক, সাহিত্য-তাত্ত্বিক ও সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক অভিধানে আলোচিত আঞ্চলিক উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি বাংলায় প্রদত্ত এই সমস্ত সাহিত্য-সমালোচক ও সাহিত্য-তাত্ত্বিকদের বক্তব্য মিলিয়ে দেখলে আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। তাই বাংলা সাহিত্যের এই সমস্ত পণ্ডিত, সাহিত্য-তাত্ত্বিক ও সাহিত্য-সমালোচকদের আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সংক্রান্ত মতামতগুলি জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।

বাংলা উপন্যাস সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনা করতে বসলে যাঁর কথা আমাদের সর্বাগ্রে মনে আসে, তিনি হলেন 'বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা' (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের প্রণেতা অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাসের 'মহাভারত' তুল্য এই গ্রন্থে তিনি বাংলা উপন্যাসের জন্মকথা থেকে শুরু করে এর বিবর্তনের নানা স্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের কথাও এসেছে। তিনি এখানে আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি আঞ্চলিক উপন্যাসকে বৃত্তিজীবনমূলক উপন্যাস বলেও অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক উপন্যাসকে বাংলা উপন্যাসের একটা নতুন অধ্যায়ের সংযোজন বলেও মনে

করেছেন। এই ধরনের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি অপরিচয়ের রহস্যমন্ডিত সুদূর ভৌগোলিক ব্যবধানে অবস্থিত কোনো অঞ্চলের বিশিষ্ট জনপ্রকৃতিকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেছেন। পাশাপাশি নানা সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপক চিত্রাঙ্কন বা কোনো বিশেষ ধরনের বৃত্তিজীবীগোষ্ঠীর বিশিষ্ট জীবনবোধকে পরিস্ফুট করার কথাও আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বলে এই যশস্বী অধ্যাপক মত দিয়েছেন -- ''সাম্প্রতিককালে বাংলা উপন্যাসে একটা নতুন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে, যাহাকে আঞ্চলিক বা বৃত্তিজীবনমূলক আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। এই জাতীয় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হইল, অপরিচয়ের রহস্যমন্ডিত, সুদূর ভৌগোলিক ব্যবধানে অবস্থিত কোনো অঞ্চলের বিশিষ্ট জনপ্রকৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপক চিত্রাঙ্কন, অথবা কোনো বিশেষ ধরনের বৃত্তিজীবীগোষ্ঠীর বিশিষ্ট জীবনবোধের পরিস্ফুটন।''[৪০] তাঁর এই বক্তব্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উঠে আসলেও আঞ্চলিক সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করাকে তিনি কিছুটা দুরূহ বলেই মনে করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে যে, প্রতিবেশ সাধারণত সকল মানুষের জীবনলীলার স্বাধীন ছন্দ ও তার নিগূঢ় এবং অনেক সময় দুর্নিরীক্ষ নিয়ন্ত্রণের চিহ্ন বহন করে। এজন্য সাধারণ প্রতিবেশ চিহ্নিত মানবজীবনকে নিয়ে রচিত উপন্যাসকে তিনি আঞ্চলিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করতে চান নি। নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে, বাংলাদেশের রাঢ়, বারেন্দ্র প্রভৃতি অঞ্চলের জীবন কাহিনিগুলিতে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক ও সমাজরীতিমূলক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠলেও সেগুলি অখন্ড বাঙালী সংস্কৃতির অংশ হওয়ায় এই উপন্যাসগুলিতে উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণও অধিকতর পরিস্ফুট। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনযাত্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও উগ্রভাবে প্রকাশিত হয়। ফলে আধুনিক জীবনের সমতা বিধানকারী প্রভাব এই উপন্যাসগুলির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে অনেকাংশে প্রতিহত করেছে — ''আঞ্চলিক সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ কিছুটা দুরূহ। প্রতিবেশ সাধারণত সকল মানুষের উপরই প্রভাবশীল; মানবজীবনলীলার স্বাধীন ছন্দ ও উহার নিগূঢ়, কখনও কখনও দুর্নিরীক্ষ্য নিয়ন্ত্রণের চিহ্ন বহন করে। এই জাতীয় সাধারণ-প্রতিবেশ-প্রভাবচিহ্নিত মানবজীবন, কিন্তু আঞ্চলিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নহে। বাঙলাদেশে রাঢ়, বারেন্দ্র প্রভৃতি অঞ্চলের

জীবনকাহিনীতে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক ও সমাজরীতিমূলক বৈশিষ্ট্য উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিলেও ইহারা এক অখণ্ড বাঙালী সংস্কৃতির অংশ বলিয়া ইহাদের মধ্যে সাধারণ লক্ষণও অধিকতর পরিস্ফুট। তাহা ছাড়া, এই বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনযাত্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও উগ্রভাবে প্রকট; আধুনিক যুগের সমতাবিধানকারী প্রভাব উহাদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে অনেকাংশে প্রতিহত করিয়াছে।''[৪১] কোন্ ধরনের সাহিত্যকে আঞ্চলিক সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যাবে, সে সম্পর্কে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, প্রত্যন্তস্থিত ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডকে নিয়ে লেখা উপন্যাস এই ধরনের সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। এই ধরনের সাহিত্যে ব্যক্তিজীবন গোষ্ঠীজীবনের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন থাকে। ফলে সমষ্টিগত জীবনাদর্শ ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাকে নির্মমভাবে কণ্ঠরোধ করে। এই ধরনের উপন্যাসে ব্যক্তি পরিচয় অপেক্ষা কৌমশাসন মানব প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে বেশি শক্তিশালী হয় — ''যে সমস্ত প্রত্যন্তস্থিত, ক্ষুদ্র ভূমিখন্ডে ব্যক্তিজীবন গোষ্ঠীজীবনের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে কবলিত, যেখানে আদিমযুগোচিত বদ্ধমূল সংস্কার, সমষ্টিগত জীবনাদর্শ ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার নির্মমভাবে কণ্ঠরোধ করিয়াছে, যেখানে ব্যক্তি পরিচয় অপেক্ষা কৌমশাসনই মানব-প্রকৃতির স্বরূপনির্ণয়ে বেশি শক্তিশালী, কেবল সেইখানেই আঞ্চলিক সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে।''[৪২]

অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অধ্যাপনার পাশাপাশি তাঁর সমকালের একজন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তিনি নিজে যেমন 'উপনিবেশ' (তিন খণ্ড), 'লালমাটি', 'মহানন্দা'র মত একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে পটভূমি করে উপন্যাস লিখেছেন, তেমনি এসবের পাশাপাশি 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) নামক একটি গ্রন্থ লিখে সেখানে তিনি সাহিত্যে আঞ্চলিকতা নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও করেছেন। এই আলোচনায় তিনি সরাসরি আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী না হলেও 'আঞ্চলিক সাহিত্য' এবং 'আঞ্চলিক লেখক' সম্পর্কে নিজের যুক্তিপূর্ণ মতামত প্রদান করেছেন। 'আঞ্চলিক' শব্দটি নিয়ে পাঠক, সমালোচক, গবেষক মহলে কীভাবে বিভ্রান্তি ঘটতে পারে, সে বিষয়ে তিনি অবহিত

ছিলেন বলে সাহিত্যে আঞ্চলিকতা নিয়ে আলোচনার সময় যাতে কোনো বিভ্রান্তিতে পড়তে না হয় সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক্ নির্দেশও করেছেন। তাঁর মতে সাহিত্যে আঞ্চলিকতার একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যে কোনো লেখাতেই 'আঞ্চলিক পরিবেশ' থাকতে পারে, তবে আঞ্চলিক পরিবেশ যুক্ত সব ধরনের সাহিত্যকে আঞ্চলিক সাহিত্য বলা যাবে না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিবেশ শুধুমাত্র ফ্রেমের কাজ করে। এক্ষেত্রে তাকে অলংকরণের বেশি কিছু বলা যাবে না। আবার অনেক সময় কোনো লেখকের লেখায় বিশিষ্ট পটভূমি রচনার জন্য বিশেষ ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে 'আঞ্চলিক পরিবেশ' উঠে আসে; কিন্তু লেখায় শুধু 'আঞ্চলিক পরিবেশ' থাকলে সেই লেখককে আঞ্চলিক লেখক বলা যাবে না — ''সাহিত্যে আঞ্চলিকতার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিবেশ মাত্র ফ্রেমের কাজ করে — তাকে অলংকরণের অতিরিক্ত কিছু বলা যাবে না। কখনো কখনো কোনো বিশিষ্ট পটভূমি রচনায় বিশেষ ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে খানিকটা সাহায্য করে থাকে। এইগুলির ভিত্তিতে কোনো লেখককে আঞ্চলিক বলা যায় না।''[৪৩] কোনো একজন লেখককে 'আঞ্চলিক লেখক' হিসেবে অভিহিত করার পেছনে তিনি ঐ লেখকের সৃষ্ট চরিত্রের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, যখন কোনো লেখকের সৃষ্ট চরিত্রগুলি তাঁর রচনায় সৃষ্ট 'আঞ্চলিক পরিবেশ'-এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে অর্থাৎ সেই বিশেষ পরিবেশের 'শক্তি ও সত্তার প্রতীক' হয়ে ওঠে এবং তাদের সমস্ত ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঐ বিশেষ পরিবেশের স্বাভাবিক ফসলরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন সেই লেখককে আঞ্চলিক লেখক এবং তাঁর সাহিত্যকে আঞ্চলিক সাহিত্য বলে। আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, আঞ্চলিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই রচনার চরিত্রদের কোনোভাবেই অঞ্চলটি থেকে পৃথক করা যায় না — ''ওই নির্দিষ্ট বিশেষণটি তখনই কোনো শিল্পীর ওপরে আরোপ করা সম্ভব — যখন বিশেষভাবে তার সৃষ্ট চরিত্রগুলো সেই বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে — তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনাগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সেই বিশিষ্ট ভিত্তি ক্ষেত্রের স্বাভাবিক শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে।''[৪৪]

বাংলা উপন্যাসের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমালোচক হলেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বাংলা উপন্যাসের সমালোচনামূলক বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'(১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ)–এ তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটির আলোচনাকালে এর আঞ্চলিকতা সম্পর্কে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। এই মন্তব্যগুলি থেকে আঞ্চলিক উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর মনোভাব অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে। তিনি তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন — একটি বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি এবং ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় বহুকাল ধরে চলে আসা স্মৃতি সংক্রান্ত সামূহিক বিশ্বাসকে তুলে আনা, সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকার সাবেকি পরিচয় দেওয়া এবং সেই অধিবাসীদের অসংস্কৃত অনুভূতির রূপায়ণের ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা। বলা বাহুল্য, এই বৈশিষ্ট্যগুলি যে কোনো সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসেই বিদ্যমান থাকে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের আলোচনায় তিনি বলেছেন — ''আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য এই উপন্যাসে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে — ১. একটি বিশিষ্ট পরিবেশ–ধৃত জনগোষ্ঠীর সামূহিক বিশ্বাস — বিশেষ সেই গোষ্ঠীর সৃষ্টি এবং ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় বহুকালাগত স্মৃতি; ২. তাদের জীবিকার সাবেকি পরিচয়; ৩. তাদের অসংস্কৃত অনুভূতির রূপায়ণের ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য।''[৪৫] এছাড়াও তিনি এই উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন। এটি হল বৃহত্তর দেশকালের হস্তক্ষেপে উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির আঞ্চলিকতা ভেঙে যাওয়া। তাঁর মতে এই বৈশিষ্ট্যটি যে কোনো প্রধান আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন — ''এর সঙ্গে আর একটি যোগ করা যায় — যা প্রায় প্রধান আঞ্চলিক উপন্যাসেই দেখা যায় — বৃহত্তর দেশকালের হস্তক্ষেপে আঞ্চলিকতা ভেঙে যাচ্ছে।''[৪৬]

অধ্যাপক অলোক রায় সম্পাদিত 'সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য' (১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থটিকে বাংলায় রচিত কথাসাহিত্যের তত্ত্ব ও প্রকরণ সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে যে কোনো সাহিত্যপ্রেমী মানুষ এক কথায় স্বীকার করে

নেবেন। এই গ্রন্থের 'আঞ্চলিক উপন্যাস' অংশটি লিখেছেন অধ্যাপক দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। এখানে তিনি আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় তিনি আঞ্চলিক উপন্যাসকে কোনো অঞ্চল বিশেষের মানব-জীবনাশ্রয়ী এক বিশিষ্ট স্বাদের উপন্যাস বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে এই অঞ্চলটির সর্বাত্মক প্রভাবে সেখানকার মানব-জীবনও বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানকার বিশিষ্ট ভূ-সংস্থান, জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, মৃত্তিকা প্রভৃতি সেখানে বসবাসকারী মানুষজনের জীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে সেই অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের দৈহিক গঠন, ভাষার উচ্চারণ, কথা বলার ভঙ্গি, জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতি-নীতি, আশা-বিশ্বাস-সংস্কার, বাংলা ভাষাভাষী অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের চেয়ে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। এই প্রভাব সেই অঞ্চলের শিষ্টজনের মধ্যে ততখানি অন্তরঙ্গ না হলেও সেখানকার গোষ্ঠীবদ্ধ কৌম-সমাজে অত্যন্ত আত্মিক হয়। উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটি পর্বতসংকুল, নদী-প্রধান, রুক্ষ-শুষ্ক-অনুর্বর হলে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে কষ্টসহিষ্ণুতা, শ্রম-দক্ষতা এবং দুঃসাহস অধিকমাত্রায় দেখা যায়। তবে এই অঞ্চলের শিষ্টজনেরা সভ্য মানুষের সংস্পর্শে কিংবা নিজেদের সুসংস্কৃত পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি অবিচল আনুগত্যে ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাদের ঐ প্রভাব থেকে অনেকখানি মুক্ত রাখে। এজন্য নিম্নশ্রেণীর গোষ্ঠীচেতনামুখ্য মানব-সমাজেই আঞ্চলিকতার লক্ষণ সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়। আঞ্চলিকতার স্বরূপ সম্পর্কে তিনি বলেছেন — ''আঞ্চলিক উপন্যাস নামেই বোঝা যায়, এ হল কোনো অঞ্চলবিশেষের মানব-জীবনাশ্রয়ী এক বিশিষ্ট স্বাদের উপন্যাস। ঐ অঞ্চলের সর্বাত্মক প্রভাবে সেখানকার মানব-জীবনও বিশিষ্ট। সেই অঞ্চলের বিশিষ্ট ভূ-সংস্থান, জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, মৃত্তিকা — সেখানকার অধিবাসীদের জীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই সে অঞ্চলের মানুষের দৈহিক গঠন, ভাষার উচ্চারণ, কথা বলার ভঙ্গি, জীবন যাত্রা, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, আশা-বিশ্বাস-সংস্কার, বাংলা-ভাষাভাষী অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের চেয়ে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। বিশেষ করে ঐ অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর গোষ্ঠীবদ্ধ কৌম-সমাজে ঐ প্রভাব যতখানি আত্মিক হয়, সেই

অঞ্চলে বসবাসকারী শিষ্টজনের মধ্যে ততখানি অন্তরঙ্গ হয় না। ঐ অঞ্চল যদি পর্বতসংকুল, নদী-প্রধান, রুক্ষ-শুষ্ক-অনুর্বর হয়, তাহলে সেখানকার মানুষের মধ্যে কষ্টসহিষ্ণুতা, শ্রম-দক্ষতা এবং দুঃসাহস অধিকমাত্রায় দেখা যায়। একই অঞ্চলের শিষ্টজনেরা সভ্যমানুষের সংস্পর্শে কিংবা নিজ নিজ পারিবারিক সুসংস্কৃত ঐতিহ্যের প্রতি অবিচল আনুগত্যে পুরোপুরি ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাঁদের ঐ সর্বাত্মক প্রভাব থেকে অনেকখানি মুক্ত রাখে। তাই নিম্নশ্রেণীর গোষ্ঠীচেতনামুখ্য মানব-সমাজেই আঞ্চলিকতার লক্ষণ সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়।''[৪৭] অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে উপন্যাসে গৃহীত বিশেষ দেশাঞ্চল এবং সেখানকার মানুষের অন্তরঙ্গ আত্মিক যোগের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে এরফলে ঐ বিশেষ অঞ্চলটির উপন্যাসের একটি স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে ওঠে এবং সেখানকার জনজীবনে তাঁর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করে সর্বজনীন রসাবেদনে পৌঁছায়। তিনি আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞায় বলেছেন — ''কোনো ঔপন্যাসিক যখন কোনো বিশেষ দেশাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সময়-প্রেক্ষিত ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে এমনভাবে তাঁর রচনায় রূপ দেন যাতে ঐ অঞ্চল যেন সেখানকার মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মিক যোগে একটি স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে ওঠে এবং সেখানকার জনজীবনে তাঁর সর্বাত্মক প্রভাবের মধ্য দিয়েও সর্বজনীন রসাবেদনে পৌঁছায় — তখনই তাঁর রচনাকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যেতে পারে।''[৪৮]

অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কালের প্রতিমা' (১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থটি বাংলা উপন্যাস সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনামূলক গ্রন্থ বলে প্রায় সকলেই মত দিয়ে থাকেন। এই গ্রন্থে তিনি সব ধরনের বাংলা উপন্যাসের আলোচনা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই আলোচনায় আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রসঙ্গও এসেছে। আঞ্চলিক উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এই ধরনের উপন্যাসের স্বরূপ সম্পর্কেও অত্যন্ত মূল্যবান মতামত প্রদান করেছেন। তিনি আঞ্চলিক উপন্যাস পাঠের সময় পাঠকমনে ভূগোলের সঞ্চারের চেয়েও জীবনবোধের সঞ্চার বেশি গুরুত্ব পায় বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে যে নির্দিষ্ট অঞ্চলকে পটভূমি

করে আঞ্চলিক উপন্যাসের লেখক উপন্যাস রচনা করেন, সেই বিশেষ অঞ্চলটি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতা থাকাই আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান শর্ত নয়, সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে মানব জীবন রহস্যের ও জীবনবোধের গভীর উপলব্ধি থাকাও একান্ত প্রয়োজন। তাই বিষয়গত সার্থকতার চেয়ে শিল্পগত সার্থকতাই আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান অন্বিষ্ট। এই ধরনের উপন্যাসে পটভূমির চেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপন মুখ্য হয়ে ওঠে বলে তাঁর মনে হয়েছে — ''আঞ্চলিক উপন্যাসে পাঠকের চৈতন্যে ভূগোলবোধির সঞ্চারই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে চাই জীবনবোধের বিস্তার। জীবন আধেয়, আঞ্চলিকতা তার আধার মাত্র — এই সত্য বিস্মৃত হলেই আঞ্চলিক উপন্যাসের শিল্প সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। লেখকের আন্তরিকতা ও অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে চাই জীবনরহস্যের ও জীবনবোধের গভীর উপলব্ধি। বিষয়গত সার্থকতা নয়, শিল্পগত সার্থকতাই আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্বিষ্ট। প্রকৃতির পটভূমি যথেষ্ট নয়, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপনই মুখ্য।''[৪৯] অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এইভাবে আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বরূপ সংক্রান্ত আলোচনা করে আঞ্চলিক উপন্যাসের চারটি প্রধান শর্তের কথাও বলেছেন। তাঁর মতে আঞ্চলিক উপন্যাসের শর্ত হিসেবে কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমা সংহতিকে তুলে আনতে হয়। মানব মনের উপর ঐ ভূ-প্রকৃতির সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তারকেও এখানে দেখাতে হয়। মূলতঃ তিনি বলতে চেয়েছেন যে, অঞ্চলটির বাইরে থেকে উপন্যাসের চরিত্রদের নিয়ে আসলে তারা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে না। মানুষ ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ যোগসাধনও আঞ্চলিক উপন্যাসে ঘটাতে হয়। আঞ্চলিক উপন্যাসের এইসকল শর্ত সম্পর্কে তিনি সবশেষে জীবন-স্বাদের অনন্য একমুখীনতা ও সার্বভৌমতাও এখানে দেখাতে হয় বলে মনে করেছেন — ''আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান শর্ত চারটি : ভৌগোলিক সীমা-সংহতি, মানব মনের উপর ঐ ভূ-প্রকৃতির সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার, মানুষে-প্রকৃতিতে অন্তরঙ্গ যোগসাধন এবং জীবন-স্বাদের অনন্য একমুখীনতা ও সার্বভৌমতা।''[৫০] তিনি 'কালের প্রতিমা' গ্রন্থটিতে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর এই আলোচনায় আঞ্চলিক উপন্যাসের

ঔপন্যাসিকের আরও তিনটি অবশ্য পালনীয় শর্তের কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর মতে এই তিনটি শর্ত হল — আঞ্চলিক উপন্যাসে গৃহীত বিশেষ অঞ্চলটি সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কারণ অঞ্চলটি সম্পর্কে দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা থাকলে সংশ্লিষ্ট ঔপন্যাসিকের পক্ষে নিজের উপন্যাসে সেই অঞ্চলটিকে যথাযথভাবে রূপদান করা সম্ভব। এসবের পাশাপাশি আঞ্চলিক উপন্যাসের ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিশেষ অঞ্চলটির ও সেখানকার মানুষের জীবনচর্যার ছবি আঁকবেন বলেও তিনি মনে করেছেন। তবে আঞ্চলিক উপন্যাসের ঔপন্যাসিককে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে শিল্পগত দিক থেকে নির্লিপ্ত থাকতে হয়। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাস সম্পর্কে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, এই উপন্যাসে বিহারের গ্রামাঞ্চলকে, গ্রামীণ মানুষকে, তাদের মানসিকতা ও সংস্কারকে নিপুণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর মতে বিহারের এই গ্রামজীবন ও সেখানকার মানুষের জীবন পরিক্রমা সম্পর্কে ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ীর নিশ্ছিদ্র অভিজ্ঞতা ছিল, সীমাহীন সহানুভূতি ছিল এবং তাঁর নির্লিপ্তি শিল্প দ্বারা পুরোটাই নিয়ন্ত্রিত ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন — ''এই উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবেও দেখা যেতে পারে। আঞ্চলিক উপন্যাসের তিনটি প্রধান উপাদান — অঞ্চলটি সম্পর্কে লেখকের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি, শিল্পগত নির্লিপ্তি। এই তিনটি শর্ত অবশ্যপালনীয়। এই সব উপাদানের সমাবেশ হয়েছে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ। বিহারের গ্রামাঞ্চলকে, গ্রামীণ মানুষকে, তাদের মানসিকতা ও সংস্কারকে লেখক নিপুণভাবে উপস্থিত করেছেন। এই গ্রামজীবন ও মানুষ সম্পর্কে সতীনাথের অভিজ্ঞতা নিশ্ছিদ্র, সহানুভূতি সীমাহীন ও নির্লিপ্তি শিল্প-নিয়ন্ত্রিত।''[৫১]

এই যশস্বী সমালোচক অন্যত্র 'আঞ্চলিক উপন্যাস' নামক একটি প্রবন্ধে 'কালের প্রতিমা' গ্রন্থে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস সংক্রান্ত করা মন্তব্যগুলির আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় তিনি 'উপন্যাস মাত্রেই একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ' বলে মন্তব্য করেও আঞ্চলিক উপন্যাসকে আলাদা করে দেখবার প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করেছেন। এখানে তিনি আঞ্চলিক উপন্যাস নামে উপন্যাসের একটি প্রকরণকে মেনে নেওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেছেন — ''. . .

মানুষ মাত্রেই মানুষ, তার জীবনালেখ্য উপন্যাস মাত্রেই এক চরিত্রের — এই হঠকারী মত অগ্রাহ্য। জীবনে যদি ভেদ স্বীকার করি, তবে জীবনানুগ উপন্যাসেও ভেদকে মানতে হবে। আর সেকারণেই আঞ্চলিক উপন্যাসকে (Regional Novel) মানতে হয়।''[৫২] এই আলোচনায় তিনি আঞ্চলিক সাহিত্যের কয়েকটি শর্তের কথা বলেছেন। এগুলির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমা-সংহতিকে তুলে আনা আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রথম শর্ত বলে তিনি মনে করেছেন। তাঁর মতে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলটির ভূ-প্রকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ভৌগোলিক সীমা-সংহতির মধ্যেই ধরা পড়ে। সারা দেশ কোনো উপন্যাসের রঙ্গভূমি হলে তাকে আঞ্চলিক সাহিত্য বলা যাবে না — ''ভৌগোলিক সীমা-সংহতি প্রথম শর্ত, তাতে সন্দেহ নেই। ভূ-প্রকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার সীমা-সংহতির মধ্যেই ধরা পড়ে। সারা দেশ জুড়ে যার রঙ্গভূমি, তা আঞ্চলিক সাহিত্য নয়।''[৫৩] আঞ্চলিক উপন্যাসের দ্বিতীয় শর্ত হিসেবে তিনি উপন্যাসে গৃহীত নির্দিষ্ট অঞ্চলটির আঞ্চলিক ভূ-প্রকৃতির মানব মনের উপর সর্বাত্মক প্রভাবের কথা বলেছেন। অর্থাৎ উপন্যাসের চরিত্রদের উপর উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির ভূ-প্রকৃতি এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, এর চরিত্রগুলিকে সেই অঞ্চলটি থেকে কোনোভাবেই আলাদা করা যায় না। চরিত্রদের উপর নির্দিষ্ট অঞ্চলটির আঞ্চলিক ভূ-প্রকৃতি এইভাবে প্রভাব বিস্তার না করলে উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার দাবী খারিজ হবে বলে তিনি মনে করেছেন — ''দ্বিতীয় শর্ত, ঐ ভূ-প্রকৃতি মানব মনের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করবে। তা যদি না করে তবে তার আঞ্চলিকতার দাবী খারিজ।''[৫৪] আঞ্চলিক উপন্যাসের তৃতীয় শর্ত হিসেবে তিনি মানুষ ও উপন্যাসে গৃহীত নির্দিষ্ট অঞ্চলটির আঞ্চলিক প্রকৃতির অন্তরঙ্গ যোগসাধনের কথা বলেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, আঞ্চলিক উপন্যাসের চরিত্ররা সেই অঞ্চলটির প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম থাকেন — ''মানুষে-প্রকৃতিতে এই অন্তরঙ্গ যোগসাধন আঞ্চলিক উপন্যাসের তৃতীয় ও অন্যতম প্রধান শর্ত, তাতে সন্দেহ নেই।''[৫৫] আঞ্চলিক উপন্যাসের চতুর্থ শর্ত হিসেবে তিনি এই ধরনের উপন্যাসে জীবন-স্বাদের অনন্য একমুখীনতা ও সার্বভৌমত্বের কথা বলেছেন — ''আঞ্চলিক

উপন্যাসের চতুর্থ শর্ত, জীবন-স্বাদের অনন্য একমুখীনতা ও সার্বভৌমতা।''[৫৬] এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, এই ধরনের উপন্যাসের চরিত্ররা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষজন হওয়ায় বৃহত্তর দেশ বা ভূ-খন্ডে বিচরণকারী মানুষজনের মত তাদের জীবন বহুমুখী হয় না; সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলটির সর্বাত্মক প্রভাবে এদের জীবন একমুখী হয়। তবে তাদের একমুখীন জীবনের ভেতরেও সার্বভৌমত্ব প্রকাশ পায়।

তবে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রকৃতিকেই শুধুমাত্র আঞ্চলিক উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে মেনে নেন নি; নতুন গড়ে ওঠা শিল্পাঞ্চল, বন্দর, শহরও এই ধরনের উপন্যাসের পটভূমি হতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। তিনি মনে করেছেন আঞ্চলিক উপন্যাসে গৃহীত পটভূমিটির ভৌগোলিক সীমা-সংহতি, সেই অঞ্চলের মানবমনের উপর প্রকৃতির সর্বাত্মক প্রভাব, জীবনস্বাদের অনন্য একমুখীনতা এবং সার্বভৌমতা থাকতেই হবে — ''আঞ্চলিক গল্প-উপন্যাসে পটভূমি রূপে কেবল প্রকৃতিকে চাই, একথা মনে করা ঠিক হবে না। নতুন গড়ে-ওঠা শিল্পাঞ্চল, বন্দর, শহর পটভূমিরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। চাই ভৌগোলিক সীমা-সংহতি, চাই সেই অঞ্চলের মানবমনের উপর প্রকৃতির সর্বাত্মক প্রভাব, চাই জীবনস্বাদের অনন্য একমুখীনতা, সর্বোপরি সার্বভৌমতা।''[৫৭] আঞ্চলিক উপন্যাস সম্পর্কে এতকিছু বলার পরেও তাঁর মনে হয়েছে যে, আঞ্চলিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিককে জীবনবোধের বিস্তার ঘটাতে হয়। এজন্য তাঁকে উপন্যাসে গৃহীত বিশেষ অঞ্চলটি সম্পর্কে দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা অবশ্যই অর্জন করতে হয়, সেইসঙ্গে ঐ অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে নির্লিপ্তভাবে উপন্যাসে পরিবেশন করতে হয় -- ''আসলকথা, আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষ জীবনবোধের বিস্তার, এর জন্য চাই অঞ্চলটি সম্পর্কে দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি ও নির্লিপ্তি।''[৫৮] এই প্রবন্ধে তিনি আঞ্চলিক উপন্যাসের আরও দু'টি লক্ষণের কথাও বলেছেন। এগুলি হল — প্রকৃতির স্বতন্ত্র চরিত্র হিসেবে দেখা দিয়ে মানবমনের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করা এবং ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে গোষ্ঠীচেতনার সামঞ্জস্য গড়ে তুলে জীবনস্বাদের অনন্য একমুখীনতা প্রতিষ্ঠা করা — ''আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান দু'টি লক্ষণ — প্রকৃতি

একটি স্বতন্ত্র চরিত্র রূপে দেখা দেয় ও মানবমনের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করে; এবং ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে গোষ্ঠীচেতনার সামঞ্জস্যে জীবনস্বাদের অনন্য একমুখীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়।''[৫৯] তবে তিনি মনে করেছেন যে, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে উপস্থাপনাই আঞ্চলিক উপন্যাসের শেষ কথা নয় — আঞ্চলিক উপন্যাসকে সার্থকথা অর্জন করতে হলে আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে গিয়ে এক সংকেতধর্মিতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় — ''আঞ্চলিক উপন্যাস যখন আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে এক সংকেতধর্মিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তা সার্থক।''[৬০]

আঞ্চলিক উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনায় সবাই 'আঞ্চলিক প্রকৃতি'র উপর জোর দিতে চাইলেও একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসে 'আঞ্চলিক প্রকৃতি' কতটা প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কেও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এই প্রবন্ধে স্পষ্ট মতামত দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে, আঞ্চলিক উপন্যাসে প্রকৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; প্রকৃতি উপন্যাসে শুধু একটি পটভূমি নয়, একটি প্রবল শক্তি বা স্বতন্ত্র সত্তা তথা বলিষ্ঠ জীবন্ত শক্তি হয়ে ওঠে। এখানে লোক ও লোকালয়ের নিবিড় সংহতি, প্রকৃতি ও প্রাকৃতজনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ এবং প্রাকৃতজনের উপর প্রকৃতির সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তারকে দেখাতে হয় — ''আঞ্চলিক উপন্যাসে প্রকৃতি একটি প্রবল শক্তি, একটি স্বতন্ত্র সত্তা, একটি জীবন্ত চরিত্র। এখানে প্রকৃতি কেবল পটভূমি নয়, স্বতন্ত্র বলিষ্ঠ চরিত্র। এখানে লোক ও লোকালয়ে নিবিড় সংহতি, প্রকৃতি ও প্রাকৃতজনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ, প্রাকৃতজনের উপর প্রকৃতির সর্বাত্মক প্রভাবের বিস্তার ঘটে।''[৬১] এত কিছুর বলার পর বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য হল — ''আঞ্চলিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় সংযোজন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আঞ্চলিক জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা চাই, স্থানিক রঙ ফোটানোর কারুকুশলতা চাই, আঞ্চলিক উপভাষার দখল চাই। কিন্তু এগুলি উপাদান মাত্র, লক্ষ্য নয়। আসলে চাই গভীর জীবনবোধ। নতুন মানুষ, নতুন ভূখণ্ড, অপরিচিত ধ্যানধারণা, নতুন মানসিকতা — সব মিলিয়ে একটা অখণ্ড জীবন গড়ে তোলার উপযুক্ত জীবনবোধ। এছাড়া কোনো লেখাই সার্থক নয়।''[৬২] এসবের পাশাপাশি তিনি আঞ্চলিক উপন্যাসের যারা পাঠক হবেন তাদের সম্বন্ধেও কিছু মন্তব্য করেছেন। আর তা করতে গিয়ে

তিনি হার্ডির 'দ্য রিটার্ন অভ্ দ্য নেটিভ' উপন্যাসের তুলনা টেনে বলেছেন যে, সেখানে এগডন হীথের রুক্ষ প্রান্তর তার ভয়াল বিস্তার নিয়ে ওয়েসেক্স অঞ্চলের বিশিষ্ট বাতাবরণ গড়ে তুললেও তার উপর প্রাধান্য লাভ করেছে একটি বিশিষ্ট জীবনবোধ। এই জীবনবোধ পাঠককে ভাবিয়ে তাকে এক চিন্তার বিশিষ্ট স্তরে উত্তীর্ণ করে। এই জীবনবোধ ও নবজন্মের মুহূর্ত উপন্যাসে দেখা গেলেই তা সার্থক হয়। পাঠকের এই গভীর জীবনবোধের প্রত্যাশা না থাকলে বহু সংবাদধর্মী বিবরণ বা রম্য-কাহিনিকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলে ভুল হয়। এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য আঞ্চলিক উপন্যাসের পাঠকের আত্মজিজ্ঞাসা ও নির্মোহ বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকা দরকার। তা না থাকলে পাঠক হিসেবে তিনি যেমন ফাঁকে পড়েন, তেমনি প্রশংসাচ্ছলে লেখককেও ফাঁকি দেন — ''হার্ডির 'দ্য রিটার্ন অভ্ দ্য নেটিভ' উপন্যাসে এগডন হীথের রুক্ষ প্রান্তর তার ভয়াল বিস্তার নিয়ে ওয়েসেক্স অঞ্চলের বিশিষ্ট বাতাবরণ গড়ে তুলেছে এবং তার উপরে প্রাধান্য লাভ করেছে একটি বিশিষ্ট জীবনবোধ, যা পাঠককে ভাবায়, তাকে চিন্তার বিশিষ্ট স্তরে উত্তীর্ণ করে। এই জীবনবোধ ও নবজন্মের মুহূর্ত যে উপন্যাসে দেখা যাবে, সেই উপন্যাসই সার্থক। আর যদি এই গভীর জীবনবোধের প্রত্যাশা না থাকে, তবে বহু সংবাদধর্মী বিবরণ বা রম্য-কাহিনীকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলে ভুল সিদ্ধান্ত করব। সেই বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্যই আঞ্চলিক উপন্যাস পাঠকের এই আত্মজিজ্ঞাসা ও নির্মোহ বিশ্লেষণ। একে বাদ দিলে পাঠক হিসেবে আমি ফাঁকে পড়ব এবং সম্ভবত, প্রশংসাচ্ছলে লেখককেও ফাঁকি দেব।''[৬৩]

শুদ্ধসত্ত্ব বসু তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের নানারূপ' (১৩৮৫ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থটিতে সাহিত্যের পরিভাষা এবং ধারাগুলি (Genre) নিয়ে করতে গিয়ে আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রসঙ্গও এনেছেন। তাঁর মতে আঞ্চলিক উপন্যাসের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা এখনো নির্ণীত হয় নি — এ সম্পর্কে সাহিত্য তাত্ত্বিক ও সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। এইভাবে তিনি আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে সমালোচকদের মধ্যে মতপার্থক্যের কথা স্বীকার করে নিয়ে নিজে থেকে আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর মতামত দিতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, কোনো উপন্যাসে দেশের

একটি বিশেষ অঞ্চলের পরিচয় থাকলে কিংবা বর্ণিতব্য অঞ্চলের ভাষাই চরিত্রদের মুখে উচ্চারিত হলেই উপন্যাসটি আঞ্চলিক হয়ে ওঠে না। কারণ প্রত্যেকটি মানুষ দেশের কোনো না কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে। স্বাভাবিকভাবে যে কোনো মানুষের উপর জন্মভূমির সেই বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে একটি পরিচয় গড়ে ওঠে। কিন্তু সব মানুষকেই কোনো না কোনো সময় জন্মভূমির পরিবেশ নির্ভর ঐ আবহাওয়ার বাইরে আসতে হয়। ফলে সে নিজের মধ্যে দেশ-কালের বাইরের সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে। তবে তাঁর মধ্যে জন্মভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সত্তার প্রভাব সর্বদা থাকে। আঞ্চলিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিক মানুষের এই জন্মগত আঞ্চলিক সত্তার বাইরের সর্বজনীন সত্তার পরিচয় ফুটিয়ে তুললেও কখনো তাঁকে জন্মভূমির অঞ্চলটির প্রভাবে গড়ে ওঠা সত্তার কবল থেকে মুক্ত করেন না — ''আঞ্চলিক উপন্যাসে দেশের এক বিশেষ অঞ্চলের পরিচয় থাকতেই হবে — এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, কিম্বা বর্ণিতব্য অঞ্চলের ভাষাই (অর্থাৎ সেখানকার উপভাষা বা dialect) চরিত্রাবলীর মাধ্যমে উচ্চারিত হবে — তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। জন্মভূমির একটি বিশেষ অংশের মধ্যে মানুষের একটা পরিচয় থাকে, কিন্তু তাকে ঐ পরিবেশ নির্ভর (সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ পরিসরজনিত) আবহাওয়ার বাইরে আসতে হয়, সেখানে সে দেশ-কালের বাইরের সত্তাকে উপলব্ধি করে। আঞ্চলিক উপন্যাসেও মানুষের এই সত্তার পরিচয় দিতে হবে।''[৬৪] তিনি নিজের মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। তাঁর মতে এই উপন্যাসের নায়ক কুবের মাঝির উপর তাঁর জন্মভূমি কেতুপুর অঞ্চলের প্রভাব থাকলেও সে জীবনক্ষেত্রে গতিশীল পদ্মার মতোই আবেগ-সম্পন্ন হয়েছে। জন্মভূমির প্রকৃতি তাঁকে বৃহত্তর জীবনচেতনার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করেছে, যা আঞ্চলিক উপন্যাসের সার্থকতার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ — ''মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি'-তে কুবের মাঝি দুর্বার পদ্মার মতোই আবেগ-সম্পন্ন হয়েছে, জন্মভূমির প্রকৃতি তাকে জীবনচেতনায় নিয়ন্ত্রিত করেছে — এইখানেই আঞ্চলিক উপন্যাসের সার্থকতা।''[৬৫] এই আলোচনাতে তিনি আঞ্চলিক উপন্যাসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, আঞ্চলিক উপন্যাস

পাঠকালে পাঠকমনে নিজের অজ্ঞাতসারেই এক ভৌগোলিক চেতনার সঞ্চার ঘটে। এই প্রসঙ্গ সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেছেন যে, এই উপন্যাসটি পাঠ করলে গঙ্গার পার্শ্ববর্তী গ্রাম সম্পর্কে পাঠকেরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই একটা ধারণা লাভ করে — ''আঞ্চলিক উপন্যাস পাঠকের অজ্ঞাতসারেই পাঠকমনে এক ভৌগোলিক চেতনার সঞ্চার করে থাকে। সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' পড়লে গঙ্গার পার্শ্ববর্তী গ্রামের সম্পর্কে একটু ধারণা হয়।''[৬৬] আমাদের মনে হয়, তাঁর এই মতটি শুধু সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, যে কোনো আঞ্চলিক উপন্যাস পাঠের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সমালোচক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তাঁর 'সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি' (২০০৩ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থটি বাংলায় রচিত সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনা মূলক গ্রন্থতালিকায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই গ্রন্থে সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার ফাঁকে তিনি আঞ্চলিক উপন্যাস সম্বন্ধে অল্প হলেও অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় তিনি কোনো একটি উপন্যাসে শুধু আঞ্চলিক পটভূমি থাকলেই সেটা উপন্যাসটির আঞ্চলিক পরিচয় হয়ে উঠবে একথা মানতে চান নি। আঞ্চলিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের উপর উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির প্রভাবকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে উপন্যাসটিতে বিশেষ অঞ্চলের পরিবেশ, ভাষা, আচার-ব্যবহার উপন্যাসের ঘটনায় এবং চরিত্রের চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে সেদিকে তিনি আলোকপাত করেছেন — ''আঞ্চলিক উপন্যাসে' (ইংরেজিতে বলে Regional Novel) বিশেষ অঞ্চলের পরিবেশ, ভাষা, আচার-ব্যবহার উপন্যাসের ঘটনায় এবং চরিত্রের চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণে প্রভাব বিস্তার করে। শুধু পটভূমি হিসেবে অঞ্চলের পরিচয় ঠিক আঞ্চলিকতা আনে না।''[৬৭] নিজের বক্তব্যটি বোঝানোর জন্য ইংরেজি সাহিত্যে ওয়েসেক্স অঞ্চল নিয়ে লেখা হার্ডির উপন্যাস এবং মিসিসিপির ইয়কনাপটোফা অঞ্চলকে নিয়ে লেখা ফকনারের উপন্যাসের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক পটভূমিকায় লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, অদ্বৈত মল্লবর্মণদের উপন্যাসগুলিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন — ''এদিক থেকে হার্ডির উপন্যাসে ওয়েসেক্স অঞ্চল, ফকনারের উপন্যাসে মিসিসিপির ইয়কনাপটোফা (yoknaptawpha) অঞ্চল উপন্যাসের কাহিনীতে প্রবেশ করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' অঞ্চল ও জীবনকে প্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত করেছে।''[৬৮]

অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাংলায় রচিত সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক 'সাহিত্য প্রকরণ' (১৪০২ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থটিতে সাহিত্যতত্ত্ব সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করার সময় আঞ্চলিক উপন্যাস সম্বন্ধেও কিছু কথা বলেছেন। কোনো উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে সেই উপন্যাসে একটি বিশেষ অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, রীতি-নীতি প্রকাশ পেয়েছে কিনা তা দেখার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেছেন। পাশাপশি সেই উপন্যাসের চরিত্রগুলি সেই বিশেষ অঞ্চলটি দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে কি না তার উপরেও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে লক্ষ রাখতে বলেছেন — ''আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি দিতে গেলে তাই সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি প্রকাশ পেয়েছে কিনা সে তো দেখতেই হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রধান ভাবে দেখতে হবে প্রধান চরিত্রগুলি অঞ্চলসম্পৃক্ত হয়ে উঠতে পেরেছে কি না।''[৬৯] তিনি একটি উপন্যাসকে আঞ্চলিক অভিধা দেওয়ার পূর্বে একটি বিশেষ অঞ্চলকে নিয়ে কোনো উপন্যাস রচিত হওয়া সম্ভব কি না তা দেখার কথা বলেছেন। একটি অঞ্চলকে নিয়ে লেখা উপন্যাসটির আখ্যান যদি যে কোনো অঞ্চলের পটভূমিকাতেই দাঁড় করানো যায়, তবে তাকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যাবে না — উপন্যাসটি যদি সেই বিশেষ অঞ্চলের পটভূমি ছাড়া দাঁড়াতেই না পারে, তবেই তা সার্থক 'আঞ্চলিক উপন্যাস' হয়ে ওঠে। আসলে এর দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছেন যে, উপন্যাসে গৃহীত বিশেষ অঞ্চলটি সমগ্র উপন্যাসে এতটাই প্রভাব ফেলে যে, তা উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে ওঠে এবং উপন্যাস থেকে ঐ বিশেষ অঞ্চলটিকে সরিয়ে নিলে

উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার লক্ষণ অনেকটাই চলে যায় — ''একটি বিশেষ অঞ্চলকে নিয়ে উপন্যাস লেখা সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। এমন হতে পারে, যে-কোনো অঞ্চলেই এমন একটি ঔপন্যাসিক আখ্যান সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল, আবার এমনও হতে পারে যে সেই বিশেষ অঞ্চল ছাড়া উপন্যাসটি দাঁড়াতেই পারে না। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই অঞ্চলটির অনিবার্যতা প্রমাণিত হয় এবং উপন্যাসটি আঞ্চলিক বিশেষণে ভূষিত হতে পারে।''[৭০]

এইভাবে দেশি ও বিদেশি সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক নানা গ্রন্থ, অভিধান, বিভিন্ন সাহিত্য-তাত্ত্বিক ও সাহিত্য সমালোচকদের আলোচনা, আঞ্চলিক উপন্যাসের স্রষ্টা ঔপন্যাসিকদের আত্মকথা, স্মৃতিচারণা বা সাক্ষাৎকার পর্যালোচনা করে আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য আমরা পেয়ে যাই। তবে এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে আঞ্চলিক উপন্যাস সম্পর্কে এত মতামত উঠে এসেছে যে, কোন্ মতটা গ্রহণ করা যাবে, আর কোন্টা গ্রহণ করা যাবে না তা নিয়েই দ্বিধায় পড়তে হয়। আঞ্চলিক উপন্যাস সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনাতেই পটভূমি হিসেবে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। তবে কোনো আলোচনায় সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলটির ভূগোলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে; আবার কোনো আলোচনায় সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলটিতে বসবাসকারী মানুষজন এবং তাদের জীবনচর্যাকে তুলে আনার দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের মনে হয় সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলটির ভূগোল এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষজনের জীবনচর্যার উপযুক্ত সম্মেলন ঘটলেই একটি উপন্যাস আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সার্থকতা লাভ করতে পারে। তবে যে কোনো আঞ্চলিক উপন্যাসকে সবার আগে একটি সার্থক উপন্যাস হয়ে উঠতে হয়। এজন্য কাহিনি, চরিত্র, প্লট, বাস্তবতা, ভাষা-সংলাপ, কথনরীতি, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, প্রতীকের ব্যবহারের মতো একটি সার্থক উপন্যাসের ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপাদানগুলি যে কোনো সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসেও সফলভাবে নিয়ে আসতে হয়। এত কিছু সত্ত্বেও আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। এই কারণে দেশি-বিদেশি নানা জ্ঞানগর্ভ আলোচনা থেকে শুরু করে সাধারণ আলোচনাতেও আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা প্রদান করা হলেও

উপন্যাসের এই প্রকরণটির একটি সংজ্ঞা প্রদান আবশ্যিক হয়ে পড়ে। একটি বাক্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞায় আমরা বলতে পারি —

কোনো একটি বিশিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার বিশিষ্ট গোষ্ঠীবদ্ধ এবং বৃত্তিধারী অধিবাসীদের একান্ত নিজস্ব জীবনচর্যা উপন্যাসের শিল্পরূপ মেনে আত্মপ্রকাশ করলে তাকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলে।

এই সংজ্ঞাটি বিস্তৃত করলে দাঁড়ায় —

উপন্যাসের সাধারণ রূপ-রীতি মেনে রচিত কোনো গদ্য আখ্যানধর্মী রচনায় মূল ভূখণ্ড বা মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা কারণে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা ভূ-ভাগকে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করে ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলটির বিশিষ্ট ভূ-প্রকৃতিসহ সেখানে বসবাসকারী মানুষজনের জীবনচর্যা অর্থাৎ তাদের জীবন-জীবিকা, আচার-আচরণ, রীতি-পদ্ধতি, বিশ্বাস-সংস্কার, লোকাচার-লোকরুচি, লোককথা-লোকসংস্কৃতি, বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস, নিজস্ব পুরাকথা, বিশিষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যতালিকা ও খাদ্যাভ্যাস, বাসগৃহ, নিজস্ব ভাষা-সংলাপ-গান, তথাকথিত সভ্যজগৎ সম্বন্ধে তাদের ধ্যান-ধারণা, যোগাযোগ ও সম্পর্কের মতো বিষয়গুলি সামগ্রিকভাবে প্রকাশিত হয়ে এক ধরনের ‘আঞ্চলিক রঙ’ বা 'Local Colour' প্রকাশ করে ঐ অঞ্চলটি একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠলে, তখন সেই আখ্যানধর্মী রচনাটিকে আমরা আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে পারি।

আঞ্চলিক উপন্যাসে পটভূমি হিসেবে গৃহীত অঞ্চলটি সমগ্র উপন্যাসে এতটা অনিবার্য প্রভাব ফেলে যে, অনেক ক্ষেত্রেই তা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠে; কোনোভাবে এই অঞ্চলটিকে সরিয়ে নিলে উপন্যাসটির সার্থক উপন্যাস হয়ে ওঠার অনেক লক্ষণ চলে যায়। পাশাপাশি আঞ্চলিক উপন্যাসে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের প্রয়োজনেই বেশ কিছু চরিত্র নিয়ে আসেন, যারা সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের সার্থক প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের মধ্যে এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে যার ফলে তাদের সেই অঞ্চলটি থেকে কখনও পৃথক করা যায় না। এজন্য আঞ্চলিক উপন্যাসে ব্যক্তি চরিত্র অপেক্ষা সমষ্টিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে আদিম কৌমসমাজের একটা রূপ এই ধরনের উপন্যাসে দেখা যায়। অনেক সময় অঞ্চলটির বাইরের লোকজন

উপন্যাসে এলেও তারা গৌণ ভূমিকাতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে। এ ধরনের উপন্যাসে ঔপন্যাসিককে 'আঞ্চলিক রঙ্' বা 'Local Colour' এমন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয় যে, উপন্যাসটি পাঠকালে পাঠক যেন ঘরে বসে নিজেকে সেই অঞ্চলটির একজন হিসেবে ভাবতে শুরু করে এবং সেখানকার সমস্ত কিছুর সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে। তবে সবথেকে গুরুত্বের দিক হল যে, আঞ্চলিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিককে এর শিল্পগত সার্থকতার দিকে নজর দিতে হয়। এজন্য এই ধরনের উপন্যাসেও ঔপন্যাসিকের জীবনবোধের বিস্তার ঘটানো অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। তাই আঞ্চলিক উপন্যাস একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাস্তবচিত্র হয়েও সর্বজনীনতা লাভের দিকে অগ্রসর হয়।

মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চলকে পটভূমি করে সেখানকার ভূগোল ও মানুষজনের জীবনচর্যাকে প্রাধান্য দিয়ে আজ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি সাহিত্যে প্রচুর উপন্যাস রচিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সবগুলি উপন্যাস যে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সার্থকতা লাভ করতে পেরেছে এমন নয়; আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সার্থকতার প্রশ্নে অনেক উপন্যাস যেমন সফল হতে পারে নি, তেমনি আবার বেশ কিছু উপন্যাস আঞ্চলিকতার গন্ডীকে অতিক্রম করে বৃহত্তর তাৎপর্য নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এজন্য সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসগুলির পাশাপাশি সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর উপন্যাসের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। এই নতুন শ্রেণীকে আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাস বলা যায়। কোনো বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত কোন্ উপন্যাসগুলিকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা হবে, আর কোন্ উপন্যাসগুলিকে আঞ্চলিকতার লক্ষণসম্পন্ন উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা হবে; তা ঠিক করতে গেলে আঞ্চলিক উপন্যাসের কিছু সাধারণ লক্ষণ সম্পর্কে ধারণা রাখতে হয়। এই সাধারণ লক্ষণগুলি হল —

প্রথমত : আঞ্চলিক উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে মূল ভূ-খন্ড বা মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চল এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবনচর্যাকে গ্রহণ করা হয়। আঞ্চলিক উপন্যাসে গৃহীত এই অঞ্চলটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো গ্রামাঞ্চল হয়। তবে নতুন গড়ে ওঠা কোনো শিল্পাঞ্চল,

বন্দর, শহরতলি, নদীর বুকে জেগে ওঠা চরভূমিও আঞ্চলিক উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে গৃহীত হতে পারে। আবার বৃহত্তর দেশের মধ্যে অবস্থিত কোনো প্রদেশও আঞ্চলিক উপন্যাসের পটভূমি হতে পারে। তবে এই বিশেষ অঞ্চলটির এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে যা অঞ্চলটিকে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হলেও খুব সহজেই তা থেকে আলাদা করে দেয়। ফলে অঞ্চলটির ভূ-প্রকৃতি এবং সেখানকার মানুষজনের জীবনচর্যার সঙ্গে মূল জনসমাজের ভূ-প্রকৃতি এবং মানুষজনের জীবনচর্যার পরিক্রমার খুব একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত : আঞ্চলিক উপন্যাসে যে অঞ্চলটিকে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তার ভৌগোলিক প্রকৃতিগত কিছু বিশিষ্টতা থাকে। মূল জনসমাজের ভৌগোলিক প্রকৃতির সঙ্গে উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির প্রকৃতির তেমন একটা মিল থাকে না। এমনকি একই এলাকার মধ্যে অবস্থিত থাকলেও উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ঐ এলাকার সাধারণ ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের থেকে পৃথক হয়। ফলে আঞ্চলিক উপন্যাসে একটি নির্দিষ্ট এলাকার ভূগোলও প্রাধান্য পায়।

তৃতীয়ত : আঞ্চলিক উপন্যাসে চরিত্ররা প্রায় সকলেই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির প্রতিনিধিত্ব করে আঞ্চলিক পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে যা মূল জনসমাজের অনেক মানুষের মধ্যে থাকলেও সেখান থেকে এদের খুব সহজেই পৃথক করা যায়। মূল জনসমাজে বা সভ্যজগতে নিয়ে আসা হলে এরা তার সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারে না। অনেক সময় মূল জনসমাজ বা সভ্যজগৎ এদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকে। এরা নিজেদের অঞ্চলেই স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করে। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে নিজেদের অঞ্চলের বাইরে এরা আসতে বাধ্য হলে সেখানে তারা একরকম অস্বস্তিতে ভোগে।

চতুর্থত : আঞ্চলিক উপন্যাসে ব্যক্তি চেতনা অপেক্ষা সমষ্টি চেতনা বেশি গুরুত্ব পায়। ফলে প্রচলিত অর্থে নায়ক বা নায়িকা এখানে একরকম অনুপস্থিতই থাকে। এই ধরনের উপন্যাসে গৃহীত নির্দিষ্ট অঞ্চলটি এবং সেখানকার সামগ্রিক জনসমাজই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নায়ক বা নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তবে অনেক সময় সেই অঞ্চলটির জনসমাজের প্রতিনিধি করে কোনো চরিত্রকে সামনে আনতে হয়। তাকে

নায়ক বা নায়িকার স্বীকৃতিও দেওয়া হয়। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলটি তার উপর এতটাই অমোঘ প্রভাব বিস্তার করে যে, অঞ্চলটিকে বাদ দিলে তার মধ্যে নায়ক বা নায়িকা হওয়ার উপযুক্ত কোনো বৈশিষ্ট্য আর অবশিষ্ট থাকে না।

পঞ্চমত : আঞ্চলিক উপন্যাসের চরিত্রদের আচার-আচরণ মূল জনসমাজের বা সভ্যজগতের মানুষের মত হয় না; তা অঞ্চলটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গড়ে ওঠে। এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো অনুন্নত এলাকার মানুষ হয়। তাদের পুথিগত শিক্ষা-দীক্ষাও তেমন থাকে না বললেই চলে। এদের উপর সেই নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার প্রকৃতির অমোঘ প্রভাব পড়ে। ফলে উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটি এবং সেখানকার প্রকৃতি উপন্যাসের চরিত্রদের আচার-আচরণ ঠিক করে দেয়। এই কারণে আঞ্চলিক উপন্যাসের চরিত্ররা যেমন কষ্টসহিষ্ণু হওয়ার পাশাপাশি অলস হয়, তেমনি সহজ-সরল-উদার হওয়ার পাশাপাশি রুক্ষ-বর্বর-হিংস্রও হয়। এই সমস্ত আচার-আচরণ তাদের মূল জনসমাজ বা সভ্যসমাজের মানুষের থেকে খুব সহজেই আলাদা করে দেয়।

ষষ্ঠত : একই দেশে বসবাসকারী মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকা ও খাদ্যাভ্যাস একই রকম হয় না। তথাকথিত ভদ্র মানুষজনের খাদ্যতালিকা ও খাদ্যাভ্যাস এবং পিছিয়ে পড়া অভাবী মানুষজনের খাদ্যতালিকা ও খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে যোজন দূরত্ব থাকে। আঞ্চলিক উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির স্বাভাবিক খাদ্যতালিকা, খাদ্যরীতি ও খাদ্যাভ্যাসের পরিচয় দিতে হয়।

সপ্তমত : মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। কারণ একই দেশে বসবাসকারী সমস্ত মানুষ একই রকম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে না। দেখা যায় যে, গ্রামাঞ্চলের মানুষজন যে পোশাকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে; শহরাঞ্চলের মানুষ সেরূপ পোশাকপরিধান করতে লজ্জা বোধ করে। আঞ্চলিক উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির পোশাক-পরিচ্ছদের বাস্তবরূপকেই তুলে আনতে হয়। এই পোশাক-পরিচ্ছদ তাদের মূল জনসমাজের মানুষদের থেকে খুব সহজেই পৃথক করে।

অষ্টমত : একটা বৃহৎ অঞ্চলের মানুষ একটি ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও স্থানভেদে সেই ভাষার শব্দ ব্যবহারে, প্রয়োগরীতি থেকে শুরু করে নানা ব্যাকরণগত

পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আঞ্চলিক উপন্যাসের বর্ণনার ভাষার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক সাধুভাষা বা মান্য-চলিত ভাষা ব্যবহার করলেও সেই ভাষায় ঐ অঞ্চলে বহুল প্রচলিত শব্দগুলি (ব্যক্তির নাম, স্থানের নাম, বস্তুর নাম, অনুষ্ঠানের নাম, রীতি-পদ্ধতির নাম, কাজের নাম প্রভৃতি) ব্যবহার করেন। তবে উপন্যাসের সংলাপের ভাষার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক চরিত্রদের মুখে সেই অঞ্চলে প্রচলিত উপযুক্ত ভাষা বসানোর চেষ্টা করেন। তবে সর্বদা যে এই চেষ্টা সফল হয় এমন নয়; তাই অনেক ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক সেই উপভাষার কিছু শব্দ ব্যবহার করে মান্য-চলিত বাংলায় অনূদিত করে দেন।

নবমত : মানুষের জীবনচর্যাই হল সংস্কৃতি। প্রত্যেক জাতির মানুষ কোনো একটি বৃহত্তর সংস্কৃতিকে লালন-পালন ও বহন করে চলে। কিন্তু স্থানভেদে একই জাতির মানুষের মধ্যেও সংস্কৃতিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু আঞ্চলিক উপন্যাসে কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষজনের জীবন পরিক্রমার বাস্তব চিত্র প্রকাশ করতে হয়, সেহেতু সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলটির আঞ্চলিক সংস্কৃতিকেও এখানে তুলে আনতে হয়। এই সংস্কৃতির সঙ্গে মূল জনসমাজ বা সভ্যজগতের সংস্কৃতিগত অল্প কিছু মিল থাকলেও থাকতে পারে, তবে নানা দিক থেকে প্রচুর পার্থক্য থাকে। তাই আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণ হিসেবে একথা বলাই যায় যে, আঞ্চলিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির নিজস্ব সংস্কৃতি আপন মহিমায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

দশমত : জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ মানুষের জীবনে এই তিনটি হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্য। এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষ নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। এছাড়া ধর্মীয় কারণেও মানুষ নানা আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। লোকজীবনে পালিত এই আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে লোকাচার বা লোক-সংস্কৃতি বলে। মূল জনসমাজে বা সভ্যজগতে এই লোকাচার বা লোক-সংস্কৃতিগত আচার-অনুষ্ঠানগুলির একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপ থাকলেও অঞ্চলভেদে এই আচার অনুষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে নানা পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এজন্য নবজাতকের জন্মগত অভ্যর্থনা যেমন মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একেক অঞ্চলের মানুষ

একেকভাবে করে, তেমনি অনুরূপভাবে মৃত্যুজনিত শোকও একেক অঞ্চলের মানুষ একেক ভাবে প্রকাশ করে; আবার বিবাহের রীতি-পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠান একেক অঞ্চলের মানুষের কাছে একেক রকম। পাশাপাশি ধর্মজনিত অনুষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও সব অঞ্চলে এক রকম আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয় না। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক-একজন দেব বা দেবীকে অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আরাধনা করা হয়। আবার প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব আরাধ্য এমন কিছু লৌকিক দেব-দেবী থাকে, যাদের অস্তিত্ব মূল জনসমাজে বা সভ্যজগতে থাকে না। আঞ্চলিক উপন্যাসে গৃহীত নির্দিষ্ট অঞ্চলটির এইরকম লোকাচার ও লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক রূপকেই তুলে আনতে হয়।

একাদশতম : আঞ্চলিক উপন্যাসে গৃহীত নির্দিষ্ট অঞ্চলটির মানুষজনের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত লোককথা তথা পুরাকথার বিবরণও ঔপন্যাসিককে তুলে ধরতে হয়। এগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিশেষ জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় বহুকালাগত স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত। তবে স্থানীয় কোনো আঞ্চলিক দেবতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রাজ-রাজড়ার শৌর্য-বীর্যের কাহিনি, কোনো মিলন বা বিষাদ পূর্ণ রোমান্টিক আখ্যানের মত নানা বাস্তব অথবা কাল্পনিক গল্প-কাহিনিও এইসব লোককথার বিষয় হতে পারে। অনেক সময় উপন্যাসের কোনো চরিত্রের মুখে গল্প বা উপকথা আকারে ঔপন্যাসিক এগুলি পরিবেশন করেন। আবার কখনো ঔপন্যাসিক নিজে থেকেও সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলটির বিশেষ জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি ও ইতিবৃত্তের বিবরণ দেন।

দ্বাদশতম : আঞ্চলিক উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা বৃহত্তর জনসমাজে প্রচলিত প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে কোনো একটি ধর্মমতে বিশ্বাসী থাকতে পারে। তবে ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় তারা নানা ধরনের আঞ্চলিক বা লৌকিক দেব-দেবীর আরাধনা করে। সেই লৌকিক দেব-দেবী অনুযায়ী নির্দিষ্ট রীতি-নীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানও তারা পালন করে। তবে এই ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানগুলি এতটাই স্বতন্ত্র হয় যে, এই মানুষগুলি কোনো মূল ধর্মের মধ্যে থাকলেও অনেক সময় তাদের ধর্মবিশ্বাসকে স্বতন্ত্র বলেই মনে হয়। বিশেষ করে হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি

সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। ফলে আঞ্চলিক উপন্যাসে গৃহীত নির্দিষ্ট অঞ্চলটির মানুষজনের বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস মূল জনসমাজ বা সভ্যজগতের মানুষজনের ধর্মবিশ্বাস থেকে নানা কারণে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে।

ত্রয়োদশতম : আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল এখানে 'আঞ্চলিক রঙ্' অর্থাৎ Local Colour ঠিকভাবে প্রকাশ করতে হয়। এই 'আঞ্চলিক রঙ্' বা Local Colour আসলে কী তা নিয়ে পন্ডিত মহলে অনেক আলোচনা হয়েছে। তবে শব্দটি দ্বারা শুধু আঞ্চলিক প্রকৃতির বর্ণনাকে বোঝায় না; এই শব্দটি তার চেয়ে কিছুটা বেশি মূল্য ধারণ করে। একে 'আঞ্চলিক রস' সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণও বলা যায়। কোনো আঞ্চলিক উপন্যাস রচনার সময় ঔপন্যাসিককে উপন্যাসটির বিষয়, ঘটনা, পাত্রপাত্রী ও তাদের ক্রিয়াকলাপ থেকে শুরু করে পোশাক–পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, আচার–আচরণ, রীতি–সংস্কার, লোকাচার–লোকবিশ্বাস, লোককথা, ধর্মবিশ্বাস, ভাষা–সংলাপ প্রভৃতি সবকিছুর উপর উপন্যাসে গৃহীত সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলটির ভূ–প্রকৃতি ও জলবায়ুর প্রভাবকে এতটাই গুরুত্ব দিয়ে তুলে আনতে হয় যে, খুব সহজেই উপন্যাসটিকে মূল ধারার যে কোনো উপন্যাস থেকে পৃথক করা যায়। 'আঞ্চলিক রঙ্' বা 'Local Colour' আসলে কোনো উপন্যাসের আঞ্চলিকতা নির্ণয়ের প্রধান শর্ত। কোনো উপন্যাসে 'আঞ্চলিক রঙ্' বা 'Local Colour' ঠিকমত ফুটে উঠলে সেই উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সার্থকতার দিকে অনেকটাই অগ্রসর হয়। আর যদি ঔপন্যাসিকের 'আঞ্চলিক রঙ্' বা 'Local Colour' ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যায়, তবে উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সার্থক হতে পারে না।

চতুর্দশতম : আঞ্চলিক উপন্যাস পাঠকালে পাঠকমনে নিজের অজ্ঞাতসারেই এক ভৌগোলিক চেতনার সঞ্চার ঘটে। তবে এই ভূগোলবোধকে অতিক্রম করে জীবনবোধকে প্রস্ফুটিত করাই আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। ফলে এইসব উপন্যাস পাঠের পর পাঠক মানব জীবনের নানারূপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত হন। এজন্য ভৌগোলিক পরিচিতিকে ছাড়িয়ে গভীর জীবনবোধের প্রকাশকে আঞ্চলিক উপন্যাসের একটি বিশেষ লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়।

পঞ্চদশতম : আঞ্চলিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিককে তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করা মূল জনসমাজ বা সভ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলটি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতেই হয়। শুধু তাই নয় আঞ্চলিক জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি ঔপন্যাসিকের স্থানিক রঙ্ ফোটানোর কারুকুশলতা, আঞ্চলিক উপভাষার উপর দখলও থাকা চাই। এজন্য ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে উঠে আসা অঞ্চলটির অধিবাসী হলে খুবই ভালো হয়। আর যদি তিনি তা না হন, তবে তাঁকে সেই অঞ্চলে দীর্ঘদিন বসবাস করে সেখানকার প্রকৃতি ও মানুষের জীবনচর্যা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। কিন্তু উপন্যাস লেখার সময় ঔপন্যাসিকদের সহানুভূতি ও শিল্পগত নির্লিপ্তি বজায় রাখতেই হয়।

ষোড়শতম : আঞ্চলিক উপন্যাসের রসাস্বাদন করতে হলে পাঠককেও অত্যন্ত সচেতন হতে হয়। তাঁর মধ্যে গভীর জীবনবোধ, আত্মজিজ্ঞাসা এবং নির্মোহ বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকা চাই। অন্যথায় সংবাদধর্মী বিবরণ বা রম্য-কাহিনিকে পাঠক আঞ্চলিক উপন্যাস বলে ভুল করে বসবেন। অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহারও পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। এজন্য পাঠককে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে নিবিড় পাঠানুশীলন করতে হয়। পাঠক যদি আঞ্চলিক উপন্যাস থেকে নিছক কোনো কাহিনি, তথ্য বা বিবরণ আশা করেন, তবে তাঁর বিভ্রান্তি হওয়াই স্বাভাবিক। পাঠককে আঞ্চলিক উপন্যাসকে প্রথমে একটি জীবননির্ভর শিল্প ভাবতে হবে। তাহলেই তিনি এই ধরনের উপন্যাস থেকে প্রকৃত রস আস্বাদন করতে সক্ষম হবেন।

সপ্তদশতম : আঞ্চলিক উপন্যাসের চরিত্ররা নিজের সেই অঞ্চলটি এবং সেখানকার সংস্কৃতিকে অত্যন্ত ভালোবাসে। তারা সেখানকার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টাও করে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে পারে না। কালের অনিবার্য প্রভাবে সেই সংস্কৃতিও বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়। মহাকালের আনিবার্য প্রভাবে আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিলুপ্তি আঞ্চলিক উপন্যাসের একটি বিশেষ লক্ষণ বলে পরিগণিত হয়।

অষ্টাদশতম : আঞ্চলিক উপন্যাসে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিবরণ থাকলেও উপন্যাসটির ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিককে সংকীর্ণতা পরিহার করে তাকে সর্বজনীন করে তুলতে হয়। উপন্যাসের এই সর্বজনীনতার কারণেই তা নিছক একটি অঞ্চলের

জীবনকথার বিবরণ না হয়ে, যথার্থ সাহিত্য হয়ে ওঠে। এজন্য পাঠক আঞ্চলিক উপন্যাস পাঠ করার পর একদিকে যেমন ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলটি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারে, তেমনি যথার্থ সাহিত্যরসও আস্বাদন করতে পারে। সর্বজনীন আবেদন তৈরি করতে না পারলে কোনো উপন্যাসই সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে না।

সর্বোপরি আঞ্চলিক উপন্যাস আর যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তা হল এক ধরনের শিল্পকর্ম। ইংরেজি অভিধান গ্রন্থে একে সামাজিক উপন্যাস থেকে বেরিয়ে আসা এক ধরনের উপন্যাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একথা তো ঠিকই যে, আঞ্চলিক উপন্যাসকে সবার আগে একটি উপন্যাস হতে হয়। তাই যে কোনো সাধারণ উপন্যাসের মত আঞ্চলিক উপন্যাসকেও উপন্যাসের সমস্ত মৌলিক বৈশিষ্ট্য মেনে চলতে হয়। অন্যান্য সব ধরনের উপন্যাসের মত আঞ্চলিক উপন্যাসেও কাহিনি, প্লট, চরিত্র, পটভূমি, বাস্তবতা, কথনরীতি, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, উপকাহিনি, লেখকের জীবনদর্শনের মত সমস্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে। এগুলি ঠিকমত বিন্যস্ত করতে পারলেই আঞ্চলিক উপন্যাসটি শিল্পগত সার্থকতার দিকে অগ্রসর হয়। তবে সবকিছুর মধ্যেও এখানে পটভূমি হিসেবে গৃহীত মূল জনসমাজ বা সভ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলটির অবিসংবাদিত প্রভাব পড়ে। তবে তা কোনো ভাবেই মানুষের জীবনবোধকে অতিক্রম করে না। কারণ যে কোনো শিল্পকর্মই মানবজীবনবোধের সুনিপুণ অঙ্কনের কারণেই সার্থকতা লাভ করে।

উল্লেখপঞ্জী

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ২৪ শে মাঘ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, সপ্তম সংস্করণ ১৪ই এপ্রিল, ১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ ২০০৪-২০০৫, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২
২। তদেব, পৃ ৭
৩। তদেব, পৃ ৮–৯
৪। তদেব, পৃ ১১–১২
৫। তদেব, পৃষ্ঠা ১৮
৬। তদেব, পৃষ্ঠা ১৯
৭। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম সংস্করণ : নভেম্বর ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ১,
৮। তদেব, পৃ ২
৯। উপন্যাসের কথা : দেবীপদ ভট্টাচার্য, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দে'জ সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৩, দে'জ, কলকাতা, পৃ ২১

১০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৬৫
১১। A Glossary of Literary Terms : M.H. Abrams & Geoffrey Galt Harpham, ninth edition 2009, Wodsworth Cengage Learning, 25 Thomson Place, Boston, MA 02210, USA. Page 231,
১২। Ibid, Page 231.
১৩। Ibid, Page 178-179.
১৪। 'The English Novel : a Short Critical History' : Walter Allen, Penguin Books, Great Britain, 1991, Page 103.
১৫। Ibid, Page 103.
১৬। A Glossary for the study of English : Lee T Lemon, Third Impression 1988, Oxford University Press, Delhi, Page 116,
১৭। Ibid, Page 116.
১৮। Ibid, Page 116.
১৯। Ibid, Page 116.
২০। The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory : J.A. Cuddon, revised by C.E. Preston, Penguin Books-1999, USA. Page 737
২১। Ibid, Page 738.
২২। Ibid, Page 738.
২৩। Ibid, Page 737-738.
২৪। A Dictionary of Literary Terms : Martin Gray, Reprint 1985, YORK PRESS, Beirut, Page 171.
২৫। Ibid, Page 171.
২৬। Ibid, Page 115.
২৭। Ibid, Page 115.
২৮। The Oxford Companion to the English Language : Tom McArthur (edited), First Edition 1992, Oxford University Press, USA.
২৯। Ibid,
৩০। Ibid,
৩১। The Oxford Companion to English Literature : Margaret Drabble (edited), Sixth Edition - 2000, Oxford University Press, Page 844.
৩২। The Regional Novel in Britain and Ireland : K.D.M Snell (edited), First Published 1998, Digitally Printed Version 2008, and Cambridge University Press, Page 1.
৩৩। Ibid, Page 1.
৩৪। Ibid, Page 1.
৩৫। The Encyclopaedia of the Novel : Caren S. Lambert, General editor : Peter Melville Logan, Associate editors : Olakunle George, Susan Hageman and Efrain Kristal, First Published 2011, Blackwell Publishing Ltd Page 667.
৩৬। Ibid, Page 667.
৩৭। Ibid, Page 667.
৩৮। Ibid, Page 669.
৩৯। Ibid, Page 669.
৪০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৭৬৩
৪১। তদেব, পৃ ৭৬৩-৭৬৪
৪২। তদেব, পৃ ৭৬৪
৪৩। বাংলা গল্প বিচিত্রা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ ১১২
৪৪। তদেব, পৃ১১
৪৫। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ২৫৩
৪৬। তদেব, পৃ ২৫৩
৪৭। সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য : অলোক রায় (সম্পাদিত), তৃতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০২, সাহিত্যলোক, কলকাতা,), পৃ ২-৩
৪৮। তদেব, পৃ ৩
৪৯। কালের প্রতিমা : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পঞ্চম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, , পৃ ২৪৫
৫০। তদেব, পৃ ২৪৫
৫১। তদেব, পৃ ১৩৩

৫২। বাসুদেব মোশেল সম্পাদিত 'বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য' গ্রন্থের অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আঞ্চলিক উপন্যাস' প্রবন্ধ, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, বুকস্ওয়ে, কলকাতা, পৃ ৪২৩
৫৩। তদেব, পৃ ৪২৩
৫৪। তদেব, পৃ ৪২৩
৫৫। তদেব, পৃ ৪২৪
৫৬। তদেব, পৃ ৪২৪
৫৭। তদেব, পৃ ৪২৪-৪২৫
৫৮। তদেব, পৃ ৪২৫
৫৯। তদেব, পৃ ৪৩০
৬০। তদেব, পৃ ৪৩০
৬১। তদেব, পৃ ৪২৫-৪২৬
৬২। তদেব, পৃ ৪৩৪-৪৩৫
৬৩। তদেব, পৃ ৪৩৫
৬৪। বাংলা সাহিত্যের নানারূপ : শুদ্ধস্বত্ত্ব বসু, ষষ্ঠ মুদ্রণ, শ্রাবন ১৪১০, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, পৃ ১৪২
৬৫। তদেব, পৃ ১৪২
৬৬। তদেব, পৃ ১৪৩
৬৭। সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ১৯৩
৬৮। তদেব, পৃ ১৯৩
৬৯। সাহিত্য প্রকরণ : হীরেন চট্টোপাধ্যায়, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৌষ সংক্রান্তি, ১৪০৬, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ ১৭৪
৭০। তদেব, পৃ ১৭৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রকাশ ও বিস্তারের সাধারণ পরিচয় সংক্ষেপ

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রকাশ ও বিস্তারের সাধারণ পরিচয় সংক্ষেপ

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার আবির্ভাব একদিনে হয়নি। অনেক সাহিত্যিকের নিরলস প্রচেষ্টা, স্বাতন্ত্র্য লাভ করার জন্য অদম্য জেদ, অপরিসীম নিষ্ঠা, উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য কলকাতার শহর জীবন ত্যাগ করে বিভিন্ন অচেনা-অজানা অঞ্চলে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া, সেসব অঞ্চলে বহু সময় অতিবাহিত করে তথ্য সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করার মানসিকতার ফলেই বাংলা কথাসহিত্যে আঞ্চলিকতার আবাহন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রথম পথ দেখিয়েছেন তিন জন — শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে যে নতুন যুগের সূচনা হয়, সেই নবযুগের একজন গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক হলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে লিখেছেন — ''বাংলা সাহিত্যে ইনিই সেই কয়লাকুঠির আবিষ্কর্তা! নিঃস্ব রিক্ত বঞ্চিত জনতার প্রথম প্রতিনিধি? বাংলা সাহিত্যে যিনি নতুন বস্তু নতুন ভাষা নতুন ভঙ্গী এনেছেন? হাতির দাঁতের মিনারচূড়া ছেড়ে যিনি প্রথম নেমে এসেছেন ধূলিম্লান মৃত্তিকার সমতলে?''[১] বস্তুতপক্ষে বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার সূচনা শৈলজানন্দের হাতেই ঘটেছে। তবে তিনি প্রথমে বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতাকে নিয়ে এসেছিলেন। প্রথমদিকে শৈলজানন্দ বর্ধমান জেলার আসানসোল-রানীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চল এবং সেখানে বসবাসকারী সাঁওতাল-বাউড়ী সম্প্রদায়ের কুলী-কামিনদের নিয়ে অনেকগুলি ছোটগল্প লেখেন, যেগুলিকে তাঁর 'কয়লাকুঠি সিরিজ'-এর গল্প বলা হয়। তাঁর এই 'কয়লাকুঠি সিরিজ'-এর 'রেজিং রিপোর্ট' এবং 'বলিদান' গল্প সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন — ''পরিপক্কতা লইয়া শৈলজানন্দের গল্প ১৩২৯ সালের ফাল্গুন মাসে প্রবাসীতে বাহির হইল — নাম 'রেজিং রিপোর্ট'। রানীগঞ্জ-উখড়া-দিশেরগড় অঞ্চলের কয়লাখাদের সাঁওতাল-বাউড়ী কুলি-কামিনদের ধাওড়ার

অজ্ঞাত জীবন লইয়া শৈলজানন্দ যে গল্পস্রোত বহাইয়া দিয়া সাহিত্যজগৎ প্রায় চমকিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সূত্রপাত এই গল্পে এবং 'বলিদান' গল্পে।''[২] ১৩২৯ বঙ্গাব্দেই 'মাসিক বসুমতি' পত্রিকায় শৈলজানন্দের এই 'কয়লাকুঠি সিরিজ'-এর আর একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। এই গল্পটির ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি 'কয়লাকুঠি' নামটি নির্বাচন করেছেন। এই গল্পেরও পটভূমি সেই বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জ-আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চল এবং সেখানকার সাঁওতাল-বাউড়ী সম্প্রদায়ের কুলী-কামিনদের জীবনচর্যা। বর্ধমান জেলার কয়লাখনি প্রধান এই অঞ্চলটি দীর্ঘদিন বাংলার মূল জনসমাজের মধ্যে থেকেও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। কারণ এই অঞ্চলটির প্রকৃতি এবং এখানে বসবাসকারী মানুষজন (কুলি-কামিন)-এর জীবনচর্যার খবর আপামর বাঙালীর কাছে কখনোই পৌঁছাত না। এই গল্পগুলি থেকেই বাংলা কথাসাহিত্যে প্রকৃত আঞ্চলিকতার সূচনা হয়। পরবর্তীকালে ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে শৈলজানন্দ 'কয়লাকুঠির দেশ' উপন্যাসটি লেখেন। বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ-আসানসোলকে পটভূমি করে লেখা এই উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেকগুলি লক্ষণ বিদ্যমান আছে।

বিশ শতকের বিশের দশকে 'কল্লোল' (প্রথম প্রকাশ ১৯২৩ খ্রিঃ) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে গতানুগতিকতা কাটিয়ে একদল সাহিত্যিক নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অগ্রসর হন। ফলে বাংলা উপন্যাস-ছোটগল্পের পটভূমি হিসেবে আমাদের চিরপরিচিত শহর বা গ্রাম নির্ভরতা কাটিয়ে বসতি, শহরতলি বা অচেনা-অজানা কোনো অঞ্চল প্রাধান্য পেতে শুরু করে। এই মনোভাব নিয়ে এই দশকে আর যাঁরা উপন্যাস চর্চায় এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮ খ্রিঃ)। বাংলা সাহিত্যের পাঠক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে কবি ও গল্পকাররূপে মনে রাখলেও প্রথম জীবনে দু'-একটি উপন্যাস লিখেও বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি আলোড়ন ফেলেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনে লেখা একটি উপন্যাস হল 'পাঁক' (১৯২৬ খ্রিঃ)। এই উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতা সেভাবে প্রকাশ না পেলেও এর পটভূমি গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি যে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ রেখেছেন, তার ভিত্তিতেই বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় এই উপন্যাসটি স্থান পায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু 'কল্লোল যুগ' (১৯৫০ খ্রিঃ) গ্রন্থের প্রণেতা, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩–১৯৭৬ খ্রিঃ) প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতই সাহিত্যে বাস্তবতার খোঁজে আমাদের চির পরিচিত লোক সমাজের বাইরে পা বাড়িয়েছিলেন। তিনি নিজের গল্প-উপন্যাসে শহরতলি, বসতি, অজানা-অখ্যাত গ্রামীণ এলাকাকে পটভূমি করে সেসব স্থানের এতদিনের অজ্ঞাত অথচ ভীষণভাবে বাস্তবনির্ভর জীবনচিত্র অঙ্কনে অগ্রসর হয়েছিলেন। এজন্য তাঁর রচনায় অনেক সময় উদাসীন বাউন্ডুলে জীবন এবং নরনারীর যৌন জীবনধারার প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। তাঁর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস 'বেদে' (১৯২৮ খ্রিঃ)। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। এর পেছনে অবশ্য উপন্যাসটির উচ্ছৃঙ্খল যৌনতা প্রকাশের বিষয়টি কাজ করেছিল। সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় অচিন্ত্যকুমারকে ঔপন্যাসিক হিসাবে তেমন কোনো স্বীকৃতি দিতে না চাইলেও এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সেদিনকার তরুণদের কাছে 'বেদে' একটি ম্যানিফেস্টোর মত হয়ে উঠেছিল। 'বেদে' উপন্যাসের পটভূমি হয়তো এদের আকর্ষণ করেছিল। বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার সূচনালগ্নে রচিত এই 'বেদে' উপন্যাসটিকে বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার আলোচনায় গ্রহণ করা হয়েছে।

'কল্লোল যুগ' বাংলা সাহিত্যে যে রোমান্টিকতার জন্ম দিয়েছিল, সেখান থেকে বাংলা সাহিত্যের অনেক প্রতিভাধর লেখক বেরিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলা কথাসাহিত্যের বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশককে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। আবার 'কল্লোল যুগ'-এর প্রভাব মুক্ত নতুন ধারার কিছু সাহিত্যিকেরও এ যুগে আবির্ভাব ঘটে। যাই হোক, এই সময়েই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাধর লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮–১৯৫৬ খ্রিঃ)-এর আবির্ভাব ঘটে, যাঁকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে 'কল্লোলের কুলবর্ধন' বলেছেন। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে বলেছেন — ''একদা তিনি পূর্ববঙ্গের নদীনালা পার হয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন এবং অল্পকালের মধ্যে আধুনিক গোষ্ঠীর প্রধান লেখকে পরিণত হন। . . . তারাশঙ্কর যেমন পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলবিশেষের মানুষদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন, তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের পরিবেশে ঐ অঞ্চলের সাধারণ লোকের জীবনচিত্রকে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।''[৩] আদ্যন্ত বিজ্ঞানের

ছাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিরাসক্ত ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা জীবনকে দেখতেন। তাঁর উপর মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্ব এবং সমাজ বিজ্ঞানী কার্ল মার্কসের শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্ব প্রচন্ড প্রভাব ফেলেছিল। তিনি বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস লিখে বাংলা কথাসাহিত্যকে এক নতুন পথের দিশা দেখিয়েছিলেন। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস হল — 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'শহরতলী' (১৯৪০), 'অহিংসা' (১৯৪৮) প্রভৃতি।

তাঁর এসব উপন্যাসের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় হল 'পদ্মানদীর মাঝি'। বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত এই উপন্যাসের 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশ থেকে জানা যায় যে, উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুলাই। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। তবে গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পূর্বাশা' পত্রিকায় তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ থেকে অষ্টম সংখ্যা মাঘ ১৩৪১ পর্যন্ত ৮ কিস্তি এবং চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৪২-এর কিস্তিসহ মোট ৯ কিস্তিতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর 'পূর্বাশা'র প্রকাশ কিছুকালের জন্য বন্ধ থাকায় উপন্যাসটির প্রকাশও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অবশেষে আষাঢ় ১৩৪৩-এ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর উপন্যাসটির প্রচুর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাসহ বিশ্বের নানা ভাষায় উপন্যাসটি অনূদিত হয়েছে। এসব থেকে উপন্যাসটির জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া পদ্মানদীর তীরে বসবাসকারী তথাকথিত প্রান্তিক মানুষজন অর্থাৎ জেলে-মাঝিদের জীবনচর্যা অবলম্বনে তিনি এই উপন্যাসটি রচনা করেন। এখানে পদ্মা তীরবর্তী গ্রামাঞ্চলগুলির সামগ্রিক বিবরণের পাশাপাশি সেসব স্থানে বসবাসকারী জেলে-মাঝিদের সর্বাঙ্গীণ জীবনচর্যা পরিবেশনে উদ্যোগী হয়েছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যের একজন স্বল্প আলোচিত লেখক হলেন সরোজকুমার রায়চৌধুরী। বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর প্রতিভাকে বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমানধর্মা' বলে মন্তব্য করে লিখেছেন — ''সরোজকুমার রায়চৌধুরী কতকটা তারাশঙ্করবাবুর সমানধর্মা।

ইঁহারও এক-আধটি গল্প কল্লোলে বাহির হইয়াছিল। তারাশঙ্করবাবুর উপন্যাসকাহিনীর ভূগোল বীরভূম জেলার চৌহদ্দিবদ্ধ, সরোজবাবুর কাহিনী ততটা স্থানসীমাবদ্ধ (regional) নয় যতটা তারাশঙ্করবাবুর কাহিনী। রোমান্সপ্রখরতা এবং বহুভাষণও সরোজবাবুর লেখায় কম।''[৪] তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সারাজীবন নানা পত্র-পত্রিকার সংস্পর্শে থাকার কারণে সরোজকুমারের মধ্যে সাংবাদিকতার পাশাপাশি একটি লেখক সত্তাও গড়ে ওঠে। তাঁর পরিণত জীবনের বেশির ভাগ সময় শহরে কেটেছিল। তিনি শহর ভিত্তিক বেশ কিছু গল্প-উপন্যাসও লিখেছেন। তবে তিনি মূলতঃ সাফল্য পেয়েছেন গ্রামমুখী লেখাগুলির জন্য। এই গ্রামমুখী লেখার কারণেই তাঁর নাম বাংলা আঞ্চলিক সাহিত্য-স্রষ্টাদের সঙ্গে একসারিতে উচ্চারিত হয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাত ধরে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে 'কল্লোল' পত্রিকায় 'দুনিয়াদারী' গল্পের মধ্য দিয়ে কথাসাহিত্যিক হিসেবে সরোজকুমার রায়চৌধুরীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বন্ধনী' প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। এরপর একে একে 'শৃঙ্খল' (১৯৩২ খ্রিঃ), 'আকাশ ও মৃত্তিকা' (১৯৩৩ খ্রিঃ), 'পান্থনিবাস' (১৯৩৫ খ্রিঃ), 'ময়ূরাক্ষী' (১৯৩৫ খ্রিঃ), 'ঘরের ঠিকানা' (১৯৩৬ খ্রিঃ), 'গৃহকপোতী' (১৯৩৭ খ্রিঃ), 'সোমলতা' (১৯৩৮ খ্রিঃ), 'শতাব্দীর অভিশাপ' (১৯৪১ খ্রিঃ), 'কালোঘোড়া' (১৯৪৬ খ্রিঃ), 'কৃষাণু' (১৯৫৪ খ্রিঃ) 'অনুষ্টুপ ছন্দ' (১৯৫৫ খ্রিঃ), 'নীলাঞ্জন' (১৯৫৬ খ্রিঃ), 'নাগরী' (১৯৬১ খ্রিঃ), 'নীল আগুন' (১৯৬৩ খ্রিঃ) প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' এবং 'সোমলতা'য় বিনোদিনী নামক এক গ্রাম্য গৃহবধূর জীবন পরিক্রমার ধারাবাহিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের তিনটি ভিন্ন পর্যায়কে প্রকাশিত করেছেন। আর তা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক সরোজকুমার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের জীবন পরিক্রমার অত্যন্ত বাস্তবধর্মী বর্ণনা দিয়েছেন। পরবর্তীকালে এই তিনটি উপন্যাস একত্রে ট্রিলজি হিসেবে 'নতুনফসল' নামে প্রকাশিত হয়। এটিই সম্ভবত সরোজকুমারের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও আলোচিত উপন্যাস। এই ট্রিলজির অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস তিনটিতে সরোজকুমার বীরভূম সংলগ্ন ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশের প্রকৃতি ও কৃষিজীবী মানুষজনের ছবি এঁকেছেন। পাশাপাশি সেই অঞ্চলের

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনচর্যারও ছবি এই উপন্যাসত্রয়ীতে উজ্জ্বলভাবে উঠে এসেছে। তাই একটি বিশেষ অঞ্চল ও সেখানকার অধিবাসীদের জীবনচর্যাকে ভিত্তি করে রচিত এই 'নতুনফসল' ট্রিলজিটির আলোচনা বাংলা কথাসাহিত্যের আলোচনা কালে বারবার স্থান পেয়েছে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই ট্রিলজির অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস তিনটিকে বৈষ্ণব জীবনের সত্য বলে মেনে নিয়ে জানিয়েছেন — ''বৈষ্ণব জীবনের সত্য চিত্র হিসাবে শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' ও 'সোমলতা' (১৯৩৮) — এই তিন খন্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাসাবলী উল্লেখযোগ্য।''[৫]

রবীন্দ্র-শরৎ পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসকার ভূদেব চৌধুরী তাঁকে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন — 'তারাশঙ্করের মতই বিভূতিভূষণও গ্রাম-লালিত শিল্পী। গ্রামের প্রকৃতি, গ্রামের জীবন তাঁর সার্থক সৃষ্টির প্রায় একক প্রেরণা। গ্রাম-প্রকৃতি-পরিবেশের বাইরে শিল্পীর কল্পনা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।''[৬] বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসগুলির দিকে নজর দিলে এ কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়। কাঁচড়াপাড়ার কাছে মুরাতিপুরে মামার বাড়িতে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বিভূতিভূষণের জন্ম। তবে তাঁর শৈশব ও কৈশোরের বেশির ভাগ সময় কেটেছে পিতৃভূমি চালকী-ব্যারাকপুর গ্রামে। এখানে বেড়ে ওঠার সময় তিনি গ্রাম্য প্রকৃতিকে খুব কাছে দেখে দেখেছিলেন এবং তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শকেও অত্যন্ত নিবিড়ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করার সময় বিভূতিভূষণ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯ খ্রিঃ)-তে নিশ্চিন্দিপুরের আড়ালে এই ব্যারাকপুরের গ্রাম্য প্রকৃতিকেই নিয়ে আসেন। তাঁর 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসটি সম্পর্কে অধ্যাপক সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন — '' 'পথের-পাঁচালী' (১৯২৯ খ্রিঃ) লেখকের বাল্যস্মৃতিমূলক উপন্যাস-চিত্র। বিভূতিবাবুর প্রগাঢ় অনুভূতি ও ভাবুকতা বইটির আখ্যায়িকাগুলিকে রমণীয় করিয়াছে।''[৭] বিভূতিভূষণের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র পরিপূরক উপন্যাস হল 'অপরাজিত'

(১৯৩১ খ্রিঃ)। এই দু'টি উপন্যাস ছাড়াও তিনি 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫ খ্রিঃ), 'আরণ্যক' (১৯৩৯ খ্রিঃ), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০ খ্রিঃ) 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১ খ্রিঃ), 'দেবযান' (১৯৪৪ খ্রিঃ), 'অনুবর্তন' (১৯৪২ খ্রিঃ), 'ইছামতী' (১৯৫০ খ্রীঃ)-এর মত উপন্যাসগুলি লেখেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বিভূতিভূষণ বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক জীবনের রূপকার ছিলেন না এটা ঠিক, তবে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় তাঁর 'আরণ্যক' ও 'ইছামতী' উপন্যাস দু'টির কথা উঠে আসে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, এবিষয়ে সম্ভবত কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না। তাঁর সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন — ''উত্তর শরৎচন্দ্র যুগের তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ কথাকার তাতে আজ আর দ্বিধা নেই। . . . তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে যে দুর্লভ বলিষ্ঠতা ও তীব্র অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে, যে বিশাল মানববোধের উদ্‌ঘাটন হয়েছে, সমসাময়িক দেশকালের ঐতিহাসিক জীবন-চিত্র যে ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তাতে শরৎচন্দ্রকে হারিয়ে আমাদের আর ক্ষোভ নেই, তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারত্ব তারাশঙ্করের মধ্যে রয়ে গেছে।''[৮] তবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু শরৎচন্দ্রের 'যোগ্য উত্তরাধিকারত্ব'কে বহন করেন নি, তাকে আরও নতুন নতুন দিকে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। এই দিকটির প্রতিও অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল। তাই তিনি তারাশঙ্কর সংক্রান্ত অন্য আর একটি গ্রন্থে লিখেছেন — ''শরৎচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের কালান্তর ও রূপান্তর ঘটালেন তারাশঙ্কর। বাংলা উপন্যাসের যে বিশালতাবোধ বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথে এসে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, তারাশঙ্করের রুক্ষকঠোর লেখনী স্পর্শে আবার তার উজ্জীবন হল। তিনি শরৎচন্দ্রের ভাবালু আবেগকে যেন পাশ কাটিয়ে দেশ ও কালের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ও জীবনের নতুন রূপ ফুটিয়ে তুললেন।''[৯] তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যে সমাজ ও জীবনের এই নতুন রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর জন্মভূমি বাঙলার রাঢ় অঞ্চলের পটভূমিকায়। রাঢ় অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনায় 'বাঙালীর ইতিহাস' প্রণেতা নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন — ''অনুমান হয়,

বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কান্দি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেলা (সাঁওতালভূমি সহ) এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ, এই লইয়া উত্তর রাঢ়। মোটামুটি অজয় নদী এই উত্তর-রাঢ়ের দক্ষিণ-সীমা এবং দক্ষিণ-রাঢ়ের উত্তর সীমা। উত্তর-রাঢ়ের উত্তর সীমা বোধ হয় কোনও সময় গঙ্গা পার হইয়া আরও উত্তরে বিস্তৃত ছিল। . . . অকাট্য লিপি প্রমাণ এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থে গঙ্গা-ভাগীরথীই রাঢ়ের উত্তরতম সীমা, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না।''[১০] তবে রাঢ় অঞ্চলের যথার্থ ভৌগোলিক সীমা নিয়ে পন্ডিত মহলে বিতর্ক আছে। নীহাররঞ্জন রায় এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকরা রাঢ়ের সীমানা সংক্রান্ত যেসমস্ত কথা বলেছেন, সেগুলিতে মতের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। তবে প্রায় সবার বক্তব্য থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার ঝাড়খন্ড রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চল। এই সীমানার মধ্যে মুর্শিদাবাদ ও পুরুলিয়া জেলার কিছু অংশের পাশাপাশি বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলার সম্পূর্ণটাই পড়ে।

ভূ-প্রাকৃতিক দিক থেকে এই অঞ্চলটিতে রুক্ষ লালমাটির প্রাধান্য বেশি দেখা যায়। রাঢ়ের সীমানার মধ্যে কিছুটা জঙ্গলাকীর্ণ, আর বাকিটা শিল্পাঞ্চল ও কৃষিভূমি। এই অঞ্চলে হিন্দুধর্মের উচ্চবর্ণের মানুষজনের পাশাপাশি প্রচুর উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস অছে। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির চা বাগান অঞ্চলকে মাথায় রেখেও বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এই রাঢ় অঞ্চলে বসবাস করে। এই অঞ্চলে যেসব উপজাতির দেখা মেলে তারা হল — সাঁওতাল, কাহার, হাড়ি, দুলে, বাগ্‌দি, বাউড়ি, ডোম, সাপুড়ে-বেদে, কাকমারা, গরুমারা, বাজিকর, ডাইনি-ডাকনী প্রভৃতি। এছাড়াও আছে বৈষ্ণব, বাউল, তান্ত্রিক মানুষজন। আর আছে মুসলিম সম্প্রদায়ের ফকির-দরবেশরা। মুসলিম ফকির-দরবেশরা বাদে এরা সকলেই সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখলেও এদের প্রত্যেকেরই ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। ফলে তাদেরও একটা নিজস্ব সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। এই অঞ্চলে হিন্দুধর্মের সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে এইসব মানুষজনের সংস্কৃতি মিলে এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। তারাশঙ্কর তাঁর গল্প-উপন্যাসে এই রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষজনের জীবনচর্যার

সর্বাঙ্গীন চিত্রকে এমনভাবে তুলে এনেছেন যে, কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল ও সেখানকার মানুষজনের জীবনচর্যাকে গুরুত্ব দিয়ে লেখা গল্প-উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যে তো বটেই, সম্ভবত বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রেও খুব একটা সুলভ নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলায় রাঢ় অঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে প্রথম কথাসাহিত্যের চর্চা শুরু করেছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক সুকুমার সেন তারাশঙ্করকে তাঁর অনুসারী বলে মন্তব্য করে লিখেছেন — ''তারাশঙ্করকে শৈলজানন্দের অনুসরণকারী বলিতে পারি।''[১১]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বীরভূমের লাভপুরে এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবীত ছিলেন। তারাশঙ্কর তাঁর ৭৩ বছরের জীবৎকালে দেশ-কাল-সমাজ-রাজনীতির প্রেক্ষিতে মানুষের জীবন সংক্রান্ত প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর সমকালে বাংলা তথা ভারতবর্ষের পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বেই প্রচুর আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে। এই সময়কালে একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি সাধিত হয়ে বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি হয়। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার নানা নব নব আবিষ্কারগুলির প্রভাব মানুষের সমাজ জীবনে এসে পড়লে সেখানেও নানাদিক থেকে পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে। সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক তারাশঙ্কর এসব কিছু দিয়েই তাঁর অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার পূর্ণ করেন। তারাশঙ্করের সমকালের বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্যে তাঁর বাল্যকালেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ বাংলার সমাজ জীবনে আছড়ে পড়ে। এরপর তাঁর কৈশোর ও যৌবনের প্রাক্ লগ্নে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধী নানা কার্যকলাপ শুরু হয়, যার একদিকে ছিল গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলন, আর অপরদিকে বিভিন্ন গুপ্ত সভা-সমিতি ও সংস্থার রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র বিল্পবী আন্দোলন। তারাশঙ্কর প্রথমদিকে ছাত্রাবস্থায় সশস্ত্র বিল্পব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেও পরবর্তী কালে গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনের উপর আস্থা রাখেন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন সক্রিয় গান্ধীবাদী কংগ্রেসকর্মী হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন। এইসময় প্রত্যক্ষভাবে দেশ-কাল-জাতি সংক্রান্ত নানা অভিজ্ঞতাও তাঁর সঞ্চিত

হয়। অবশ্য স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসেন এবং সাহিত্যের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন।

সে সময়ে এসব রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়াও বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থাতেও প্রচুর পরিবর্তন আসে। জমিদারের সন্তান তারাশঙ্কর খুব কাছে থেকে এই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনগুলিকেও প্রত্যক্ষ করেন। সুদীর্ঘ অতীতকাল থেকে তারাশঙ্করের জীবনের প্রথম দিনগুলি পর্যন্ত গ্রামবাংলার সমাজ সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, যেখানে সামন্তপ্রভু অর্থাৎ জমিদারেরাই ছিল শেষ কথা। এই ব্যবস্থায় অধিকাংশ মানুষ কৃষি ও তার আনুষঙ্গিক জীবিকা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। এই ব্যবস্থায় জমিদারেরা প্রজাদের কাছে থেকে খাজনা আদায় করত ঠিকই, এমনকি এজন্য নানারকম জোর-জবরদস্তি, অন্যায়-অবিচার, শাসন-শোষণও করত; কিন্তু গ্রামের শিক্ষা-দীক্ষা, সুখ-শান্তি, উন্নয়ন প্রভৃতির দিকেও তারা নজর দিত। কিন্তু তারাশঙ্করের কৈশোর-যৌবনের প্রাক্‌লগ্ন থেকেই অর্থাৎ বিশ শতকের শুরু থেকেই বাংলার গ্রামসমাজে পরিবর্তনের সূচনা হয়। ধীরে ধীরে জমিদার নিয়ন্ত্রিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জায়গা নিতে শুরু করে পুঁজিনির্ভর ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরাই অর্থাৎ মালিক শ্রেণি সমাজের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের দান যন্ত্রনির্ভর নানা ধরনের কল-কারখানা এতদিনের কৃষি সভ্যতার জায়গা নিতে শুরু করে। এতে সাধারণ মানুষ কৃষিজীবী থেকে শ্রমিকে পরিণত হতে শুরু করে। আর নব্য গড়ে ওঠা পুঁজিপতিরা অর্থাৎ কল-কারখানার মালিকেরা অন্য কোনো দিকে নজর না দিয়ে শুধু কীভাবে আরও বেশি মুনাফা অর্জন করা যায়, তার দিকেই বেশি করে নজর দিতে শুরু করে। এজন্য তারা কোনো ন্যায়-নীতি বা হিতাহিতের তোয়াক্কা করে না। তারাশঙ্কর নিজে ছিলেন জমিদারের সন্তান; স্বভাবতই সামন্ততন্ত্রের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল। অবশ্য সেজন্য তিনি ধনতন্ত্রকেও অস্বীকার করেন নি এবং আটকাতেও চান নি, সেই ক্ষমতাও ছিল না; কিন্তু পুরোপুরি মন থেকে মেনে নিতেও পারেন নি। দেশ-বিদেশের এইসমস্ত আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রভাব তাঁর জন্মভূমি রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী লাভপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলিতেও পড়তে শুরু করে। তিনি এই সামাজিক যুগ সন্ধিক্ষণকেই তাঁর অধিকাংশ লেখায় তুলে এনেছেন এবং অবশ্যই

সেটা রাঢ় অঞ্চলের আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন — ''আমাদের পরিচিত কালের দুর্বার সামাজিক অর্থনীতিক পরিবর্তনের ফলে গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন তারাশংকরই প্রথম দেখিয়েছেন। তিনি এই পরিবর্তনের, যুগান্তরের প্রথম শিল্পী।''[১২]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থল পশ্চিমবাংলার রাঢ় অঞ্চল মধ্যযুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। মধ্যযুগের কবি কৃত্তিবাস ওঝা, মালাধর বসু, মুকুন্দ চক্রবর্তী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কাশীরাম দাস, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্ট াচার্যদের মত বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর কবিদের বেশির ভাগই ছিলেন এই রাঢ় অঞ্চলের সন্তান। স্বাভাবিক ভাবে এঁদের কাব্য-কবিতায় সচেতনভাবেই হোক বা অবচেতনেই হোক রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি ও সেখানকার মানুষজনের জীবনচর্যা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তবে এঁরা সবাই কমবেশি ধর্মীয় বিষয়কে অবলম্বন করে সাহিত্য চর্চা করেছেন। তাই তাদের লেখায় রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি, মানুষজন ও তাদের জীবনচর্যার ছবি উঠে এলেও এঁরা কেউ-ই তারাশঙ্করের মতো শুধু রাঢ় অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষজনসহ সবকিছুই 'আঞ্চলিক রঙ'-এ রাঙিয়ে নতুন করে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে কলম ধরেন নি। মধ্যযুগের এইসমস্ত কবি-সাহিত্যিকদের থেকে বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর এখানেই স্বতন্ত্র। তিনি রাঢ় অঞ্চলে জন্মেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত এই অঞ্চলের বাইরের বিষয়কেও তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন; কিন্তু রাঢ় অঞ্চলটির প্রকৃতি ও মানুষদের বিস্তারিত জীবনচর্যাকে যেভাবে নিজের লেখায় তুলে এনেছেন, তা পূর্ববর্তী সাহিত্যিকরা তো বটেই, পরবর্তীকালেও কেউ তাঁর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি।

তারাশঙ্করের আগে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন রচনায় রাঢ় অঞ্চলের প্রসঙ্গ থাকলেও সেখানকার প্রকৃতি ও জীবনচিত্রণ করা কখনোই সে সব রচনায় প্রধান হয়ে ওঠে নি। এই অঞ্চলে জন্মানো, বড় হয়ে ওঠা ও জীবনের অধিকাংশ সময় কাটানোর কারণেই তারাশঙ্কর নিজের জন্মভূমি রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতিকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন ও অনুভব করেছিলেন। আর বেড়ে ওঠার সময় এবং পরবর্তী সময়েও নানা কার্যোপলক্ষে তিনি ঘুরে ঘুরে ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী এই অঞ্চলটিতে বসবাসকারী

উচ্চবর্ণের মানুষগুলির পাশাপাশি কাহার, দুলে, বাগ্‌দী, হাড়ি, ডোম, বেদে, সাঁওতালদের মত উপজাতি সম্প্রদায় এবং বাউল-বৈষ্ণব, শাক্ত-তান্ত্রিকদের মতো সেই অঞ্চলের বহু মানুষের জীবন পরিক্রমাও খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে তিনি নিজেই লিখেছেন — ''গ্রাম্য ভদ্রজনের সমাজে, চাষীর গ্রামে, বৈষ্ণবের আখড়ায়, এমনই ভাবে তাদের জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একটা বড় সুবিধা ছিল আমার। রূপ আমার ছিল না, যেটুকু লাবণ্য বা শ্রী ছিল সেটুকুও রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে এমনই পুড়ে গিয়েছিল যে কর্কট নাগ বিষজর্জর নল রাজার সারথ্য কর্ম গ্রহণের সুযোগের মত আমিও পেয়েছিলাম ওদের সঙ্গে সমান হয়ে মিশবার সুযোগ। ওদের কথাবার্তা আচার ব্যবহার সব জেনেছিলাম সেদিন — ওদেরই একজনের মত।''[১৩] এইভাবে রাঢ় অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তারাশঙ্কর যে জীবন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, সাহিত্যচর্চা করার সময় তিনি তাঁর সেই বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষজনের জীবনচর্যাকে প্রকৃত জীবনশিল্পীর নিষ্ঠা সহকারে তাঁর উপন্যাস-ছোটগল্পে তুলে এনেছেন। এজন্য তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাস ও ছোটগল্পে এই রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষজনের জীবনচর্যা একটা বড় জায়গা নিয়েছে।

তিনি মোট ৬০টির মত উপন্যাস লিখেছেন। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে অনেকগুলিরই পটভূমি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল বীরভূমের গ্রামাঞ্চলের প্রকৃতি এবং মানুষজনের জীবনচর্যা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে গেলে এই উপন্যাসগুলির প্রায় সবক'টিতেই আঞ্চলিকতার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে রাঢ় অঞ্চলকে পটভূমি করে লেখা তারাশঙ্করের সমস্ত উপন্যাস যেমন আঞ্চলিকতার দাবী রাখে না, তেমনি বাংলা উপন্যাসের আঞ্চলিকতার আলোচনায় সবগুলিকে টেনে আনাও সমীচীন নয়। কিন্তু বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন্ উপন্যাসগুলিকে রাখা হবে, তা ঠিক করতে বসলেও বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। সেজন্য তারাশঙ্করের যে উপন্যাসগুলি সবচেয়ে বেশি আঞ্চলিকতার দাবী রাখে সেগুলিকে নিয়েই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত। এইরকম আঞ্চলিকতার দাবী রাখা উপন্যাসগুলি হল 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ), 'কালিন্দী' (১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ), 'গণদেবতা' (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩

খ্রিস্টাব্দ), 'কবি' (১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ) এবং 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ)। রাঢ় অঞ্চলনির্ভর তারাশঙ্করের অনেকগুলি উপন্যাসের মধ্যে এই কয়েকটিকে বেছে নেওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হল, সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের সামগ্রিক প্রকৃতি এবং সেখানকার মানুষের জীবনচর্যা এই উপন্যাসগুলিতে পটভূমি হিসেবে গৃহীত হয়নি। এই উপন্যাসগুলিতে রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত এমন সব প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষদের জীবনচর্যা স্থান পেয়েছে যে, সেই অঞ্চলগুলির অবস্থানসহ ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং সেসব স্থানে বসবাসকারী মানুষজনের জীবনচর্যা সম্পর্কে বাংলা উপন্যাসের পাঠক তারাশঙ্করের এই উপন্যাসগুলি পাঠ করেই প্রথম জানতে পারেন। উপন্যাসগুলিতে গৃহীত এই অঞ্চলগুলি সামগ্রিকভাবে রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত থেকেও যেন নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিরাজ করছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত হওয়ায় 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি' এবং 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসগুলি প্রথমার্ধের আলোচনায় এসেছে। আর বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হওয়ায় বাকি দু'টি উপন্যাস অর্থাৎ 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' এবং 'আরোগ্য নিকেতন' দ্বিতীয়ার্ধে আলোচিত হয়েছে।

বিশ শতকে রবীন্দ্র-শরৎ যুগের অবসানের পর বাংলা সাহিত্য যে সকল কথাসাহিত্যিকের রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮–১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ)। পেশায় অধ্যাপক নারায়ণবাবু ছিলেন এক বিরল প্রতিভার মানুষ। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন সাহিত্যের সমালোচক, তেমনি অপরদিকে সাহিত্যের স্রষ্টাও। ফলে তিনি বেশ কিছু সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে অনেকগুলি ছোটগল্প এবং কিছু উপন্যাস লিখেও বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। নারায়ণবাবু উপন্যাস লেখা শুরু করেন বিশ শতকের চল্লিশের দশকে। রবীন্দ্র-শরৎ পরবর্তীযুগে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে বাংলা কথাসাহিত্যের চর্চা করলেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিলেন। তাই তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার মূল্যায়ন করতে বসে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''বাংলাদেশের

দীর্ঘ-প্রসারিত, বৈচিত্র্যহীন সমভূমির প্রান্তভাগে যেমন একটি পার্বত্য বন্ধুরতা ও আরণ্য দুর্ভেদ্যতার প্রাচীরবেষ্টনী আছে, তেমনি তাহার শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবন-যাত্রার সুদূর পশ্চাৎপটে একটা অসংস্কৃত হৃদয়োচ্ছ্বাস ও বন্যা-দুর্বার আবেগের গভীর রেখাঙ্কিত সীমান্তপ্রদেশ আছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আর্যজাতির সহিত তুলনায় বাঙালীর রক্তধারা ও চিত্তবৃত্তিতে আদিম অনার্য প্রভাবের বিচিত্রতর সংমিশ্রণ সুপ্ত আছে। মনের অবচেতন স্তরে সংবৃত এই অতীত সংস্কার কখনও কখনও অতর্কিতভাবে তাহার রক্তে দোলা দেয়, তাহার জীবনের ধূসরতার মধ্যে এই রক্তরেখা কোন কোন মুহূর্তে ঝিলিক দিয়া উঠে। বাঙালী জীবনের এই প্রখর রাগদীপ্ত প্রত্যন্ত প্রদেশ আধুনিক যুগের যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের তীব্র কৌতূহল ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও শ্রেষ্ঠতম।''[১৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অনেকগুলিই উপন্যাস লিখেছেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি পটভূমি হিসেবে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত থেকেও নানা কারণে বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চল এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবনচর্যাকে অর্থাৎ আঞ্চলিক সীমা-সংহতির নিরিখে মানব জীবনকথা পরিবেশনে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর এই ধরনের উপন্যাসগুলি হল — 'উপনিবেশ' (তিনপর্ব, ১৯৪৪ খ্রিঃ), 'লালমাটি' (১৯৫১ খ্রিঃ), এবং 'মহানন্দা' (১৯৫৩ খ্রিঃ)। এর মধ্যে 'উপনিবেশ' উপন্যাসটি বিশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত হওয়ায় এই উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার দিকগুলি এই অধ্যায়ে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। বাঁকি দু'টি উপন্যাস 'লালমাটি' ও 'মহানন্দা'র প্রসঙ্গ বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আলোচনায় করা হয়েছে।

বিশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের বাংলা কথাসাহিত্য যাদের গল্প-উপন্যাস দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলেন সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৫–১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ)। প্রচার-বিমুখ এই মানুষটি নিজ সমকালে তেমন জনপ্রিয়তা না পেলেও বাংলা সাহিত্যের পাঠক আজ তাঁর অবদানকে অস্বীকার করতে পারেন না। বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি সতীনাথকে 'লেখকের লেখক' বলে অভিহিত করেছিলেন। সতীনাথ ভাদুড়ী ব্যক্তিগত জীবনে যেমন প্রচার বিমুখ ছিলেন, তেমনি নিজের সম্পর্কে বরাবর স্বল্পভাষী থেকেছেন। জানা যায় যে,

তাঁদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান ছিল নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। তাঁর পিতা ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী পেশায় ছিলেন ব্যবহারজীবী। জীবিকার টানেই তিনি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগর থেকে বর্তমান বিহারের পূর্ণিয়ায় চলে আসেন। এখানে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে সতীনাথ ভাদুড়ী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্য-শৈশব-কৈশোর থেকে শুরু করে জীবনের বেশির ভাগ সময় এই পূর্ণিয়াতেই কেটেছে। তাঁর এই সময়কালে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে তীব্র রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়। সেই অস্থির সময়ে সতীনাথ নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। প্রথমদিকে দূর থেকে গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন, সত্যাগ্রহ প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হলেও অচিরেই সরাসরি গৃহ, পরিবার, পেশা প্রভৃতি সবকিছু ছেড়ে সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন এবং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে টিকাপট্টি আশ্রমে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। এরপর থেকেই তাঁর দেশের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে ওঠে। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী, সংগঠক এবং পরিচালক হিসেবে তিনি কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো গরুর গাড়িতে, কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে পুলিশের সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এইসময় তিনি একদিকে শিক্ষাদীক্ষাহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দারিদ্রেপূর্ণ গ্রামগুলিকে যেমন খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তেমনি গান্ধীজীর প্রভাবে এই গ্রামজীবনে কীভাবে পরিবর্তনের জোয়ার আসতে শুরু করেছিল সেটাও পর্যবেক্ষণ করেছেন। ১৯৪০-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী বিভিন্ন সময়ে তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপের কারণে তিনবার হাজারিবাগ জেল, ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেল এবং পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সতীনাথের কংগ্রেস সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটে এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণের কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। অবশ্য পঞ্চাশের দশক থেকে তিনি সরাসরি রাজনীতি থেকে সরে আসেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। ১৯৩৯-এ জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের পর বিহারে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে এবং জেলে গিয়ে লোকজীবন সম্পর্কে সতীনাথ যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তারই ভিত্তিতে তিনি প্রথম উপন্যাস 'জাগরী' (১৯৪৫ খ্রিঃ) লেখেন। এরপর দুই চরণে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (প্রথম চরণ ১৯৪৯ খ্রিঃ এবং দ্বিতীয় চরণ ১৯৫১ খ্রিঃ),

‘চিত্রগুপ্তের ফাইল’ (১৯৪৯ খ্রিঃ) ‘অচিনরাগিণী’ (১৯৫৪ খ্রিঃ), ‘সংকট’ (১৯৫৭ খ্রিঃ), ‘দিগভ্রান্ত’ (১৯৬৬ খ্রিঃ মৃত্যুর পর প্রকাশিত)-এর মত উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর তথা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’। বিশ শতকের দুই অর্ধে এর দু’টি চরণ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু চরণ দু’টি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং এদের কোনোভাবেই আলাদা করা সম্ভব নয়। তাই এর দু’টি চরণকে একসঙ্গে ধরে নিয়েই আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ কতটা সার্থক তা আলোচিত হয়েছে।

বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যের প্রেক্ষিতে এক বিরল প্রতিভা হলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১ খ্রিঃ)। হিন্দুধর্মের নিম্ন বর্ণ হিসেবে পরিগণিত মালো সম্প্রদায়ের স্বল্পায়ু এই সাহিত্যিকটি বর্তমান বংলাদেশের কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাছাকাছি এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন অদ্বৈতের সারাজীবন অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে কেটেছে। তিনি খুব কম বয়স থেকেই নানা কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প লিখলেও বাংলা সাহিত্যের পাঠক তাঁকে একজন ঔপন্যাসিক হিসেবেই মনে রেখেছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘রাঙামাটি’ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে লিখলেও তা প্রকাশিত হয় ‘চতুষ্কোণ’ পত্রিকায় ১৩৭১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে চৈত্র সংখ্যায়। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস ‘শাদা হাওয়া’ প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ‘সোনারতরী’ পত্রিকার শারদ সংখ্যায়। আর ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটি ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর সমস্ত খ্যাতির মূলে আছে এই ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই উপন্যাসটি পূর্ববাংলার কুমিল্লা জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তিতাস নদী তীরের প্রকৃতি এবং সে অঞ্চলে বসবাসকারী মালো সম্প্রদায়ের জীবন পরিক্রমা অবলম্বনে রচিত। ঔপন্যাসিক নিজে ঐ সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন — তাঁর বেড়ে ওঠাও সেই তিতাস নদী সংলগ্ন অঞ্চলটিতে।

বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনাকালে অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের ‘চরকাশেম’ (১৯৫২ খ্রিঃ) উপন্যাসটির কথা উঠে আসে। অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৯০৭-১৯৬২ খ্রিঃ) কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। সাধারণ

শ্রমজীবীদের যৌথজীবনের কথা বলা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যিকদের মূল লক্ষ্য থাকে। তাঁর 'চরকাশেম' উপন্যাসটি সেই শ্রেণীর রচনা। এখানে ঔপন্যাসিক নিম্ন-পূর্ববঙ্গের গরীব চাষীদের আর্থ-সামাজিক জীবনের নিখুঁত ছবি পরিবেশন করেছেন।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক জীবনের অন্যতম রূপকার হলেন মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭ খ্রিঃ)। তাঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন বলেছেন যে, মনোজবাবুর লেখা সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও দ্রুতগতি। তিনি বেশ কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে একসময় জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস হল — 'জলজঙ্গল' (১৯৫১ খ্রিঃ), 'বৃষ্টি বৃষ্টি' (১৯৫৭ খ্রিঃ), 'রক্তের বদলে রক্ত' (১৯৫৯ খ্রিঃ), 'মানুষ গড়ার কারিগর' (১৯৫৯ খ্রিঃ), 'রূপবতী' (১৯৬০ খ্রিঃ), 'বন কেটে বসত' (১৯৬১ খ্রিঃ) প্রভৃতি। এর মধ্যে 'জলজঙ্গল' এবং 'বন কেটে বসত' উপন্যাস দু'টি নিম্নবঙ্গ সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলকে পটভূমি করে লেখা। এরমধ্যে 'জলজঙ্গল'-এ বাদা অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রকৃতির বিস্তারিত বিবরণ আছে। আর 'বন কেটে বসত'-এ তথাকথিত সভ্যসমাজের লোকজনের আগমনে বাদা অঞ্চলের জীবনধারার পরিবর্তনের ছবি ধরা পড়েছে। এগুলিতে আঞ্চলিকতার নানা লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।

স্বাধীনোত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ কথা সাহিত্যিক হলেন সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮ খ্রিঃ)। তরুণ বয়স থেকেই তিনি প্রত্যক্ষভাবে মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে সাম্যবাদী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন, শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এমনকি জেল পর্যন্ত খেটেছিলেন। ফলে যারা সাধারণ মানুষ, বেঁচে থাকার জন্য কঠোর জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন — তাদের কথা শোনানোর উদ্দেশ্যেই কলম ধরেন। তাঁর উপন্যাসগুলি হল — 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১ খ্রিঃ), 'বি. টি. রোডের ধারে' (১৯৫২ খ্রিঃ), 'শ্রীমতি কাফে' (১৯৫৩ খ্রিঃ), 'গঙ্গা' (১৯৫৭ খ্রিঃ), 'বাঘিনী' (১৯৬০ খ্রিঃ), 'বিবর' (১৯৬৭ খ্রিঃ), 'প্রজাপতি' (১৯৬৭ খ্রিঃ), 'স্বীকারোক্তি' (১৯৬৭ খ্রিঃ), 'মানুষ' (১৯৭০ খ্রিঃ), মহাকালের রথের ঘোড়া' (১৯৭৭ খ্রিঃ), 'বাথান' (১৯৮৫ খ্রিঃ) প্রভৃতি। এই সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে 'গঙ্গা' বাংলা সাহিত্যের একটি অত্যন্ত আলোচিত উপন্যাস। এখানে সমরেশ বসু উত্তর ২৪ পরগণা জেলার

বসিরহাট মহকুমা অঞ্চলের 'মাছধরা'দের জীবন পরিক্রমা অবলম্বনে রচনা করেছেন। বর্ধমান-নদীয়া জেলার বিস্তৃত তৃণক্ষেত্র, চারণভূমিকে পটভূমি করে তাঁর 'বাথান' উপন্যাসটি গোপালকদের জীবনচর্যা অবলম্বনে রচিত।

কথাসাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় (১৯৩৪ খ্রিঃ —) বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নানা বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা করে বাংলা কথাসাহিত্যকে এখনও সমৃদ্ধ করে চলেছেন। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস হল — 'পূর্ব পার্বতী' (১৯৫৭ খ্রিঃ), 'সিন্ধুপারের পাখি' (১৯৫৯ খ্রিঃ), 'কেয়াপাতার নৌকো', (১ম পর্ব ১৯৬৯ খ্রিঃ, ২য় পর্ব ১৯৭০ খ্রিঃ) 'মহাযুদ্ধের ঘোড়া', 'অনুপ্রবেশ', 'আকাশের নীচে মানুষ', 'মানব জীবন', ক্রান্তিকাল' (২০০৩ খ্রিঃ আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত) প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে বেশ কিছু উপন্যাসে আঞ্চলিক উপাদানের কথাও আছে।

তাঁর প্রথম জীবনে লেখা 'পূর্ব পার্বতী', 'সিন্ধুপারের পাখি' এবং 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাস তিনটি অনেকটাই আঞ্চলিকতার লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাস। এর মধ্যে 'পূর্বপার্বতী' উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগাল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'সিন্ধুপারের পাখি' উপন্যাসের পটভূমি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। আর মোট ছয় পর্বে রচিত 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসটির প্রথম দু'টি পর্বের পটভূমি স্বাধীনতা সমকালীন পুর্ববঙ্গের রাজদিয়া অঞ্চল।

অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১ খ্রিঃ) উত্তরবঙ্গের লোক ছিলেন। ফলে তিনি মূলতঃ উত্তরবঙ্গকে পটভূমি করে কথাসাহিত্যের চর্চা করে গেছেন। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস হল — 'নয়নতারা' (১৯৫৫ খ্রিঃ), 'গড় শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭ খ্রিঃ), 'নির্বাস' (১৯৫৯ খ্রিঃ), 'দুখিয়ার কুঠি' (১৯৫৯ খ্রিঃ), 'মহিষকুড়ার উপকথা' (১৯৭৮ খ্রিঃ), 'রাজনগর' ১৯৮৩ খ্রিঃ), 'চাঁদ বেনে' (১৯৯৩ খ্রিঃ) প্রভৃতি। তাঁর সম্পর্কে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় মন্তব্য করেছেন — ''উত্তরবঙ্গের যে অঞ্চলে অমিয়ভূষণের বসবাস, তার অল্প দূর থেকেই তরাই বনভূমির শুরু। এই অঞ্চলে নানা গোত্রের উপজাতি বা ট্রাইবের বাস। অনেক ট্রাইবের সংমিশ্রণও ঘটেছে। আঞ্চলিক মমতার টানেই হোক, কি নৃতাত্ত্বিক আগ্রহের কারণেই হোক, অথবা বণিক সভ্যতার কলুষিত স্পর্শের থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত — যে কারণেই হোক, অমিয়ভূষণের কথাসাহিত্যে এদের প্রবেশদ্বার অবারিত। যে শিকড়ের সন্ধানে

অমিয়ভূষণ বার বার ইতিহাসের দূর কালে পাড়ি দেন, এই সব উপজাতি জনজাতির মধ্যে, আরণ্যক ও অর্ধ-আরণ্যকদের আদিমতার মধ্যে সেই শিকড়ের অনেকখানি আভাস পাওয়া যায়। যে জন্যই হোক, অমিয়ভূষণের কথাসাহিত্যে এই সবের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।''[১৫] এসব কথা তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাস সম্পর্কে খাটে।

অমিয়ভূষণ তাঁর 'দুখিয়ার কুঠি' এবং 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাস দু'টির পটভূমি হিসেবে উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলকে গ্রহণ করছেন। তাঁর 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসটির পটভূমি হল স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে ঘটে যাওয়া বাংলার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ এবং স্বাধীনতা সমকালীন ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিবরণ। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষজনের জীবনচর্যার কথা তুলে এনেছেন।

কল্লোলের বিদ্রোহ স্তিমিত হওয়ার পর আধুনিকতম জীবন জিজ্ঞাসায় বাঙালি মানসিকতায় যে জটিলতা আসতে শুরু করেছিল তাকে ভিত্তি করেই সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০ খ্রিঃ) কথাসাহিত্যের চর্চা করেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসে নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবনকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'ফসিল' ও 'অযান্ত্রিক' ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব। ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তবে কয়েকটি উপন্যাস লিখেও তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস হল -- 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪ খ্রিঃ), 'গঙ্গোত্রী' (১৯৪৭ খ্রিঃ), 'ত্রিযামা' (১৯৫৭ খ্রিঃ), 'শ্রেয়সী' (১৯৫৭ খ্রিঃ), 'শতকিয়া' (১৯৫৭ খ্রিঃ) প্রভৃতি। এসবের মধ্যে 'শতকিয়া' হল তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসে মানভূম অঞ্চলের প্রকৃতি ও আদিম সংস্কারের সঙ্গে ঔপন্যাসিক সুবোধ ঘোষ দাশু ঘরামী এবং সকালীর জীবনের এক নিবিড় যোগ রচনা করেছেন।

শক্তিপদ রাজগুরু (১৯২২-২০১৪ খ্রিঃ)-র 'তবু বিহঙ্গ' (১৯৬০ খ্রিঃ) উপন্যাসটি পশ্চিম রাঢ়ের বনভূমির প্রান্তে অবস্থিত ঊষর প্রান্তরে গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু শিবিরের জীবনের কাহিনিকে পটভূমি করে রচিত। ঔপন্যাসিক ঐ উদ্বাস্তু শিবিরের কর্মাধ্যক্ষের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলটির মানুষজন ও তাদের কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

রমাপদ চৌধুরী (১৯২২ খ্রিঃ —)-র 'বন পলাশীর পদাবলী' (১৯৬২ খ্রিঃ) উপন্যাসটি বন পলাশী নামক একটি গ্রামকে পটভূমি করে লেখা। এই উপন্যাসে মূলতঃ বন পলাশী নামক গ্রাম এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষদের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বাংলার অন্যান্য গ্রামের সঙ্গে এই গ্রামটির কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও উপন্যাসে গ্রামটিকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে গ্রামটিকে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও স্বতন্ত্র বলেই মনে হয়। তাই উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় আনা হয়েছে।

প্রভাত দেব সরকারের 'ওরা কাজ করে' (১৯৬৪ খ্রিঃ) উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পীরপুর গ্রামের ক্ষেতমজুরদের জীবনচর্যাকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। এখানে পীরপুর গ্রামটি মূল জনসমাজে অবস্থিত হয়েও বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত। সেই গ্রামের ক্ষেতমজুরদের জীবনযাপন প্রণালী, রীতি-সংস্কার, লোক-সংস্কৃতির কথা থাকায় আঞ্চলিকতার আলোচনায় উপন্যাসটি গৃহীত হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬ খ্রিঃ —) প্রান্তিক মানুষ, বিশেষ করে সাঁওতাল-আদিবাসী জনজাতিদের নিয়ে বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেছেন। এই উপন্যাসগুলিতে তিনি এদের বাসভূমি থেকে শুরু করে জীবনযাপন প্রণালী, লোকাচার, লোকসংস্কৃতি, পোশাক-আশাক প্রভৃতির বিস্তারিত পরিচয় তুলে এনেছেন। এই উপন্যাসগুলিতে লেখিকা প্রয়োজনমত আঞ্চলিক উপভাষাও ব্যবহার করেছেন। ফলে এই উপন্যাসগুলি অনেকটাই আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর এই ধরনের উপন্যাসগুলি হল — 'কবি বন্দ্যোঘটি গাঞিঁর জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৬ খ্রিঃ), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭ খ্রিঃ), 'অপারেশন বসাই টুডু' (১৯৭৮ খ্রিঃ), 'চোট্টি মুন্ডা এবং তাঁর তীর' (১৯৮০ খ্রিঃ) 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' (১৯৯০ খ্রিঃ) এবং 'ব্যাধখন্ড' (১৯৯৭ খ্রিঃ)।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০ খ্রিঃ —) তাঁর 'তৃণভূমি' (১৯৭০ খ্রিঃ) উপন্যাসটির পটভূমি হিসেবে তাঁর জন্মভূমি মুর্শিদাবাদ জেলার দ্বারকানদীর দুই তীরের 'কুলহীন ধূসর সমুদ্রের মতো তৃণভূমি' অঞ্চলকে গ্রহণ করেছেন। এজন্য এই উপন্যাসে ঐ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি থেকে শুরু করে অধিবাসীদের জীবনচর্যা সংক্রান্ত

অনেক বিষয় উঠে এসেছে। ফলে এই উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় স্থান দেওয়া হল।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪ খ্রিঃ —)-এর 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (১৯৭০ খ্রিঃ) উপন্যাসটি দেশভাগের অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালের ঢাকা জেলার শীতলক্ষ্যা নদী তীরবর্তী হিন্দু-মুসলিম জনজীবনকেন্দ্রিক একটি গ্রামকে পটভূমি করে লেখা। এখানে ঐ অঞ্চলটির রীতি-নীতি, আচার-সংস্কৃতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, লোককথা-লোকাচার, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, ভাষারীতির পরিচয় রয়েছে। তাই উপন্যাসটি আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মেদিনীপুরের শালবনি অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষদের জীবনচর্যা অবলম্বনে গুণময় মান্না (১৯২৫ খ্রিঃ —) তাঁর 'শালবনী' (১৯৭৮ খ্রিঃ) উপন্যাসটি রচনা করেছেন। এই উপন্যাসে মেদিনীপুর-খড়গপুর এবং বাঁকুড়া-গড়বেতার মাঝে অবস্থিত শালবনি অঞ্চলে শালগাছের যে বনভূমি তৈরি হয়েছে সেই বনাঞ্চলটির বিবরণের পাশাপাশি সেখানকার উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনচর্যার কথাও উঠে এসেছে। মেদিনীপুরে ঘাটাল বাজারকে পটভূমি করে লেখা তাঁর 'মুটে' উপন্যাসটির নায়ক ঐ বাজারের মুটে সুধীর সাঁতরা। তাকে কেন্দ্র করে মুটেদের জীবনের পেশাগত নানা দিক এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। সেইসঙ্গে ঘাটাল বাজারের বাস্তব ছবিও উপন্যাসে আছে। এই দু'টি উপন্যাসের আঞ্চলিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দেবেশ রায় (১৯৩৬ খ্রিঃ —) তাঁর 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮ খ্রিঃ) উপন্যাসটি ছয়টি পর্বে উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তিস্তা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশী সম্প্রদায়ের পাঁচশো বছরের ইতিহাসকে ধরতে চেয়েছেন। এজন্য উপন্যাসটির আলাদা গুরুত্ব আছে। ঔপন্যাসিক এখানে তিস্তা তীরবর্তী অঞ্চলটিকে অত্যন্ত জীবন্তভাবে তুলে এনে ঐ অঞ্চলটির প্রকৃতি ও মানুষজনের জীবনচর্যা সংক্রান্ত বিষয়কে স্থান দিয়েছেন। এজন্য 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অভিজিৎ সেন (১৯৪৫ খ্রিঃ —)-এর 'রহু চণ্ডালের হাড়' (১৯৮৫ খ্রিঃ) উপন্যাসটি উত্তরবঙ্গের এক যাযাবর-গোষ্ঠীর জীবন আলেখ্য। এখানে তাদের দেড়শ বছরের ইতিহাস ধরা পড়েছে। এদের না আছে স্থায়ী বাসস্থান, না আছে স্থায়ী জাতি-

ধর্ম; এদের একটাই পরিচয় যে, এরা হল বাজিকর। অনেক জায়গা ঘোরার পর এরা শেষপর্যন্ত মালদা জেলাতে এসে থিতু হয়েছে। উপন্যাসটিতে মালদার গ্রামীণ জনপদজীবনের ভূ-প্রকৃতি, শস্যক্ষেত, নদ-নদী, মানুষের রীতি-নীতি, আচার-সংস্কৃতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিষয়গুলি আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত হয়েছে কিনা বিচারের জন্য আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭ খ্রিঃ —)-এর 'চারণভূমি' (১৯৯৪ খ্রিঃ) উপন্যাসটি চারণভূমিতে ভেড়া চরোয়া বা ভেড়িহারদের জীবন পরিক্রমা অবলম্বনে রচিত। এখানে গোষ্ঠী জীবনের রূপ প্রকাশ পেয়ে আঞ্চলিকতার কিছু লক্ষণ ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়েছে। তাই এই উপন্যাসটি আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭ খ্রিঃ —)-এর 'মহুলবনীর সেরেঞ' (১৯৯৫ খ্রিঃ) উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকদের নানা ভাবে আকর্ষণ করে। এই উপন্যাসটি অবলম্বনে সিনেমাও তৈরি হয়েছে। এই উপন্যাসটি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রেক্ষিতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষজনের বাসভূমি থেকে শুরু করে অঞ্চলটির প্রকৃতি এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষগুলির জীবনচর্যার নানা দিক আছে। সে কারণে এই উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় আনা হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত বিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাস গুলির বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করাই আমাদের গবেষণার প্রধান লক্ষ্য। এই আলোচনার সুবিধার্থে শুরুর পুর্বে এই উপন্যাসগুলিকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হল — বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা এবং বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা। এগুলি দু'টি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। নীচে এই দুই অর্ধের উপন্যাসগুলির দু'টি পৃথক তালিকা তৈরি করা হল। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠির দেশ' উপন্যাসটি ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত হলেও এই ছকে উপন্যাসটিকে বিশ শতকের প্রথমার্ধে রাখা হয়েছে। কারণ উপন্যাসটির প্রাথমিক উপাদান শৈলজানন্দেরই রচিত 'কয়লাকুঠি' নামক ছোটগল্পে আছে। এটি 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই 'কয়লাকুঠি' গল্প থেকেই বাংলা কথাসাহিত্য প্রথম

আঞ্চলিকতার দিকে দৃষ্টি প্রদান করেছিল। তাই উপন্যাসটিকে প্রথমার্ধের আলোচনার প্রথমেই স্থান দেওয়া হয়েছে।

'বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা'র আলোচনায় যে উপন্যাসগুলি গৃহীত হয়েছে তার তালিকাটি এরূপ —

ঔপন্যাসিকের নাম	**উপন্যাসের নাম ও প্রথম প্রকাশকাল**
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	কয়লাকুঠির দেশ – ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।
প্রেমেন্দ্র মিত্র	পাঁক – ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ।
অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত	বেদে – ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	পদ্মানদীর মাঝি – ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ।
সরোজকুমার রায়চৌধুরী	নতুন ফসল (ট্রিলজি)
	ক) ময়ূরাক্ষী – ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।
	খ) গৃহকপোতী – ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ।
	গ) সোমলতা – ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	আরণ্যক– ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	ধাত্রীদেবতা – ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ।
	কালিন্দী – ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ।
	গণদেবতা – ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ।
	পঞ্চগ্রাম – ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ।
	কবি – ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ।
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	উপনিবেশ (তিন পর্ব)– ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	হাঁসুলী বাঁকের উপকথা – ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ।
বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ইছামতী – ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ।
সতীনাথ ভাদুড়ী	ঢোঁড়াই চরিত মানস (প্রথম চরণ)– ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ।
	(দ্বিতীয় চরণ)– ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

'বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা'র আলোচনায় নিম্নোক্ত উপন্যাসগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—

ঔপন্যাসিকের নাম	**উপন্যাসের নাম ও প্রথম প্রকাশকাল**
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	লালমাটি – ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ।
মনোজ বসু	জলজঙ্গল – ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	নাগিনী কন্যার কাহিনী – ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ।
	আরোগ্য নিকেতন – ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ।
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	মহানন্দা – ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ।
অদ্বৈত মল্লবর্মণ	তিতাস একটি নদীর নাম ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।
সমরেশ বসু	গঙ্গা – ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।
প্রফুল্ল রায়	পূর্বপার্বতী – ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।
অমিয়ভূষণ মজুমদার	গড় শ্রীখণ্ড – ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।
সুবোধ ঘোষ	শতকিয়া – ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ।
প্রফুল্ল রায়	সিন্ধুপারের পাখি – ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ।
অমিয়ভূষণ মজুমদার	দুখিয়ার কুঠি – ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ।
অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ	চরকাশেম – ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ।
শক্তিপদ রাজগুরু	তবু বিহঙ্গ – ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ।
মনোজ বসু	বন কেটে বসত – ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ।
রমাপদ চৌধুরী	বনপলাশীর পদাবলী – ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ।
প্রভাত দেবসরকার	ওরা কাজ করে – ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ।
মহাশ্বেতা দেবী	কবি বন্দ্যোঘটি গাঞিঁর জীবন ও মৃত্যু – ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ।
প্রফুল্ল রায়	কেয়াপাতার নৌকো
	প্রথম পর্ব – ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।
	দ্বিতীয় পর্ব – ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ।
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	তৃণভূমি – ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ।

ঔপন্যাসিকের নাম	উপন্যাসের নাম ও প্রথম প্রকাশকাল
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে–১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ।
মহাশ্বেতা দেবী	অরণ্যের অধিকার –১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ।
	অপারেশন বসাই টুডু –১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ।
গুণময় মান্না	শালবনী –১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ।
অমিয়ভূষণ মজুমদার	মহিষ কুড়ার উপকথা –১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ।
মহাশ্বেতা দেবী	চোট্টি মুন্ডা এবং তাঁর তীর –১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ।
সমরেশ বসু	বাথান –১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।
অভিজিৎ সেন	রহু চণ্ডালের হাড় ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।
দেবেশ রায়	তিস্তাপারের বৃত্তান্ত –১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ।
মহাশ্বেতা দেবী	টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা –১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ।
গুণময় মান্না	মুটে –১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ।
ভগীরথ মিশ্র	চারণভূমি –১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ।
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	মহুলবনীর সেরেঞ –১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।
মহাশ্বেতা দেবী	ব্যাধখণ্ড –১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।

এই দুই ভাগের উপন্যাসগুলির আঞ্চলিকতা সম্পর্কে পরবর্তী দু'টি অধ্যায়ে অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। কল্লোল যুগ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দশম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪১৬, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ১৬

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড) : সুকুমার সেন, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ ৩৪৭

৩। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ : ১৯৯৫, পুনর্মুদ্রণ : ২০০০-২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ৫৬২

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড), পৃ ৩৫৭

৫। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ : ২৪ শে মাঘ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, সপ্তম সংস্করণ : ১৪ই এপ্রিল, ১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৪-২০০৫, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ৫৪১

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (চতুর্থ পর্যায়) : ভুদেব চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ৩৬৯
৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড), পৃ ৩৪৬
৮। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ : ১৯৯৫, পুনর্মুদ্রণ : ২০০০-২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ৫৬০
৯। তারাশঙ্কর, বিশালতা ও উত্তরকাল : ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, কালি ও কলম, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৫৭
১০। বাঙালীর ইতিহাস : ড. নীহাররঞ্জন রায়, পৃ ১৪৯
১১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ড. সুকুমার সেন (পঞ্চম খণ্ড), পৃ ৩১৪
১২। কালের প্রতিমা : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ১৬২
১৩। আমার সাহিত্যজীবন : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ২৩
১৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৬২০
১৫। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা : সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট ২০০৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,পৃ ২৪৭

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসটির প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের যাত্রা শুরু হওয়ার পর অর্ধ-শতাধিক বৎসর অতিক্রম করলেও এখানে সেই অর্থে আঞ্চলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। বিশ শতকের বিশের দশকে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রথম বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার আবাহন ঘটান। তিনি বর্ধমানের রানীগঞ্জ-আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চলকে পটভূমি করে প্রথমদিকে 'কয়লাকুঠি' (১৩২৯ বঙ্গাব্দ), 'রেজিং রিপোর্ট' (১৩২৯ বঙ্গাব্দ), 'নারীর মন' (১৩৩০ বঙ্গাব্দ), 'বলিদান' (১৩৩০ বঙ্গাব্দ), 'জোহানের বিয়া'(১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)-এর মত বেশকিছু ছোটগল্প লেখেন। এরপর সেই একই অঞ্চলকে নিয়ে তিনি 'বানভাসি' (১৯২৩ খ্রিঃ), 'ষোল আনা' (১৩৩২ বঙ্গাব্দ), 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' (১৯২৬ খ্রিঃ), 'নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী' এবং 'কয়লাকুঠির দেশ' (১৯৫৮)-এর মত কয়েকটি উপন্যাস লেখেন। বিশ শতকের এই বিশের দশকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র 'পাঁক' (১৯২৬ খ্রীঃ) এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'বেদে' (১৯২৮ খ্রিঃ) উপন্যাসগুলি লেখেন। এরপর বিশ শতকের প্রথমার্ধে অঞ্চল জীবনকে পটভূমি করে একে একে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬ খ্রিঃ), সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ট্রিলজি 'নতুন ফসল'-এর 'ময়ূরাক্ষী' (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), 'গৃহকপোতী' (১৯৩৭ খ্রিঃ) এবং 'সোমলতা' (১৯৩৮ খ্রিঃ), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' (১৯৩৮ খ্রিঃ) এবং 'ইছামতী' (১৯৫০ খ্রিঃ), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যয়ের 'ধাত্রীদেবতা' (১৯২৯ খ্রিঃ), 'কালিন্দী' (১৯৪০ খ্রিঃ), 'গণদেবতা' (১৯৪২ খ্রিঃ), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩ খ্রিঃ), 'কবি' (১৯৪৪ খ্রিঃ) এবং 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭ খ্রিঃ), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তিনখণ্ডে 'উপনিবেশ' (১৯৪৪ খ্রিঃ) এবং সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৫০ খ্রিঃ)-এর প্রথম চরণ প্রকাশিত হয়। এই অধ্যায়ে মূলত উপরে উল্লিখিত রচনাগুলির আঞ্চলিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)

উপন্যাসটির দ্বিতীয় চরণ এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হলেও এটি যেহেতু প্রথম চরণটিকেই এগিয়ে নিয়ে গেছে, তাই এই অধ্যায়ের আলোচনায় 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর দু'টি চরণেরই আঞ্চলিকতার বিষয়টি উঠে আসবে।

বিশ শতকের তথা বাংলা কথা সাহিত্যের আঞ্চলিকতা সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬ খ্রিঃ)-এর গল্প-উপন্যাস দিয়েই শুরু করতে হয়। কারণ বাংলা কথাসাহিত্যে তিনিই প্রথম আঞ্চলিকতার আবাহন ঘটান। তাঁর সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন — '' . . . বাংলা সাহিত্যে ইনিই সেই কয়লাকুঠির আবিষ্কর্তা! নিঃস্ব রিক্ত বঞ্চিত জনতার প্রথম প্রতিনিধি? বাংলা সাহিত্যে যিনি নতুন বস্তু নতুন ভাষা নতুন ভঙ্গী এনেছেন? হাতির দাঁতের মিনার চূড়া ছেড়ে যিনি প্রথমে নেমে এসেছেন ধূলিম্লান মৃত্তিকার সমতলে।''[১] তাঁর পৈতৃক নিবাস বীরভূম জেলার খয়রাশোলের রূপসীপুর গ্রাম হলেও শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় এবং পিতা দ্বিতীয়বার বিয়ে করায় শৈলজানন্দের শৈশব ও কৈশোর মাতামহের কাছে প্রথমে বর্ধমানের অণ্ডালে এবং পরবর্তীকালে রাণীগঞ্জে কাটে। ফলে শৈশব থেকেই তিনি বর্ধমানের এই কয়লাখনি অঞ্চলের প্রকৃতি এবং সাঁওতাল-বাউরি-হাড়ি জনজাতির তথাকথিত অন্ত্যজ মানুষদের জীবনচর্যার সঙ্গে পরিচিত হন। প্রথম যৌবনে তিনি কয়লাখনি অঞ্চলে কাজও করেন। ফলে যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন এই কয়লাখনি অঞ্চল এবং সেখানকার তথাকথিত অন্ত্যজ মানুষদের জীবনচর্যাকেই তাঁর লেখার পটভূমি করেন। এই সময় থেকেই তিনি গল্প লেখার দিকে ঝোঁকেন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে ১৩২৯ বঙ্গাব্দ (১৯২২ খ্রিস্টাব্দ)-এর কার্তিক সংখ্যায় 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় শৈলজানন্দের প্রথম উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'কয়লাকুঠি' প্রকাশিত হয়। তাঁর এই 'কয়লাকুঠি' গল্পটি পড়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মন্তব্য করেন — ''কে এই নবাগত? মাটির উপরকার শোভনশ্যামল আস্তরণ ছেড়ে একেবারে তার নিচে অন্ধকার গহ্বরে গিয়ে প্রবেশ করেছে? সেখানে কয়লার বদলে তুলে আনছে হীরামণি?''[২] ১৩২৯ সালেরই ফাল্গুন মাসে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় তাঁর 'রেজিং রিপোর্ট' নামক ছোটগল্পটি। এই 'রেজিং রিপোর্ট' এবং ১৩৩০ সালে 'প্রবাসী'তে

প্রকাশিত ‘বলিদান’ গল্পটির প্রশংসা করে ড. সুকুমার সেন বলেছেন — ‘‘পরিপক্কতা লইয়া শৈলজানন্দের গল্প ১৩২৯ সালের ফাল্গুন মাসে প্রবাসীতে বাহির হইল — নাম ‘রেজিং রিপোর্ট’। রানীগঞ্জ-উখড়া-দিশেরগড় অঞ্চলের কয়লাখাদের সাঁওতাল-বাউড়ী কুলি-কামিনদের ধাওড়ার অজ্ঞাত জীবন লইয়া শৈলজানন্দ যে গল্পস্রোত বহাইয়া দিয়া সাহিত্যজগৎ প্রায় চমকিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সূত্রপাত এই গল্পে এবং ‘বলিদান’ গল্পে।’’[৩] এরপর একে একে ‘নারীর মন’ (১৩৩০, কল্লোল), ‘জোহানের বিয়া’ (১৩৩৩, কালিকলম) গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। শৈলজানন্দের ‘জোহানের বিয়া’ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘পোনাঘাট পেরিয়ে’ গল্প দু’টি পড়ে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক জীবনের রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পলেখার একটি নতুন পথের সন্ধান পান বলে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন — ‘‘. . . এসময়ে আকস্মিকভাবে তাঁর হাতে পৌঁছায় ‘কালি-কলম’ পত্রিকার দুটি সংখ্যা (১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। ১৯২৬) — এই দুই সংখ্যায় যথাক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘জোহানের বিয়া’ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘পোনাঘাট পেরিয়ে’। গল্পলেখার একটি নতুন পথের সন্ধান তিনি পেলেন, তার ফলে লিখলেন ‘রসকলি’ গল্প (১৯২৬)।’’[৪] এছাড়াও তিনি ‘ঝমরু’, ‘মরণবরণ’, ‘বন্দী’, ‘বনবিহগী’, ‘সাঁওতাল’-এর মত বেশকিছু ছোটগল্প লেখেন। তবে ‘কয়লাকুঠি’, ‘রেজিং রিপোর্ট’, ‘মা’, ‘নারীর মন’ এবং ‘জোহানের বিয়া’ গল্পগুলিকেই তাঁর কয়লাকুঠি সিরিজের গল্প বলা হয়। এগুলিতে তিনি রানীগঞ্জ-আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চল এবং সেখানকার অন্ত্যজ মানুষদের তুলে এনে বাংলা কথাসাহিত্যে যথার্থ আঞ্চলিকতার সূচনা ঘটান।

শুধু ছোটগল্পেই নয়, উপন্যাসেও শৈলজানন্দ বর্ধমানের রানীগঞ্জ-আসানসোলের সেই কয়লাখনি অঞ্চল এবং সেখানকার অন্ত্যজ মানুষের জীবনের ছবি তুলে আনার দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর হাতে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসেরও যাত্রা শুরু হয়। তিনি এই অঞ্চলটিকে পটভূমি করে অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছেন। তবে এক্ষেত্রে শুধু কয়লাখনি অঞ্চল নয়, রাঢ়ের সমতলভূমির কথাও স্থান পেয়েছে। তাঁর এইরকম উপন্যাসগুলির মধ্যে ‘বানভাসি’, ‘ষোল আনা’,

'মহাযুদ্ধের ইতিহাস', নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী' 'পাতালপুরী' 'কয়লাকুঠির দেশ'-এর মত কয়েকটি উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের বেশ কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি ছোটগল্প ও উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিলেই শৈলজানন্দের কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার স্বরূপ স্পষ্ট করা সম্ভব হবে।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম আঞ্চলিকতার আবাহন করেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি বর্ধমানের রানীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের খয়লাখনি অঞ্চলকে পটভূমি করে কিছু ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এজন্য বাংলা উপন্যাসের আঞ্চলিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও একটি বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত তাঁর প্রথমদিককার ছোটগল্পগুলিকে বাদ দিয়ে কোনো আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর কিছু ছোটগল্প পড়ে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন — ''শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু কিছু পড়েছি। দেখেছি, দারিদ্র্য জীবনের যথার্থতা, অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লিখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনার দারিদ্র্য ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। . . . তাঁর কলমে গ্রামের যে-সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলবার কারি-পাউডারি ভঙ্গীটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয় নি।''[৫] বিশিষ্ট সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরীও শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি সম্পর্কীয় গল্পগুলির মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতার সূচনা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন — ''কয়লাকুঠির গল্পগুলি বাঙালি মধ্যবিত্ত পাঠক সমাজের একঘেয়ে প্রথাবদ্ধ জীবনে এক অনাস্বাদিত মুক্তির সুখস্পর্শ বহন করে আনল। এক সজীব সতেজ জীবনরসের অফুরন্ত স্রোত প্রবাহিত করে দিল বাঙলা কথাসাহিত্যে। কয়লাখনির অতল থেকে লেখক তুলে আনলেন দীপ্ত প্রাণের হীরকখণ্ড। রানীগঞ্জ ধানবাদ অঞ্চলের কয়লাকুঠির অধিবাসী সাঁওতাল, বাউড়ি, কুলি-কামিনদের সুস্থ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আদিম জীবনের নিঃসঙ্কোচ প্রেম, ঈর্ষা, আত্মত্যাগ ও অকুণ্ঠ স্থূল উদ্দামতার বলিষ্ঠ সরল কাহিনী বাঙালি পাঠকের দৃষ্টিকে মুগ্ধ অভিভূত করে দিল। বস্তুত শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি অঞ্চলের গল্পের মধ্য দিয়ে বাঙলা কথাসাহিত্যের আঞ্চলিকতা (Regionalism) বা স্থানীয় রঙ (Local Colour) বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠল।''[৬] শুধু তাই নয়, বাংলা

সাহিত্যের ইতিহাসকার অধ্যাপক সুকুমার সেনও তাঁর গল্পকার সত্তার ভূয়সী প্রশংসায় মুখর হয়েছেন — ''শৈলজানন্দের গল্প ''বাস্তব'' (রিয়ালিস্টিক) বলিতে যাহা বোঝায় শুধু তাহাই নয়, ''বাস্তবিক''ও। তীব্র অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ অনুভব শৈলজানন্দের সাহিত্য-সাধনাকে পরিচিত সরণি হইতে ভুলাইয়া উপেক্ষিত-অবজ্ঞাত মানুষের অপরিচিত জীবনের অনাবিষ্কৃত গহনের দিকে পরিচালিত করিয়াছিল।''[৭] আর তাঁর রচিত গল্পগুলি সম্পর্কে অধ্যাপক সেন বলেছেন — ''স্থান-কাল-ভাষা-পরিবেশের সৌষ্ঠব, যাহাকে ইংরাজীতে বলে ''লোক্যাল কালার'', তাহা শৈলজানন্দের গল্পে পরিপূর্ণভাবে দেখা গেল। অথচ কাহিনীর অত্যন্ত জৈবিক মানুষগুলি স্থান-কাল-পরিবেশের মধ্যে কোথাও খর্ব হইয়া হারাইয়া যায় নাই। বিষয় সর্বদা জীবন্ত, অনেক সময় নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত। ইহাও বাঙ্গালা সাহিত্যে কিছু নূতন।''[৮] এজন্য বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার আলোচনা করতে বসলেও শৈলজানন্দের কিছু ছোটগল্পের পরিচয় নিতেই হয়। তবে যেহেতু আমাদের আলোচনা উপন্যাসকেন্দ্রিক, তাই আমরা শৈলজানন্দের ছোটগল্পের আলোচনা তাঁর কয়লাকুঠি সিরিজের 'কয়লাকুঠি', 'রেজিং রিপোর্ট' 'মা', 'জোহানের বিয়া' এবং 'নারীর মন' — এই পাঁচটি গল্পের মধ্যে সীমবদ্ধ রেখেছি।

মাত্র বাইশ বছর বয়সে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর **'কয়লাকুঠি'** গল্পটি রচনা করেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের (১৯২২ খ্রিস্টাব্দ) কার্তিক সংখ্যায় 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় এই গল্পটি প্রকাশিত হয়। বাউরি সম্প্রদায়ের মেয়ে বিলাসীর সুতীব্র প্রেমতৃষ্ণা এবং তার করুণ পরিণতি নিয়ে গল্পটি রচিত। গল্পটির কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের স্বামী নানকুকে তার স্ত্রী বিলাসী প্রচণ্ড ভালোবাসত। কিন্তু তা সত্ত্বেও নানকু মাইনু নামে আর এক মেয়েকে মন দেয়। তারা দু'জনে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে বিলাসী রমনা নামে একজনের সঙ্গে থাকতে শুরু করে। সে তাকে শরীর দিলেও নানকুর প্রতি অবিচল ভালোবাসা থাকায় মন দিতে পারে না। একদিন বিলাসী খবর পায় যে, মাইনু মারা গেছে এবং নানকু ফিরে এসেছে। এতে বিলাসী আনন্দে আত্মহারা হলেও পরে জানতে পারে কয়লাখনিগর্ভে চাপা পড়ে তার স্বামী নানকুও মারা গেছে। এই খবর শুনে সে প্রচুর মদ্যপান করে রাতের অন্ধকারে খনির তলায় নেমে গিয়ে নানকুর মৃতদেহ খুঁজে বের করে এবং তাকে

জড়িয়ে ধরে উন্মাদিনীর মত বিলাপ করে। এমন সময় কয়লার একটা 'মস্ত চাংড়া' তাদের মাথার উপর সশব্দে নেমে পড়লে নানকুর সঙ্গে সঙ্গে বিলাসীও খনিগর্ভে সমাধিস্থ হয়ে যায়। এভাবে বিলাসী ও নানকুর জীবনের বেদনা-ঘন পরিণতিতে 'কয়লাকুঠি' গল্পটি শেষ হয়েছে।

এই গল্পে বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ-আসানসোল এলাকার কয়লাখনি অঞ্চলের পটভূমির বর্ণনা স্বল্প হলেও অত্যন্ত জীবন্ত হয়েছে। বিলাসী, নানকু, রমনা, মাইনুর মত চরিত্র এবং তাদের কার্যকলাপ পুরোপুরি এই কয়লাখনি অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের শ্রমিক-মজুর শ্রেণির মানুষদের কথাই স্মরণ করায়। বিশেষ আঞ্চলিক প্রতিবেশের বাইরে এইরকম মানুষজনের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। বাউড়ি কন্যা বিলাসীর স্বামী নানকুর প্রতি প্রেমে একনিষ্ঠ থেকেও রমনা খালাসীকে দেহদান করা গল্পটির একটি বিশেষ দিক। আবার ঘরে পতিব্রতা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নানকুর অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ সেই কয়লাখনি অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শ্রমিক-মজুরদের মানসিকতাকেও স্পষ্ট করে। এখানে সাঁওতাল-বাউড়িদের মতো উপজাতি সম্প্রদায়ের আদিম প্রেমের চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। প্রচুর মদ্যপান করে বিলাসী স্বামীর মৃতদেহের সন্ধানে যেভাবে কয়লাখনির গর্ভে নেমেছে তা একমাত্র ঐ অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের নারীদের পক্ষেই সম্ভব। হয়তো এখানে আঞ্চলিকতার বিস্তৃত রূপ প্রকাশ পায় নি, ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে তা সম্ভবও নয়। তবুও এই 'কয়লাকুঠি' গল্পটিতে গল্পকার আঞ্চলিকতাকে নিয়ে এসে বাংলা কথাসাহিত্যে একটা নতুন দিক উন্মোচন করেছেন, যা পরবর্তী সময়ে আঞ্চলিক উপন্যাস রচনার পথ অনেকটাই প্রশস্ত করেছে।

'কয়লাকুঠি' গল্প প্রকাশের বছরেই অর্থাৎ ১৩২৯ বঙ্গাব্দে শৈলজানন্দের কয়লাখনি অঞ্চল নির্ভর আর একটি ছোটগল্প **'রেজিং রিপোর্ট'** প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী'র ফাল্গুন সংখ্যায়। এই গল্পে তিনি কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রমিক-শোষণের করুণ, মর্মন্তুদ ও কদর্য চিত্র এঁকেছেন। এর কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, কয়লাখনি ম্যানেজার জেমস সাহেব অধিক মুনাফা লাভের নেশায় শ্রমিকদের অবধারিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও দু'বার ভাবেন না। তার এই উদগ্র আকাঙ্ক্ষার বলি হয় কয়লাখনির শ্রমিক টুইলা। সে খনির অতলে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। কিন্তু

তার মৃত্যু জেমস সাহেবের লোভকে একটুও টলাতে পারে নি। তিনি এই ঘটনাটিকে হালকাভাবে নেন এবং অত্যন্ত উদ্ধতভাবে বলেন — 'কুছ পরোয়া নেই'। কারণ হিসেবে জানান যে, তার হাতে এরকম অনেক হয়েছে। তবুও যেন তেন প্রকারে কয়লার রেজিং বাড়াতে হবে। একসময় খনির রেজিং-বাবু তাঁর কাছে টুইলার ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রসঙ্গ তুললে তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে বলেন — "Damn your Tuila." এইভাবে এই 'রেজিং রিপোর্ট' গল্পটিতে এক খনি শ্রমিকের মৃত্যু এবং তজ্জনিত মালিকপক্ষের মনোভাব প্রকাশ করে শৈলজানন্দ সেই অঞ্চলের শ্রমিক-শোষণের ছবি এঁকেছেন। এই গল্পেও রানীগঞ্জ-আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষজনের জীবন পরিক্রমার ছবি আছে। পাশাপাশি অঞ্চলটির মানুষজন সম্পর্কে তথাকথিত সভ্যসমাজের মনোভাবের কথাও উঠে এসেছে। এগুলি সবই আঞ্চলিকতার লক্ষণ। তাই অধ্যাপক সুকুমার সেনের মত ভাষাবিদ্ ও সাহিত্য-সমালোচক আঞ্চলিকতার নিরিখে শৈলজানন্দের 'রেজিং রিপোর্ট' গল্পটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

শৈলজানন্দের **'মা'** গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৩৩০ বঙ্গাব্দ)। এটিও গল্পকারের কয়লাকুঠি সিরিজের গল্প। এখানে আঞ্চলিকতার পটভূমিকায় সাঁওতাল যুবক-যুবতীর সমাজ-বিগর্হিত অসংযত যৌবনলীলা, সাঁওতালদের সমাজ-জীবনের ইতস্তত রূপচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাঁওতাল রমণী পরী। সাঁওতাল যুবক টুরা তাকে ভালোবাসে। পরীর সঙ্গে টুরার বিয়ে দিতে টুরার পিতা লামারও আপত্তি নেই। পরী তাকে ভালোবাসলেও তার জ্যাঠা তথা প্রতিপালক দুখনের আপত্তিতে বিয়ে করতে পারে নি। কারণ দুশ্চরিত্র জামাইয়ের হাতে পড়ে তার একটি মাত্র মেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করায় দুখনের বিয়ের প্রতি আস্থা চলে গিয়েছিল। পরী ও টুরা দু'জনেই কয়লাখনিতে কাজ করে। টুরা পরীকে বারবার বিয়ের প্রস্তাব দিলেও সে প্রত্যাখ্যান করে। এরূপ অবস্থায় একদিন কয়লাখনির অন্ধকারে টুরা পরীকে জোর করে ভোগ করলে পরী গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তবুও সে টুরাকে বিয়ে করতে রাজি হয় না এবং আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে শেষ পর্যন্ত তার নবোদ্ভুত জননী সত্তার কারণেই আত্মাহুতি দেওয়া সম্ভব হয় না — তিন নম্বর খাদে আত্মাহুতি দিতে গিয়ে সন্তানের

মুখ মনে পড়লে সে ফিরে আসে। ফিরে আসার পথেই তার সন্তান জন্ম নেয়। সেখানে টুরা এসে পৌঁছোলে পরী আর কোনো কথা না বলে টুরার পেছনে পেছনে ধীর পদক্ষেপে তার কুটিরে এসে প্রবেশ করে। এভাবে এই গল্পে এক প্রান্তিক সমাজের নারী পরীর জননীসত্তার উন্মোচন ঘটানো হয়েছে। পাশাপাশি গল্পটিতে কয়লাখনি অঞ্চলের প্রান্তিক সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সমাজ জীবনের বহুমাত্রিক ছবি প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য এই 'মা' গল্পটিও একটি সার্থক আঞ্চলিক গল্প হতে পেরেছে।

শৈলজানন্দের কয়লাকুঠি সিরিজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প হল **'নারীর মন'**। গল্পটি 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০)-য় প্রকাশিত হয়। কয়লাখনি অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একই পুরুষকে নিয়ে দুই নারীর ঈর্ষা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মান-অভিমান এবং সবশেষে গভীর ভগিনী-স্নেহ এই গল্পের মূল উপজীব্য। এই গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র ভুলি সাঁওতাল যুবক ভোলার ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে পীরু মাঝির পৌরুষ ও উদ্দামতায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিয়ে করে। কিন্তু বিয়ের পর জানা যায় ভুলি বন্ধ্যা। এই অজুহাতে পীরু ভুলির বোন টুরনীর প্রতি আকৃষ্ট হলে ভুলি তার প্রতিবাদ করায় স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হয়। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ভোলাকে পীরুর বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। সে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ভোলা যদি পীরুকে পরাস্ত করতে পারে তাহলে সে তাকে 'সাঙা' করবে। ভুলিকে পাবার আশায় একদিন বিকেলে কয়লাখাদ থেকে ফিরে আসার সময় পরিশ্রমক্লান্ত অবসন্ন পীরুকে ভোলা আক্রমণ করে। জেতা তো দূরের কথা পীরুর কাছে খুব সহজেই ভোলা হার মানে। কিন্তু গাছের আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখে ভুলি একটুও হতাশ হয় না, বরং স্বামী পীরুর জয়ে উল্লসিত হয়। তবে সে সব ছেড়ে আসাম যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ট্রেনে চেপে বসে। এদিকে আসাম যাওয়ার কথা ছিল তার বোন টুরনীর। টুরনী স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই ট্রেন ছেড়ে দিলে দূরে পলাশ বনে বোনের দৌড়ে আসা দেখে ভুলির চোখ ছলছল করে ওঠে। সে প্রাণ ভরে বোনকে দেখে নিয়ে জানালার পাশে সরে বসে। এইভাবে এই গল্পে শৈলজানন্দ কয়লাখনি অঞ্চলের অন্ত্যজ নারীদের আদিম ও অকৃত্রিম প্রেম, তাকে পাওয়ার জন্য উদগ্র ও উদ্দাম আচরণ, বঞ্চনার প্রতিবাদে প্রতিশোধস্পৃহা এবং ভগিনীপ্রীতির ছবি চিত্রিত করেছেন।

এগুলি একটি বিশিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবনচর্যাকেই প্রতিফলিত করেছে। ফলে কয়লাকুঠি সিরিজের অন্যান্য গল্পের মত 'নারীর মন' গল্পটিও একটি সার্থক আঞ্চলিক গল্প হয়ে উঠেছে।

'জোহানের বিয়া' গল্পটিও কয়লাখনি অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুখীর মাধ্যমে গল্পকার প্রান্তিক সম্প্রদায়ের নারীর আপাত নির্দয় বুকে প্রচ্ছন্ন বেদনা লুকিয়ে থাকার ছবি এঁকেছেন। উচ্ছল যুবতী সুখী পরিস্থিতির চাপে পড়ে খোঁড়া জোহানকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। শারীরিক দিক থেকে পঙ্গু জোহান দৈহিকভাবে সুখীর যোগ্য না হওয়ায় সুখী তাকে নানা ভাবে অবজ্ঞা করে। তার জীবনে জোহানের উপস্থিতিকেও সে অস্বীকার করতে চায়। ঘটনাক্রমে জোহানের অপমৃত্যু ঘটলে সুখী প্রথম বুঝতে পারে তাঁর হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে জোহানের প্রতি ভালোবাসা জন্ম নিয়েছে। এইজন্য সে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে। এই গল্পে শৈলজানন্দ কয়লাখনি অঞ্চলের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সারল্যময় ভালোবাসা ও বেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। দেহকে আশ্রয় করে এই ভালোবাসা বিকাশ লাভ করতে চাইলেও শেষপর্যন্ত দেহাতীত ভালোবাসায় পর্যবসিত হয়েছে।

এইরকম অজস্র ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে শৈলজানন্দ বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার আবাহন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর এই জাতীয় গল্পের প্রশংসা করে বাংলা কথাসাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন — ''শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০) বাঙলা কথাসাহিত্যে তাঁর কয়লাকুঠির গল্প দিয়ে একটা নতুন হাওয়া এনে দিয়েছেন। কয়লার খনি, তার কুলি-মজুর, সাঁওতাল নর-নারী, নিচুতলার মানুষদের বিচিত্র সমাবেশ — বাউরি-হাড়ি-ডোম, খনি-জীবনের পরিবেশের মধ্যে এই অকিঞ্চন মানুষদের অনালোকিত দিনযাপন, একে অবলম্বন ক'রে শৈলজানন্দ যে-সব গল্প লিখেছেন, উপাদানের নতুনত্বের কারণেই শুধু নয়, সহানুভূতির বিস্তারের কারণেও এই গল্পগুলি সেদিন অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবং কালক্রমে এইভাবে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে যাকে আধুনিক বলতে বাধা নেই।''[৯]

আমাদের আলোচনা যেহেতু উপন্যাসনির্ভর তাই এবারে আমরা শৈলজানন্দের উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গটি কতটা উঠে এসেছে সেদিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। এব্যাপারে আমরা বাংলা উপন্যাসের বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছি, যেখানে তিনি ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দের সমালোচনার পাশাপাশি প্রশংসাও করেছেন — ''রচনার প্রাচুর্য ও অজস্রতার দিক দিয়া শৈলজানন্দ সম্মানজনক উল্লেখের অধিকারী। তাঁহার বড় উপন্যাসের মধ্যে কোনোটিই উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করে নাই। কয়লাকুঠির কুলি-মজুর-সাঁওতালদের জীবনযাত্রা, রীতি-নীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান ও প্রণয়লীলা হইতে বৈচিত্র্য-আহরণের চেষ্টাতেই তাঁহার প্রধান মৌলিকতা।''[১০] শৈলজানন্দের অনেক উপন্যাসই বর্ধমানের রানীগঞ্জ-আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষজনের জীবনচর্যাকে পটভূমি করে রচিত। তবে তাঁর উপন্যাসে আঞ্চলিকতার আলোচনা 'ষোল আনা' এবং 'কয়লাকুঠির দেশ' — এই দু'টি উপন্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবনের প্রথমদিকে রচিত **'ষোল আনা'** উপন্যাসটি ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি সে সময়ে প্রচলিত বীরভূম-বর্ধমানের 'ষোল আনা' ব্যবস্থার ক্লিন্ন রূপটিকে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। উপন্যাসটির কাহিনি অংশ খুব বেশি নয়। এর সূচনায় দেখা যায় যে, রুক্মিণী নামক এক সুন্দরী মেয়ে তথাকথিত নীতির ধার না ধেরে রাখাল নামক এক যুবককে বিয়ে না করেই ঘরে এনে বসবাস করলে গ্রামের মাতব্বরদের সভা 'ষোল আনা'-র কর্তারা ক্ষেপে যায়। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আস্ফালন দেখায় হরি পন্ডিত। সে রুক্মিণীর বাড়িতে মৃদু তিরস্কার করতে যায়। তবে স্বাধীনচেতা রুক্মিণী তাঁর কথায় কর্ণপাত না করায় মীমাংসার জন্য সে রুক্মিণীকে 'পালোয়ার' জোগাড় করে দিতে বলে। রুক্মিণী তার কথা মত রাখালের পোষা একটি বড় পাঁঠা গ্রামের 'ষোল আনা'কে উপহার দেয়। তবে উপন্যাসের কাহিনি এখানেই শেষ হয় না। এরপর উপন্যাসের কাহিনি রুক্মিণীকে বাদ দিয়ে ভিন্নমুখী হয়। এই ভিন্নমুখী কাহিনিতেও 'ষোল আনা' ব্যবস্থা প্রাধান্য পায়। এই অংশে নিতাই ডাক্তার, মাতু পিসি ও তার মেয়ে রানীর কথা স্থান পেয়েছে। গ্রামের 'ষোল আনা'-র চাপে পড়ে বিবাহিত এবং সন্তানের জনক নিতাই ডাক্তার মাতু পিসির মেয়ে রানীকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। অবশ্য নিতাই ডাক্তারের এই বিয়ের পেছনে জমি ও অর্থের লোভও কাজ করেছিল। তার প্রথম স্ত্রী লক্ষ্মী এই ঘটনায় ভেঙে পড়লেও শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা মেনে নেয়। কিন্তু বিয়ে সম্পন্ন হলে মাতু

পিসি প্রতিশ্রুতি মত জমি ও অর্থ নিতাই ডাক্তার এবং হরি পন্ডিতকে দিতে অস্বীকার করলে তারা রানীর বিরুদ্ধে 'কুশ পাঁথোল' সংঘটিত করতে প্রয়াসী হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত 'কুশ পাঁথোল' হয় না — রানীর মা মাতু জামাইকে ১০০ টাকা যৌতুক দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে গ্রামে কালভৈরবের গাজন শুরু হলে মেলা থেকে ফেরার পথে রানীর সঙ্গে নিতাই ডাক্তারের দেখা হয়। ডাক্তার রানীকে দেখে মজে গিয়ে তার সঙ্গে ঘরে আসে, যা দেখে মাতু খুশি হয়। এরপর উভয়ের মিলনের ইঙ্গিতে উপন্যাসটির কাহিনির সমাপ্তি ঘটে।

এই উপন্যাসটির কাহিনি অংশ স্বল্প হলেও বর্ধমান ও বীরভূমের সীমান্ত এলাকার ছোট্ট একটি গ্রামের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেক লক্ষণ আছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক গোপিকানাথ রায়চৌধুরীও অবগত করেছেন — ''লেখক 'ষোল আনা' গ্রন্থে এই অঞ্চলের 'লোকাল কালার' নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন — এখানেই তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব। সমগ্র গ্রামটির পথঘাট বাড়ীঘর এবং সর্বোপরি কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোভী স্বার্থপর সংকীর্ণচেতা মানুষগুলি একেবারে জীবন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।''[১১] উপন্যাসটির সূচনাতেই আঞ্চলিক পটভূমি মূর্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটিতে ভৈরবীতলা, কয়লাখাদের উল্লেখের পাশাপাশি দু-একবার কয়লাকুঠির প্রসঙ্গও এসেছে। তবে সবচেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে অরণ্যের সীমান্তবর্তী গ্রামটি। এখানকার আঞ্চলিক গ্রাম শাসনব্যবস্থা হল 'ষোল আনা'। এটি আসলে গ্রাম্য সমাজপতিদের কার্যসিদ্ধির মাধ্যম। উপন্যাসে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম্য মাতব্বরদের অত্যাচার, লোভ, নীতিহীনতার দিকটিকে উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। 'পালোয়ার', 'কুশপাঁথোল' প্রভৃতি লোকবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক পটভূমিকে মূর্ত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাষারীতিতে আঞ্চলিক রূপটি গৃহীত হয়েছে। যেমন 'লি-গা', 'জাড়ের রেতে', 'তুমার বিটি', 'ফেলব নাই কুনুদিন', 'লগৌই দিছি', 'গেলম', 'কুথা' প্রভৃতি। সুন্দরী রুক্মিণী, রাখাল, হরি পন্ডিত, নিতাই ডাক্তার, লক্ষ্মী, মাতু পিসি, রানীর মত উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র ও তাদের আচার-আচরণ উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটি দ্বারা প্রভাবিত। এসব কারণেই অল্প বয়সে লেখা শৈলজানন্দের এই 'ষোল আনা' উপন্যাসটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হবার পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অধিকাংশ উপন্যাসেই রাঢ়বঙ্গ এবং সেখানকার কয়লাখনি অঞ্চল প্রাধান্য পাওয়ায় তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাস আঞ্চলিক উপন্যাস হবার পথে অগ্রসর হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল **'কয়লাকুঠির দেশ'**। এটি তাঁর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস। এর প্রকাশকাল হল ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ। এই উপন্যাসটিতে শৈলজানন্দ বর্ধমান–বীরভূমের কয়লাখনি অঞ্চলের আঞ্চলিক পটভূমিকায় নব্য ধনী দেবু চাটুজ্যের পুত্র রঞ্জনের সঙ্গে বনেদি মুখুজ্যে বংশের সীতারাম মুখুজ্যের কন্যা মালার রোমান্টিক প্রণয় কাহিনি বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসটির কাহিনি অংশ থেকে জানা যায় যে, দেবু চাটুজ্যে ছিল কোলিয়ারির একজন কর্মচারী। কিন্তু কোলিয়ারির নিঃসন্তান এবং বৃদ্ধ ম্যানেজারের বদান্যতায় তার ভাগ্য রাতারাতি বদলে যায়। তিনি দেশে ফিরে যাবার সময় নিজের কুঠিগুলির স্বত্ব কর্মচারী দেবুর নামে লিখে দেন। ফলে দেবু হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠে। এই দেবুর পুত্র রঞ্জনের সঙ্গে সেই অঞ্চলের বনেদি মুখুজ্যে বংশের মেয়ে মালার প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মালার পিতা সীতারাম যখন রঞ্জনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে মনস্থ করেছিলেন, তখন একদিন দশ হাজার টাকা প্রাপ্তির আশায় দেবু সীতারামের কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে মিষ্টিমুখ করে দু'হাজার টাকা নিয়ে যায়। তবে অর্থের লোভে সে এই বিয়ে ভেঙে কোনো এক রাজার কন্যার সঙ্গে রঞ্জনের বিয়ে স্থির করে এবং লোক মারফৎ সীতারামের টাকা ফেরৎ দেয়। ফলে রঞ্জন ও মালার প্রণয়ে সঙ্কট নেমে আসে। এ সময় চুমকি নামের এক ইরানি কন্যা মালাকে রঞ্জনের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেও নিজে রঞ্জনকে ভালোবেসে ফেলে। সে সরাসরি রঞ্জনকে প্রেমের প্রস্তাব দেয় এবং তাকে পাবার আশায় দল ছাড়ে। রঞ্জন চুমকির প্রেম প্রস্তাব নাকচ করে দিলেও ইরানি যাযাবর দলটির এক ব্যক্তি তাকে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে অপ্রত্যাশিত আক্রমণ করে বসে। শেষ পর্যন্ত ঐ দলের অন্য একটি লোকের প্রচেষ্টায় রঞ্জন রক্ষা পায়। তবে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর কিছুদিন পর মুখুজ্যদের পুকুরে একটি মৃতদেহ পাওয়া গেলে দেবু চাটুজ্যে সীতারামের নামে খুনের অভিযোগ আনে, যার পরিণামে সীতারামের জেল হয়। এভাবে পরিস্থিতি জটিলতার দিকে এগোলে হঠাৎ রঞ্জনের আবির্ভাব ঘটে। রঞ্জন জানায় সে পালিয়ে গিয়ে এতদিন তার পিসির বাড়িতে ছিল। রাজকন্যার বিয়ে হয়ে যাওয়াতেই সে ফিরে এসেছে। ফলে

সীতারামের জেল থেকে মুক্তি ঘটে এবং দেবু তার কৃতকর্মের জন্য তার কাছে ক্ষমা চায়। এমতাবস্থায় রঞ্জন ও মালার বিয়েতে কোনো অসুবিধা না থাকলেও মালা বেঁকে বসে। তার বক্তব্য যে, যার জন্য তার বাবা জেল খেটেছে তাকে কোনোমতে বিয়ে করবে না। অবশেষে সকলের চেষ্টায় জট খোলে এবং মালা ও রঞ্জনের বিয়ের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই উপন্যাসটির আলোচনায় আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে উঠে আসে। বস্তুত এখানে বীরভূম-বর্ধমানের কয়লাখনি অঞ্চলের আঞ্চলিক পটভূমিকে গ্রহণও করা হয়েছে। উপন্যাসটির সূচনাতেই সুলতানপুরের কয়লাখনি অঞ্চলের ভৌগোলিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেখানকার অসমতল ভূমি, আঁকাবাঁকা রাঙামাটির পথ, গেরুয়া রঙের ক্রমশ কালো হয়ে আসা, মাঠের মাঝে যেখানে সেখানে চিমনি থেকে কালো ধোঁয়া উঠে আসা, লোহার তৈরি প্রকাণ্ড হেড গিয়ারের দণ্ডায়মান থাকা, কয়লাবোঝাই টবগাড়ির আসা যাওয়ার বর্ণনার মধ্য দিয়ে এখানে আঞ্চলিকতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। কয়লার দামের ওঠা নামার মধ্য দিয়ে সেখানকার অর্থনীতিরও যে ওঠা নামা হয় এই উপন্যাসে তারও উল্লেখ আছে — ''কিন্তু এখানকার সবকিছু যেন ওই কয়লার বাজারের সঙ্গে সমসূত্রে গাঁথা। কয়লার দাম যখন চড়ে, সকলের মুখে হাসি ফোটে। আবার দাম যখন পড়ে, চারিদিকে মনে হয় যেন অন্ধকার।''[১২] সেই সঙ্গে এই উপন্যাসে অত্যন্ত জীবন্তভাবে আছে কয়লাখনি অঞ্চলের প্রকৃতির বাস্তবচিত্র — গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতের বর্ণনা। শুধু তাই নয়, ঔপন্যাসিক সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত 'জল শান্তির উৎসব', 'সংকট-মোচন পূজা'র মত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের কথাও এখানে বলেছেন। জল শান্তির উৎসবের বর্ণনায় লেখা হয়েছে — ''শুরু হল জলশান্তি। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতা উপবাস করে রইল।''[১৩] আর সংকট-মোচন পূজার বর্ণনায় লেখা হয়েছে — ''ওদিকে হিঙুল নদীর তীরে শ্মশান ঘাট। সেই শ্মশানের পাশে সঙ্কটভৈরবীর মন্দির। বিপদের দিনে গ্রামের লোক এই সঙ্কট তারিণীর মন্দিরে তাদের সঙ্কটমোচনের প্রার্থনা জানায়।''[১৪] উপন্যাসটিতে শৈলজানন্দ ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় ভাষারীতিরও প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাই 'কয়লাকুঠির দেশ' উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাস হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে।

তবে আঞ্চলিকতার লক্ষণাক্রান্ত হয়েও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘কয়লাকুঠির দেশ’ সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে নি। অধ্যাপক-সমালোচক অলোক রায়ের ‘সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য’ গ্রন্থে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার সূচনা শৈলজানন্দ করেছিলেন বলে মন্তব্য করা হলেও তাঁর ‘কয়লাকুঠির দেশ’ উপন্যাসকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি – – ‘‘বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে শৈলজানন্দ এই ধারাটির সূচনা করলেও তাঁর ‘কয়লাকুঠির দেশ’ ঠিক সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। প্রকৃতি এখানে প্রেক্ষাপটে থেকেও চরিত্রগুলির উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি এবং স্বয়ং একটি চরিত্র হয়ে দেখা দেয়নি।’’[১৫] এই উপন্যাসটি প্রসঙ্গে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি শৈলজানন্দের কথাসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সার্থক আঞ্চলিক গল্প রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসা করলেও সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় তাঁর ব্যর্থতার আলোচনা প্রসঙ্গে এই ‘কয়লাকুঠির দেশ’ উপন্যাসটির কথা উল্লেখ করেছেন — ‘‘বাংলায় আঞ্চলিক গল্প-উপন্যাসের সূত্রপাত হয়েছিল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘নারীমেধ’ নামে গ্রথিত ত্রয়ী-গল্পে (১৯২৮)। সার্থক আঞ্চলিক গল্প তিনি লিখেছেন, কিন্তু উপন্যাসে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তার প্রমাণ ‘কয়লাকুঠির দেশ’। তা উপন্যাস, কিন্তু আঞ্চলিক উপন্যাস নয়, কারণ প্রকৃতি সেখানে কাহিনীর পটভূমিমাত্র, কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত চরিত্র নয়, প্রকৃতি সেখানে পাত্রপাত্রীর উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এ উপন্যাসে রঞ্জন ও মালার জীবনের সমস্যা (বিবাহ সমস্যা) যে কোন দেশে কালে ঘটতে পারে।’’[১৬] প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কয়লাখনি অঞ্চলকে প্রেক্ষাপট করে মালা ও রঞ্জনের প্রণয় সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের বিরোধের ছবি এঁকেছেন। মালা, রঞ্জন, দেবু, সীতারাম, চুমকির মত উপন্যাসের প্রধান চরিত্ররা কেউ কয়লাখনি অঞ্চলটি দ্বারা প্রভাবিত নয়। বস্তুত উপন্যাসটির পটভূমি কয়লাখনি অঞ্চল না হয়ে অন্য কোথাও হলেও উপন্যাসের কাহিনি এবং চরিত্র চিত্রণে তেমন কোনো ব্যাঘাত ঘটত বলে মনে হয় না। ফলে শৈলজানন্দের ‘কয়লাকুঠির দেশ’ উপন্যাসটি একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হতে পারে নি।

এই উপন্যাস দু'টি ছাড়াও শৈলজানন্দের 'বানভাসি', 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস', নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী', 'পাতালপুরী'র মত অসংখ্য উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে রাঢ়বঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চলকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এগুলি উপন্যাস হিসেবেই প্রথম শ্রেণির মধ্যে পড়ে না। এজন্য আঞ্চলিক দিকটাও তেমনভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় নি। যাই হোক, বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতা আনয়নের ক্ষেত্রে শৈলজানন্দকে ভগীরথের মর্যাদা দেওয়া হয়। অনেকেই এবিষয়ে তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তবে সবাই যে একবাক্যে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন এমন নয়। যেমন তাঁর সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যের বিখ্যাত বাস্তববাদী চিত্রকর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মূল্যায়নে বলেছেন — ''শৈলজানন্দের গ্রাম্যজীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ — কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এর বাস্তব সংঘাত আসে নি। বস্তিজীবন এসেছে কিন্তু বস্তিজীবনের বাস্তবতা আসে নি — বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তের রোমান্টিক ভাবাবেগ।''[১৭] আবার অধ্যাপক সুকুমার সেনের মত বোদ্ধা তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথনির্দেশক রূপে বর্ণনা করে তাঁকে শৈলজাপন্থী লেখক বলে মন্তব্য করেছেন — ''তারাশঙ্করকে শৈলজানন্দের সহযাত্রী বলিতে পারি। শৈলজানন্দ কয়লাকুঠির সাঁওতাল জীবন লইয়া সীমাবদ্ধ কাহিনী রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর লইলেন তাঁহার দেশ দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবন — পুরোনো গ্রামের জমিদার-ঘর হইতে নদীচরের মালো-বেদে পাড়া পর্যন্ত।''[১৮]

বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার সূচনালগ্নের আলোচনাকালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের **'পাঁক'** উপন্যাসটিকেও স্থান দিতে হয়। কারণ বিশ শতকের বিশের দশকে 'কল্লোল' (প্রথম প্রকাশ ১৯২৩ খ্রিঃ) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে গতানুগতিকতা কাটিয়ে একদল সাহিত্যিক নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অগ্রসর হন। এতে বাংলা উপন্যাস-ছোটগল্পের পটভূমি হিসেবে আমাদের চিরপরিচিত শহর বা গ্রাম নির্ভরতা কাটিয়ে বসতি, শহরতলি বা অচেনা-অজানা কোনো অঞ্চল প্রাধান্য পেতে শুরু করে। ফলে বাংলা সাহিত্যে অঞ্চলনির্ভর কথাসাহিত্য রচনার প্রবণতা শুরু হয়। নিঃসন্দেহে এব্যাপারে পথিকৃৎ ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছাড়াও এই দশকে আর যারা উপন্যাস চর্চায় এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

(১৯০৪–১৯৮৮ খ্রিঃ)। তিনি নিজের রচনায় আঞ্চলিকতা নিয়ে তেমন চর্চা করেন নি। তবুও অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের প্রতিমা' গ্রন্থে তাঁকে বাংলা আঞ্চলিক জীবনের সবচেয়ে বড় রসস্রষ্টা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরী বলে মন্তব্য করেছেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতে, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'জোহানের বিহা' এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' গল্প দু'টি পড়ে এগুলির প্রভাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' রচনা করেন — ''. . . এসময়ে আকস্মিকভাবে তাঁর হাতে পৌঁছায় 'কালি-কলম' পত্রিকার দুটি সংখ্যা (১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। ১৯২৬) — এই দু সংখ্যায় যথাক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'জোহানের বিহা' ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে'। গল্পলেখার একটি নতুন পথের সন্ধান তিনি পেলেন, তার ফলে লিখলেন 'রসকলি' গল্প (১৯২৬)।''[১৯]

বাংলা সাহিত্যের পাঠক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে কবি ও গল্পকাররূপে মনে রাখলেও প্রথম জীবনে দু'-একটি উপন্যাস লিখেও বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি আলোড়ন ফেলেছিলেন। তাঁর লেখা এইরকম একটি উপন্যাস হল 'পাঁক' (১৯২৬ খ্রিঃ)। এই উপন্যাসটি তাঁর ২২ বছর বয়সে প্রকাশিত হলেও কুড়ি বছর বয়স থেকেই তিনি এর রচনা শুরু করেন। এটি তাঁর অপরিণত বয়সের রচনা হলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার অধ্যাপক সুকুমার সেন উপন্যাসটির প্রশংসা করে মন্তব্য করেছেন — ''প্রেমেন্দ্রবাবুর প্রথম কাহিনী ''পাঁক'' (১৯২৬) তাঁহাকে ''আধুনিক'' সাহিত্যিকদের উচ্চ শ্রেণীতে তুলিয়া দিয়াছিল। দরিদ্র গৃহস্থ ও বস্তিবাসীর হীন ও কুৎসিত সংসারযাত্রার চিত্রাবলী এই উপন্যাস।''[২০] 'পাঁক' উপন্যাসটি রচনার আগেই শৈলজানন্দের নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতার আবাহন ঘটে গিয়েছিল। যদিও 'পাঁক' আঞ্চলিক উপন্যাস হয় নি, তবুও এই উপন্যাসের পটভূমি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্র যে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ রেখেছেন, তার ভিত্তিতেই বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় পাঁক উপন্যাসটি ঢুকে পড়ে।

'পাঁক' উপন্যাসটিতে কাহিনি অংশ খুব বেশি নেই। এখানে দেখা যায় যে, বস্তির মুচিপাড়ায় কালাচাঁদ তার বাপ-মা মরা বিধবা বোন পাঁচিকে নিয়ে বাস করে। কঠোর তাদের জীবন সংগ্রাম। খাদ্য-বস্ত্রের মর্মান্তিক অভাবের বাস্তবতাকে সঙ্গে নিয়ে

তাদের চলতে হয়। কালাচাঁদ রাজমিস্ত্রীর যোগাড়ের কাজ করে। কিন্তু কাজ করতে করতে বাবুদের বাড়ির কিছু ভেঙে ফেলায় পাওনা মজুরিটুকুও তাকে দেওয়া হয় না। এটা সে নীরবে মেনে না নিয়ে নিস্ফলা প্রতিবাদ করে। অনেকক্ষেত্রেই সে ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে উগ্র ক্রোধ প্রকাশ করেছে। তার সাহসিকতা সেই পাড়ার মেয়ে নেত্যকে মুগ্ধ করে। নেত্য হল 'সুরকী-কলের উপকী-কাটা' মজুরনী। কালাচাঁদ, পাঁচি ও নেত্য ছাড়াও এই পাড়ায় তিনকড়ি মুচি, আহ্লাদীর মা প্রমুখেরা বাস করে। তবে সবাই বস্তির পঙ্কিল পরিবেশে হাপিয়ে উঠে সেখান থেকে মুক্তি খোঁজে। কিন্তু মুক্তি তাদের ঘটে না — ব্যর্থ হয়ে সবাই সেখানেই এসে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, আর যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আর্তনাদ করে। এদের মধ্যে স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, মায়া, মমতার মত মানবিক প্রবৃত্তিগুলি অত্যন্ত প্রবল পরিমাণে থাকায়, এদের যন্ত্রণা অনেক বেশি। কালাচাঁদ ও নেত্য এর মধ্যেই রোমান্টিক ভাবালুতায় সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখে; কিন্তু জাতিভেদপ্রথার সংস্কারের জন্য তাদের প্রেম সফল হয় না। পাঁচী বাপ-মা মরা বিধবা হলেও তার মধ্যে সংস্কারবোধ ও অভিমান অত্যন্ত প্রবল। উপন্যাসে তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে করুণরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা আছে। আহ্লাদি এবং স্ট্যানলির সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসে মিশনারী জীবনের উন্নততর রূপের আভাস দেওয়া হয়েছে। তবে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে কেবল পঙ্কিল পরিবেশের চিত্রণ করেন নি, তা থেকে উত্তরণের জন্য সমাজতান্ত্রিক পথের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। উপন্যাসের শেষ অংশে বিলেত ফেরৎ অর্থনীতিবিদ্ অশান্ত কর্মকারের মাধ্যমে সেই আদর্শের বাণী ও গণ-আন্দোলনের বার্তা উচ্চারিত হয়েছে। সে ছদ্মবেশে বস্তিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে দরিদ্র মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে।

এভাবে 'পাঁক' উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক পটভূমি হিসেবে আমাদের অতি পরিচিত কোনো শহরাঞ্চল বা গ্রামীণ এলাকাকে না নিয়ে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত থেকেও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন বস্তির মুচিপাড়াকে গ্রহণ করেছেন। কালাচাঁদ, নেত্য, পাঁচী, আহ্লাদীর মা-র মত চরিত্ররা উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে তেমন সফল না হলেও সকলেই সেই বস্তির মানুষজনের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এখানে বস্তির জীবনের নগ্ন রূঢ় বাস্তবতা, ক্লেদ-গ্লানি, দারিদ্র্য, শোষিত-পীড়িত মানুষের অসহায়তার ছবিও আছে। স্থানবিশেষে বস্তি অঞ্চলে প্রচলিত ভাষারীতির প্রয়োগও আছে। এগুলি

সবই আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। তবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' কখনোই আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। বাংলা সাহিত্যের কোনো আলোচকও উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় স্থান দেন নি। অনেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবি ও গল্পকার সত্তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও ঔপন্যাসিক প্রতিভাকে প্রথম শ্রেণির প্রতিভা হিসেবে স্বীকার করতে চান নি। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও আছেন। তিনি তাঁর ছোটগল্পকার সত্তার প্রশংসা করলেও ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ ('বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা'র পঞ্চম সংস্করণ) পর্যন্ত তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার মূল্যায়নে বলেছেন — ''বড় উপন্যাস-রচনায় প্রেমেন্দ্র তাঁহার শক্তির অনুরূপ সাফল্য এখনও লাভ করিতে পারেন নাই। লেখক এখনও এ-বিষয়ে পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত আছেন মনে হয় — সাধনার দুর্গম পথ অতিক্রমের পর সিদ্ধি এখনও তাঁহার করায়ত্ত হয় নাই।''[২১] তবে এটা মনে রাখা দরকার প্রেমেন্দ্র মিত্র যখন 'পাঁক' উপন্যাসটি লেখেন, তখন বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার কেবল সূচনা হচ্ছিল — তখনও পর্যন্ত সেই অর্থে কোনো সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস লেখা হয় নি। এই উপন্যাসটিও তাঁর ২০-২২ বছর বয়সের রচনা। স্বাভাবিকভাবে তাঁর মধ্যে তারুণ্যের উচ্ছলতা তখনও কাটেনি এবং সার্থক উপন্যাস লেখার মত পরিণতিবোধ আসেনি। এমতাবস্থায় এই উপন্যাসে পটভূমি থেকে শুরু করে ঘটনা সংস্থাপন, চরিত্র চিত্রণের মত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে রূঢ় বাস্তবতার যে ছবি তিনি এঁকেছেন, তা পরবর্তীকালে রচিত নানা ঔপন্যাসিকের সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রেও দেখা যায়। তাই আঞ্চলিক উপন্যাস না হয়েও অত্যন্ত বাস্তবধর্মী উপন্যাস হওয়ার কারণে তরুণ বয়সে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় স্থান করে দেওয়া উচিত বলেই মনে হয়।

বিশ শতকের বিশের দশকে প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **'বেদে'** (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটির কথাও এই প্রসঙ্গে উঠে আসে। 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা কথাসাহিত্যকে রবীন্দ্র-ভাব-পরিমণ্ডল থেকে মুক্ত করতে যে কয়েকজন প্রয়াসী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন এই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)। 'কল্লোল যুগ' (১৯৫০ খ্রিস্টার) গ্রন্থের প্রণেতা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু অচিন্ত্যকুমারও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতই সাহিত্যে

বাস্তবতার খোঁজে আমাদের চির পরিচিত লোক সমাজের বাইরে পা বাড়িয়েছিলেন। তিনি নিজের গল্প-উপন্যাসে শহরতলি, বসতি, অজানা-অখ্যাত গ্রামীণ এলাকাকে পটভূমি করে সেসব স্থানের এতদিনের অজ্ঞাত অথচ ভীষণভাবে বাস্তবনির্ভর জীবনচিত্র অঙ্কনে অগ্রসর হয়েছিলেন। এজন্য তাঁর রচনায় অনেক সময় উদাসীন বাউন্ডুলে জীবন এবং নরনারীর যৌন জীবনধারার প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। তাঁর 'বেদে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর পাঠক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন উঠেছিল। এর পেছনে অবশ্য উপন্যাসটির উচ্ছৃঙ্খল যৌনতা প্রকাশের বিষয়টি কাজ করেছিল। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে প্রকাশিত এই উপন্যাসে অচিন্ত্যকুমার কাঞ্চন নামক এক ভবঘুরে চরিত্রের জীবন পরিক্রমার মধ্য দিয়ে মূলত প্রান্তিক যাযাবর বেদে সম্প্রদায়ের জীবনধারাকে তুলে আনার দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। কথাসাহিত্যের সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় অচিন্ত্যকুমারকে ঔপন্যাসিক হিসাবে তেমন কোনো স্বীকৃতি দিতে না চাইলেও তাঁর 'বেদে' উপন্যাসটির প্রশংসা না করে থাকতে পারেননি। যদিও তিনি উপন্যাসটিকে হামসুনের 'Hunger' উপন্যাসের প্যাটার্নে রচিত উপন্যাস বলে মন্তব্য করেছেন, তবুও এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এই উপন্যাসটি সেদিনকার তরুণদের কাছে একটি ম্যানিফেস্টোর মত হয়ে উঠেছিল — ''হামসুনের Hunger উপন্যাসের ভবঘুরে নায়কের প্যাটার্ন অনুসরণ ক'রেই অচিন্ত্যকুমার তাঁর প্রথম উপন্যাস বেদে রচনা করেন। বেদে সেদিনের আধুনিক তরুণদের কাছে একটা ম্যানিফেস্টোর মত কাজ করেছিল।''[২২] অন্য অনেকের সঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখরাও 'সেদিনের আধুনিক তরুণ' ছিলেন। সুতরাং বিষয়বস্তুর দিক থেকে না হলেও 'বেদে' উপন্যাসের পটভূমি এদের আকর্ষণ করে থাকতেই পারে। এখানে ঔপন্যাসিক অন্ত্যজ জীবনের একটি বিশেষ রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বাভাবিকভাবে এতে সমাজ বাস্তবতাও অত্যন্ত তীব্রভাবে এসেছে। এর পটভূমি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তিনি সে সময়কার বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিকতা কাটিয়ে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। এজন্য আঞ্চলিক উপন্যাস না হলেও বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার সূচনালগ্নে রচিত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এই 'বেদে' উপন্যাসটি সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার।

এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'কল্লোল' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষে। তবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। এটি অচিন্ত্যকুমারের প্রথম মৌলিক উপন্যাস। এর নায়ক পচা ওরফে কাঁচা ওরফে কাঞ্চন। তার কোনো সঠিক পরিচয় নেই — সে কোথা থেকে এসেছে, তার মা-বাবাই বা কে, সে কোথায় যাবে এসবের কিছুই উপন্যাসে স্পষ্ট নয়। জোয়ারের জলে সে ভাসতে ভাসতে আসে, মনে হয় সে যেন স্রোতের শ্যাওলা। তার যাযাবর জীবনের কোনো স্থির আদর্শ নেই, তেমন কোনো লক্ষ্যও নেই। চলার পথের পরিবর্তমান ঘটনা ও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনের মূল্যবোধও পরিবর্তিত হয়। তবে সব সময় এক অস্থির যৌবনের ফেনিল উন্মত্ততা তার মধ্যে কাজ করেছে — বিদেহী প্রেমের চেয়ে দেহের ক্ষুধাই তার কাছে অধিকতর প্রত্যক্ষ বলে মনে হয়েছে। সে ভবঘুরে জীবনের প্রথম কৈশোর থেকে পূর্ণ যৌবনকালের মধ্যে ছ'টি নারীর সংস্পর্শে এসেছে। এই নারীরা হল আহ্লাদি, আসমানী, বাতাসী, মুক্তা, বনজোৎস্না ও মৈত্রেয়ী। প্রাণধর্মের অমোঘ আকর্ষণে এদের সঙ্গে কাঞ্চনের পরিচয় ঘটলেও কোথাও তার এই আকর্ষণ একনিষ্ঠ প্রেমের রূপ নিতে পারে নি। এজন্য এই নারীদের সঙ্গে কাঞ্চনের সম্পর্ক শুধু শারীরিক থেকে গেছে — কখনো নেহাৎ শরীরকে অতিক্রম করে কিশোর জীবনের প্রেমের একনিষ্ঠতার স্নিগ্ধ সৌরভ ও স্বপ্নের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি। কাঞ্চন পাপ-পুণ্য সম্পর্কে উদাসীন, নীতির কোনো অনুশাসন সে মানতে শেখেনি। স্রোতের শ্যাওলার মত সে ভেসে বেড়িয়েছে। এতেই যেন তার সুখ। তার জীবনে কোনো মূল, কোনো বন্ধন না থাকায় তার ভালোবাসা পথিকের সঙ্গে পথিকের ক্ষণকালের পরিচয়ের মত নিতান্তই পথের পরিচয়ের মত উন্মূলিত হয়েছে। এই ভালোবাসা শিকড়হীন প্রান্তিক মানুষের ভালোবাসা যা মূল জনসমাজের মানুষেরা ভাবতেও পারে না। এই জীবনও প্রান্তিক জীবন। আঞ্চলিক উপন্যাসে এই রকম মূল জনসমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষ এবং তাদের তথাকথিত প্রান্তিক জীবনকেই তুলে আনা হয়।

এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কাঞ্চনের এই জীবন পরিক্রমার পাশাপাশি তার পথের সঙ্গী হিসেবে অন্ত্যজ ভবঘুরে সহায়-সম্বলহীন নানান দুঃখী-দরিদ্র-হতভাগ্য মানুষকেও নিয়ে এসেছেন। তারা বিশেষভাবেই কলকাতা শহরের বাসিন্দা। তবে শহর কলকাতার তথাকথিত ভদ্র মানুষজন এদের দিকে ঘুরেও তাকান না। শহরের নিকৃষ্ট

স্তরের মেস বা আস্তাকুঁড়ের মত বস্তিতে বাস-করা এই মানুষগুলি নিদারুণ দারিদ্রের চাপে নিষ্পিষ্ট। বিকাশ, বিনোদ, সৌম্য, বনজোৎস্না প্রমুখ হল এইসব মানুষ। এরাও নিজেদের জীবনকে নিয়ে নানা স্বপ্ন দেখে। কিন্তু নগর জীবনের যান্ত্রিক নিষ্ঠুর চাকার তলায় পিষ্ঠ হয়ে তাদের যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন ঝরে, ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ভবঘুরে কাঞ্চন এদের দুঃখ-দারিদ্রের সেই চরম রূপ প্রত্যক্ষ করেছে। আঞ্চলিক উপন্যাসে ঠিক এই জিনিসটাই দেখা যায়। এই ধরনের উপন্যাসে মূল জনসমাজ বিচ্ছিন্ন একটি বিশেষ অঞ্চলের দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের অঞ্চলটি নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে, তবে শেষপর্যন্ত তাদের কোনো স্বপ্নই পূরণ হয় না; সভ্যসমাজের লোভ-লালসার কাছে তাদের সমস্ত স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এমনকি এরা নিজেদের অঞ্চলটির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিও রক্ষা করতে পারে না।

অবশ্য অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাস নয়; এমনকি আঞ্চলিকতার লক্ষণ সম্পন্ন উপন্যাসও নয়। এই উপন্যাসটি যে সময়ে লেখা হয়েছে, তখন বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস লেখার ধারা শুরু হয় নি। তখনও পর্যন্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় কোনো বিশিষ্ট অঞ্চলকে পটভূমি করে কয়েকটি ছোটগল্প রচিত হয়েছিল মাত্র। প্রথম সার্থক বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস বা আঞ্চলিকতার লক্ষণধর্মী উপন্যাস লেখা হয়েছিল এর অনেক পরে — ত্রিশের দশকের শেষাংশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের হাত ধরে। সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস লেখার মতো প্রতিভা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মধ্যে ছিল না বলে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন। তিনি তাঁকে প্রধানত কবি ও গল্পকার বলে মত দিয়ে জানিয়েছেন যে, তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাস শিথিল-গ্রন্থিত এবং ভাবাবেগ ও কাব্যিকতার দ্বারা আক্রান্ত। তিনি যে ভাষাশিল্পী, উপন্যাসে এটা বিজ্ঞাপিত করতেই তাঁর উৎসাহ বেশি — ''অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রধানত কবি এবং গল্পকার। শেষের দিকে তিনি বেশ কয়েকটি ছোটগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। তার মধ্যে বাঙালি সমাজের নিচুতলার অনেক জীবন্ত ছবি আমরা পেয়েছি। কিন্তু তাঁর উপন্যাস অধিকাংশই শিথিল-গ্রন্থিত এবং ভাবাবেগ ও কাব্যিকতার দ্বারা আক্রান্ত। তিনি যে ভাষাশিল্পী এই তথ্যটা তিনি উপন্যাসে এমনভাবে বিজ্ঞাপিত করতে উৎসুক যে,

পাঠকের দৃষ্টি অনেক সময় সেই দিকেই আটকে যায়।''[২৩] অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'বেদে' উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে তেমন সম্মানের আসন দিতে চান নি। যাই হোক, 'বেদে' আঞ্চলিক উপন্যাস বা আঞ্চলিকতার লক্ষণধর্মী উপন্যাস না হলেও এই উপন্যাসের কাহিনি পরিকল্পনা, পটভূমি গ্রহণ, চরিত্র চিত্রণ, বাস্তবতার মত বিষয়গুলিতে ঔপন্যাসিক যে বলিষ্ঠতার ছাপ রেখেছেন, তা পরবর্তীকালের অনেক আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রণেতাদের প্রভাবিত করেছিল। এখানেই বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার আলোচনায় 'বেদে' উপন্যাসটির গুরুত্ব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮–১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ)–এর উপন্যাসগুলির মধ্যে **'পদ্মানদীর মাঝি'** উপন্যাসটি যে সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস সেকথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ড. সুকুমার সেনও স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি 'পদ্মানদীর মাঝি'কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে না করলেও এই উপন্যাসটিকে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস এবং ভালো লেখা বলে মত দিয়েছেন — ''মানিকবাবুর সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' ভালো লেখা তবে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা নয়।''[২৪] অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'পদ্মানদীর মাঝি'র জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন — ''পদ্মানদীর মাঝি' বোধ হয় তাঁহার রচিত উপন্যাসাবলীর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।''[২৫] উপন্যাসটির এই জনপ্রিয়তার পেছনে প্রথম দু'টি কারণ হিসেবে তিনি 'পদ্মানদীর মাঝি'র বিষয়ের অভিনবত্ব অর্থাৎ পদ্মানদীর মাঝিদের দুঃসাহসিক ও কিছুটা অসাধারণ জীবনযাত্রার আকর্ষণী শক্তি এবং পূর্ববঙ্গের সরস ও কৃত্রিমতা বর্জিত কথ্যভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগের কথা বলেছেন। তবে এই উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন — ''ইহার সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণী–অধ্যুষিত গ্রাম্যজীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতিবোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমানির্দেশ। এই ধীবর–পল্লীর জীবনযাত্রায় শিক্ষিত আভিজাত্যের মার্জিত রুচি ও উচ্চ আদর্শবাদের ছায়াপাত হয় নাই।''[২৬] বলা বাহুল্য, যে কোনো আঞ্চলিক উপন্যাস এই লক্ষণগুলিকে নিয়েই গড়ে ওঠে। এগুলি ছাড়াও 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে আরও

কিছু আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। উপন্যাসটির জনপ্রিয় হয়ে ওঠার কারণ হিসেবে এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী থেকে জানা যায় যে, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি রচনার কিছুদিন আগে তিনি তাঁর দাদা হিমাংশুবাবুর বিয়ের পাত্রী খোঁজার জন্যে পরিবারের অনেকের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। সেখানে পাত্রী খুঁজে বিয়ের কাজ সমাধা করতে তাঁদের মাস খানেকের বেশি সময় কেটে যায়। এই দীর্ঘ সময়কালে তিনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। হিমাংশুবাবুর বিয়ের পর পরিবারের অন্যরা সবাই ফিরে এলেও দিন পনেরোর মত তিনি পূর্ববঙ্গে থেকে যান। এই সময়টায় মাঝে মাঝেই তিনি পদ্মা তীরবর্তী অঞ্চলের জেলে-মাঝিদের বসতিতে গিয়ে হাজির হয়ে তাদের সঙ্গে সময় কাটাতেন, তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা-খাওয়া-পরা সমস্ত কিছুই করতেন। ফলে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন পদ্মা তীরবর্তী এই সমস্ত অঞ্চল এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষজনের দৈনন্দিনকার জীবন পরিক্রমা সম্পর্কে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন হয়। এরপর কলকাতা ফিরে এসে সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই তিনি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি রচনা করেন। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এটি ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা সাহিত্যের বাস্তববাদী কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর আগে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ নিজেদের গল্প-উপন্যাসে মূল ধারার বাইরে গিয়ে আঞ্চলিক জীবনকে তুলে ধরে সাহিত্যচর্চা শুরু করে বাংলা কথাসাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য আনার চেষ্টা করলেও পুরোপুরি সফল হতে পারেন নি। তবে এদিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক বেশি সফল ও ভাগ্যবান বলা যায়। তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস থেকেই বাংলা উপন্যাসে যথার্থ আঞ্চলিকতার আবাহন ঘটে। মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানাদিক থেকে স্বতন্ত্র একটি বিশিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষের জীবন পরিক্রমাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই উপন্যাসে তিনি অনেকটাই সফল হয়েছেন।

পূর্ববঙ্গের পদ্মা-তীরবর্তী কেতুপুর নামক একটি গ্রামকে পটভূমি করে এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। এই গ্রামের জেলেপাড়ার বাসিন্দা হল কুবের। সে-ই

উপন্যাসের নায়ক। উপন্যাসটিতে তার জীবন পরিক্রমাকে তুলে ধরা হয়েছে। সে জেলেপাড়ার সমস্ত জেলে-মাঝিদের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই কুবের হল দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম। বর্ষাকালে দু'-তিন আনা ভাগে অন্যের নৌকা ও জালের সাহায্যে পদ্মার বুকে ইলিশ মাছ ধরে তার জীবন চলে। বছরের অন্য সময় তাকে সেই অঞ্চলের কারও পুকুর-ডোবা জমা নিয়ে সেখানে মাছ ধরে অথবা অপরের নৌকায় মাঝিগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। ঘরে তার শারীরিকভাবে পঙ্গু স্ত্রী মালা আছে, যার সন্তান জন্ম দেওয়া ছাড়া তেমন কোনো কাজ নেই। একটি নবজাত শিশু ছাড়াও এই উপন্যাসে কুবের-মালার তিনটি সন্তানের উল্লেখ আছে — মেয়ে গোপি এবং ছেলে লখা ও চন্ডী। গ্রামের জমিদার বংশের মেজোবাবু অনন্ত তালুকদার নানাভাবে জেলেদের উন্নয়নের চেষ্টায় নামলেও জেলেপাড়ার মেয়েদের নামে কলঙ্ক দেওয়ার বাইরে কিছু করে উঠতে পারে না। এই গ্রামেই দেবদূতের মত আবির্ভাব ঘটে হোসেন মিয়ার, যে কারণে-অকারণে জেলেপাড়ার দরিদ্র মানুষগুলির সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। তাকে দরিদ্র জেলে-মাঝিরা ভয় করে এবং তার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করতে চায়। তবে কেউ-ই হোসেনের অনিবার্য আকর্ষণ থেকে দূরে থাকতে পারে না। সে বহুদূরে সমুদ্রের মাঝে জেগে ওঠা জঙ্গলাকীর্ণ একটি দ্বীপ নীলামে কিনে নিয়ে তার নাম রেখেছে ময়নাদ্বীপ। জনমানবহীন এই দ্বীপকে মনুষ্য বাসের উপযোগী করে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরিয়ে তোলাই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই ময়নাদ্বীপে সে আদিম শ্রমনির্ভর এক শোষণহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে। এজন্য সংসার জীবনে পরাস্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া অথচ সন্তান উৎপাদনে সক্ষম মানুষদের সেখানে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করতে তার উৎসাহের সীমা নেই। এই উপন্যাসে জেলে-মাঝিদের প্রতিনিধি তথা নায়ক কুবেরকে ময়নাদ্বীপে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করার পরিকল্পনাও সে করে। এদিকে কুবের ঘরে স্ত্রী মালা থাকলেও শ্যালিকা কপিলার প্রতি এক রহস্যময় সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কপিলার একটার পর একটা আচরণ তাদের এই সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা আনে। শেষপর্যন্ত কুবেরের জেলে-মাঝি সত্তা ছেড়ে কপিলার হাত ধরে ময়নাদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে।

এই উপন্যাসের কাহিনি অংশটি অনেকটাই আঞ্চলিকতার বাতাবরণে পরিবেশিত হয়েছে। তবে উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায় কী না, তা

নিয়ে বাংলা সাহিত্যের সমালোচকরা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন। একদল একে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে চান, আবার অপর একদল একে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে মানতে না চেয়ে ব্যক্তিজীবনের রোমান্টিক আখ্যান বলে অভিহিত করতে চান। তবে উপন্যাসটির আলোচনাকালে সমস্ত সমালোচক একে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে না চাইলেও এখানে নানা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। এটাও ঠিক যে, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি পাঠকালে এর মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলি যে কোন সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাই 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার স্বরূপ নির্ণয় করতে গেলে প্রথমে উপন্যাসটির সেই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে বের করা দরকার।

এই উপন্যাসটির মূল পটভূমি হল পদ্মা তীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের জেলেপাড়া। উপন্যাসের বেশির ভাগ ঘটনা ঘটেছে হয় কেতুপুর গ্রামে অথবা বহমান পদ্মার বুকের উপর। এছাড়াও সোনাখালি, দেবীগঞ্জ, চরডাঙা, আকুরটাকুর, আমিনবাড়ি এবং ময়নাদ্বীপে কিছু ঘটনা ঘটেছে। এই অঞ্চলগুলির সঠিক অবস্থানের উল্লেখ উপন্যাসে না থাকলেও এটা ঠিক যে, এগুলি পূর্ববঙ্গে অবস্থিত নানা স্থান। এগুলির মধ্যে আকুরটাকুর এবং ময়নাদ্বীপ বাদে সবগুলিই পদ্মাতীরে অবস্থিত। উপন্যাসে এই স্থানগুলি এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, এগুলি মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হলেও সেখান থেকে পৃথক একটি অঞ্চল বলেই মনে হয়। এই অঞ্চলটিতে নানা ধরনের মানুষ বসবাস করলেও উপন্যাসে মূলত জীবন ও জীবিকার বিষয়ে পদ্মার উপর নির্ভরশীল জেলে-মাঝিদের জীবন পরিক্রমার দিকেই নজর দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসটি শুরুও হয়েছে বর্ষার ভরা পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার বিবরণের মধ্য দিয়ে —

''বর্ষার মাঝামাঝি।

পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরশুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোন সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকার আলো ওগুলি। সমস্তরাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য

সংকেতের মতো সঞ্চালিত হয়। একসময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে গ্রামে রেলস্টেশনে ও জাহাজঘাটে শ্রান্ত মানুষ চোখ বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। শেষ রাত্রে ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে। জেলে নৌকার আলোগুলি তখনও নেভে না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মতো দেখায়।''[২৭]

পদ্মার বুকে মাছ ধরার প্রসঙ্গেই নায়ক কুবেরের আবির্ভাব ঘটেছে। সে উপন্যাসে বর্ণিত অঞ্চলটির অর্থাৎ জেলেপাড়ার পদ্মার উপর নির্ভরশীল মানুষগুলির প্রতিনিধি। এখানে তার জীবন পরিক্রমাকেই তুলে ধরা হয়েছে। কুবেরের জীবন পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির সমগ্র আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও প্রতিফলিত হয়েছে।

কুবের জাতিতে জেলে হলেও তার নিজের জাল বা নৌকা কিছুই নেই। বর্ষার পদ্মায় অন্যের জাল ও নৌকায় দু'-তিন আনা ভাগে সে মাছ ধরে এবং বছরের অন্য সময় কারও পুকুর বা খাল জমা-বিলি নিয়ে অথবা অপরের নৌকায় মাঝিগিরি করে তাকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তার উপার্জনের বেশির ভাগটাই হয় বর্ষায় ইলিশের মরশুমে। এজন্য জ্বর গায়ে স্ত্রীর নিষেধ অমান্য করেও সারারাত জলে ভিজে ভিজে তাকে মাছ ধরতে হয়। এত কষ্ট করে মাছ ধরার পরেও তাকে জাল ও নৌকার মালিকের কাছে তো বটেই, আড়তদার, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি থেকে শুরু করে অনেকের কাছেই ঠকতে হয়। ফলে তাকে দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়। এটা শুধু কুবেরের জীবন পরিক্রমার ছবি নয়, এ যেন জেলে পাড়ার পদ্মার উপর জীবন-জীবিকার ব্যাপারে নির্ভরশীল সমস্ত মানুষের জীবন পরিক্রমার ছবি। ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে এই জেলেদের পাড়াটিও মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন — ''পুবদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাহাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই

এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে। তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পারে না। একটি কুঁড়ের আনাচেকানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তারই ফলে জেলেপাড়াটি হইয়া উঠিয়াছে জমজমাট।''[২৮]

দারিদ্র্য জেলেপাড়ার মানুষের অনিবার্য নিয়তি। এদের বাড়ির পরিবেশ, সাজসজ্জা, আসবাবপত্র প্রভৃতি সবকিছুর মধ্যে দারিদ্র্যের ছাপ প্রকাশ পায়। সদ্য সন্তান জন্ম দেওয়া নারীদের জন্যেও এরা ঠিকমত থাকার ব্যবস্থা করতে পারে না। কুবেরের বাড়ির সর্বত্র এই দারিদ্র্যের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় — ''কুবের ওদিকের দাওয়াবিহীন ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িল। বাহিরে বর্ষার আকাশে কড়া রোদ উঠিলেও জানালা দরজার বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় এ ঘরের ভিতরটা একটু অন্ধকার। কোণার দিকে রক্ষিত জিনিসগুলি চিনিতে হইলে ঠাহর করিয়া দেখিতে হয়। ঘরের একদিকে মাটিতে পোঁতা মোটা বাঁশের পায়ায় চৌকি সমান উঁচু বাঁশের বাতা বিছানো মাচা। মাচার অর্ধেকটা জুড়িয়া ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। তৈলচিক্কণ কালো বালিশটি মাথায় দিয়া কুবেরের পিসি এই বিছানায় শয়ন করে। মাচার বাকি অংশটা হাঁড়িকলসিতে পরিপূর্ণ। নানা আকারের এতগুলি হাঁড়িকলসি কুবেরের জীবনে সঞ্চিত হয় নাই, তিন পুরুষ ধরিয়া জমিয়াছে। মাচার নীচেটা পুরাতন জীর্ণ তক্তায় বোঝাই।''[২৯] উপন্যাসের অনেক জায়গায় কুবেরের এই অপরিসীম দারিদ্র্যের বিবরণ আছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে — ''ঘটিটা তুলিয়া লইয়া ঘরের সামনে সংকীর্ণ দাওয়ায় উবু হইয়া বসিয়া কুবের উঠানে কুলকুচা করিল। গণেশের মতো ঘটি উঁচু করিয়া আলগোছে জল খাইয়া কলিকায় তামাক সাজিতে বসিল। পিসি দাওয়ার একপাশে ইলিশ মাছের তেলে ইলিশ মাছ ভাজিতেছে। অন্য পাশে মালার আঁতুড়। নিচু দাওয়ায় মাটি জল শুষিয়া শুষিয়া ওখানটা বাসের অযোগ্য করিয়া দিয়াছে, তবু ওইখানেই ভিজা স্যাঁতসেঁতে বিছানায় নবজাত শিশুকে লইয়া মালা দিবারাত্রি যাপন করিবে।''[৩০] শুধু কুবের একাই এমন দরিদ্র নয়, জেলেপাড়ার প্রায় সবাই এরূপ দারিদ্র্যের শিকার। তাই দেখা যায় যে, জেলেপাড়ার সিধু সস্তায় একটা পাঁঠার মাথা কিনে আনলে রান্নার অন্যান্য উপকরণের জন্য তাকে কুবেরের দ্বারস্থ হতে হয়। সে

কুবেরকে পাঁঠার মাথাটি দেখিয়ে বলেছে — ''শ্যাষ বেলায় সস্তা কিনলাম কুবির। পুরা পাঁচ আনা চাইয়া শ্যাষ ম্যাশ চোদ্দ পয়হায় দিল। মাইয়াটারে ব্যানুন রাঁইধবার কইলাম, তা কয়, ত্যাল মরিচ নাই, চালও নাকি বাড়ছে।''[৩১]

অবশ্য এত দারিদ্র্যের মধ্যেও জেলেপাড়ায় পরনিন্দা-পরচর্চার অভাব ঘটে না। এই কাজে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী হল নকুল। কালো গায়ের রঙযুক্ত কুবেরের ফর্সা পুত্র সন্তান জন্মালে নবজাতকের গায়ের রঙের কারণে কুবেরের স্ত্রী মালাকে নিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করতে সে দ্বিধা করে নি — ''তুই তো দেখি কালাকুষ্ঠি কুবির, গোরাচাঁদ আইল কোয়ান থেইকা? ঘরে তো থাকস না রাইতে, কিছু কওন যায় না বাপু।''[৩২] পীতমের বাড়িতে গিয়ে পীতমের মেয়ে যুগী ও জমিদারের মহুরি শীতলবাবুকে জড়িয়ে সে পীতমকে বাজে ঈঙ্গিত করেছে। তাই ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''কে জানে, কী আশ্চর্য ইহাদের উপভোগ্য রসিকতা। যুগী পীতম মাঝির মেয়ে, সম্প্রতি জেলেপাড়ারই একধারে একখানা ঘর বাঁধিয়া মেজোকর্তার মুহুরি শীতল ঘোষের সঙ্গে বাস করিতেছে। এত লোকের মাঝে পীতমের সামনেই তাহার মেয়ের সম্বন্ধে নকুল অনায়াসে রসিকতা করে, সকলে হাসাহাসি করিয়া তাহা উপভোগও করে বিনা বাধায় ও বিনা দ্বিধায়।''[৩৩] তাই মনে হয় যে, জেলেপাড়ায় এ ঘটনা যেন স্বাভাবিক — কাল পরম্পরায় তা চলতেই থাকে।

এই উপন্যাসের চরিত্ররা বেশির ভাগ উপন্যাসে বর্ণিত জেলেপাড়াটির প্রতিনিধিত্ব করেছে। জেলেপাড়ার পুরুষদের দিনের অধিকাংশ সময় পদ্মার উপর কাটে। এদের মধ্যে কেউ পদ্মার বুকে মাছ ধরে, কেউ পদ্মার উপর নৌকা চালিয়ে মাঝিগিরি করে। যারা মাছ ধরে তারা বছরের পুরোটা পদ্মার উপর নির্ভরশীল না থাকলেও সারাটা বছর এদের জল, জাল, ডিঙি প্রভৃতি নিয়েই কাটে। এক্ষেত্রে এরা পদ্মা সংলগ্ন কোন খাল, ডোবা বা কারও পুকুরের উপর নির্ভর করে — ''পদ্মা ও পদ্মার খালগুলি ইহাদের অধিকাংশের উপজীবিকা। কেহ মাছ ধরে, কেহ মাঝিগিরি করে। কুবেরের মতো কেহ জাল ফেলিয়া বেড়ায় খাস পদ্মার বুকে, কুঁড়োজাল লইয়া কেহ খালে দিন কাটায়। নৌকার যাহারা মাঝি, যাত্রী লইয়া মাল বোঝাই দিয়া পদ্মায় তাহারা সুদীর্ঘ পাড়ি জমায়, এ গাঁয়ের মানুষকে ও গাঁয়ে পৌঁছাইয়া দেয়।''[৩৪]

জেলেপাড়ার সমাজ মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হলেও মেয়েরাও সংসার চালানোর কাজে আত্মনিয়োগ করে। তাদের সম্পর্কে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ''ছেলের বয়স আট-দশ বছর পার হইয়া গেলে তার সম্বন্ধে চিন্তা করা জেলেপাড়ার মেয়েদের রীতি নয়। চিন্তা করিবার অপরাপর বিষয়ের তাদের অভাব নাই। কচি ছেলে ছাড়া মায়ের কোল খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। নিষ্ঠুর ছাড়া স্বামী বড়ো একটা হয় না। দুটি কুঁড়েঘরের কুটিরে যে সংকীর্ণ সংসার, তারও কাজ থাকে অফুরন্ত। পুরুষেরা মাছ ধরিয়া আনে, পাইকারি কেনাবেচা করে, চুপড়ি মাথায় করিয়া বাড়ি বাড়ি মাছ যোগান দেওয়া তাদের কাজ নয়। ও কাজটা জেলেপাড়ার মেয়েরা সন্তান প্রসবের আগে-পিছে দু-একটা মাস ছাড়া বছর ভরিয়া করিয়া যায়। অপোগণ্ড শিশু ছাড়া আর কোন সন্তানের ছোট ছোট বিপদ-আপদের কথা ভাবিবারও যেমন তাহাদের সময় নাই, ওদের স্নেহ করিবার মত মানসিক কোমলতাও নাই। নবজাত সন্তানকে তাহারা যেমন পাশবিক তীব্রতার সঙ্গে মমতা করে, বয়স্ক সন্তানের জন্য তাহাদের তেমনি আসে অসভ্য উদাসীনতা। ছেলে মরিয়া গেলেও শোক তাহারা করে না, শুধু সুর করিয়া মড়াকান্না কাঁদে।''[৩৫] তবে পুরুষেরা মেয়েদের সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রের বাইরে কিছু ভাবতে পারে না। একটুতেই জেলে রমণীদের কপালে তাচ্ছিল্য, উদাসীনতা, অপমান, ধমক, মারধোরের মত বিষয়গুলি জোটে। উপন্যাসের নানা স্থানে মালা-কুবেরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর বিবরণ আছে। আপন মেয়ে গোপির বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়েও স্ত্রী মালার সঙ্গে আলোচনায় কুবেরের অনীহা কাজ করে — ''তা শুইনা তর কাম কী? মাইয়ালোক চুপ মাইরা থাক। পোলা বিয়ানের লাইগা পিরথিমিতে আইছস, বিয়া পোলা যত পারস — রাও করস কে রে?''[৩৬] জেলে রমণীরা নিজেদের অঞ্চলে স্বচ্ছন্দ থাকলেও বাইরের জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। এজন্য হোসেন মিয়া কলকাতা গেছে শুনে মালার এক পয়সার সূচ আনানোর কথা মনে পড়ে — ''মালা আপশোশ করিয়া বলিল, কবে গেল? আগে নি একবার কইলা! এক পয়হার সুই আইনবার কইতাম—কইলকাতায় পয়হায় দশখান পাওন যায়।''[৩৭] বাইরের জগৎ সম্পর্কে এই অজ্ঞতা শুধু মেয়েদেরই নয়, জেলেপাড়ার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে গোপিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটির উল্লেখ করতে হয়

— ''একটা চওড়া কাঠের তক্তায় শোয়াইয়া ধরাধরি করিয়া গোপিকে নদীতীরে লইয়া যাওয়া হইল। কাঁথা বালিশ হাতে করিয়া কপিলা গেল সঙ্গে। ইতিমধ্যে জেলেপাড়ায় খবর রটিয়া গিয়াছিল। গ্রামের একটি মেয়েকে হাসপাতালে নেওয়া প্রতিমা বিসর্জনের চেয়ে কম গুরুতর ব্যাপার নয় জেলেপাড়াবাসীদের কাছে — এই ভোরে নদীতীরে একটি ছোটোখাটো ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে কুবের একেবারে হয়রান।''[৩৮] অবশ্য জেলেপাড়ার মেয়েরা সবাই একরকম নয়, এর ব্যতিক্রমও আছে। এই উপন্যাসে এইরকম ব্যতিক্রমী মহিলা হল — যুগী ও কপিলা। এরমধ্যে পীতমের মেয়ে যুগী জেলেপাড়ার সমাজকে তোয়াক্কা না করে স্বেচ্ছায় জমিদারের মহুরি শীতলবাবুর রক্ষিতা হয়েছে, আর কপিলা পুরুষতন্ত্রের বেঁধে দেওয়া বন্ধনে আটকে না থেকে নিজেই নিজেকে চালনা করেছে।

কুবেরের ছেলেদের বিবরণের মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসে জেলেপাড়ার শিশু-কিশোরদের জীবন পরিক্রমার ছবিও প্রকাশ পেয়েছে — ''লখা ও চন্ডী হয় ডাংগুলি খেলিতে গিয়াছে, আর না হয় কোথাও বঁড়শি ফেলিয়া ধরিতেছে পুঁটিমাছ। যেখানেই ওরা থাক আর যাই করুক, জলে ভিজিয়া জ্বরে পড়িবে না, জলে ডুবিয়া মরিবেও না। সে ভয় মালার নাই। সে কেবল ভাবিয়া মরে, মারামারি করিয়া ছেলে দুটা কোনোদিন না খুন হইয়া আসে।''[৩৯] এভাবেই জেলেপাড়ার মানুষদের জীবন অতিবাহিত হয়। মেজোকর্তা অনন্তবাবু এবং হোসেন মিয়া — এরা দু'জন জেলেপাড়ার বাইরে থেকে এসে এই উপন্যাসে জেলেদের ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে। এরমধ্যে সর্বদা জেলেদের সঙ্গে থেকে, তাদের বৃত্তি গ্রহণ করে হোসেন জেলেদের একজন হয়ে উঠলেও মেজোকর্তা অনন্তবাবুর সঙ্গে তাদের দূরত্ব থেকেই গেছে — ''জেলে পাড়ার ঘরে ঘরে একদিন মেজোবাবুর যাতায়াত ছিল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতির জ্ঞান বিতরণ করিয়া মাঝিদের জীবনগুলি উন্নততর করিবার ঝোঁকে তিনি আভিজাত্য ভুলিয়াছিলেন। শিক্ষা মাঝিরা পায় নাই, মাঝিদের বউ-ঝিরা শুধু পাইয়াছিল দুর্নাম, গ্রামে গ্রামে খবর রটিয়াছিল যে কেতুপুরের মেজোকর্তা জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে রমণী চাখিয়া বেড়াইতেছেন — জেলেপাড়া মেজোবাবুর প্রণয়িনীর উপনিবেশ! আজ আর জেলেপাড়ার দিকে যাওয়ার সময় মেজোবাবু পান না। মাঝিদের কারও সঙ্গে দেখা

হইলে খবর জিজ্ঞাসা করেন। সকালে দুপুরে জেলে পাড়ার ভাঙা কুটিরে গিয়া সময় যাপন করিবার সময়েও যে দুস্তর ব্যবধান মাঝিদের সঙ্গে মেজোবাবুর থাকিয়া গিয়াছিল, কোনও মন্ত্রে তাহা ঘুচিবার নয়। মাঝিরা বিব্রত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ভালো করিবার খেয়ালে বড়লোক কবে গরিবের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছে? মেজোবাবু তো হোসেন মিয়া নয়। দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অন্তহীন সরলতার সঙ্গে নিচু স্তরের চালাকি, অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্গে একান্ত নির্ভর, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অধর্মকে অনায়াসে সহিয়া চলা — এসব যাদের জীবনে একাকার হইয়া আছে, পদ্মার বুকে নৌকা ভাসাইয়া যারা ভাবুক কবি, ডাঙায় যারা গরিব ছোটলোক, মেজোবাবু কেন তাদের পাত্তা পাইবেন? ও কাজ হোসেন মিয়ার মত মানুষের পক্ষে সম্ভব, মেজোবাবুর চেয়ে বেশি টাকা উপার্জন করিয়াও যার মাঝিত্ব খসিয়া যায় নাই।''[৪০]

এই উপন্যাসে গৃহীত জেলেপাড়াটির মানুষজনের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ জনিত লোকাচার-লোকবিশ্বাসের বর্ণনাসহ সেখানে ঘটে যাওয়া নানা উৎসব-অনুষ্ঠান এবং অঞ্চলটির সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত কিছু লোককথার বিবরণও আছে। কেতুপুরের জেলেপাড়ায় নবজাতককে সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। কোনো বাড়িতে নবজাতকের আবির্ভাব ঘটলে আনন্দ-উৎসবের পরিবর্তে সেই বাড়ির জেলেরা ভাবে তাদের পরিবারে খাওয়ার জন্য একজন লোক বাড়ল — ''জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ন। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশি মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লিতে। এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।''[৪১] জেলেপাড়ায় মানুষের মৃত্যু হয় প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে অথবা পদ্মার বুকে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে। মানুষের মৃত্যু ঘটলেও তারা এ সম্পর্কে খুব বেশি হা-হুতাশ করে না, অনিবার্য নিয়তি বলেই মেনে নেয়। এই উপন্যাসে মৃত্যু সংক্রান্ত লোকাচারের বিবরণ তেমনভাবে নেই। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের মধ্যে জেলেদের কাছে বিবাহ একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এনিয়ে যোগ্য পাত্রদের মধ্যে রীতিমত লড়াই-বিবাদ বেঁধে যায়। মেয়ের বাবারাও পাত্রের সচ্ছলতা দেখার পাশাপাশি রীতিমত মোটা অঙ্কের পণ আদায়ের হিসেব করে। কুবেরের মেয়ে

গোপির বিয়ের ক্ষেত্রেও এই জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। মেয়ে গোপির জন্য জামাই হিসেবে গণেশের শালা যুগলকে কুবেরের মনে ধরে। গণেশ তার সমস্ত কাজের সঙ্গী হলেও কুবের যুগলের থেকে মোটা অঙ্কের পণ নেওয়ার ফন্দি করে — ''গোপির বয়স এগারো, কুবের মেয়ের বয়স এক বছর ভাঁড়ায় আর এক বছর হাতে রাখিয়া বলে, নয়। ন বছর বয়সে যে মেয়ের এগারো বছরের বাড়, বিয়ের বাজারে তার দাম আছে। গণেশের শালা যুগল সম্প্রতি পাশের গ্রাম হইতে বোনের তত্ত্ব লইবার ছলে আসা-যাওয়া শুরু করিয়াছে। সোজাসুজি কথা সে এখনও পাড়ে নাই, আলাপ আলোচনার মাঝখানে বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন করিয়া কুবের কী রকম দর হাঁকিবে জানিবার চেষ্টা করিয়াছে। স্পষ্ট করিয়া কুবেরও এখন পর্যন্ত কিছু বলে নাই। কথা উঠিলে বহুক্ষণ ধরিয়া মেয়ের প্রশংসা কীর্তন করিয়া শুধু একটু আভাস দিয়াছে দুকুড়ি তিনকুড়ি টাকার। বুদ্ধি থাকে যুগল আন্দাজ করিয়া নিক। গণেশের আত্মীয় বলিয়া টাকার বিষয়ে কুবের তাহাকে খাতির করিবে না। যুগল সম্ভবত তাহা টের পাইয়াছে, তাই ইলিশ মাছের মরশুমটা শেষ হইবার প্রতীক্ষায় আছে। হাতে তখন কী রকম টাকা জমে দেখিয়া কথা পাড়িবে। কুবের বোঝে না কী! সকলের গোপন মতলব সে চোখের পলকে আঁচ করিয়া ফেলে।''[৪২] শেষপর্যন্ত, ঝড়ে গোপির পা ভাঙায় যুগল গোপিকে বিয়ে না করলে ময়নাদ্বীপ ফেরৎ সর্বহারা রাসু তাকে বিয়ে করার জন্য তৎপর হয়। কুবের তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা দিলেও বেশি পণ নিয়ে হোসেন মিয়ার মনোনীত পাত্রের সঙ্গে গোপির বিয়ে দেয়। এনিয়ে রাসুর সঙ্গে কুবেরের শত্রুতার জন্ম হয়। সম্ভবত এর ফলশ্রুতিতেই উপন্যাসের শেষে রাসুর মামা পীতমের চুরি যাওয়া টাকার ঘটি কুবেরের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় এবং পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য কুবেরকে গ্রাম ত্যাগ করে কপিলার হাত ধরে ময়নাদ্বীপের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে হয়।

এই উপন্যাসে জেলেপাড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত তিনটি উৎসবের বর্ণনা আছে — রথযাত্রা, দুর্গাপূজা এবং দোল। রথের মেলায় জেলেপাড়ায় ভালোই ধুম পড়ে। কেতুপুরের অপর পারে পদ্মা তীরবর্তী সোনাখালিতে রথের দিন থেকে উল্টোরথ পর্যন্ত সাতদিন ধরে বেশ বড় এই মেলা চলে। জেলেপাড়ার প্রায় সবাই মেলা দেখতে আসে। জেলেরা এই মেলা থেকে তাদের শখের জিনিসের পাশাপাশি অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অত্যাবশ্যকীয় জিনিস কেনে। আবার অনেকেই মেলায় এসে

জুয়া খেলে নিজের অতিকষ্টে জমানো টাকা-পয়সা সর্বস্ব খুইয়ে ফেলে। রথের মেলার বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''রথের দিন এই মাঠে প্রকাণ্ড মেলা বসে, উল্টারথ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পদ্মা আগে তফাতে ছিল, এখন এত কাছে সরিয়া আসিয়াছে যে মেলার একটা প্রান্ত প্রায় নদী তীরেই আসিয়া ঠেকে। স্থলপথ ও জলপথে দল বাঁধিয়া আসিয়া মানুষ মেলায় ভিড় বাড়ায়। ভিড় বেশি হয় প্রথম এবং শেষ দিন, মাঝখানের কদিন মেলা একটু ঝিমাইয়া যায়। গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় ও শখের পণ্য সমস্তই মেলায় আমদানি হয়, এমনকি শহরের নারী-পণ্যের আবির্ভাবও ঘটিয়া থাকে। কাপড়ের দোকান, মনোহারি দোকান, মাটির খেলনার দোকান, খাবারের দোকান, দোকান যে কত বসে তার সংখ্যা নাই। . . . কয়েকটি স্থানে গবর্ণমেন্ট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত জুয়াখেলা চলে। মেলার এটা একটি প্রধান অঙ্গ।''[৪৩] রথের মেলার সন্ধ্যেগুলো জেলেপাড়ার বাড়িগুলিতেও এক অনাবিল আনন্দ বয়ে আনে — ''যাহারা রথের মেলায় গিয়াছিল একে একে তাহারা ফিরিয়া আসিতে থাকে। সন্ধ্যার সময় জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে আজিকার সন্ধ্যাটি নামে সানন্দ। বউরা হাসিমুখে লাল পাছাপাড় শাড়ি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখে, নূতন কাচের চুড়ির বাহারে মুগ্ধ হয়, কাচ ও কাঠের পুঁতির মালা সযত্নে কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখে, ছেলেমেয়েরা বাঁশি বাজায় আর মাটির পুতুল বুকে জড়াইয়া ধরে। আহ্লাদ বহন করিয়া এই তুচ্ছ উপকরণও যে কুটিরে আসে না, সেখানে যে বিষাদ জমাট বাঁধিয়া থাকে তা নয়, কোন না কোন রূপে সোনাখালির মেলার আনন্দের ঢেউ সে কুটিরেও পৌঁছিয়াছে। একটি কাঁঠাল, দুটি আনারস, আধসের বাতাসা — এই দরিদ্রের উপনিবেশেও যে দরিদ্রতম পরিবার শুধু নুন আর অদৃষ্টকে ফাঁকি দিয়া ধরা পুঁটির তেলে ভাজা পুঁটিমাছ দিয়া দিনের পর দিন আধপেটা ভাত খাইয়া থাকে — খুশি হইয়া উঠিতে আর তাহাদের অধিক প্রয়োজন কিসের?''[৪৪]

রথের মেলার পাশাপাশি দুর্গাপূজাতেও জেলেপাড়াতে আনন্দ নেমে আসে। ঢাকঢোল বাজিয়ে খুব ধুমধাম করে কেতুপুরে দুর্গাপূজা হয়। এ সময় নারী-পুরুষ সকলে ঠাকুর দেখে, প্রসাদ নেয়, আনন্দ করে; কেউ কেউ আকণ্ঠ মদ গিলে দিন কাটায় — ''কেতুপুরে চারদিন পূজার ঢাকঢোল বাজিল — উৎসব হইল। জেলেপাড়ার

ছেলেবুড়া দুবেলা ঠাকুর দেখিল, কেহ কেহ তাড়ি গিলিয়া খুব মাতলামি করিল, শীতল একদিন একটা দেশি মদের বোতল সাবাড় করিয়া রাসুকে ধরিয়া আচ্ছা করিয়া পিটাইয়া দিল।''[৪৫] রঙের উৎসব দোলও এই গরীব জেলে-মাঝিদের জীবনে আনন্দ নিয়ে আসে। টাকা-পয়সার অভাব থাকায় কাদা-রঙ মিশিয়ে এরা হোলি খেলে, শোভাযাত্রা বের করে — ''রং ও কাদা নিয়া গ্রামে দোলের উৎসব চলিয়াছে, রঙের চেয়ে কাদার পরিমাণটাই এ পাড়ায় বেশি। চাষাভূষা জেলেমাঝির পাড়া এটা, এখানে রঙের বড়ো অনটন। অনেক বেলায় কাদামাখা মূর্তিসমূহের একটা শোভাযাত্রা পাড়া হইতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইল। গাধার মতো ক্ষুদ্রকায় একটা ঘোড়ার উপর বিচিত্র সাজে দোলের রাজা অতিকষ্টে বসিয়া আছে, গলায় তাহার ছেঁড়া জুতোর মালা, গায়ে গোটা দশেক ছিন্নভিন্ন জামা, চারিদিকে লড়বড় করিয়া ঝুলিতেছে অনেকগুলি ছেঁড়া ন্যাকড়া। . . . তাথৈ তাথৈ নাচ, ছুটাছুটি হইচই, ডোবা পুকুরের পাঁক তুলিয়া যাকে খুশি ছুঁড়িয়া মারা — আনন্দ বটে দোলের!''[৪৬] এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি ছাড়াও এই উপন্যাসের একস্থানে আঞ্চলিক উৎসবের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''বাজারে টিনের চালার নীচে যেখানে তরিতরকারির দোকান বসে সেইখানে যাত্রার আসর বসিয়াছে, লোক জমিয়াছে ঢের। কুবের একপাশে বসিয়া পড়িল। পানবিড়ির দোকান ছাড়া এত রাত্রে পসরা সাজাইয়া কেহ নাই, রূপ-কন্যারাও যাত্রা শুনিতে আসিয়াছে। পেশাদার দল নয়, আলু-বেচা তেল-বেচা মানুষের সখের দল, অনেকে হয়তো পড়িতেও জানে না, একে ওকে দিয়া পড়াইয়া শুনিয়া শুনিয়া পার্ট মুখস্থ করিয়াছে, শক্ত শক্ত অনেক শব্দই উচ্চারণ হয় না, তাই হাস্যকর রকমে ভাঙিয়া জিহ্বার উপযোগী করিয়া নিয়াছে — বক্তৃতাগুলি কথ্য ও শুদ্ধ ভাষার এক অপরূপ খিঁচুড়ি। পোশাকপরিচ্ছদের যেমন অভাব, অভিনেতা নির্বাচনে কাণ্ডজ্ঞানেরও তেমনই অভাব। বালক লখিন্দরের পাশে তার চেয়ে একহাত বেশি লম্বা বেহুলা নির্বিকার চিত্তে পার্ট বলে — গলাটি মিহি বলিয়া আর চমৎকার ঢঙে অভিনয় করিতে পারে বলিয়া ওকে বেহুলা করা হইয়াছে, আর কিছু দেখিবার প্রয়োজন হয় নাই।''[৪৭]

এই সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানের পাশাপশি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কিছু লোককথার বিবরণও আছে। সোনাখালির যে স্থানটিতে রথের মেলা বসে তাকে

অন্নাবাবার মাঠ বলে। এই মাঠ সম্পর্কে সে অঞ্চলে একটা লোককথা প্রচলিত আছে — ''স্থানটির অন্নবাবার মাঠ নাম হওয়ার একটু ইতিহাস আছে। অনেকদিন আগে এ অঞ্চলে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সে সময় কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া এই মাঠে আস্তানা গাড়েন এবং একটি বিরাট অন্নসত্র খুলিয়া দেন। নিজের বলিতে সন্ন্যাসীর এক কানাকড়ি সম্বলও ছিল না। শোনা যায়, এমনই আশ্চর্য ছিল মানুষের উপর তাহার প্রভাব যে সামনে দাঁড়াইয়া চোখে চোখে চাহিয়া তিনি হুকুম দিতেন আর বড়ো বড়ো জমিদার মহাজনেরা মণে মণে চাল ডাল পাঠাইয়া দিত এই মাঠে। শত শত ভদ্র গৃহস্থ নিজেরাই কোমর বাঁধিয়া তাহা রান্না করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীদের বিতরণ করিত অন্ন। ব্যাপারটা যে ঠিক এইরকমই ঘটিয়াছিল তার কোন প্রমাণ এখন আর নাই। যেসব বড়ো বড়ো উনানে সেই বিরাট ক্ষুধা-যজ্ঞের আগুন জ্বলিত আজ তাহার একটু কালির দাগ পর্যন্ত কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।''[৪৮]
এই অঞ্চলের পদ্মার জেলে-মাঝিরা নৌকা যাত্রার পূর্বে কিছু লোকবিশ্বাস মেনে চলে। এরা মুসলমানদের পাঁচপীরের মধ্যে বদরের নাম করে যাত্রা শুরু করে। এদের বিশ্বাস নৌ যাত্রাকালে বিপদে-আপদে বদরই তাঁদের রক্ষা করবে — ''গুমটি দিছে, বাদাম চলব না, সকাল সকাল রওনা দিবা। বদর কইও মাঝি, সাঁঝের আগে ফির‍্যা আইও, আসমান ভাল দেখি না। শুইনা আলাম আজকালির মদ্যি জবর ঝর হইবার পারে।''[৪৯] প্রবল ঝড়-বৃষ্টির সময় তার প্রকোপ কমানোর জন্য বাড়িতে এই অঞ্চলের জেলে-মাঝিদের মেয়ে-বৌয়েরাও কিছু লোকবিশ্বাস মেনে চলে — ''একদিন প্রবল ঝড় হইয়া গেল। কালবৈশাখী কোথায় লাগে। সারাদিন টিপি টিপি বৃষ্টি হইল, সন্ধ্যায় আকাশ ভরিয়া আসিল নিবিড় কালো মেঘ, মাঝরাত্রে শুরু হইল ঝড়। কী সে বেগ বাতাসের আর কী গর্জন! বড়ো বড়ো গাছ মড়মড় শব্দে মটকাইয়া গেল, জেলেপাড়ার অর্ধেক কুটিরের চালা খসিয়া আসিল, সমুদ্রের মতো বিপুল ঢেউ তুলিয়া পদ্মা আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল তীরে। . . . ঝড় শুরু হইলে ঘরে ঘরে মেয়েরা উঠানে পিঁড়ি পাতিয়া দিয়াছে — ঝড়ের দেবতা বসিবেন, শান্ত হইবেন। ঘরে ঘরে মেয়েরা কপাল কুটিয়া মধুসূদনকে ডাকিয়াছে। এ কি রোষ দেবতার? কেন এ প্রলয়?''[৫০]

উপন্যাসটিতে পটভূমি হিসেবে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অঞ্চলকে গ্রহণ করার পাশাপাশি চরিত্র হিসেবে সেই অঞ্চলের মানুষজন এবং তাদের জীবন-জীবিকা, আচার-ব্যবহার, উৎসব-অনুষ্ঠান, বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোককথাকে তুলে আনার পাশাপশি ভাষা প্রয়োগের দিক থেকেও আঞ্চলিক উপভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উপন্যাসটি প্রথম পুরুষ কথনরীতি বা সর্বজ্ঞ রীতিতে লেখা। তাই উপন্যাসের বর্ণনার ভাষার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক বাংলা সাধু ভাষারীতিকে গ্রহণ করলেও সংলাপের ভাষায় তিনি পূর্ববঙ্গের বাংলা আঞ্চলিক কথ্যভাষাকেই গ্রহণ করেছেন। এই ভাষারীতির কিছু দৃষ্টান্ত হল—

কুবেরের সংলাপ :

১। ''আইজ পারুম না শেতলবাবু। আজান খুড়া সিদা মোর দিকে চাইয়া রইছে দেখ না? বাজারে কেনো গে আইজ।'' (পৃ ১০)

২। ''জিগানের কাম কী? তা কই নাই খুড়া। মিছা কওয়নের মানুষ তুমি না। মাছ নি কাল বেশি বেশি পড়ছিল, তাই ভাবলাম তোমারে বুঝি চালানবাবু ঠকাইছে।'' (পৃ ১২)

৩। ''চুপ যা গণেশ। পোলা দিয়া করুম কী? নিজেদের খাওয়ন জোটে না, পোলা!'' (পৃঃ ১৫)

৪। ''বয় গণেশা, বয়। অ পিসি, আমারে আর গণশারে দুগা মুড়ি দিবা গো? আ লো গোপি, আমারে নি এক ঘটি জল দিবার পারস?'' (পৃ ১৯)

মালার সংলাপ :

১। ''আ গো যাইও না, শুইনা যাও। চালা দিয়া নি ঘরে জল পড়ছে? ছনগুলা লইয়া যাও, বিছানার তলে ছন দেওন না দেওন সমান।'' (পৃ ২১)

২। ''বুড়া কী বজ্জাত! মাথার ভাগ দিব না আইঠা কলা দিব, দেইখো।'' (পৃ ৩০)

৩। ''ক্যান মাঝি ক্যান, এত গোসা ক্যান? কবে কই নিছিলা আমারে, চিড়ডা কাল ঘরের মধ্যি থাইকা আইলাম, এউক্কা দিনের লাইগা বেড়াইবার যাই যদি, গোসা করবা ক্যান?'' (পৃ ১০৬)

গোপির সংলাপ :

১। ''বাই উ ওই বাবুগোর পোলার নাখান ধলা হইছে বাবা। নকুইলার মাইয়া পাঁচি কী কইয়া গেল শুনবা? সায়েবগো এমন হয় না। না পিসি?'' (পৃ ১৭)

২। ''ক্যান কমু জ্যাঠা? বজ্জাতটা আমারে যা মুখে লয় কয় না?'' (পৃ ১৭)

৩। ''রাইত কইরা মাইজাবাবু নি আমাগোর বাড়ি আহে তাই জিগায়। ইবার জিগাইলে একদল পাঁক দিমুনে মুখের মধ্যে।'' (পৃ ১৭)

কপিলার সংলাপ :

১। ''পোলাপান, সাধ নি মেটে দেইখা? তোমার লখা বুড়া তো হয় নাই মাঝি, একনজর দেইখা ফাল দিয়া বাড়িত্ ফিরবো? যারে লখা যুগী মাসির লগে—দেইখো বইন পোলারে, পোলা বড় বজ্জাত।'' (পৃ ৫৯-৬০)

২। ''চুপ কর মাঝি, বেবাকে শুনব। যাইবা যাও, কী আর কমু তোমারে? এউক্কা কথা কইয়া দিই মাঝি, মাথা খাও, দিদিরে কথাডা কইও। কইও, কপিলা পরের ঘরের বউ, পরের শাসনে কপিলার মুখে রাও নাই। অতিথ্ কই থাকবো, অতিথ্ কী খাইবো, কপিলারে কেডা তা জিগায়? দুষি কইরো মাঝি, শাইপো—কিন্তু এই কথাটা কইও দিদিরে, মাথা খাও মাঝি, কইও।'' (পৃ ৯৮)

৩। ''ক্যান মাঝি ক্যান? আমারে ভাব ক্যান? সোয়ামির ঘরে না গেছি আমি? আমারে ভুইলো মাঝি—পুরুষের পরান পোড়ে কয়দিন? গাঙের জলে নাও ভাসাইয়া দূর দেশে যাইও মাঝি, ভুইলো আমারে। ছাড়, মানুষ আহে।'' (পৃ ১১১)

হোসেন মিয়ার সংলাপ :

১। ''যাবা না ক্যান? ডর কিসির? আসমান দেইখ্যা রওনা দিবা, আসমান দেইখা ফিরবা। বাদলা দিনের ঝড় জানান দিয়া আহে।'' (পৃ ২৪)

২। ''বিয়ানে একবার বাড়িত্ যাইও রাসু বাই। পয়সাকড়ি পাইবা মালুম হয়, নিকাশ নিয়া খারিজ দিমু। ময়নাদ্বীপির জমিন না নিলি জঙ্গল কাটনের মজুরি দিই—খাওন পরন বাদ। কাইল যাইও। . . . মন করতিছ, হোসেন মিয়া ঠক। তোমারে ঠকাইয়া হেসেন মিয়ার ফয়দা কিসির! কোন্ হালারে আমি জবরদস্তি ময়নাদ্বীপি নিছি? আপনা খুশিতে গেছিলা, ঝুট না কলি মানবা রাসু বাই। ফিরা আইবার মন ছিল, আমারে কতি পারলা না? একসাথ আইতাম?'' (পৃ ৩৪)

৩। ''ময়নাদ্বীপি মোল্লা পামু কই? রাজবাড়ির আজীজ ছাহাব কন, ময়নাদ্বীপি শও জনা মানুষ হলি আর মসজিদ দিলি আর হিঁদুরে জমিন না দিলি গিয়া থাকতি পারেন। তা পারুম না মিয়া। হিঁদু না নিলি মানুষ পামু কই? হিঁদু নিলি মসজিদ দিমু না। ক্যামনে দিমু কও? মুসলমানে মসজিদ দিলি, হিঁদু দিব ঠাহুরঘর—না মিয়া, আমার দ্বীপির মদ্যি ও কাম চলব না।'' (পৃ ৮৬)

গণেশের সংলাপ :

১। ''চল্ কুবির, না-টা ঠিক কইরা থুইয়া আহি। আমারে ডাইকা আজান খুড়া নায় গিয়া বইয়া আছে।'' (পৃ ১৯)

২। ''হীরু জ্যাঠা ছন দিব? জ্যাঠারে তুই চিনস্ না কুবির, কাইলের কাণ্ড জানস? বিহানে ঘরে ফির‍্যা শুমু, বউ কয় চাল বাড়ন্ত। খাও আইঠা কলা, ভর রাইত জাইগা ঘুমের লাইগা দুই চক্ষু আঁধার দ্যাহে—চাল বাড়ন্ত! বউরে কইলাম হীরুজ্যাঠার ঠাই দুগা চাল কর্জ আন্‌গা, দুপুর গাঁয়ে গিয়া কিনা আনুম। কলি না পিত্যয় যাবি কুবির, বউরে জ্যাঠা ফিরাইয়া দিল। কয় কী বিষ্যুদবার কর্জ দেওন মানা।'' (পৃ ২০-২১)

ধনঞ্জয়ের সংলাপ :

১।''কাইল চাইরে নামবো। হালার মাছ ধইরা জুত নাই।'' (পৃ ৮)

২।''জিরানের লাইগা মরস ক্যান ক দেহি? বাড়িত্ গিয়া সারাডা দিন জিরাইস। আর দুই খেপ দিয়া ল।'' (পৃ ৯)

৩।''হ, চাইরশ না হাজার। দুইশ সাতপঞ্চাশখান মাছ। সাতটা ফাউ নিয়া আড়াইশর দাম দিছে।'' (পৃ ১২)

নকুলের সংলাপ :

১। ''শ্যাষ রাইতে তর বউ খালাস হইছে কুবির।'' (পৃ ১৫)

২। ''আমাগোর পাঁচি গেছিল, আইসা কয় কি কুবেরের ঘরে নি রাজপুত্তুর আইছে বাবা, ওই একরত্তি একখান পোলা, তাঁর চাঁদপানা কথা কী কমু। রং হইছে গোরা।'' (পৃ ১৫)

রাসুর সংলাপ :

১। ''কই কুবিরদা, কই। তোমাগো দেইখা মুখে রাও সরে না, কতকাল পর ফিরা আলাম!'' (পৃঃ ২৬)

২। ''আমি একা ফির‍্যা আইলাম গো মামা, সবকটারে গাঙের জলে ভাসাইয়া দিয়া আমি একা ফির‍্যা আইলাম।'' (পৃ ২৮)

সিধুর সংলাপ :

১। ''তা আইলাম কুবির, তা আইলাম। রঙ্গ কইরা কইলাম, বোঝস না? কোঁচটা কিনা আনলি সন্দ করি। নিল কত?'' (পৃ ২৯)

২। ''ত্যাল মরিচ দিয়া ব্যানুন যা হইব—অমর্ত। আমিনুদ্দির ঠাই প্যাজ রসুন মাইগা আইনা—'' (পৃ ৩০)

এছাড়াও এই উপন্যাসে পদ্মার মাঝিদের একটি নিজস্ব ভাষার উল্লেখ আছে। পদ্মার উপর ময়নাদ্বীপ থেকে ফেরার সময় রাসু এবং কুবের এই সাংকেতিক ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান করেছে — ''বহুদূর নদীবক্ষ হইতে হাঁক আসিতেছিল, মানবকণ্ঠের একটানা একটা ক্ষীণ আওয়াজ। দুই কানের পিছনে হাত দিয়া হাঁক শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুবের সাড়া দিয়া উঠিল। এ এক ধরনের ভাষা, পূর্ববঙ্গের মাঝিশ্রেণির লোক ছাড়া এ ভাষা কেহ জানে না। এ ভাষায় কথা নাই, আছে শুধু তরঙ্গায়িত শব্দ। উন্মুক্ত প্রান্তরে, বিস্তৃত নদীবক্ষে এ শব্দ দূর হইতে দূরে চলিয়া যায়, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে কিন্তু তরঙ্গের তারতম্য অবিকল থাকিয়া যায়। অস্ফুট গুঞ্জনের মতো মৃদু হইয়াও যদি কানে আসিয়া লাগে, পদ্মানদীর মাঝি কান পাতিয়া শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারে। শব্দের দুর্লক্ষ্য উৎসের দিকে চাহিয়া সে বুক ভরিয়া বাতাস গ্রহণ করে। বাঁ হাত কানের পিছনে রাখিয়া, ডান হাতটি মুখের সম্মুখে আনিয়া সঞ্চালিত করিয়া উচ্চারিত একটানা আওয়াজে সে তরঙ্গের সৃষ্টি করে।''[৫১]

এতকিছুর পাশাপাশি উপন্যাসটিতে পদ্মানদীর উপস্থিতিও এর আঞ্চলিক লক্ষণকে অনেকটা দৃঢ় করেছে। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের উপর পূর্ববঙ্গের এই নদীটি এতটাই অনিবার্য প্রভাব ফেলেছে যে, একে ছাড়া পদ্মা তীরবর্তী মানুষেরা নিজেদের জীবনের কথা ভাবতে পারে না। পদ্মা নানা সময়ে তার তীরে বসবাসকারী জেলে-মাঝিদের দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ালেও ঔপন্যাসিক বলেছেন — ''তবু নদী ছাড়া সবই বাহুল্য। আকাশের রঙিন মেঘ ও ভাসমান পাখি, ভাঙন-ধরা তীরে শুভ্র কাশ ও শ্যামল তরু, নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এসব কিছুই যদি না থাকে এই বিশাল একাভিমুখী জলস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালোবাসিবে সারাজীবন। মানবী প্রিয়ার যৌবন

চলিয়া যায়, পদ্মা তো চিরযৌবনা।''[৫২] উপন্যাসে পদ্মার বুকে তার মাঝিদের বিশেষ অধিকারের উল্লেখও নানা জায়গায় আছে। মেয়ে গোপিকে আমিনবাড়ির হাসপাতালে রেখে কপিলাকে নিয়ে কুবের পয়সা দিয়ে নৌকা ভাড়া করতে চাইলে জনৈক মাঝির সঙ্গে কুবেরের কথোপকথনটির উল্লেখ করা যায় — ''কত নাও যাইবো কাইল, পয়সা দিয়া ক্যান যাইবা কুবের বাই? বলিয়া পরিচিত মাঝি কুবেরকে নৌকায় রাত্রি যাপন করিতে অনুরোধ করে। শুধু পরিচিত মাঝি কেন, পদ্মানদীর মাঝি সে, পদ্মানদীর যে-কোন মাঝির নৌকায় রাত্রিযাপনের অধিকার তার জন্মগত, . . . ।''[৫৩] আবার রাসু যখন ময়নাদ্বীপ থেকে পালিয়ে এসেছিল তখন সোনাখালি মেলায় আগত একটি নৌকায় সে চেপেছিল। এতে নৌকার মাঝি রাগ করলেও ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ''রাগের কারণটা তাহাদের সহজেই বোঝা যায়। সুলপী হইতে সোজাসুজি সোনাখালির মেলায় যাওয়ার বদলে রাসুকে এখানে পৌঁছাইয়া দিতে তাহাদের পদ্মা পার হইতে হইয়াছিল। প্রতিদানে রাসু যে তাহাদের কিছুই দিতে পারে নাই তাহাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু এ ক্রোধ তাহাদের ফলপ্রসু নয় — এ শুধু ক্রোধ। রাসুর মতো দুরবস্থায় পড়িয়া আবার যখন কেহ তাহাদের পদ্মা পার করিয়া দিবার অনুরোধ জানাইবে এমনিভাবে রাগিয়া উঠিলেও সেই নিরুপায় মানুষটিকে তাহারা না বলিতে পারিবে না, বিনা প্রত্যাশায় বোঝাই নৌকা লইয়া তিন ক্রোশ অতিরিক্ত বইঠা বাহিবে। ইহা মহত্ত্ব নয়, পরোপকার নয় — ইহা রীতি, অপরিহার্য নিয়ম। আশ্চর্য এই, এ নিয়ম পালন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠাও অনিয়ম নয়।''[৫৪]

এভাবে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাটিতে আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠার কারণ হিসেবে এইরকম অজস্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তবে এই উপন্যাসটিকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলার প্রসঙ্গে সমালোচকেরা দ্বিধাবিভক্ত। অনেকেই একে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে চান নি। মূলত উপন্যাসটির স্থানগত ব্যাপ্তি, সমষ্টিকে প্রাধান্য না দিয়ে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া, বহিরাগত শক্তির সঙ্গে স্থানীয় শক্তির দ্বন্দ্বের অভাব, 'পদ্মানদীর মাঝি'র অনুকরণে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারা সৃষ্টি না করা, উপন্যাসটির ক্ষেত্রে

আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে যাওয়া প্রভৃতি বিষয় এই উপন্যাসটির সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হতে না পারার কারণ হিসেবে উঠে আসে।

এটা ঠিকই যে এই উপন্যাসটির ঘটনাস্থল যতক্ষণ পদ্মাতীরবর্তী কেতুপুর গ্রাম ও তৎসংলগ্নস্থানে সীমাবদ্ধ ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত উপন্যাসটির আঞ্চলিক লক্ষণ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না। কিন্তু হোসেন মিয়া এবং তাঁর ময়নাদ্বীপের অনুপ্রবেশ ঘটার পর এর আঞ্চলিক লক্ষণ অনেকটাই আক্রান্ত হয়েছে। কারণ ময়নাদ্বীপের বাসিন্দারা প্রায় সবাই জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া সৈনিক, তারা কেউ আর পদ্মার উপর নির্ভরশীল জেলে-মাঝি নয় — এরা সবাই আদিম কৃষিনির্ভর সমাজ পত্তনের কারিগর। এই বিষয়টি অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়েরও দৃষ্টি এড়ায়নি — ''এই উপন্যাসে সুদূরের ইশারা এনেছে রহস্যময় চরিত্র হোসেন মিয়া ও তার দূরবর্তী দ্বীপ। ঐ অপরিচিত দ্বীপে বসতি স্থাপনের দুঃসাধ্য প্রয়াসে রত হোসেন মিয়া পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের জীবনের দিগন্তকে প্রসারিত করে দিয়ে উপন্যাসের আঞ্চলিক সীমা-সংহতিকে শিথিল করে দিয়েছে। জেলে-মাঝিরা যেখানে পদ্মার কাছে, প্রকৃতির কাছে হার মেনেছে, হোসেন মিয়া সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই দিয়েছে। এই ইঙ্গিতটি একেবারে অগ্রাহ্য নয়।''[৫৫] অধ্যাপক অলোক রায়ের 'কথাসাহিত্য সাহিত্যকোষ' গ্রন্থে অধ্যাপক দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের এই দিকটির প্রতি আলোকপাত করে বলেছেন — ''পদ্মানদীর মাঝি'তে সেখানকার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ঐ নদীরই প্রভাবে। নদীর অস্থিরতা ও বেগ ঐ সম্প্রদায়ের জীবনে যাযাবরত্ব ও গতি এনে দিয়েছে। তথাপি এখানে গোষ্ঠীচেতনা প্রবল হতে পারে নি। হোসেন মিঞার কতুবদিয়া দ্বীপের মায়াময় আকর্ষণ এখানকার অধিবাসীদের আর এক রাজ্যে আহ্বান করেছে।''[৫৬]

আঞ্চলিক উপন্যাসে নায়ক বা নায়িকা চরিত্রের অবতারণা করা হলেও এখানে শুধু তাদের জীবন পরিক্রমার বিবরণ থাকে না; তাদের বসবাসকারী অঞ্চলটির সামগ্রিক ছবি এখানে উঠে আসে। এককথায় আঞ্চলিক উপন্যাস কোন ব্যক্তি মানুষের কাহিনি না হয়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সমস্ত মানুষের (সমষ্টির) কাহিনি হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসটির কাহিনির সূচনায় সমষ্টির ইঙ্গিত থাকলেও শেষপর্যন্ত তা ব্যক্তি মানুষ অর্থাৎ উপন্যাসের নায়ক কুবেরের কাহিনি হয়ে উঠেছে বলে অনেকেই মনে করেছেন।

এদের মধ্যে সবার আগে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলতে হয়। উপন্যাসটির আলোচনায় তিনি বলেছেন — ''ইহা ততটা নদীতে মাছমারার কাহিনী নহে যতটা নদী হইতে গৃহ-প্রত্যাগত ধীবরের গার্হস্থ্য জীবন ও হৃদয়-সমস্যার অশান্ত আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ।''[৫৭] উপন্যাসটির কাহিনি অংশে এটা দেখাও যায় যে, পদ্মা তীরবর্তী জেলে-মাঝিদের জীবন পরিক্রমার বিবরণ দিয়ে শুরু হলেও অচিরেই তা কুবেরের ব্যক্তিজীবনের কাহিনির দিকে অগ্রসর হয়েছে। এই বিষয়টি সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায়েরও দৃষ্টি এড়ায় নি — ''পদ্মার জেলেদের জীবনযাত্রা, তাদের জীবনসংগ্রাম এ উপন্যাসে মানিকের লক্ষ্য নয়। মানিকের লক্ষ্য কপিলা আর কুবেরের অবৈধ আকর্ষণ, ফলে পদ্মা নদী, মাছের কেনা-বেচা সব নিয়ে যে ধীবরজীবন, তার অনেকটাই উপন্যাসে ফোকাসের বাইরে পড়ে গিয়েছে। বরং রোমান্সের টানে হোসেন মিয়ার মত অভিনব চরিত্র ও তার বিচিত্র কার্যকলাপ ক্রমশ কেন্দ্র দখল করে নিয়েছে।''[৫৮] অধ্যাপক অশুকুমার সিকদারও 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বস্তুসমগ্রতার অভাব লক্ষ করেছেন — ''আঞ্চলিক উপন্যাস যেন সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের সাহিত্যরূপ। ফ্রেমটা আঞ্চলিক উপন্যাসের, কিন্তু 'পদ্মানদীর মাঝি' আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। একটা বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতি, এইক্ষেত্রে পদ্মানদী, কীভাবে সে অঞ্চলের গোষ্ঠীজীবনকে প্রভাবিত করে তার ইশারা হয়তো আছে। 'নদীতে শুধু জলের স্রোত। জলে স্থলে মানুষের অবিরাম জীবনপ্রবাহ।' কিন্তু তবু গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বস্তুসমগ্রতা বর্ণনা করা এই উপন্যাসের লক্ষ্য নয়। বরং চলমান নদীস্রোতের পটভূমিতে জেলেগ্রাম কেতুপুরের এক প্রান্তে মানুষের প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের কথাই 'পদ্মানদীর মাঝি'তে রূপায়িত।''[৫৯]

তবে গোষ্ঠিবদ্ধ জীবনের কাহিনি না হওয়ায় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি যে একেবারে আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এই মত কেউ-ই প্রদান করেন নি। এই প্রসঙ্গে সমস্ত সমালোচকের হয়ে সম্ভবত অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলে দিয়েছেন — ''আঞ্চলিক উপন্যাস মূলত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক উপন্যাস, 'পদ্মানদীর মাঝি' ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপন্যাস। তবু আঞ্চলিক উপন্যাসের শর্ত কিছুটা পালিত হয়েছে। এ উপন্যাসে প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র সত্তারূপে দেখা দিয়েছে, ভূ-প্রকৃতি

মানবমনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, ভৌগোলিক সীমাসংহতি রক্ষিত হয়েছে। যে ধীবর-গোষ্ঠীর জীবন এখানে চিত্রিত, তা একান্তভাবে বাস্তবনির্ভর। কোনো উচ্চ আদর্শ, বাস্তববর্জিত সৌন্দর্যবোধ, রোমান্টিক দৃষ্টি ধীবর-পল্লীর উপর রঙীন আলো ফেলে নি। পদ্মাতীরবর্তী জেলেদের মান-অভিমান-ঈর্ষা-চক্রান্ত-দ্বন্দ্ব-দলাদলি-প্রীতি-ভ্রাতৃত্ব সব কিছুই নিখুঁতভাবে রূপায়িত।''[৬০] যে কোন সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসে এসব কিছুরই অস্তিত্ব থাকে।

যে কোন সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসে পটভূমি হিসেবে গৃহীত অঞ্চলটির স্থানীয় সংস্কৃতি অর্থাৎ লোকাচার, লোক-সংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোককথার বাস্তব রূপচিত্র অঙ্কন করা হয়। সেই সঙ্গে এও দেখানো হয় যে বহিরাগত শক্তির প্রভাবে সেই স্থানীয় সংস্কৃতি ভেঙে পড়ে। উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রীরা অনেক চেষ্টা করেও সেই সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে সেই অর্থে অভ্যন্তরীণ শক্তির সঙ্গে বহিরাগত শক্তির বিরোধ নেই। আসলে এখানে পদ্মা তীরবর্তী জেল-মাঝিদের স্থানীয় সংস্কৃতিরই পূর্ণাঙ্গ রূপ নেই, তাই ভেঙে যাওয়ার প্রসঙ্গ আসেনি। বহিরাগত শক্তি হিসেবে হোসেন মিয়া এলেও সেও পদ্মানদীর মাঝিদের একজন হয়ে উঠেছে। তবে এটা ঠিক কুবেরের মত পদ্মানদীর মাঝিরা যখন হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপ বসতি স্থাপন করবে তখন সেখানে আর কেতুপুরের জেলেপাড়ার সংস্কৃতিকে লালন-পালন করবে না। কারণ হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে মন্দির-মসজিদের কোনো ব্যাপারই নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মত সাহিত্যিকরা মূলত 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় পরিবর্তন আনতে প্রয়াসী হন। তাদের এই প্রয়াস থেকেই বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার আবাহন ঘটে। তবে কেউ-ই সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস লিখতে পারেন নি। এরপর বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক — এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন ঘটে। এঁদের মধ্যে প্রথম দু'জন তাঁদের সাহিত্য কর্মে স্থানিক বিষয়কে প্রাধান্য দেন। এরমধ্যে তারাশঙ্কর তো বাংলা আঞ্চলিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসেবে স্বীকৃতিও পেয়েছেন। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এদের সমধর্মী ছিলেন না বলে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন — ''অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোলযুগ'-এ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কল্লোলের উত্তরপুরুষ বলেছেন। কিন্তু কল্লোলীয়দের সঙ্গে নিজের মনোভঙ্গীর পার্থক্য মানিক নিজেই নির্দেশ করে দিয়েছেন তাঁর 'লেখকের কথা' নামে ছোট বইটির পাতায়। . . . মানিক কল্লোলের ধারাবাহী নন, তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণের স্থানিক সাহিত্যও তাঁকে প্রেরণা দেয়নি।''[৬১] সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আঞ্চলিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বলেছেন — '' . . . 'পদ্মানদীর মাঝি' একান্তভাবে 'আঞ্চলিক উপন্যাস' নয়। বস্তুত এই একখানি গ্রন্থ ছাড়া পদ্মানদী বা পূর্ববঙ্গের এধরনের আঞ্চলিক পরিবেশ অবলম্বন করে লেখক আর কোনও উপন্যাস লেখেননি। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা কথাসাহিত্যে 'আঞ্চলিক উপন্যাস'-এর কোন ধারা রচনা করতে চান নি।''[৬২] অবশ্য তিনি এই অনুমানের নিরসন নিজেই ঘটিয়েছেন — ''শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও পরবর্তীকালে তারাশঙ্করের হাতে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের আঞ্চলিক জীবনকথা যেমন মূর্ত হয়ে উঠেছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসে তেমনি পূর্ববঙ্গের স্থানীয় রঙ (local colour) ফুটে উঠেছে সংযত বাস্তব বর্ণবিন্যাসের নৈপুণ্যে। পদ্মানদীর মাঝির দল, তাদের পরিবারের লোকজন — সকলের চরিত্র নিখুঁত বাস্তবতায় লেখক চিত্রিত করেছেন। তাদের দুঃখ দারিদ্র্য, জীবন ধারণের জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রাম, পারস্পরিক সহানুভূতি আবার কলহ-দলাদলি সব কিছুর মধ্য দিয়ে তাদের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণধর্ম প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পদ্মার প্রচন্ড স্রোতোবেগের সঙ্গে লেখক যেন এই দুর্মর প্রাণবেগের নিগূঢ় সাদৃশ্যের ব্যঞ্জনা অনুভব করেছেন মনে হয়।''[৬৩] অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার এই উপন্যাসটির প্রশংসায় বলেছেন — ''মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) থেকে উপন্যাসে পটভূমি ও বৃত্তিগত জীবনের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়তে শুরু করে।''[৬৪] এই মন্তব্য থেকে আমরা ধরেই নিতে পারি যে, তিনি আসলে বলতে চেয়েছেন যে, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস থেকেই বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়েছে।

অবশ্য উপন্যাসটি পদ্মা তীরবর্তী গ্রামজীবনের জীবনচর্যার বিবরণ দিয়ে শুরু হলেও এর আবেদন নিছক গ্রামকেন্দ্রিক নয় — পদ্মা তীরবর্তী গ্রামগুলিকে ছাড়িয়ে বহুদূর প্রসারিত হয়েছে। সমালোচক আশিস কুমার দে বিষয়টিকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন — ''স্থাণীয় বর্ণ, আঞ্চলিকতা পেরিয়ে বিস্তীর্ণ পৃথিবীর কথা 'পদ্মানদীর মাঝি'তে বারবার আছে। সেগুলিকে উপেক্ষা করে প্রতিবেশ, উপভাষার স্বাদ এবং আচার ব্যবহার, চিন্তা-অনুভূতির বিশেষ রূপ নিয়ে বিচার করলে সমালোচনা অনেক কিছু হারাবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মা নদীর মাঝি'র রূপকে জীবনের নানা কথা — যা বৈশ্বিক — তাই বলতে চেয়েছেন।''[৬৫] একথা শুনে মনে হয় 'পদ্মানদীর মাঝি' আঞ্চলিক উপন্যাস হতে পরেনি। অধ্যাপক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যও উপন্যাসটির আঞ্চলিক উপন্যাস হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন — ''নির্দিষ্ট আঞ্চলিক পটভূমিকায় রচিত হলেও পদ্মানদীর মাঝি আঞ্চলিক উপন্যাসও নয়। প্রকৃতপক্ষে কোনো শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই কেবল আঞ্চলিক উপন্যাস হয় না। তা অঞ্চলকে ছাড়িয়ে যায়। যেখানে প্রকৃতি ও মানবজীবনকাহিনী একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, যেখানে কোন উত্তরণ নেই, সেখানে আঞ্চলিক চিত্র যতই বিশ্বাসযোগ্য হোক না কেন তা আঞ্চলিক চিত্র মাত্র, উপন্যাস নয়।''[৬৬] তবে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য এরূপ সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছে — ''আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করাই আঞ্চলিক উপন্যাসের শেষ লক্ষ্য। . . . 'পদ্মানদীর মাঝি'তে (১৯৩৬) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্চলিক ভূ-প্রকৃতি ও প্রকৃতিনির্ভর জীবনকে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ অনুসরণ করেও জীবনের গভীর নদীপ্রতিম রহস্যকে উদ্ভাসিত করে তোলেন।''[৬৭] সুতরাং এই বিষয়টি নিয়ে যে 'পদ্মানদীর মাঝি'র আঞ্চলিকতাকে নস্যাৎ করা যায় না তা নিশ্চিত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়র 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটিকে সকলে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস না বললেও কেউ উপন্যাসটির আঞ্চলিক লক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি। এই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু এবং পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রয়োগ নিয়ে অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ সপ্রশংস মন্তব্য করে বলেছেন — ''পদ্মাতীরবর্তী ধীবর-জীবন এর মুখ্য কথাবস্তু। সম্ভবত এটিই প্রথম বাংলা উপন্যাস যেখানে আদ্যন্ত কথোপকথনে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।''[৬৮] মানিক-গবেষক কানাই সেন

এই উপন্যাসটির আঞ্চলিক লক্ষণগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন — ''সমাজের একটি শ্রেণীর সম্পূর্ণ শ্রেণী-চরিত্র তুলে ধরতে গেলে কিম্বা একটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে ঔপন্যাসিকের যে দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভঙ্গি এবং বাস্তব জ্ঞানের প্রয়োজন পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সেগুলি পরিপূর্ণভাবে দেখা গেছে। উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে আছে এর পরিচয়। মুখের ভাষা থেকে শুরু করে সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার, বিশ্বাস এবং সর্বোপরি পরিবেশ সচেতনতায় এ উপন্যাসটি একটি শ্রেণী-বিশেষের পূর্ণাঙ্গ জীবন-চিত্র হিসেবে সার্থক হয়েছে।''[৬৯] শুধু এই মন্তব্যটির ভিত্তিতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটিকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায়। তবুও এর আঞ্চলিকতা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। অবশ্য সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব বসু প্রদত্ত তাঁর পরিভাষা সংক্রান্ত গ্রন্থটির একটি মন্তব্যে — ''আঞ্চলিক উপন্যাসে দেশের এক বিশেষ অঞ্চলের পরিচয় থাকতেই হবে — এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, কিম্বা বর্ণিতব্য অঞ্চলের ভাষাই (অর্থাৎ সেখানকার উপভাষা বা dialect) চরিত্রাবলীর মাধ্যমে উচ্চারিত হবে — তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। জন্মভূমির একটি বিশেষ অংশের মধ্যে মানুষের একটা পরিচয় থাকে, কিন্তু তাকে ঐ পরিবেশনির্ভর (সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ পরিসরজনিত) আবহাওয়ার বাইরে আসতে হয়, সেখানে সে দেশ-কালের বাইরের সত্তাকে উপলব্ধি করে। আঞ্চলিক উপন্যাসেও মানুষের এই সত্তার পরিচয় দিতে হবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'তে কুবের পদ্মার মতই আবেগ-সম্পন্ন হয়েছে, জন্মভূমিখন্ডের প্রকৃতি তাকে জীবনচেতনায় নিয়ন্ত্রিত করেছে — এইখানেই আঞ্চলিক উপন্যাসের সার্থকতা।''[৭০]

যাই হোক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হতে পেরেছে কি না — এই সংক্রান্ত অজস্র প্রশ্ন আজ পর্যন্ত উঠেছে। সম্ভবত এই ধরনের প্রশ্ন আরও উঠবে। কারণ এই উপন্যাসটি বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের একেবারে প্রথম যুগের রচনা। আঞ্চলিকতার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য তখনও নির্ণীত হয় নি। তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে তা মেনে চলাও সম্ভব হয় নি। অবশ্য এটাও ঠিক যে কোন কালজয়ী সাহিত্য নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্য মেনে চলে না। 'পদ্মানদীর মাঝি'র ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে। এখানে মানিক

পদ্মার তীরে বসবাসকারী ধীবরদের জীবনের একটি রূপকে দেখাতে চেয়েছেন। কুবেরের মধ্যে দিয়ে সে উদ্দেশ্যে তিনি অনেকটা সফলও হয়েছেন। ধীবর কুবের পদ্মার তীর ছেড়ে সুদূর ময়নাদ্বীপের বাসিন্দা হওয়াতেই উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতা লঙ্ঘিত হয়েছে বলে সমালোচকগণ মনে করেন। তবে মনে হয় ধীবর জীবনের অনিবার্য পরিণতিকে দেখানোর জন্যই ঔপন্যাসিক ময়নাদ্বীপের পরিকল্পনা করেছেন। তাই বলা যায় যে, বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রথম যুগের রচনা হওয়ায় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি হয়তো সম্পূর্ণ সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হতে পারে নি ; কিন্তু আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেকগুলি লক্ষণ সঙ্গে নিয়ে বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাস হয়ে উঠেছে।

সরোজকুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩–১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ)–এর একটি জনপ্রিয় ও আলোচিত উপন্যাস হল **'নতুনফসল'**। এটি ট্রিলজি। 'ময়ূরাক্ষী' (১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ), 'গৃহকপোতী' (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ) এবং 'সোমলতা' (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) — এই তিনটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এর কাহিনিবস্তু গড়ে উঠেছে। এগুলিতে ঔপন্যাসিক বিনোদিনী নামক এক গ্রাম্য গৃহবধূর জীবন পরিক্রমার ধারাবাহিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের তিনটি ভিন্ন পর্যায়কে প্রকাশিত করেছেন। এই ট্রিলজির অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস তিনটিতে তিনি বীরভূম সংলগ্ন ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশের প্রকৃতি ও কৃষিজীবী মানুষজনের বাস্তব ও জীবন্ত ছবি এঁকেছেন। পাশাপাশি সেই অঞ্চলের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনাড়ম্বর জীবনচর্যারও ছবি এই উপন্যাসত্রয়ীতে উজ্জ্বলভাবে উঠে এসেছে। তাই একটি বিশেষ অঞ্চল ও সেখানকার অধিবাসীদের জীবনচর্যাকে ভিত্তি করে রচিত এই ট্রিলজিটির আলোচনা সমালোচকেরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই করেছেন। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই ট্রিলজির অন্তর্ভুক্ত উপন্যাস তিনটিকে বৈষ্ণব জীবনের সত্য বলে মেনে নিয়ে জানিয়েছেন — ''বৈষ্ণব জীবনের সত্য চিত্র হিসাবে শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' ও 'সোমলতা' (১৯৩৮) — এই তিন খন্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাসাবলী উল্লেখযোগ্য।''[৭১]

'ময়ূরাক্ষী'তে ঔপন্যাসিক বীরভূম সীমান্তবর্তী পশ্চিম মুর্শিদাবাদের ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী কমলপুর নামক একটি গ্রামকে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই কমলপুর গ্রামের উনিশ বর্ষীয়া গৃহবধূ বিনোদিনী হল এই উপন্যাস তথা সমগ্র

‘নতুনফসল’ ট্রিলজির নায়িকা। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক স্বামী হারান এবং হাবল ও মেনি নামের দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে তার আপাত সচ্ছল সংসার। উপন্যাসের কাহিনি অংশে দেখা যায় মোটামুটি অবস্থাপন্ন পরিবারের গৃহবধূ বিনোদিনী সারাদিন পল্লী সংসারের অভ্যস্ত খাঁটা-খাটুনির মধ্য দিয়ে স্বামী-সন্তানদের নিয়ে সংসার জীবন নির্বাহ করে। আপাতভাবে তাকে সুখী বলে মনে হলেও স্বামী হারানের সঙ্গে বয়সের ব্যবধান তাকে মাঝে মাঝে সংসার বিমুখ করে তোলে — সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করলেও প্রায় রাতেই সে স্বামীর সঙ্গে কলহে জড়িয়ে পড়ে। হয়তো এই কারণেই একদিকে কলেজে পড়া গ্রাম্য তরুণ তারাপদ এবং অপরদিকে বাল্যপ্রণয়ী চালচুলোহীন বৈষ্ণব গৌরহরির প্রতি আকর্ষণ তাকে মাঝে মাঝেই উন্মনা করে তোলে। বাল্যপ্রণয়ী গৌরহরির আকর্ষণই সে বেশি করে অনুভব করে। গৌরহরির গান তার মনকে মাঝেমাঝেই সংসার জীবন থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বাউল-বৈষ্ণবদের আখড়ায়। এর ফলশ্রুতিতে হারানের সঙ্গে সামান্য সাংসারিক বিবাদে জড়িয়ে পড়ে বিনোদিনী স্বামীগৃহ ত্যাগ করে। বিনোদিনীর এই স্বামীগৃহ ত্যাগের মধ্য দিয়েই সরোজকুমারের ‘ময়ূরাক্ষী’র কাহিনি অংশ শেষ হয়েছে।

‘ময়ূরাক্ষী’র পর বিনোদিনীর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ‘গৃহকপোতী’র মধ্য দিয়ে। এর কাহিনি অংশে দেখা যায় স্বামীগৃহ ত্যাগ করে বিনোদিনী তার বাল্যসখী ললিতার কাছে আশ্রয় নেয়। বৈষ্ণব সমাজের ললিতা স্বামীগৃহ ত্যাগ করে আপন মনের মানুষ রসময়কে নিয়ে সাতগাঁ-কাঞ্চনপুরে আখড়া তৈরি করে বাস করছিল। এখানে গৃহধর্মের বেড়াজালহীন মুক্ত আকাশে বিচরণ করা রসময়-ললিতার উদাসী সংসার জীবন বিনোদিনীকে আকর্ষিত করলেও গৃহকপোতী বিনোদিনীর গৃহীমনকে ফেলে আসা সংসার এক অজানা আকর্ষণে টানতে থাকে। তাই রসময়ের আখড়াতেই সে নিজের একাকী সংসার পেতে বসে — রীতিমত মানুষের ধান-কলাই ভেঙে দিয়ে পয়সা রোজগার শুরু করে দেয়, এমনকী লোককে ধার-বাকী দিয়ে সুদ আদায়ের ব্যবসাও সে শুরু করে। এদিকে বাউল-বৈষ্ণবদের মুক্ত আকাশ, গানের সুরকেও সে ভুলতে পারে না — তার হৃদয় কন্দরে লুকিয়ে থাকা গৌরহরির প্রতি গুপ্ত প্রণয় মাথা চাড়া দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে বিনোদিনীর মা এবং দাদা নিতাইপদ এসে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যায়। বিনোদিনীর দাদার সংসারে ফিরে যাওয়ার মধ্য

দিয়ে উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 'ময়ূরাক্ষী'তে ঔপন্যাসিক বিনোদিনী-হারাণের সংসার জীবনের প্রেক্ষিতে কৃষিজীবনের ছবি আঁকলেও 'গৃহকপোতী'তে রসময়ের আখড়ার প্রেক্ষিতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জীবনচর্যার অন্তর্নিহিত দিকটিকে প্রকাশ করেছেন।

এরপর দাদা-বৌদির সংসারে বিনোদিনীর জীবনের তৃতীয় পর্যায় 'সোমলতা' সূচনা হয়। এর কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, দাদার সংসারে থাকাকালীন অবস্থায় গৌরহরির প্রতি বিনোদিনীর গুপ্ত প্রণয় প্রকাশ্যে আসে। এ সময় বিনোদিনী বারবার নিজের হৃদয়কে চেনার চেষ্টা করলে, প্রতিবারই তার হৃদয় গৌরহরির প্রতি ধাবিত হয়। এর ফলস্বরূপ তার জীবনে কলঙ্ক নেমে আসে। সে গৌরহরিকে একেবারে আপন করে পেতে চায়। কিন্তু বিনোদিনীকে কলঙ্কিত করার পর থেকেই গৌরহরির মন অন্যদিকে ধাবিত হয় — সে আপন সম্প্রদায়ের কিশোরী কমললতাকে নিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এদিকে গৌরহরির কাছ থেকে পাওয়া কলঙ্কই বিনোদিনীকে পরিশুদ্ধি দেয়। তাই উপন্যাসের শেষে দেখা যায় যে, সে স্বামী হারান এবং দুই সন্তান হাবল ও মেনিকে সঙ্গে নিয়ে কমলপুরে পুনরায় তার নিজের সংসারে ফিরে যায়। উপন্যাসের শেষে বিনোদিনীর আপন সংসারে ফিরে যাবার বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''বাঁধাঘাটের উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ললিতা আর নয়নতারা দেখলে, সেই মাঠের পথ ভেঙে ওরা চলেছে ষ্টেশনের দিকে। আগে হারান। তার মাথায় বিনোদিনীর পেটারী, কোলে মেনী। কালো কষ্টিপাথরে খোদাই-করা মূর্তির মতো বলিষ্ঠ, সুদীর্ঘ, সুঠাম দেহ। মাথায় মধ্যাহ্ন সূর্যের পরিপূর্ণ আলোর রাজছত্র। যেন সে এই বসুন্ধরার দিগ্বিজয়ী রাজা। পাশে তারই লাঠিটি কাঁধে করে দৃপ্ত ভঙ্গীতে চলেছে হাবল। পিছনে বিনোদিনী। মাঠের প্রবল হাওয়ায় তার পিঠের কাপড় নৌকার পালের মত ফুলে ফুলে উঠছে। বাঁধাঘাটের উঁচু পাড় থেকে সবাইকে চেনা যাচ্ছে, কেবল ওকে নয়। ও যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। ও যেন এই বসুন্ধরা স্বয়ং — আলোয় ছায়ায়, অন্ধকারে, ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপে দেয় দেখা। কলঙ্কে এবং মহিমায় সে রূপের আর শেষ নেই।''[৭২] বিনোদিনীর হৃদয়ের টানাপোড়েন, গৌরহরি দ্বারা কলঙ্কিত হওয়া এবং সেই কলঙ্কের মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে সংসার জীবনে ফিরে আসার মধ্য দিয়েই 'সোমলতা'র পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

এই ট্রিলজির তিনটি উপন্যাসেই ঔপন্যাসিক ময়ূরাক্ষী লালিত পশ্চিম মূর্শিদাবাদের মূল জনসমাজ থেকে নানা দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে নায়িকা বিনোদিনীর জীবন পরিক্রমার তিনটি বিশেষ পর্যায়কে ফুটিয়ে তুলেছেন। এটা করতে গিয়ে তিনি সেই অঞ্চলের চাষি সমাজের পাশাপাশি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জীবনচর্যার ছবি প্রকাশ করেছেন। ফলে এগুলিতে সেই অঞ্চলের বিশিষ্ট ভূ-প্রকৃতির পাশাপাশি মানুষজন এবং তাদের জীবনচর্যা অর্থাৎ আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, লোকবিশ্বাস-লোককথা, খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশিষ্ট ভাষারীতির মত আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেক লক্ষণও প্রকটিত হয়েছে। এইজন্য অধ্যাপক অলোক রায়ের 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থের 'আঞ্চলিক উপন্যাস' রচনায় বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু উপন্যাসের সঙ্গে সরোজকুমারের এই উপন্যাসত্রয়ীকেও সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে — ''মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' ও 'সোমলতা' . . . প্রভৃতি কতকটা ব্যাপক অর্থে আঞ্চলিক উপন্যাস।''[৭৩] অবশ্য এই 'নতুনফসল' ট্রিলজির অন্তর্গত উপন্যাস-ত্রয়ীকে আঞ্চলিক উপন্যাসের আখ্যা দেওয়া যায় কি না তা নির্ধারণের পূর্বে এগুলিতে আঞ্চলিক লক্ষণ কতটা ফুটে উঠেছে সেটা জানা অত্যন্ত জরুরি।

যে কোন সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান শর্ত হল যে, ঐ উপন্যাসে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিশিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার জনসমাজকে তুলে আনতে হয়, যাদের সম্পর্কে তথাকথিত সভ্যসমাজের মানুষজন খুব বেশি খোঁজ খবর রাখে না। ঔপন্যাসিক সরোজকুমার এইরকম মানসিকতারই লোক ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' গ্রন্থে শিশিরকুমার দাশ জানিয়েছেন — ''সরোজকুমারের রচনার ভৌগোলিক পটভূমি মূর্শিদাবাদ। এখানকার নদীপ্রান্তর, মানুষ তাঁর উপন্যাসের মূল উপকরণ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতই তাঁর উপন্যাসে একটি স্থানগত বৈশেষিকতা আছে।''[৭৪] 'নতুনফসল' ট্রিলজির তিনটি উপন্যাসেই তিনি পটভূমি হিসেবে ময়ূরাক্ষী লালিত বীরভূম সংলগ্ন পশ্চিম মূর্শিদাবাদের গ্রামাঞ্চল এবং সেখানকার জনসমাজকে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাস তিনটির কাহিনি ধারার মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও এগুলির প্রধান

ঘটনাস্থল হিসেবে তিনটি স্বতন্ত্র স্থানকে তিনি নিয়ে এসেছেন। এরমধ্যে প্রথম উপন্যাস ‘ময়ূরাক্ষী’র ঘটনাস্থল হারান-বিনোদিনীর কমলপুর গ্রাম, দ্বিতীয় উপন্যাস ‘গৃহকপোতী’র ঘটনাস্থল সাতগাঁ-কাঞ্চনপুরের রসময়-ললিতার আখড়া, আর তৃতীয় উপন্যাস ‘সোমলতা’র ঘটনাস্থল মূলত বিনোদিনীর বাপের বাড়ির গ্রাম, তবে এই উপন্যাসের কিছু ঘটনা বৈষ্ণব সমাজের বড় বাবাজীর আখড়াতে এবং কমলপুরে হারানের বাড়িতে ঘটেছে। এই স্থানগুলি সবই তথাকথিত মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। এজন্য ঔপন্যাসিক এই জায়গাগুলির আলাদা করে স্থান নির্দেশও করে দিয়েছেন। প্রথম উপন্যাস ‘ময়ূরাক্ষী’র শুরুতেই গ্রীষ্মের জলহীন ময়ূরাক্ষীর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে সরাসরি উপন্যাসের পটভূমি কমলপুরের বর্ণনায় ঢুকে পড়েছেন — ‘‘এদিকে, কমলপুরের দিকে, খেয়াঘাটের কিছু উপরেই স্নানের ঘাট। সরু এক ফালি রাস্তা উঁচু পাড় থেকে এঁকে বেঁকে ঘাটে নেমে এসেছে। স্নানের সময় সে রাস্তা মেয়েদের ভিজে কাপড়ের জলে এমন পিছল হয়ে থাকে যে নিতান্ত অভ্যস্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কারও সে পথে ওঠা-নামা করা কঠিন। মেয়েরা পারে। তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। তারা ঘাটে ঘড়া নামিয়ে বসে দাঁত মাজে, নিজেদের ঘরকন্না সুখ দুঃখের গল্প করে, ওরই মধ্যে খেয়াঘাটে যারা পার হয় গুণ্ঠনের ফাঁকে তাদেরও দেখে নেয়। তারপর স্নান শেষ করে জলভরা ঘড়া কাঁখে নিয়ে ডানহাত দোলাতে দোলাতে অবলীলাক্রমে উপরে উঠে আসে।

উপরেই একটা প্রাচীন বটবৃক্ষ চারিদিকে ছায়ায় অন্ধকার করে আছে। তারই নীচে দিয়ে গ্রামে আসার পথ। আলপথে একটুখানি এসেই গ্রামের রাস্তা, আলের চেয়ে খানিকটা চওড়া। গ্রামখানি নিতান্তই ছোট। সকলেই চাষি গৃহস্থ। সম্মুখেই কয়েক ঘর কুমোরের বাস। তাদের শালের আগুনের ধোঁয়া অনেক দূর থেকেও দেখা যায়। ওদিকে গ্রামের অপর প্রান্তে কয়েক ঘর হাড়ি-বাগ্দি বাস করে, গ্রাম থেকে একটুখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে অত্যন্ত জরাজীর্ণ ছোট ছোট চালাঘরে।’’[৭৫]

দ্বিতীয় উপন্যাস ‘গৃহকপোতী’র শুরু হয়েছে বাউল-বৈষ্ণব রসময়-ললিতার আখড়াস্থল সাতগাঁ-কাঞ্চনপুর গ্রামের বর্ণনা দিয়ে — ‘‘সাতগাঁ-কাঞ্চনপুর গ্রামখানি আকারে বড়। আসলে দু’টি একই গ্রাম, মধ্যে একটি পুল। পুলের এধার সাতগাঁ, ওধার কাঞ্চনপুর। এইটুকুমাত্র ব্যবধানে পৃথক গ্রাম হওয়ার কথা নয়। পার্থক্য গ্রাম

দু'টি পৃথক জমিদারের অধীন ব'লে। সাতগাঁর জমিদার সিংহগোষ্ঠী, কাঞ্চনপুরের মল্লিকবাবুরা। সাতগাঁয়ে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের সংখ্যাই বেশি। অন্যান্য জাতি দু'চার ঘর ক'রে। কাঞ্চনপুরে সদ্‌গোপের সংখ্যাই বেশি। অন্য জাতির সংখ্যা কম। পশ্চিম প্রান্ত ময়ূরাক্ষী। তার ধারে অনেকখানি জায়গা নিয়ে উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়, তার ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ ইত্যাদি। তারই অদূরে একটা আমবাগানের মধ্যে রসময়ের আখড়া। একেবারে নদীর উপরে বললেই হয়।''[৭৬]

'সোমলতা'য় আলাদা করে কোন গ্রামের বর্ণনা না থাকলেও এর মূল পটভূমি বিনোদিনীর বাপের বাড়ির গ্রাম এবং সেখানকার কৃষিভিত্তিক জনসমাজ। এখানে গৌরহরির আখড়াকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জীবন চর্যারও উল্লেখ আছে। 'নতুনফসল' ট্রিলজির তিনটি উপন্যাসেই মূলত কৃষিনির্ভর গ্রাম সমাজের ছবি উঠে এসেছে। তবে ময়ূরাক্ষী নদী এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আখড়াগুলি উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামগুলিকে মূল জনসমাজ থেকে নানা দিক থেকেই স্বতন্ত্র করেছে। 'ময়ূরাক্ষী' উপন্যাসটির শুরুতেই শেষ গ্রীষ্মের ময়ূরাক্ষীর বর্ণনা দিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন —

''ময়ূরাক্ষী চলে বয়ে।

শেষ গ্রীষ্মের ময়ূরাক্ষী। স্রোত তার ক্ষীণ হয়ে এসেছে। একদিকে ধূ ধূ করছে বালুচর। কত পাখির পায়ের দাগ তার উপর বিচিত্র আলপনা কেটে গেছে। চিহ্ন রয়েছে কত মানুষের পায়ের দাগের। কেউ জল নিতে এসেছে, কেউ গেছে। গত রাতের চক্রবাকী ফেলে গেছে একটি পালক। সেটি হাওয়ায় ইতস্তত উড়ছে। কর্মব্যস্ত মানুষের চোখে তার মূল্য নেই। দুটি পাখির নিগূঢ় বিরহ-মিলন কথার এই নীরব সাক্ষী কারও চোখে পড়ে না। ক্ষয়-ক্ষীণ শীর্ণা ময়ূরাক্ষীতে এখন খেয়াঘাটে নৌকা নেই। খেয়া পারাপার বন্ধ। লোকে হেঁটে পার হচ্ছে। তারই চিহ্ন নদীতটে আঁকা। কাকচক্ষুর মত নির্মল জলে এক টুকরো আকাশের ছায়া পড়ে। দিনে রৌদ্রজ্জ্বল ধূসর আকাশ, অপরাহ্নে গলিত স্বর্ণাভ, রাত্রে তারায় ভরা নির্মল নীল। . . . এমনি করে বয়ে চলেছে ময়ূরাক্ষী। কোথাও গ্রামের কোল ঘেঁষে লাজনম্রা তনুদেহ কিশোরী বধূর মত। কোথাও দিগন্তপ্রসারী ছায়াহীন শূন্য মাঠের মধ্য দিয়ে অনশনক্ষীণা ব্রতচারিণী দেয়াসিনীর মতো। আবার দহের কাছে যেন স্থির-যৌবনা বিলাসিনীর মতো, তার নিস্তরঙ্গ নীলাভ কালো জল মৃত্যুর মতো লোভার্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।''[৭৭] এই ময়ূরাক্ষী লালিত

অঞ্চলটির সঙ্গেই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা একাত্ম হয়ে উঠেছে। এই কারণেই সমালোচক বলেছেন — ''বীরভূম-মুর্শিদাবাদের ময়ূরাক্ষী নদীলালিত অঞ্চলের প্রকৃতির সঙ্গে সরোজকুমারের উপন্যাস তিনটির বৈষ্ণব পাত্রপাত্রীর নিবিড় সংযোগ। বিনোদিনী ও হারানের জীবন ঐ প্রকৃতির জীবন ছন্দে এরই সুরে বাঁধা।''[৭৮] সুতরাং উপন্যাসত্রয়ীতে উল্লিখিত ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী অঞ্চলটিও একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। এটি যে কোন সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

এই ট্রিলজির চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনটি উপন্যাসেই মূলত দুই ধরনের চরিত্র আছে — কৃষক পরিবারের চরিত্র এবং বৈষ্ণব চরিত্র। উপন্যাসের নায়িকা বিনোদিনী, তাঁর স্বামী হারান, দুই সন্তান হাবল ও মেনি, তার মা, দাদা নিতাইপদ, বৌদি নয়নতারা, বাপের বাড়ির গ্রামের শিবদাস এবং তার মা ও স্ত্রী, কমলপুর গ্রামের রসিক পাল এবং তার স্ত্রী ও পুত্রবধূ মানিকের মা, তারাপদের বাবা সদানন্দ, মা ও বোন কিশোরী, রতনমণি, বৃন্দাবন, বৃদ্ধ গয়ানাথ, হারানের বাড়ির রাখাল থেকে শুরু করে অসংখ্য কৃষক পরিবারের চরিত্র এই উপন্যাস তিনটিতে দেখা যায়। কৃষক পরিবারের চরিত্রগুলি মূলত 'ময়ূরাক্ষী' এবং 'সোমলতা'তেই আছে। এদের পাশাপাশি বৈষ্ণব চরিত্রগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এরূপ চরিত্রগুলির মধ্যে প্রধান হল বিনোদিনীর বাল্যপ্রণয়ী গৌরহরি, গৌরহরির বোন ও বিনোদিনীর বাল্যসখী ললিতা ও তার স্বামী রসময়। এরা ছাড়াও ছোট বাবাজী সহ বড় বাবাজীর শ্রাদ্ধকার্যে আসা ও গৌরহরির আখড়ায় মহোৎসবে উপস্থিত মানুষজন এবং তমাললতা হল বৈষ্ণব চরিত্র। এছাড়াও কলেজে পড়া তারাপদ, সাতগাঁ-কাঞ্চনপুরের তামাকের লোভে রসময়ের আখড়ায় হাজির হওয়া ইংরেজি ইস্কুলে পড়া সুদাম ও রাধিকা, গ্রাম্য ওঝা, ডাক্তারের মত বেশ কিছু স্বতন্ত্র চরিত্রও এই উপন্যাস তিনটিতে আছে।

ঔপন্যাসিক নিজে মুর্শিদাবাদের এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মেছিলেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোর গ্রামেই কেটেছিল। সুতরাং গ্রাম্য কৃষিজীবী মানুষ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। নিজের চোখে দেখা কৃষিজীবী মানুষদেরই তিনি এই উপন্যাসে কৃষক চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এজন্য তিনি হারান, সদানন্দ, নিতাইপদ, বৃন্দাবন, রসিক পালের মত গ্রাম্য কৃষকদের যথার্থভাবেই এঁকেছেন। এদের কথাবার্তা,

আলাপ-আলোচনা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই কৃষিকাজকে ভিত্তি করেই এগিয়েছে। নায়িকা বিনোদিনী ও তার বৌদি নয়নতারা যথার্থই কৃষকবধূ রূপে অঙ্কিত। বাংলার প্রায় সমস্ত কৃষকবধূর মত এদের জীবন পরিক্রমাও স্বামী, সন্তান, সংসারের মঙ্গল কামনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এজন্য রসময়ের আখড়ায় থাকার সময় অথবা দাদার সংসারে থাকার সময় এক মুহূর্তের জন্যেও বিনোদিনী তার সংসারের চিন্তা ত্যাগ করতে পারে নি। তবে কৃষক পরিবারের এই চরিত্রগুলি চিত্রণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক পারদর্শিতা দেখালেও সেই অর্থে অভিনবত্ব আনতে পারেন নি। তারাপদ, গ্রাম্য ওঝা, ইংরেজি ইস্কুলে পড়া ছাত্রদ্বয়, ডাক্তারের মত চরিত্রগুলি গতানুগতিক চরিত্ররূপেই চিত্রিত। তবে তিনি অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন গৌরহরি, রসময়, ললিতা, ছোট বাবাজী, কমললতা, বড় বাবাজীর শ্রাদ্ধসভায় এবং গৌরহরির আখড়ায় উপস্থিত হওয়া বৈষ্ণব সমাজের নানা ধরনের নরনারীর চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে। শোনা যায় তাঁর এইসকল বৈষ্ণব চরিত্র চিত্রণ দক্ষতা দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য ঔপন্যাসিক নিজ স্বীকারোক্তিতেই জানিয়েছিলেন যে, তাঁদের অঞ্চলটা বৈষ্ণব প্রধান এবং তাঁরা বৈষ্ণব পদকর্তা যদুনন্দন দাসের বংশধর। ফলে তাঁর দেহেও আছে বৈষ্ণবীয় রক্ত। হয়তো এই কারণেই তাঁর উপন্যাসত্রয়ীতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষগুলি অত্যন্ত জীবন্তভাবে স্থান পেয়েছে। এসব ছাড়াও তিনি এখানে মুর্শিদাবাদ-বীরভূম সীমান্তে বয়ে চলা ময়ূরাক্ষী নদী এবং তার তীরের প্রকৃতিকেও চরিত্রায়ন করেছেন। ময়ূরাক্ষীর প্রকৃতিই যেন নায়িকা বিনোদিনীর মানসিক কাঠামো গড়ে তুলেছে। ময়ূরাক্ষীর মতই কখনো সে সুজলা-সুফলার অবতার নিয়ে সংসার জীবনকে ভরিয়ে দিয়েছে, কখনো গ্রীষ্মের শুষ্কতায় নিজের জীবনে হাহাকার ডেকে এনেছে, আবার কখনো বা দু'কূল প্লাবী বানে নিজে তো ভেসেছেই, তার আপাত সুখী সংসারকেও ভাসিয়ে দিয়েছে। এজন্য এই ট্রিলজিতেও মূল জনসমাজ থেকে আপাত বিচ্ছিন্ন একটি বিশিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার গ্রাম্য প্রকৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে।

এগুলি ছাড়াও এই ট্রিলজির অন্তর্গত উপন্যাস তিনটিতে আঞ্চলিক উপন্যাসের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। আগেই বলা হয়েছে এখানে মূলত দু'ধরনের চরিত্র আছে — কৃষক শ্রেণির চরিত্র এবং বৈষ্ণব চরিত্র। ঔপন্যাসিক

শুধু এই দু'ধরনের চরিত্র চিত্রণ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি — তাদের জীবনের বিস্তারিত ছবিও প্রকাশ করেছেন। ফলে আমরা চাষিজীবনের সঙ্গে যুক্ত নানা রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, লোককথা, অন্ধবিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষারীতির পাশাপাশি এখানে বৈষ্ণব সমাজের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষারীতি সহ অনাড়ম্বর মাধুর্যময় জীবনের ছবিও পাই।

এই উপন্যাস তিনটিতে ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী মূর্শিদাবাদ-বীরভূম সীমান্তের বিশেষ অঞ্চলটির কৃষকসমাজের বাস্তব ও জীবন্ত ছবি উঠে এসেছে। ফলে চাষবাসের খুঁটি-নাটি বিবরণসহ এর সঙ্গে যুক্ত গ্রাম্য-দলাদলি, পরশ্রী-কাতরতা, কুৎসা-রটনা, গ্রাম্য লোককথা, পুষ্কর মেঘের বৃত্তান্ত, ছড়া-প্রবাদ, ডাক-খনার বচন, বৃষ্টি নামাতে ব্যাঙের বিয়ে, ওঝা দ্বারা ভূত তাড়ানো, বাস্তু সাপ জনিত গ্রাম্য সংস্কার প্রভৃতির উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে যথার্থ আঞ্চলিক পরিবেশও ঔপন্যাসিক গড়ে তুলেছেন। ঐ অঞ্চলে একটি ছড়া প্রচলিত ছিল —

''যদি বর্ষে ফুনি ফুনি
বাঁশের ডগায় শোল পৌনি।
যদি বর্ষে ছিটে ফোটা,
তবে জানবে বর্ষা গোটা।
যদি বর্ষে মুষলধারে,
মাঝ দরিয়ায় বগা চরে।''[৭৯]

হারান এই ছড়াটির মর্মকথা জানতো, তাই বর্ষার শুরুতে মুষলধারে বৃষ্টি দেখে দুশ্চিন্তায় পড়েছে। তবে সদানন্দের কাছে 'পুষ্কর মেঘ'-এর গল্প শুনে তার আশংকা অনেকটাই কমে গেছে। গ্রাম্য মানুষকে নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়। এই উপন্যাসে 'ডাইনি বুড়ির গল্প', ওঝা দিয়ে ভূত তাড়ানোর ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে সেসবের ছবিও আঁকা হয়েছে। এছাড়াও অনাবৃষ্টির কারণ হিসেবে হারান মনে করেছে —

''চত্রি মাসে পাঁচ শনি,
লরের মাংস না খায় শকুনি।''[৮০]

এই অনাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গ্রামের ছোট ছোট মেয়েরা ব্যাঙের বিয়ের আয়োজন করেছে। এই বিয়েতে বিয়ে সংক্রান্ত নানা লৌকিকতা পালনের পাশাপাশি গ্রাম্য ছড়াও গাওয়া হয়েছে। যেদিন ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই রাতেই প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে। হারানের বাস্তু সাপ মারা যাওয়া এবং সেই কারণে প্রায়শ্চিত্ত করার মধ্য দিয়ে গ্রাম্য সংস্কারের আর একটি দিকও এই উপন্যাসে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সাংসারিক জিনিসপত্রের মধ্যে এখানে 'তালপাতার তালাই', 'বসার চাটাই', 'গাই দোয়ার কেঁড়ে', 'মাছধরার ঘাটজাল', 'তেল রাখার চোঙ' প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে এখানে ঔপন্যাসিক গ্রাম্য পাঠশালা, মাইনর স্কুল, ইংরেজি বোর্ডিং স্কুলের উল্লেখ করেছেন। চাষিঘরের বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করত না বললেই চলে। অবশ্য কেউ কেউ গ্রামের পাঠশালা ও মাইনর স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে শহরে কলেজে পড়তে যেত। এখানে গ্রাম্য ছেলে তারাপদ তা করেছে। তবে একে গ্রামের মানুষ বিলাসিতাই মনে করত। এজন্য তারাপদের পিতা সদানন্দকে নানা কটাক্ষ শুনতে হয়েছে। কেউ কেউ নিজেদের ছেলেকে দূরের গ্রামে ইংরেজি বোর্ডিং ইস্কুলে রেখেও পড়াত। সুদাম এবং রাধিকা — এই রকম দুইজন বোর্ডিং ইস্কুলে পড়া ছাত্র। ঐ অঞ্চলে পয়সার বদলে বিনিময় ব্যবস্থাও যে চালু ছিল তাও এখানে দেখানো হয়েছে।

ঐ অঞ্চলের মানুষজনের খাদ্যতালিকা ও খাদ্যাভ্যাসের পরিচয়ও এই ট্রিলজিতে আছে। প্রাতঃরাশ হিসেবে মুড়ির চলই ছিল। তবে এর সঙ্গে শশা, কাঁচা লঙ্কা, গুড়, দই প্রভৃতি খাবার যুক্ত হত। হারানের প্রাতরাশের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''বিনোদিনী একটা বড় জামবাটিতে করে একবাটি মুড়ি, তার ধারে দু কুচি শশা, একটা কাঁচা লঙ্কা, একটা বাটিতে একবাটি গুড় আর একবাটি দই তার সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল।''[৮১] বাড়িতে আত্মীয়-কুটুম্ব এলে খাবারে নতুনত্ব যোগ হত। তাই বিনোদিনী প্রদত্ত রসময়-ললিতার জলখাবারের তালিকায় দেখা যায় — ''চিড়ে ভাজা, ছোলা ভাজা, নারকেল, আদার কুচি, কাঁচা লঙ্কা, শশা, বড় জামবাটিতে বাটিভরা মুড়ি, গুড়, দই।''[৮২] প্রধান খাবারের তালিকায় গরম ভাত, পান্তা ভাত, পেঁয়াজ দিয়ে কলাই বাটা, শাক, টক দিয়ে মাছের ঝোল প্রভৃতি ছিল।

তামাক পুরুষদের কাছে অত্যন্ত আবশ্যকীয় ছিল — ''এখানে তামাক খাওয়াটা ভাত-মুড়ির মত একটা খাদ্য।''[৮৩]

উপন্যাস তিনটির কৃষক পরিবারের লোকেরা সাধারণ চলিত ভাষায় কথা বললেও তাদের কথায় অনেক আঞ্চলিক শব্দ ঢুকে গেছে। 'ভগমান', 'গোবর সানতে বসা', 'গরু পিইয়ে যাওয়া', 'মাছ ধরে ভুট্টি নাশ করা' প্রভৃতি এইরকম আঞ্চলিক শব্দ। শ্রী সঞ্জয় ভট্টাচার্য মহাশয় সরোজকুমারের এই চাষি সংলাপ রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে জানিয়েছেন — ''চাষি সংলাপে তিনি (সরোজ) . . . শরৎচন্দ্র ও তারাশংকরের চাইতে (তাঁদের অন্য অনেক কৃতিত্ব সত্ত্বেও) অধিকতর দক্ষ এবং সে-জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতর বলেই মনে হয়। তাছাড়া চাষিদের জীবন দর্শন সম্পর্কেও সরোজকুমার পূর্বসূরীর চাইতে বেশি ওয়াকিবহাল।''[৮৪]

এইভাবে ঔপন্যাসিক তাঁর 'নতুনফসল' ট্রিলজিতে চাষিদের জীবনচর্যার বিবরণ তুলে ধরে আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করেছেন। তবে শুধু চাষিদের জীবন চিত্রণের জন্য নয়, এখানে মূলত সেই অঞ্চলের বৈষ্ণবদের অত্যন্ত বাস্তবসম্মত জীবনচর্যার ছবি আঁকার কারণেই তাঁকে বাংলা আঞ্চলিক সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার তারাশঙ্করের 'সমানধর্মা' বলা হয়। এই উপন্যাস ত্রয়ীতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষজনের জীবনচর্যার যথার্থ প্রকাশ ঘটার কারণেই অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এদের আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে চেয়েছেন — ''আঞ্চলিক উপন্যাসের সার্থক উদাহরণ সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী' গোষ্ঠীভুক্ত তিনটি উপন্যাস : 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' ও 'সোমলতা' (১৯৩৮)। রাঢ়-বাংলার গ্রামজীবনের পটভূমিতে বিধৃত বৈষ্ণব সমাজের কাহিনী এই উপন্যাস ত্রয়ী। বৈষ্ণব সমাজের স্বাধীন স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত নরনারীর জীবন কাহিনী এখানে চিত্রিত হয়েছে।''[৮৫] একথা সত্যি যে, ঔপন্যাসিক এগুলিতে রাঢ়ের বৈষ্ণবীয় জীবনধারার অত্যন্ত স্বাভাবিক ও জীবন্ত ছবি এঁকেছেন। তিনি বৈষ্ণব জীবনের সহজ, নির্লিপ্ত, নৈতিকতার প্রভাবমুক্ত জীবন-মাধুর্য প্রকাশ করতে ঔপন্যাসিক কুণ্ঠিত হননি। উপন্যাসগুলিতে গৌরহরি, রসময়, ললিতারা নিজেদের গানের মধ্য দিয়ে সমাজ-সংস্কারের বাধাবন্ধনহীন মুক্ত জীবনের আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে জীবনপথে এগিয়ে চলেছে — গানের

মধ্য দিয়েই এরা যেন জীবনে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, হৃদয়-যন্ত্রণা, অভাব-অনটন ভুলে থাকতে চায়। মনের টানে এই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা জোড় বেধে আখড়া তৈরি করে বসবাস করলেও কেউ কারো প্রতি অহেতুক অসপত্ন অধিকার ফলাতে যায় না। এজন্য অনায়াসেই ললিতা তার আপাত সচ্ছল স্বামীগৃহ ত্যাগ করে 'মনের মানুষ' রসময়ের সঙ্গে 'কণ্ঠিবদল' করে একসঙ্গে যেমন বাস করতে পারে, তেমনি রসময়ের অগোচরে তারাপদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। অনুরূপভাবে গৌরহরিও তার বাল্যপ্রেমকে কলঙ্কিত করার জন্য বিন্দুমাত্র যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় না — বিনোদিনীকে কলঙ্কিত করে ত্যাগ করার পর, গৌরহরি তার নৈতিক স্খলনের চেয়ে দীর্ঘদিনের বিমূঢ়তার জন্য বেশি কষ্ট অনুভব করেছে। এরা 'মনের মানুষ'-এর সঙ্গে 'কণ্ঠিবদল' করে সংসার করার জন্য নয় — সাধনার সঙ্গী হিসেবে কাছে পাবার জন্য। তাই ললিতা-রসময় বা গৌরহরিরা জীবনের যে কোন পিছুটানকে কাটিয়ে উঠে আপন সাধনায় ডুবে যেতে পারে। তারা মনের আনন্দে গান বাধে, সেই গান গেয়ে লোকের দরজায় ভিক্ষা করে। এতে যা জোটে, তা দিয়েই দিনাতিপাত করে। সঞ্চয়ের বা ভবিষ্যতের কোন চিন্তা এদের মধ্যে থাকে না — এমনকী পরদিন কী করে চলবে, তা নিয়েও এরা খুব বেশি ভাবিত নয়। এদের কথাবার্তায় সর্বদা বৈষ্ণবীয় বিনয় থাকে। অনেক সময় বিভিন্ন বৈষ্ণব পদ গেয়ে এরা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করে। এই বৈষ্ণবীয় জীবন ধারার প্রকাশই এই ট্রিলজির অভিনবত্বের দিক। চাষিজীবনের বর্ণনা তো বটেই, এই বৈষ্ণবীয় জীবনের আন্তরিক প্রকাশই এই ট্রিলজিকে মূল ধারার বাংলা উপন্যাস থেকে বের করে এনে আঞ্চলিক উপন্যাস হওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী যখন সরোজকুমারের সমালোচনা করে কিছু কথা বলেন, তখন বিনা বাক্যব্যয়ে সে সব কথা মেনে নেওয়াও যায় না। তিনি বলেছেন — ''তারাশঙ্করের সঙ্গে সরোজকুমারের সমতুলনীয়তা আমাদের সাহিত্যভাবনায় প্রবাদ-প্রতিম হয়ে পড়েছে। অথচ সবটুকুই সকারণ নয়। সরোজকুমারের সর্বাপেক্ষা পরিচিত উপন্যাস-ত্রয়ী — ট্রিলজি — 'ময়ূরাক্ষী' (১৯৩৬), 'গৃহকপোতী' (১৯৩৭) আর 'সোমলতা' (১৯৩৮) একত্রে 'নুতনফসল' নামে পরিচিত। এই উপন্যাসগুচ্ছ নিয়েই তারাশঙ্করের সগোত্রতার কথা পুনঃপুন উচ্চারিত হয়ে থাকে। তিনটি খণ্ড জুড়ে

গ্রাম্যজীবনের নিবিড়-গভীর কাহিনী। কমলপুর গ্রামে 'ভদ্রলোক' এক ঘরও নেই; সবাই চাষা — নিজের হাতে জমি চাষ করে। আর বৈষ্ণব বৈরাগীর আখড়া। এই খড় মাটি নিয়ে কেবল গল্পের কাঠামো নয়, বিচিত্র-বিসর্পিল গতিময় জীবনের পূর্ণ প্রতিমাও গড়া। একই গ্রামীণতার প্রসঙ্গে অঞ্চল-পরিবদ্ধতার কথাও আসে। বীরভূমের সংলগ্ন 'পশ্চিম মুর্শিদাবাদ'-এর গ্রামাঞ্চল যেন চাকলা বেঁধে উঠে এসেছে গল্পের পরিসরে। তাহলেও সরোজকুমারের কাহিনী 'আঞ্চলিক' নয় অবশ্যই, যে-অর্থে তারাশঙ্করের। প্রকৃতি-চকিত গ্রামজীবনের প্রতি শিল্পীর কবিতা-স্নিগ্ধ প্রীতির অনুভবে বিভূতিভূষণের কথাও মনে আসতে পারে। তাহলেও তারাশঙ্করের অতি-সচেতন বর্ণাঢ্যতা কিংবা বিভূতিভূষণের অতি উদ্বেলতা তার নিরুচ্চার উপলব্ধিতে অনুপস্থিত।''[৮৬] এর যথার্থ উত্তর দিতে আমাদের অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্মরণাপন্ন হতে হয় — ''লেখকের একটি বিশেষ গুণ এই যে, চরিত্র পরিকল্পনায় ও মন্তব্য-প্রকাশে তিনি কোথাও সংযম ও পরিমিতিবোধ হারান নাই। আধুনিক উপন্যাসের একটা বিশেষত্ব — over-emphasis বা সুর চড়াইবার প্রবণতা। ইহার চরিত্রগুলি সর্বদাই বিস্ফোরণের (explosion) সীমান্তে দণ্ডায়মান, বিদ্রোহে ফাটিয়া পড়িবার ঠিক পূর্ববর্তী অবস্থায় প্রধূমিত। লেখকের মন্তব্য-বিশ্লেষণও যেন পাঠককে বধির ভাবিয়া লইয়া তাহার কর্ণে অবিমিশ্র উচ্চ চিৎকার। সর্বত্র অস্বাভাবিক তীব্র গতিবেগ, পরিবর্তনের ঘুর্ণিবায়ু, ভূমিকম্পের ভারকেন্দ্রচ্যুত বিপর্যয়, ভাব-বিলাসের অনিশ্চিত বাষ্পাকুলতা। এই সাধারণ প্রবণতার মধ্যে সরোজকুমার একটি প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম। তাঁহার উপন্যাস খুব গভীর বা জটিল নয়, কিন্তু ইহার মধ্যে একটি মৃদু, শান্ত সত্যপ্রিয়তা বর্তমান। বাংলার কৃষক-প্রধান পল্লীজীবনের যে ব্রতপার্বন উৎসবে চাষার আনন্দ ও সৌন্দর্যবোধ উথলিয়া পড়ে, কৃষিকার্যের বিভিন্ন স্তরকে আশ্রয় করিয়া তাহার মনে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভক্তি-বিশ্বাসের মৃদু কম্পন দোলা দেয় লেখক তাহা কোনরূপ অতিরঞ্জন না করিয়া, খুব সহজ ভাবে আঁকিয়াছেন।''[৮৭] উপন্যাসটি সম্পর্কে কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন — ''শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী তাঁহার তিনখানি উপন্যাস বা উপন্যাস-ত্রয়ীতে (ময়ূরাক্ষী, গৃহকপোতী, সোমলতা) যে সৃষ্টি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাহাও অনন্যসুলভ। ইহাতে যেমন

একটি বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ সমাজের জীবনালেখ্য অপূর্ব কলানৈপুণ্য সহকারে অঙ্কিত হইয়াছে, তেমনই সেই সমাজের অন্তরে পূর্ণ প্রবেশ করিবার যে মহানুভব শক্তির পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহাও একটি উৎকৃষ্ট কবিশক্তি। যে ভূমি, যে প্রতিবেশ ও যে সংস্কৃতির পটভূমিকায় তিনি জীবনের এই নতুন রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন, সে যে কত বাস্তব তাহা অনুভব করি তাহার স্টাইলে — ভাষার অতিশয় সংক্ষিপ্ত সরলতায়, ভাবালুতার সতর্ক সংযমে।''[৮৮]

বিশিষ্ট সমালোচক সমরেশ মজুমদার 'নতুনফসল' ট্রিলজির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন — ''নতুনফসলে'র ট্রিলজি অর্থাৎ 'ময়ূরাক্ষী'-'গৃহকপোতী'-'সোমলতা' বৈষ্ণব জীবনের সহজ সারল্যে মণ্ডিত সেই জীবন বিন্যাস যা পশ্চিম দৃষ্টিবাদীদের স্নিগ্ধ শ্যামল মাটির গন্ধে ভরপুর। এখানেই তার আঞ্চলিকতার বন্ধন। ময়ূরাক্ষী তীরস্থ গ্রামীণ জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি এঁকেছেন সরোজকুমার। বাউল জীবনের সঙ্গে নিকট পরিচয়ে অচ্ছেদ্য লেখক, বাউল জীবনে নিভৃত মুহূর্তগুলি তুলে ধরেছেন। এখানকার কৃষক জীবনের উপাদান উপাচারে সজ্জিত করেছেন উপন্যাস শরীরকে, এখানে আছে গ্রামের কলহ উৎসব লৌকিক অলৌকিকতা, তিনটি খন্ডে বিন্যস্ত 'নতুনফসল' চাষি জীবনের গৃহাঙ্গণকে সম্প্রসারিত করেছেন লেখক। পথের দুধারে বৈষ্ণবের আখড়ার দুয়োর পর্যন্ত, যেখানে মিশেছে আসক্তি বিজড়িত মায়ার সংসার ও নির্লিপ্ত বাউলের উদাস বৈরাগ্য — এ দুয়ের সম্মিলন ঘটিয়েছেন সরোজকুমার।''[৮৯] তিনি এখানেই না থেমে আরও বলেছেন — ''পশ্চিম মুর্শিদাবাদের এক ধরনের বাউল-সমাজের জীবন যাপন, জীবনচর্যা, অপরাপর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, সামগ্রিকভাবে জীবন সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণা বিমুক্ত হয়ে একটি অঞ্চল একটি অনন্য অনুভূতির সূত্রে গ্রথিত হয়েছে, সরোজকুমার সাবলীল ভঙ্গিতে সেই জীবনস্বরূপ, গাথা সংযোজিত করে বাংলা উপন্যাসের সামগ্রিক পরিধি যেমন বিস্তৃত করে দিয়েছেন, তেমনি একটি আঞ্চলিকতাবদ্ধ ইতিহাস রচনা করে দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন।''[৯০]

সরোজকুমারের উপন্যাস তিনটির মূল্যায়নে বলা যায় যে, এই উপন্যাসগুলি হয়তো বাংলা সাহিত্যের প্রথম সারির উপন্যাসগুলির মধ্যে পড়ে না, তবে উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা কারণে বিচ্ছিন্ন

ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী বীরভূম সংলগ্ন পশ্চিম মুর্শিদাবাদের একটি বিশেষ অঞ্চল এবং সেখানকার কৃষিজীবী এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষ জনের জীবনচর্যা অর্থাৎ রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোককথা, লোকসংস্কার, ধর্মবিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশিষ্ট ভাষারীতি প্রভৃতির পরিচয় আছে। এগুলি যে কোন সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাই সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' এবং 'সোমলতা'কে সার্থকতার মাপকাঠিতে না ফেলেও আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করাই যায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ)-এর **'আরণ্যক'** উপন্যাসটি ভাগলপুরের অদূরে অবস্থিত ফুলকিয়া, নাঢ়া বইহার, লবটুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের অরণ্য প্রকৃতি ও মানুষের জীবনচিত্র অবলম্বনে রচিত হয়েছে। এর বিজ্ঞাপন অংশে বলা হয়েছে — ''আরণ্যক'-এর পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশী নদীর অপর পারে এরূপ দিগন্ত বিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রান্তর পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বন পাহাড় তো বিখ্যাত।''[৯১] ঔপন্যাসিক কর্মজীবনে পাথুরিয়াঘাটার বিস্তৃত জমিদারী এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে তাদের ভাগলপুরের জমিদারীতে কার্যোপলক্ষে বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন। এইসময় কাজের সুবাদেই তাঁকে ভাগলপুরের অদূরে বন জঙ্গল পরিহিত অঞ্চলে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়। তখন তিনি যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সেগুলির ভিত্তিতে এই উপন্যাসটি রচনা করেন। অবশ্য ভাগলপুরের সেই বনাঞ্চলে কাটানোর সময়েই তাঁর মাথায় ভাবনা আসে যে, এই অঞ্চলটিকে শিল্পিত রূপ দিতে হবে। এ সম্পর্কে তিনি 'স্মৃতির রেখা'য় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারীতে জানিয়েছেন — ''এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখব — একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি।''[৯২] সম্ভবত এই ভাবনাকেই বাস্তবরূপ প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি এই উপন্যাসটি লেখেন। উপন্যাসটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার দাশ বলেছেন — ''কর্মসূত্রে বিভূতিভূষণ কিছুকাল ভাগলপুর নিকটবর্তী এক বনাঞ্চলে থাকতেন। সেই বনভূমি ও তার সঙ্গে যুক্ত অজস্র মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শের অভিজ্ঞতাই এই কাহিনীর ভিত্তিভূমি।''[৯৩] আর অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের

মতে — ''মাঝে গোরক্ষিণী সভার ভ্রাম্যমাণ প্রচারক রূপে বাংলা আসাম ত্রিপুরা ও আরাকান অঞ্চলে ভ্রমণ করেন এবং খেলাত ঘোষ এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার রূপে ভাগলপুর সার্কেল-এ কিছুকাল কাজ করেন। এই দুই ভিন্ন বৃত্তির অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে 'অভিযাত্রিক' ও 'আরণ্যক' গ্রন্থে।''[৯৪] তাই এটা মানতে দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে, বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাস তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল।

এই উপন্যাসটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে সেকালে তো বটেই, একালেও স্বকীয়তার দাবী রাখে। এই ধরনের উপন্যাস শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও খুব কম লেখা হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যে এই ধরনের উপন্যাসের অনুপস্থিতির দিকে লক্ষ রেখেই অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''প্রকৃতির সহিত মানবমনের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কাহিনী বাঙলা উপন্যাসে ত নাই-ই ; ইউরোপীয় উপন্যাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে।''[৯৫] বর্তমান বিহারের ভাগলপুর এবং তৎসংলগ্ন বনভূমি অঞ্চল ও সেখানকার মানুষজনের জীবনচর্যা বিভূতিভূষণের মনে যে প্রভাব ফেলেছিল, তারই ফলশ্রুতি হল এই উপন্যাস। এখানে ঔপন্যাসিক সত্যচরণ নামক একজনের আত্মকথনের মাধ্যমে যেন নিজের অতীত স্মৃতিচারণায় ডুবে গেছেন। সত্যচরণই সমগ্র উপন্যাসের কথক। কলকাতায় কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝেই নিজের অতীতের কর্মজীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে সে এই উপন্যাসের অবতারণা করেছে। এখানে আনুপূর্বিক কোনো কাহিনি নেই; কিন্তু একটার পর একটা টুকরো টুকরো ঘটনার সাহায্যে ভাগলপুরের অদূরের আজমাবাদ, ইস্‌মাইলপুর, ফুলকিয়া, নাঢ়া বইহার, লবটুলিয়া থেকে মহালিখা পাহাড় ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের প্রান্তদেশ পর্যন্ত অঞ্চলগুলির অরণ্যপ্রকৃতি এবং মানুষজনের জীবন্ত ছবি উঠে এসেছে। সত্যচরণের আত্মকথা থেকেই জানা যায় যে, সে একটা জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে নদীর চর থেকে জেগে ওঠা বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘা জমির প্রজাবিলি করার জন্য ঐ অঞ্চলে যায়। সে যখন সেখানে যায়, তখন অঞ্চলটি ছোট বড় নানা উদ্ভিদ এবং বিভিন্ন ধরনের পশু পাখিদের বসবাসের কারণে বনভূমি হয়ে উঠেছিল। প্রায় জনমানবহীন এই অঞ্চলটিতে রাতের বেলা তো বটেই, দিনের বেলাতেই পথ চলতে ভয় করত। তবে পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যেই সে ঐ অঞ্চলের প্রায় সমস্ত জমি প্রজাবিলি করে

এলাকাটিকে জনবহুল করে তোলে। প্রকৃতিপ্রেমী সত্যচরণ বনভূমিকে ভালোবাসলেও তার হাতেই সেখানকার বনভূমি বিনষ্ট হয়। কীভাবে এই সময়কালের মধ্যে ঐ অঞ্চলে অবস্থান করে তার দ্বারা এই বনভূমি বিনষ্ট হয়েছিল, সে সব নানা ঘটনার বিবরণই সত্যচরণ নিজের আত্মকথনে বিবৃত করেছে। ফলে উপন্যাসটিতে সেই অঞ্চলটির সঙ্গে সম্পর্কিত নানা টুকরো টুকরো ঘটনা, কাহিনি এবং অসংখ্য চরিত্র স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি প্রকৃতিপ্রেমিক ঔপন্যাসিক সময় ও সুযোগ পেলেই সত্যচরণের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালোবাসার পরিচয় দিয়ে অনেকবার প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় উদ্যোগী হয়েছেন। ফলে সমস্ত কিছুর মিশ্রণে 'আরণ্যক' উপন্যাসটিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে যে, উপন্যাসটি বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনায় ঢুকে পড়ে।

এই উপন্যাসে কার্যকারণ পরম্পরাসূত্রে গ্রথিত আনুপূর্বিক কোন কাহিনি নেই — যা আছে তা হল কথক সত্যচরণের অভিজ্ঞতাজাত বিভিন্ন ঘটনার টুকরো টুকরো ছবি। এজন্য 'আরণ্যক'কে উপন্যাস বলা যায় কি না তা নিয়েই পণ্ডিত-সমালোচক মহলে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অনেকে একে 'দিনলিপি' বা 'প্রতিবেদন' অথবা 'ভ্রমণ কাহিনি' বলতে চান। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসটির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে — '' . . . 'আরণ্যক' সেই কল্পলোকের বিবরণ। ইহা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে — উপন্যাস।''[৯৬] তবুও 'আরণ্যক'-এর উপন্যাস হওয়া, না হওয়া নিয়ে সমলোচক মহলে প্রশ্ন থেকেই গেছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন — '' . . . উপন্যাস বলতে সাধারণত যা বুঝে থাকি — সমাজ মধ্যগত মানুষের জীবনের একটা যথাসম্ভব সামগ্রিক চেহারা, তা আমরা আরণ্যকে পাই না। আরণ্যকে পাই কয়েকটি কাটা কাটা সুন্দর ছবি। উপন্যাস চলমান জীবনের রূপ — কার্যকারণ-প্রবাহে বাহিত চলমান রূপ। আরণ্যক যেন কম বেশি স্থিরচিত্রের অ্যালবাম।''[৯৭] তবে এই সমালোচনা যুক্তির ধোপে টেকে না। কারণ অনেক বিদগ্ধ সমালোচকই 'আরণ্যক'কে উপন্যাস হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। এদের মধ্যে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও পড়েন। তিনি 'আরণ্যক' সংক্রান্ত আলোচনায় খুব সংক্ষেপে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন — ''আরণ্যক উপন্যাস। অবশ্যই উপন্যাস।''[৯৮] তবে সেই সঙ্গে এর শ্রেণীবিচারের

ক্ষেত্রে তিনিও সংশয়ে পড়েছেন — '' . . . তার আগে এটাকে কোনো সামাজিক উপন্যাসের মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না।''[৯৯] শুধু তিনি একা নন; তাঁর মত অনেকেই এর শ্রেণী নির্ণয় করতে বসে বিভ্রান্ত হয়েছেন। এজন্য উপন্যাসটির আলোচনায় আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ আসে। অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের গোচরে এই উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার লক্ষণ থাকার বিষয়টি এসেছে — ''অরণ্য জীবনের সমাজ-সংস্কৃতির একটা সমগ্র রূপের আভাসও 'আরণ্যকে' আছে। বাসস্থান, খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড়, রীতি-নীতি, মানবিক সম্পর্কের আকর্ষণ ও ঘৃণা, প্রচ্ছন্ন স্বার্থপরতা ও প্রকাশ্য শোষণ, দারিদ্র্য ও অসহায়তা, আরণ্যক সমাজের শ্রেণিগত পরিচয় — জমিদার, জোতদার, মহাজন, প্রজা, ভূমিহীন ও যাযাবর শ্রেণি চাষি-মজুরদের সঙ্গে বাঘ ভালুক হাতি নীলগাই হায়নার আনাগোনা, লৌকিক সংস্কার ও অলৌকিক অপদেবতা বা জিন্-এর সঙ্গে মিশে থাকা ও পার্থিব প্রাকৃতিক রূপ ও ভয়ঙ্কর সৃষ্টি ছাড়া রূপের রহস্যময়তা — সব মিলে-মিশে 'আরণ্যক' এক প্রাকৃতিক মহাকাব্য। . . . আরণ্যকে সংস্কৃতির এই সার্বিক রূপটি জীবন্ত আঞ্চলিক সত্তা হিসেবে একালের পাঠককেও আকৃষ্ট করতে বাধ্য।''[১০০]

আগেই বলা হয়েছে যে, এই উপন্যাসে পূর্বাপর সম্পর্কযুক্ত কোন আনুপূর্বিক কাহিনি নেই; এখানে যা আছে, তা হল উপন্যাসের কথক সত্যচরণের অভিজ্ঞতাজাত বিভিন্ন টুকরো টুকরো ঘটনা বা কাহিনির বিবরণ। তবে এই টুকরো টুকরো ঘটনা বা কাহিনিগুলি একত্রে জুড়ে দিলে আমরা যে সামগ্রিক চিত্রটি পাই তা হল, ভাগলপুরের অদূরে আজমাবাদ, ইস্মাইলপুর, ফুলকিয়া, নাঢ়া বইহার, লবটুলিয়া থেকে মহালিখা পাহাড় ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের প্রান্তদেশ পর্যন্ত অঞ্চলগুলির অরণ্যপ্রকৃতি এবং মানুষজনের জীবন্ত ছবি। এই নির্দিষ্ট অঞ্চলটিকে প্রেক্ষাপট করেই ঔপন্যাসিক তাঁর কথক সত্যচরণের কথনে সমগ্র উপন্যাসটিকে উপস্থাপন করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উপন্যাসের এই নির্দিষ্ট অঞ্চলটি দীর্ঘদিন থেকেই মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। উপন্যাসটির সর্বত্র এই বিচ্ছিন্নতার চিত্র আছে। এজন্য কলকাতার সভ্য সমাজে লালিত-পালিত সত্যচরণ কার্যোপলক্ষে সেখানে গেলেও প্রথমদিকে কিছুতেই ঐ

অঞ্চলটিকে হৃদ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছিল না। পরে অবশ্য সে ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলটিকে ভালোবেসে ফেলে এবং তার জন্য আলাদা টান অনুভব করে। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ, কারণ অঞ্চলটিকে ভালোবাসার পাশাপাশি সত্যচরণ সেখানকার অরণ্য প্রকৃতিকে ভালোবেসে ফেলেছিল। তার হাতেই সেই অরণ্য প্রকৃতি বিনষ্ট হয় — সে-ই ঐ অঞ্চলে অরণ্য উচ্ছেদ করে প্রজা বসিয়ে তাকে জনবসতিপূর্ণ করে তোলে। এভাবে উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক পটভূমি বিকাশ লাভ করেছে। অবশ্য মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত যে কোনো উপন্যাসই আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় স্থান পায় না — এর সঙ্গে ঐ উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষজনের জীবনচর্যা অর্থাৎ তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, জীবন-জীবিকা, সংস্কার-বিশ্বাস, লোকাচার-লোকবিশ্বাস-লোককথা-লোকসংস্কৃতি, বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিশিষ্ট ভাষারীতি প্রভৃতির সংমিশ্রণে একটা 'আঞ্চলিক রঙ্' ফুটিয়ে তুলতে হয়।

'আরণ্যক' উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণের দিকে নজর দিলে সবার আগে সত্যচরণের কথাই মনে আসে, কারণ সে-ই এই উপন্যাসের কথক। তবে সত্যচরণ যে 'আরণ্যক'-এর নায়ক নয়, এটা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে — ''আরণ্যক উপন্যাসে দেখেছি, বেশিটাই স্থিরচিত্র, সেখানে প্রতিবেশই প্রধান, উত্তর বিহারের অরণ্যভূমিই যেন নায়ক, সত্যচরণ শুধু দর্শক।''[১০১] উপন্যাসে গৃহীত অরণ্য প্রকৃতি এখানে নায়কের স্থান দখল করেছে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই অরণ্য প্রকৃতিকে নায়িকা হিসেবে মেনে নিয়ে তাকে রাণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং সেখানকার মানুষজনকে তার সভাসদ্ বলে মন্তব্য করেছেন — ''এই আরণ্য রাজসভার সভাসদ্গুলি নামে ও কার্যে, ব্যবহারে ও হৃদয়বৃত্তিতে প্রতিবেশের সহিত একসুরে বাধা — উদার, অনাসক্ত নিস্পৃহতার ভাবমণ্ডলবেষ্টিত। কবি বেঙ্কটেশ্বর, অধ্যাপক মটুকনাথ, উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্, সৌন্দর্যপিয়াসী যুগলপ্রসাদ, সাঁওতাল-রাজ দোবরু পান্না ও তাঁহার প্রপৌত্রী, নিজ সরল পবিত্র হৃদয়ের খাঁটি আভিজাত্যে গৌরবময়ী তরুণী ভানুমতী, স্বভাবশিল্পী, নৃত্যবিশারদ ধাতুরিয়া — সকলের উপরেই আরণ্য

মহিমার রাজচ্ছত্র প্রসারিত। অপেক্ষাকৃত প্রাকৃত জনসাধারণও — রাজুপাঁড়ে, জয়পাল কুমার, কুন্তা রাজপুতানী, গনোরী তেওয়ারী, নকছেদী-তুলসী-মঞ্চী, গিরিধারীলাল প্রভৃতি — বনস্পতির পার্শ্বে ক্ষুদ্র ঝোপজঙ্গলের মত — এই আরণ্য পরিমণ্ডলের সহিত চমৎকার মিশিয়া গিয়াছে। এমন কী বাঙালি ডাক্তার রাখালবাবুর বিধবা স্ত্রী, বিহার-প্রবাসী দরিদ্র বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারের অবিবাহিতা যুবতী কন্যা ধ্রুবা, জবা — ইহারাও বাঙালি সমাজের বহু শতাব্দীর সাধনালব্ধ সংস্কার হারাইয়া এই অরণ্য সমাজের আভিজাত্যগৌরবহীন, শ্রমকর্কশ জীবনযাত্রা অবলম্বন করিয়াছে।''[১০২] এখানে তিনি যাদের কথা বলেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির ভূমিপুত্র নয় — বহিরাগত; কাজের সূত্রে বা জমি পাবার লোভে সেই অরণ্য ভূমিতে এসে হাজির হয়েছে। তবে এটাও ঠিক যে এরা কেউ-ই সত্যচরণের মত বহিরাগত নয়, অর্থাৎ তথাকথিত সভ্যসমাজের প্রতিনিধি নয়। এদের আচার-আচরণ ও জীবনযাপন পদ্ধতি অনেকটাই সেই অঞ্চলটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এদের মধ্যে ব্যতিক্রম সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না ও ধনঝরি পাহাড়ের কোলে অবস্থিত তার রাজধানীর বাসিন্দারা, যাদের মধ্যে তরুণ যুবক জগরু এবং যুবতী রাজকন্যা ভানুমতীও ছিল। উপন্যাসে রাজা, রাজপরিবার, রাজধানী প্রভৃতির উল্লেখ থাকলেও এই সাঁওতালদের ঔপন্যাসিক হতদরিদ্র রূপেই চিত্রিত করেছেন। এরাই সেই অঞ্চলের ভূমিপুত্র। তাই সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''দোবরু পান্না অরণ্যভূমির আত্মা, 'আরণ্যক' উপন্যাসেরও আত্মা। ভানুমতী অরণ্যভূমির সৌন্দর্যের প্রতীক। দোবরু পান্না মর্যাদার প্রতীক।''[১০৩] সুতরাং এই উপন্যাসে এক সত্যচরণ বাদে সমস্ত চরিত্রের মধ্যেই কমবেশি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

এই উপন্যাসে মূলত হিন্দু সংস্কৃতির বিবরণ আছে। ভাগলপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের হিন্দুধর্মের জাতপাত নির্ভর সমাজের ছবি এখানে স্থান পেয়েছে। এই সমাজের পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক এখানে যে কয়েকটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল রাজপুত, ভূমিহার ব্রাহ্মণ, গঙ্গোতা প্রভৃতি। এছাড়াও এখানে আদিম অনার্য সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কথা আছে। এদের মধ্যে রাজপুতরাই সবথেকে ক্ষমতাশালী। এই উপন্যাসে দু'জন দুর্ধর্ষ রাজপুতের কার্যকলাপের উল্লেখ আছে —

নন্দলাল ওঝা ও রাসবিহারী সিং। এছাড়াও কুন্তার স্বামী দেবী সিং-এর কথা পরোক্ষে এসেছে। এরা কারণে-অকারণে নিম্নবর্ণের গঙ্গোতা প্রজাদের উপর অন্যায় অত্যাচার ও শোষণ চালায়, জমির উৎপন্ন ফসল গায়ের জোরে দখল করে নেয়, সর্বদা পায়ের নিচে রাখতে চায়; আর ধন সম্পদের গরমে উগ্র ও বন্য আভিজাত্যে মেতে থাকে। রাজু পাঁড়ে বা মটুকনাথের মত ভূমিহার ব্রাহ্মণদের এখানে গরীব মানুষ হিসেবেই দেখানো হয়েছে। তবে এরাও ধর্মীয় কারণে নিম্নবর্ণের গঙ্গোতাদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে। অবশ্য এদের ধর্মীয় জীবনের বিস্তারিত পরিচয় এখানে নেই। তবে গঙ্গোতাসহ নিম্নবর্ণের প্রজাদের জীবন চর্যার বিস্তারিত ছবি এই উপন্যাসে আছে। এরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করলেও তাদের দুঃখের শেষ নেই। উচ্চবর্ণের জমিদার-মহাজনরা কারণে-অকারণে এদের উপর অত্যাচার করে, বঞ্চিত করে, ঠকায়। তীর্থক্ষেত্রেও এদের অধিকার দেওয়া হয় না। তাই মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে স্নান করতে গিয়ে গঙ্গোতা যুবতী মঞ্চীকে ব্রাহ্মণ পাণ্ডার কাছে শুনতে হয় — ''গাঙ্গোতীনকে আমরা নাইতে দিই নে কুণ্ডের জলে, চলে যা।''[১০৪] এরপরেও জেদ করলে তাকে লাঞ্ছিত হতে হয় এবং 'টেনে-হিঁচড়ে মারতে মারতে' সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই জাতপাতের কারণেই অসুস্থ বৃদ্ধ গিরিধারীলালের সেবার্থে উচ্চবর্ণের কেউ এগিয়ে আসে না।

এই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির প্রেক্ষিতে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঐ অঞ্চলের নানা আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণের উল্লেখও আছে। এখানে প্রধান দু'টি উৎসবের উল্লেখ আছে — দোল উৎসব এবং ছটপূজা। দোল উৎসবে কথক সত্যচরণ রাসবিহারি সিং রাজপুতের বাড়ি আমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে বন্য প্রাচুর্য দেখে এসেছিল। ছট পূজা সে অঞ্চলের অত্যন্ত জনপ্রিয় উৎসব। কথক ও রাজু পাঁড়ে এক ছটপূজার রাত্রে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সদ্য গড়ে ওঠা জনবসতিটির অনেক বাড়িতেই গিয়েছিল। ঐ অঞ্চলে হনুমানজীর পূজাও ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। তাই সদ্য গড়ে ওঠা লোকালয়টির বিভিন্ন স্থানে হনুমানজীর মূর্তি বসতে দেখা যায়। আর আছে বুনো মহিষের দেবতা 'টাঁড়বারো'। এসবের পাশাপাশি ঔপন্যাসিক সত্যচরণের জবানীতে সাঁওতালদের ধনঝরি পাহাড়ে আয়োজিত রাস উৎসবেরও সুন্দর বিবরণ এই উপন্যাসে দিয়েছেন। ফসল উঠার পর সেই অঞ্চলটিতে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এজন্য সদ্য গড়ে ওঠা সেই লোকালয়টিতে মেলা বসে। ঐ মেলায় নানা

ধরনের বিক্রেতার আবির্ভাব ঘটে। ক্রেতা মূলত ফসল কাটুনে মজুরের দল। নাচ-গানের আসর সেখানে বসে। এই সূত্রেই প্রৌঢ় দশরথের আবির্ভাব ঘটে, যে ননীচোরা নাটুয়া গেয়ে দর্শকদের বিনোদন করে নিজের জীবিকা অর্জন করে। নাচিয়ে বালক ধাতুরিয়ার মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে প্রচলিত নাচের বিবরণ পাওয়া যায়। তার কাছ থেকেই জানা যায় যে, ওখানে 'ছক্করবাজি' নাচের খুব কদর। কবি বেষ্কটেশ্বরের মাধ্যমে এখানকার সাহিত্যচর্চার বিবরণও উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও সে অঞ্চলের লোককথা-লোকবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত পরী, জিন প্রভৃতি অশুভ শক্তির কথাও এখানে আছে। বোমাইবুরুর জঙ্গলে এক মহিষ পালক বাপ-ছেলের করুণ কাহিনির মধ্যে দিয়ে জিনের অলৌকিক কাহিনিও এখানে পরিবেশন করা হয়েছে। ফলে উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষগুলির বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস ও সে সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান, লোককথা, লোকাচার, লোকসংস্কৃতির মত বিষয়গুলি এক আঞ্চলিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে উঠে এসেছে।

উপন্যাসটিতে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষজনের খাদ্যতালিকা তথা খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ, শিক্ষাব্যবস্থা, চিকিৎসাব্যবস্থার বিবরণও উঠে এসেছে। নুন দিয়ে মকাই সিদ্ধ 'ঘাটো' ছিল সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষগুলির প্রধান খাবার। এছাড়াও চিনা ঘাসের দানা সিদ্ধ, বাথুয়া ও অন্যান্য শাক সেই অঞ্চলের সাধারণ গঙ্গোতা সম্প্রদায়ের মানুষগুলির খাদ্যতালিকায় থাকতে দেখা যায়। উচ্চশ্রেণির লোকেরা মকাই বা কলাইয়ের ছাতুর তাল বানিয়ে খায়। এদের বিলাসিতা বলতে ছিল খাবার পরে সুপুরি কেটে মুখে দেওয়া। এজন্য বাসনপত্রেরও তেমন বাড়বাড়ন্তের উল্লেখ এই উপন্যাসে নেই। মাটির হাড়িতে মকাই সিদ্ধ 'ঘাটো' রান্না করে পাতায় করে লবণ দিয়ে তা গরম গরম পরিবেশন করা হয়। থান কাপড়ের খুঁটে বা কোনো পাত্রে ছাতু মেখে ক্ষুধানিবারণ করেই এরা সন্তুষ্ট হয়। কালেভদ্রে ভাতের সঙ্গে এদের দেখা হয়। এজন্য সত্যচরণ লবটুলিয়ায় গেলে তার আসার খবর শুনে অনেকেই বিনা নিমন্ত্রণে শুধু ভাত খাবার জন্য বহুদূর থেকে এসে কাছারি বাড়িতে দু'দিন ধরে অপেক্ষা করে। এ সম্পর্কে পাটোয়ারী সত্যচরণকে জানিয়েছে — ''হুজুর, এরা বড় গরীব; ভাত জিনিসটা খেতে পায় না। কলাইয়ের ছাতু, মকাইয়ের ছাতু, এই এরা বারোমাস খায়। ভাত খেতে পাওয়াটা এরা ভোজের সমান বিবেচনা করে। আপনি আসচেন, ভাত

খেতে পাবে এখানে, সেই লোভে সব এসেছে।''[১০৫] অবশ্য বড়লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রিতের খাদ্যতালিকায় অনেক কিছুই থাকে। নন্দলাল ওঝার বাড়িতে কথক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গেলে সেখানে তাকে যেভাবে আপ্যায়ন করা হয় তার বর্ণনায় কথক বলেছে — ''প্রকাণ্ড কাঠের পিঁড়ির আসন পাতা — সম্মুখে এমন আকারের একখানি পিতলের থালা আসিল, যাহাতে করিয়া আমাদের দেশে দুর্গাপূজার বড় নৈবেদ্য সাজায়। থালায় হাতির কানের মত পুরী, বাথুয়া শাক ভাজা, পাকা শশার রায়তা, কাঁচা তেঁতুলের ঝোল, মহিষের দুধের দই, পেঁড়া।''[১০৬] রাসবিহারী সিং রাজপুতের বাড়িতে দোলের উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়েও সত্যচরণ অনুরূপ খাদ্যতালিকার পরিচয় পায়। ছটপূজা উপলক্ষে সে অঞ্চলের একধরনের পিঠের উল্লেখ এই উপন্যাসে আছে — ''শালপাতায় কয়েকখানি আটা ও গুড়ের পিঠে আসিল — এক-একখানি পিঠে এক ইঞ্চি পুরু ইটের মত শক্ত, ছুঁড়িয়া মারিলে মানুষ মরিয়া না গেলেও দস্তুর মত জখম হয়। অথচ প্রত্যেকখানা পিঠে ছাঁচে ফেলা চন্দ্রপুলির মত বেশ লতাপাতা কাটা। ছাঁচে ফেলিবার পরে তবে ঘিয়ে ভাজা হইয়াছে।''[১০৭] কুন্তা ছটপূজা উপলক্ষে সত্যচরণের জন্য এনেছিল — ''থালায় কয়েকখানি পিষ্টক, কিছু চিনি, দুটি কলা, একখণ্ড ঝুনা নারিকেল, একটা কলম্বা লেবু।''[১০৮]

সে অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। এদের চাহিদাও ছিল অত্যন্ত সীমিত। তাই সত্যচরণের কাছারীর সিপাহী যখন তার কাছে একটি লোহার কড়া চায়, তখন এই চাওয়ার পিছনে যুক্তি দেয় — ''একখানা লোহার কড়া থাকলে কত সুবিধা হুজুর। যেখানে সেখানে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, ভাত রাঁধা যায়, জিনিসপত্র রাখা যায়, ওতে করে ভাত খাওয়া যায়, ভাঙবে না। . . . অনেক দিনের সাধ একখানা কড়া আমার হয়, হুজুর যদি মঞ্জুর করেন, হুজুর মালিক।''[১০৯] এখানকার মানুষগুলির পোশাক-আশাকে শৌখিনতা ছিল না বললেই চলে। লজ্জা নিবারণের জন্য এরা ঠিকমত পোশাক-আশাক জোটাতে পারে না — গ্রীষ্মকালে পুরুষদের উর্ধ্বাঙ্গ প্রায় আবরণহীন থাকে, নিম্নাঙ্গে এরা থান কাপড়ের খাটো ধুতি পরে। মেয়েরা শতছিন্ন দেহাতি কাপড় দিয়ে কোনোরকমে লজ্জা নিবারণ করে। শীতকালে চাদর বা মেরজাই জাতীয় কিছু পরে এরা ভয়ঙ্কর শীতের মোকাবিলা করে। রাতের বেলা বাসস্থানের

পাশে আগুন জ্বালিয়ে রাখে। অনেকেই মাথা বাদে শরীরের বাকি অংশ খোলা আকাশের নিচে শস্যের ভুসির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে শীত নিবারণ করে। বাসস্থান বলতে এই শ্রমজীবী মানুষগুলির তেমন কিছু ছিল না। এরা শুকনো কাশডাটা এবং সাবাই ঘাসের ছাউনি দিয়ে ঘর তৈরি করে পরিবার নিয়ে বসবাস করে। ঐ অঞ্চলে শিক্ষাদীক্ষার চল ছিল না বললেই চলে। মটুকনাথ পাঁড়ে টোল খুললে সেখানে যে কয়েকজন ছাত্র জোটে, প্রায় সবাই খাবার লোভেই জোটে। অবশ্য রাজু পাঁড়ের মুখ থেকে শোনা যায় যে, সে শিক্ষালাভার্থে গুরুগৃহে গিয়েছিল। তবে গুরুকন্যার প্রেমে পড়ার কারণে তার আর পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। সেখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থার হালও ছিল খুব খারাপ। মাঝে মাঝেই মহামারীর আক্রমণে প্রচুর লোক প্রাণ হারাত। রাজু পাঁড়ের টোটকা, আর কথকের হোমিওপ্যাথির চিকিৎসাই ছিল সাধারণ মানুষগুলির ভরসা। উপযুক্ত পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করানোও এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই ডাক্তার রাখালবাবু দীর্ঘদিন সে অঞ্চলে ডাক্তারি করলেও বিশেষ কোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি করতে পারেন নি এবং তার মৃত্যুর পর স্ত্রীকে রাতের অন্ধকারে লোকের ক্ষেতে মকাই কুড়োতে বের হতে দেখা যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেক লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছে। ফলে উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে দ্বিধা করা উচিত নয়। তবে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে যা বোঝায়, তার অনেক কিছুই এই উপন্যাসে অনুপস্থিত। এরমধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষগুলির নিষ্প্রভ উপস্থিতি — এরা কেউই পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক চরিত্ররূপে উপস্থাপিত হয় নি, সবাই প্রায় বিচ্ছিন্নভাবে হাজির হয়ে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করে গেছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সঠিক মন্তব্যই করেছেন — ''আরণ্যক' (১৯৩৯) উপন্যাসে বিভূতিভূষণ আঞ্চলিক উপন্যাসের সীমাবন্ধনে অনেকটা ধরা দিয়েছেন। এটি পুরোপুরি আঞ্চলিক উপন্যাস নয় এই কারণে যে এখানে প্রকৃতি মুখ্য, মানুষ গৌণ। আঞ্চলিক উপন্যাসে ভূ-প্রকৃতি মানুষের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করে, মানবে প্রকৃতিতে এক অখণ্ড সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একথা ঠিক আঞ্চলিক উপন্যাসে প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র সত্তা, বিশিষ্ট চরিত্র। 'আরণ্যকে'র প্রকৃতি স্বতন্ত্র সত্তা, কিন্তু প্রকৃতিই প্রথম ও

শেষ কথা। এখানে প্রকৃতি প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, চেতনাশক্তিসম্পন্ন। এখানে প্রকৃতি তার মহান ভয়াল ও সুন্দর গাম্ভীর্য নিয়ে উপস্থিত। এখানে প্রকৃতিই সব-কিছু। এই বিশাল প্রকৃতির পটভূমিতে মানুষের সঙ্কুচিত দ্বিধাজড়িত উপস্থিতি। আরণ্য প্রকৃতির সুগম্ভীর মহিমার কাছে মানুষ এখানে নিষ্প্রভ, গৌণ।''[১১০] তবে এটাও ঠিক যে, আঞ্চলিক উপন্যাসের চরিত্ররা উপন্যাসে বর্ণিত অঞ্চলটির ঘেরাটোপেই নিজেদের আবদ্ধ রাখে। এই উপন্যাসেরও বেশির ভাগ চরিত্র নিজেদের পরিচয় উপন্যাসে গৃহীত অরণ্য প্রকৃতির ঘেরাটোপেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। হয়তো একারণেই অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য তত্ত্ব বিষয়ক 'সাহিত্য প্রকরণ' গ্রন্থে আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় একটি বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসটির আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি উপন্যাসটি প্রসঙ্গে লিখেছেন — '' . . . আরো একটি জিনিস লক্ষ করার দরকার আছে, অন্তত 'আঞ্চলিক উপন্যাস' হিসেবে তার শ্রেণীবিভাগ সঠিক কিনা তা বুঝবার জন্য। একটি বিশেষ অঞ্চলই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি কিনা, বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যই উপন্যাসটি নিয়ন্ত্রিত করেছে কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। এমন হতে পারে, যে-কোন অঞ্চলেই এমন একটি ঔপন্যাসিক আখ্যান সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল, আবার এমনও হতে পারে যে সেই বিশেষ অঞ্চল ছাড়া উপন্যাসটি দাঁড়াতেই পারে না। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই অঞ্চলটির অনিবার্যতা প্রমাণিত হয় এবং উপন্যাসটি আঞ্চলিক বিশেষণে ভূষিত হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের নাম করতে পারি। দোবরু পান্না, ভানুমতী, যুগলপ্রসাদ, মঞ্চী, গণু মাহাতো, ধাতুরিয়া, ধাওতাল সাহু, রাজু পাঁড়ে প্রভৃতি বিচিত্র উজ্জ্বল চরিত্র একেবারে নিষ্প্রভ এবং তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে এদের ভাগলপুরের সেই বিশেষ অঞ্চল থেকে বার করে আনলে। এ থেকেই বোঝা যায়, সেই আরণ্য প্রকৃতিই এই উপন্যাসের নিয়ামক শক্তি।''[১১১]

অনেকে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসটিকে গ্রহণ করলেও কেউ-ই একে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দেন নি। আমাদের আলোচনাতেও বারবার উপন্যাসটির আঞ্চলিক লক্ষণগুলির কথা উঠে এসেছে। তবে এটাও ঠিক যে, শুধু এই আঞ্চলিক লক্ষণগুলিই

‘আরণ্যক’ উপান্যাসটির মূলকথা নয়। বাংলা উপন্যাস তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ‘আরণ্যক’ উপন্যাসটির একটা আলাদা তাৎপর্য আছে। এই তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে গেলে হয়তো উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ উঠে আসে, তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়। ‘আরণ্যক’ উপন্যাসটি আঞ্চলিকতার ঘেরাটোপ অতিক্রম করে প্রকৃতিপ্রেমী বাঙালিকে এক রহস্যময় রোমান্টিক অনুভূতির অলৌকিক জগতে পৌঁছে দেয়। এর আঞ্চলিকতা সেই জগতেরই একটি অংশমাত্র। এজন্য বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের নিরিখে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’ উপন্যাসটির শ্রেণি নির্ণয় করতে গেলে একে আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাস বলেই ক্ষান্ত থাকতে হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮–১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ)–কে বাংলা আঞ্চলিক সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তিনি নিজের জন্মস্থল বীরভূম জেলা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলকে পটভূমি করে বেশ কিছু উপন্যাস রচনা করেছেন, যেগুলিতে আঞ্চলিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর এইরকম উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রথমেই **‘ধাত্রীদেবতা’** (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটির নাম করতে হয়। এই উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন — ‘‘বঙ্গশ্রী পত্রিকায় (১৯৩৪) ‘জমিদারের মেয়ে’ নামে ছোট আকারে প্রথম প্রকাশিত। চার বছর পরে শনিবারের চিঠিতে ধাত্রীদেবতা নামে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশকে কেন্দ্র করে দেশের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের নানা আন্দোলন ও পরিবর্তন এই উপন্যাসের উপজীব্য। ব্যক্তিগত আদর্শবাদ, পারিবারিক সংঘাত ও বৃহত্তর সামাজিক জীবনের সহিত ব্যক্তি–জীবনের সমন্বয় এই কাহিনীকে এক বিশালতা দিয়েছে।’’[১১২] এই উপন্যাসটি আসলে শিবনাথ নামক একটি চরিত্রের বাল্য–কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের শ্যামল গৌরবে পৌঁছানোর কাহিনি। শিবনাথের জীবন পরিক্রমার সঙ্গে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত জীবনের কৈশোর ও যৌবনের অনেক ঘটনার মিল থাকায় এই উপন্যাসটিকে তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলা হয়। এই উপন্যাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন ও তৎপরবর্তীকালের রাজনীতির প্রসঙ্গ থাকায় অনেকে উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক উপন্যাসও বলতে চান। আবার রাঢ় অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসটিতে

উক্ত অঞ্চল এবং ভারতবর্ষের রাজনীতি সংক্রান্ত এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যে, উপন্যাসটি মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি লাভ করেছে বলে অনেকে মত দেন। তবে উপন্যাসটিতে তারাশঙ্করের আত্মকথা, রাজনীতির প্রসঙ্গ বা মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিলাভ যাই থাকুক না কেন, সমস্ত কিছুই পরিবেশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল বীরভূমের এক বিশেষ অঞ্চলের আঞ্চলিক জীবনকথার প্রেক্ষাপটে। উপন্যাসটির কিছু ঘটনা কলকাতায় ঘটলেও এর অনেকটা স্থান জুড়ে ঐ বিশেষ অঞ্চলের গ্রাম্যপ্রকৃতি থেকে শুরু সেখানকার মানুষজন ও তাদের জীবনচর্যা স্থান পেয়েছে। এই উপন্যাসের পূর্বে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলটির উপস্থিতি তেমনভাবে লক্ষ করা যায় না। এজন্য 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাস সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত আলোচকের আলোচনায় অবধারিতভাবে এর আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গটি স্থান পেয়েছে।

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে কাহিনি অংশের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ময়ূরাক্ষী সংলগ্ন লাঘাটা-বন্দর নামক রাঢ়বঙ্গের একটি গ্রামাঞ্চলের পটভূমিকায় উপন্যাসের নায়ক শিবনাথকে এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের সন্তান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিবনাথ শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় মা জ্যোতির্ময়ী দেবী ও পিসিমা শৈলজাদেবীর অভিভাবকত্বে মানুষ হয়। আদতে জ্যোতির্ময়ী দেবীর সন্তান হলেও শিবনাথের উপর পিসিমা শৈলজাদেবীর দাবীই যেন বেশি। একই রাত্রে স্বামী ও সন্তান হারিয়ে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া ননদের এই দাবীকে শিবনাথের মাও প্রশ্রয় দেন। পিসিমা শিবনাথকে একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী জমিদার বানাতে চান। শিবনাথের মা শিবনাথকে নিয়ে পিসিমার সমস্ত দাবী মেনে নিলেও এই ইচ্ছাটির সঙ্গে সহমত হতে পারেন না; তিনি চান যে, তার ছেলে পড়াশুনো করে একজন সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠবে এবং তাকে সবাই একজন বড় মানুষের মা বলে চিনবে।। এজন্য তিনি শিবনাথকে যেমন দেশবিদেশের নানাধরনের বইপত্র পড়ার কথা বলেন, তেমনি প্রচুর উৎসাহ দিয়ে দেশসেবার, দেশের মানুষের মুক্তি প্রদানের স্বপ্নও দেখান। শিবনাথের বেড়ে ওঠার সময় তার জীবনে আরও দু'জন ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন — গোঁসাইবাবা ও রামরতন মাস্টার। প্রথমজন অর্থাৎ গোঁসাইবাবা শিবানাথের বাবার বন্ধু ছিলেন এবং ইংরেজ সেনাবিভাগে কাজ করার সুবাদে নানা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়েছিলেন। তিনি সময় ও সুযোগ পেলেই শিবনাথকে তার অভিজ্ঞতাজাত

দেশবিদেশের যুদ্ধক্ষেত্রের নানা গল্প শোনান। আর দ্বিতীয়জন অর্থাৎ রামরতন মাস্টার ছিলেন শিবনাথের গৃহশিক্ষক, ইনি শিবনাথকে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, ক্ষমতালোভী জমিদার বানানোর চেয়ে একজন উদার, বিবেকবান মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষাদানের প্রতিই বেশি মনোযোগ দেন। ছাত্রাবস্থায় ঐ অঞ্চলের নব্য ধনী ব্যবসায়ী রামকিঙ্করবাবুর মাতৃহারা বোনঝি নান্তি ওরফে গৌরীর সঙ্গে শিবনাথের বিয়ে হয়। উপন্যাসে গৌরীর সঙ্গে শিবনাথের তেমন বনিবনা হতে দেখা যায় না — সে শিবনাথকে গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে ব্যবসা করে সুখী জীবনযাপনের জন্য চাপ দিলেও শিবনাথ গ্রাম ত্যাগ করার কথা ভাবতে পারে না। উপন্যাসে শিবনাথের কিছু সময় পড়াশোনার জন্য কলকাতায় কাটলেও বেশির ভাগ সময় গ্রামেই কেটেছে। তার গ্রামজীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক এখানে ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী রাঢ় বঙ্গের গ্রামজীবনের একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন। পূর্বেই বলেছি যে, এই উপন্যাসে শিবনাথের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর নিজেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই উপন্যাসে শিবনাথের রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী গ্রামজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী রাঢ় অঞ্চল সংক্রান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতাই তুলে ধরেছেন।

শিবনাথের সঙ্গে বিয়ের পর ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে নান্তি ওরফে গৌরীর পক্ষে জমিদার বাড়ির আদব-কায়দা মেনে নিতে অসুবিধা হয়। বিশেষ করে শিবনাথের পিসিমার আদেশ-উপদেশকে মেনে নেওয়া তার পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ সে শিবনাথের বাড়ি ছেড়ে গ্রামেই মামারবাড়িতে গিয়ে তার দিদিমার কাছে আশ্রয় নেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে শিবনাথদের অঞ্চলটিতে গ্রীষ্মকালে কলেরা রোগ মহামারীর রূপ নেয়। তখন গ্রামের অনেক অবস্থাশালী পরিবারের সঙ্গে গৌরীসহ শিবনাথের শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও গ্রামত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে শিবনাথের উপরেও গ্রামত্যাগের চাপ আসলেও শিবনাথ যায় না — গ্রামে থেকে অসহায় গ্রাম্য দরিদ্র মানুষগুলির সেবাকার্যে নিযুক্ত হয়। মায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত শিবনাথ এভাবেই প্রথম দরিদ্র-আর্তের সেবায় সরাসরি নামে। এদিকে গভর্ণমেন্ট মহামারী পীড়িত গ্রামের দুঃস্থ মানুষগুলির চিকিৎসার্থে সুশীল ও পূর্ণ নামক মেডিক্যাল কলেজের দুই উজ্জ্বল ছাত্রকে পাঠায়। সেবাকার্য করার সূত্রেই এদের সঙ্গে শিবনাথের

বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। গ্রাম থেকে মহামারী বিদায় নিলে সুশীল ও পূর্ণ কলকাতায় ফিরে যায়। এদিকে শিবনাথ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে এবং উচ্চশিক্ষার লাভের জন্য কলকাতায় পড়তে আসে। পুরোনো বন্ধুত্বের সুবাদে এখানে সে সুশীল ও পূর্ণের আরও কাছাকাছি আসে। তারা ততদিনে ইংরেজবিরোধী একটি সশস্ত্র বিপ্লববাদী সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হয়ে উঠেছে। শিবনাথও এদের সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিয়ে সেই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সাঁওতাল পরগণায় এক সাধক বিপ্লবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর শিবনাথ সশস্ত্র বিপ্লববাদের পথ ত্যাগ করে।

এরপর মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে শিবনাথ গ্রামে ফিরে আসে। সে সময় তার মা মারা যান। মায়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে স্ত্রী গৌরীও ফিরে আসে। শ্রাদ্ধের পর পিসিমা শিবনাথ ও গৌরীর হাতে সংসারের ভার ন্যস্ত করে কাশীবাসী হন। সংসার হাতে পেয়ে জমিদার সন্তান শিবনাথ প্রজাশোষণ করে অর্থোপার্জনের পরিবর্তে প্রজাদের হিতসাধনের দিকে নজর দেয়। এদিকে মা ও মাস্টারমশাই-এর আদর্শে মানবসেবার ব্রত গ্রহণ করা জমিদার সন্তান শিবনাথের সঙ্গে সংসার করতে ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে গৌরীর নানা দিক থেকে সমস্যা হয়; বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের মতান্তর দেখা দিলে সে পুনরায় মামার বাড়ি দিদিমার আশ্রয়ে চলে যায়। এদিকে স্ত্রী বাড়ি ত্যাগ করার পর শিবনাথও বাড়ি ছাড়ে এবং ময়ূরাক্ষীতীরস্থ বিল্বগ্রামে জমি নিয়ে চাষাবাদ শুরু করে। প্রজাদের হিতসাধনের জন্য সে নানারূপ পরিকল্পনাও শুরু করে। এতে বেশ কয়েকবছর কেটে যায়। ইতিমধ্যে কলকাতায় তার স্ত্রী গৌরী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। এ সময় গান্ধীজী অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলে শিবনাথ সেই আন্দোলনের শরিক হয় এবং তার অঞ্চলটির নেতৃত্ব গ্রহণ করে সেখানকার জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমের সঞ্চার ঘটানোর জন্য নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে। তবে এই আন্দোলনে যোগদানের কারণে অবধারিতভাবে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এবং সে কারাবরণ করে। শিবনাথ কারাবরণ করলে প্রথমে কলকাতা থেকে শিশুসন্তানসহ গৌরী এবং তারপর কাশী থেকে পিসিমাও ফিরে আসে। এরা সবাই শিবনাথকে দেখতে কারাগারে যায়। সেখানেই শিবনাথ তার পুত্রকে প্রথম দেখে। এখানে পিসিমা শৈলজাদেবীর আড়ালে দেশমাতৃকাকে শিবনাথের ধাত্রীদেবতা হিসেবে বন্দনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে।

এই উপন্যাসটিতে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসের মতো উপন্যাসের বেশ কয়েকটি প্রকরণের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তবে এসবের ভেতরেই উপন্যাসটি আঞ্চলিকতার নানা উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে 'পিপাসার্ত বীরভূম'-এর পরিচয় আছে বলে মন্তব্য করেছেন। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে রাঢ় অঞ্চলের গৈরিক মৃত্তিকার বর্ণনা দিয়ে — ''বাংলা দেশের কৃষ্ণাভ কোমল উর্বর ভূমি-প্রকৃতি বর্তমান বেহারের প্রান্তভাগে বীরভূমে আসিয়া অকস্মাৎ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ষড়ৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া যেন ভৈরবী বেশে তপশ্চর্যায় মগ্ন। অসমতল গৈরিকবর্ণের প্রান্তর তরঙ্গায়িত ভঙ্গীতে দিগন্তের নীলের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; মধ্যে মধ্যে বনফুল আর খৈরিকাঁটার গুল্ম; বড় গাছের মধ্যে দীর্ঘ তালগাছ তপস্বিনীর শীর্ণ বাহুর মত ঊর্দ্ধলোকে প্রসারিত।''[১১৩] এরপরেই ঔপন্যাসিক বীরভূম জেলার নদ-নদীর কথা উল্লেখ করে লিখেছেন — ''বীরভূমের দক্ষিণ অংশে বক্রেশ্বর ও কোপাই দুইটি নদী মিলিত হইয়া কুয়ে নাম লইয়া মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া ময়ূরাক্ষীর সহিত মিলিত হইয়াছে।''[১১৪] উপন্যাসটির শেষে আছে পিসিমার আড়ালে দেশমাতা তথা বাস্তুভূমির প্রতি নায়ক শিবনাথের জবানীতে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের ঐকান্তিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন — ''সমস্ত জীবের দাত্রী যিনি ধরিত্রী, জাতির মধ্যে তিনিই তো দেশ, মানুষের কাছে তিনিই বাস্তু, সেই বাস্তুর মূর্তিমতী দেবতা তুমি, তোমাকে যে সে বাস্তুর বংশের কল্যাণ করতেই হবে। এই তো তোমার ধর্ম। তুমিই তো আমার বাস্তুকে চিনিয়েছ, তাতেই চিনেছি দেশকে। আশীর্বাদ কর, ধরিত্রীকে চিনে যেন তোমায় চেনা শেষ করতে পারি।''[১১৫]

এখানে ঔপন্যাসিক যেমন বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, কোপাই, কুয়ে প্রভৃতি নদ-নদীর বর্ণনা দিয়েছেন, তেমনি সেই অঞ্চলটির ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনের গভীর সম্পর্কটির কথাও বলেছেন। এই অঞ্চলটিতে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত পরিবেশে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়, খরার সময় লাল কাঁকড়ের প্রান্তর ধূ ধূ করে, প্রজারা প্রাণপণ চেষ্টা করেও খাজনা দিতে পারে না, ঘরে ঘরে শুরু হয় কলেরা, দেখা দেয়

মহামারী। এই উপন্যাসে এভাবেই আঞ্চলিক সীমাসঙ্গতির নিরিখে স্থানীয় প্রকৃতির সমস্ত চিত্রই ঔপন্যাসিক তুলে এনেছেন। এর পাশাপাশি ঐ অঞ্চলের মানুষজনের জীবনচর্যার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। ফলে এখানে রাঢ় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও নদ-নদীর বর্ণনার পাশাপাশি মানুষজনের জীবন-জীবিকা, সংস্কার-বিশ্বাস, লোকাচার-লোককথার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, বিশেষ ভাষারীতি প্রভৃতির গভীর ও ব্যাপক পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, যা উপন্যাসটি প্রকাশের আগে পর্যন্ত বৃহত্তর বাঙালি সমাজের কাছে অজ্ঞাত ছিল। অবশ্য উপন্যাসটিতে আংশিকভাবে কলকাতার ছাত্র আন্দোলনের কথা, ছাত্রদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের কথাও এসেছে এবং উপন্যাসটির শেষে নায়ক শিবনাথের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক একটি বৃহত্তর আদর্শে উপনীত হতে চেয়েছেন।

এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক গৃহীত অঞ্চলটির নিরিখে দুই কালের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে জমিদার-নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবক্ষয়িত রূপকে প্রকাশ করেছেন, যেখানে অবধারিতভাবে প্রবেশ করেছে পুঁজিনির্ভর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। পাশাপাশি এখানে সমকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গও আছে। ফলে উপন্যাসটিতে জমিদারী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের পাশাপাশি সমকালীন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে প্রচুর চরিত্রের আগমন ঘটেছে। এই চরিত্রগুলির মধ্যে শিবনাথ, তার মা জ্যোতির্ময়ী দেবী, পিসিমা শৈলজা দেবী, স্ত্রী নান্তি ওরফে গৌরী, শ্যালক কমলেশ, মামাশ্বশুর রামকিঙ্কর বাবু, রামকিঙ্কর বাবুর মা অর্থাৎ গৌরীর দিদিমা, শিবনাথদের গ্রামের ভদ্রলোকেরা উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষ এবং হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি। শিবনাথের মাস্টারমশাই রামরতনবাবু, সুশীল, পূর্ণ, কলকাতার মেসের ছেলেরা, সাঁওতাল পরগণার সাধক বিপ্লবীটি, দারোগা প্রমুখেরা সবাই উচ্চবর্ণের না হলেও ভদ্র সমাজের প্রতিনিধি। আর জমিদার বাড়ির বিশ্বস্ত অনুচর শম্ভু, নায়েব রাখাল সিং, কেষ্ট সিং, সতীশ চাকর, গোমস্তা কুড়ারাম মিশ্র, পঞ্চানন মোড়ল, শ্যামু, বড়চুলের ছেলেটি, পাগলটি, ফ্যালা ডোম, তার স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্যরা, নিত্য ঝি, রতন, শম্ভুর মা, দুর্গা ঠাকুরাণী, গ্রামের অন্যান্য প্রজাসাধারণ এবং অক্ষয় তান্ত্রিকসহ রক্ষেকালীর পূজায় উপস্থিত মানুষজনেরা বেশির ভাগই নিম্নবর্ণের মানুষ এবং উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটি থেকেই সম্পূর্ণ আঞ্চলিক

বৈশিষ্ট্যসহ উঠে এসেছে। গোঁসাইজী অর্থাৎ শিবনাথের বাবার বন্ধু ব্রিটিশের সেনাবিভাগে কাজ করা রামজী সাধুও এদের মধ্যে পড়ে। তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিরোধের কথা নিয়ে এলেও তার চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগ দিয়েছেন শিবনাথের মধ্য দিয়ে একটি রাজনৈতিক দর্শনে পৌঁছানোর দিকে।

এর ফাঁকেই ঐ অঞ্চলের মানুষগুলির জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত বিষয়টি সামান্য হলেও এসেছে। শিবনাথের পরিবার সামন্ততান্ত্রিক পরিবার হওয়ায় জীবন ও জীবিকার বিষয়ে এই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই জমিদারী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। শিবনাথের জমিদারীর প্রজাদের এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের কৃষিকাজই ছিল প্রধান জীবিকা। এইজন্য খরার ফসল নষ্ট হওয়া, জমিদারের পুকুরের জল ছেড়ে দিয়ে সেই ফসল বাঁচানোর চেষ্টা করা, ধান বিক্রি, নায়েব-গোমস্তার কার্যকলাপ, প্রজাদের থেকে খাজনা আদায়, জমিদার পরিদর্শনে গেলে নজর দেওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা দিতে না পারলে জমিদারী নীলামে ওঠা প্রভৃতি প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে এসেছে। জমিদারী নীলামে ওঠবার প্রাক্কালে শিবনাথ তার জমিদারী এলাকা পরিদর্শনে গেলে সেই এলাকার মোড়ল পঞ্চানন প্রথমে তার বৌমার গয়না শিবনাথকে বের করে দেয়। শিবনাথ তা নিতে অস্বীকার করে বাড়ি রওনা দিলে পঞ্চানন গ্রাম থেকে জমিদারের জন্য কিছু নজর আনে — ''পঞ্চানন মাথা তুলিল না, বরং আর একটু হেঁট করিয়া একখানি মুষ্টিবদ্ধ হাত প্রসারিত করিয়া বলিল, হুজুর আপনি পায়ের ধূলো দিলেন, আর শুধু শুধু — ,দয়া করে এই — ,সামান্য পাঁচ টাকাও ভরাতে পারলাম না হুজুর, সমস্ত গাঁ ঝেটিয়ে দু পয়সা চার পয়সা করে আপনার নজর — ''[১১৬] শিবনাথের শ্বশুরবাড়ির পরিবার অর্থাৎ রামকিঙ্করবাবুর পরিবার ছিল ব্যবসায়ী পরিবার। উপন্যাসে এদের ধন গৌরবের বিষয়টি দেখানো হলেও বিস্তারিত কার্যকলাপের পরিচয় নেই। শিবনাথের স্ত্রী গৌরী শিবনাথকে ব্যবসা করার কথা বলেছিল। সে একবার শিবনাথকে বলে — ''দাদা আমাকে বলে গেছে, মামাদের আপিসে তুমি চাকরি কর, তুমি লিখলেই দিবে। আপিসে চাকরি করে ব্যবসা শিখে পরে তুমি নিজে ব্যবসা করবে। কিংবা এখনই যদি ব্যবসা কর, মামারা টাকা দিবে, তারপর তুমি শোধ দিও।''[১১৭] তবে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসে কোনো বিশেষ

অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকার যেরূপ বিস্তারিত পরিচয় থাকে, এই উপন্যাসে তা অনেকাংশেই অনুপস্থিত।

এই উপন্যাসের মানুষজনেরা ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে বেশির ভাগই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। উপন্যাসের প্রধান চরিত্ররা হিন্দুধর্মের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ হলেও নিম্নবর্ণের কিছু মানুষজনের পরিচয়ও এখানে আছে। তবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঔপন্যাসিক এখানে গৃহীত অঞ্চলটির লৌকিক বিশ্বাস ও লৌকিক ধ্যান-ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে এই উপন্যাসে আঞ্চলিক সংস্কার-বিশ্বাস, কিংবদন্তী, লোককল্পনা, লোকসঙ্গীত, অলৌকিক ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির পরিচয় আছে। সমগ্র বীরভূম জুড়ে যখন ভয়ঙ্কর খরা, তীব্র অনাবৃষ্টি চলেছে, ঘরে ঘরে কলেরা মহামারীর রূপ নিয়েছে, তখন এই অঞ্চলটির সাধারণ মানুষ এর হাত থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে রক্ষেকালী পূজার আয়োজন করেছে — ''ঢাক বাজিতেছে। সদর রাস্তায় ঢাক বাজাইয়া কেহ বোধহয় কিছু ঘোষণা করিয়া চলিয়াছে . . . রক্ষেকালীর পূজো হবে; পরন্তু অমাবস্যায় চাঁদা লাগবে, চলবে সব। দেবাংশি দোরে মালসা পেতে দিবে, সর্ষে পোড়া ছড়িয়ে দেবে।''[১১৮] সেখানকার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে রূপকথার মত আশ্চর্য সব গল্প। তাদের বিশ্বাস রক্ষেকালীর পূজা করলে দেবী এসে ঝেঁটিয়ে কলেরাকে দূর করে দেবে। দুর্গা ঠাকুরণীর মুখে শোনা যায় এই জাতীয় একটি গল্প — ''মা আসবেন, এসে এক রেতে তেড়ে বার করবেন গাঁ থেকে . . . গাঁয়ে একমাস কলেরা, শেষে যেদিন রক্ষেকালীর পূজা হল, সেদিন রেতে পথে পথে সে কী কান্না মা! তারপর এই ভোরবেলাতে এই কালো বিভীষণ চেহারার এক মেয়ে এক চেটাই বগলে গাঁ থেকে বেরিয়ে গেলো।''[১১৯] অমাবস্যা তিথিতে শ্মশানে পাঁঠাবলিসহ মহাসমারোহে এই রক্ষেকালীর পূজা হয়, সেদিন সকাল থেকেই ঢাক, ঢোল, সানাই বাজতে থাকে, গ্রামের প্রত্যেক বাড়ির গৃহিণী অথবা প্রবীনতমা স্ত্রীলোক — একজন নিরম্বু উপবাস করে থাকেন, যারা পূজা ও বলি হয়ে গেলে জলগ্রহণ করেন। গ্রামসুদ্ধ এক রহস্যময় পরিবেশ তৈরি হয়। পূজাস্থল অর্থাৎ শ্মশানের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''এখানে ওখানে দল বাঁধিয়া বসিয়া গিয়াছে ভক্তের দল, গোল হইয়া বসিয়া স্খলিতকণ্ঠে চিৎকার করিতেছে, মধ্যে মদের বোতল। কোথাও চলিতেছে গাঁজা। শ্মশানের মধ্যস্থলে একটা

মাটির বেদীর উপর কালী প্রতিমা, পুরোহিত সম্মুখে বসিয়া একটি জবার অঞ্জলি লইয়া বোধ হয় ধ্যানস্থ। . . . এই হল উপযুক্ত পূজামণ্ডপ। শ্মশানের মাঝখানে, ওপরে অনাবৃত আকাশ, চারিদিকে শেয়াল কুকুরের চিৎকার; এ না হলে মানায় না।''[১২০] রক্ষেকালীর পূজা ছাড়াও এই উপন্যাসে 'লুণ্ঠন ষষ্ঠী'র গল্প এবং শিবনাথের মামাশ্বশুর রামকিঙ্করের বাড়ির দোল উৎসবের প্রসঙ্গের কথা আছে।

ঐ অঞ্চলের নিম্নবর্ণের মানুষগুলির মধ্যে ভূতের আতঙ্ক তীব্র ছিল, তা ফ্যালা ডোমের মৃত্যুর পর তার কলেরা রোগাক্রান্ত মৃতপ্রায় বৌটির মধ্যেও দেখা যায়। সে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মুখে দাঁড়িয়ে ফ্যালার মৃত আত্মার ভয়ে ঘরে যেতে রাজি হতে না চেয়ে শিবনাথকে বলেছে — ''ওগো না গো, ঘরের ভেতর আঁদার কোণে যদি সে বসে থাকে?''[১২১] শিবনাথ তাকে দেবতার নাম, ভগবানের নাম করার কথা বললেও তার বিশ্বাস 'চন্ডীমায়ের একটুকুন পুষ্প' এনে দিলে ভূত আসবে না। শেষপর্যন্ত শিবনাথ কাগজে পেন্সিল দিয়ে রামনাম লিখে তার শিয়রে রাখলে সে ভয়মুক্ত হয়।

উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষজনের বাসগৃহ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাসের বিস্তারিত বিবরণ নেই। হয়তো উপন্যাসের প্রধান চরিত্রেরা উচ্চবর্ণের হওয়ার কারণে তারাশঙ্কর এসবের বর্ণনায় যান নি। উপন্যাসটি সাধু বাংলা গদ্যে রচনা করলেও তিনি চরিত্রদের মুখে চলিত ভাষার সংলাপ বসিয়েছেন। এরমধ্যে প্রধান চরিত্রগুলিসহ শিক্ষিত, ভদ্র, শহুরে মানুষগুলি মান্যচলিত বাংলায় কথাবার্তা বলেছে। আর ঐ অঞ্চলের গ্রাম্য মানুষগুলি, যারা উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্র হিসেবে জায়গা পেয়েছে, যেমন জমিদার বাড়ির বিশ্বস্ত অনুচর শম্ভু ও তার মা, জমিদারী সীমানায় বসবাসকারী সাধারণ ডোম, বাগ্‌দী, বাউরী প্রজারা এবং জমিদার বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকারা সবাই রাঢ়ী উপভাষার সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক রূপে কথা বলেছে। যেমন শম্ভু বলেছে — ''ওরা আর আসবে না বাবু। সন্‌জে হয়ে এলো, চলেন, বাড়ি যাই। সেই কখন আইচেন, বলেন দেখি।''[১২২] সে আরও বলেছে — ''যাক, শালারা চলে যাক, তেড়ে আসবে, ছিঁড়ে ফেলাবে আমাদিকে, বাঘের জাত তো।''[১২৩] আবার শম্ভুর মা বলেছে — ''ওগো বাবু, ভয়ে কাঁপুনি আসছে গো; বলতে যে লারছি। কাল

রেতে আবার ছজনার হইছে গো।''[১২৪] এইভাবে চরিত্রদের মুখের ভাষা-সংলাপের ক্ষেত্রেও এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এভাবে 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটি পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল বীরভূমের নানা আঞ্চলিক উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছে। এখানে সেখানকার আঞ্চলিক ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, ঋতুবৈচিত্র্য থেকে শুরু করে সেখানকার মানুষজন, তাদের জীবন-জীবিকা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, লোকরুচি, লোককথা, আঞ্চলিক উপভাষা প্রভৃতি সবকিছুই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে এই উপন্যাসে আঞ্চলিকতার একটা বাহ্যিক পরিকাঠামো রয়েছে। উপন্যাসটির মূলে রয়েছে শিবনাথের তথা ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের গভীর দেশপ্রেম, বিশিষ্ট রাজনৈতিক জীবনদর্শন। তাই জলহীন মাঠ দেখে তারাশঙ্করের দ্বিতীয় সত্তা শিবনাথের মনে হয়েছে — ''মৃত্তিকাময়ী মা — সুজলা সুফলা, মলয়জ শীতলা তৃষ্ণায় চৌচির হইয়া ফাটিয়া যাইতেছেন।''[১২৫] স্ত্রী গৌরী তাকে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যাওয়ার পরামর্শ দিলে সে গভীর আবেগের সঙ্গে বলেছে — ''জান গৌরী, মাঠে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, মনে হল মাটি যেন কথা কইছে। জল শুকিয়ে মাঠের জমি চৌচির হয়ে যাচ্ছে। মানুষ যেমন তেষ্টায় হা হা করে, মাঠের মাটির মধ্যে তেমনি শব্দ অবিরাম উঠছে। . . . এ মাটি ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।''[১২৬] এই উপন্যাসে মাটির ভিতরে শিবনাথ উপলব্ধি করেছে দেশ ও জননীকে। সে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাস স্থাপন করে দেশ গঠনে এবং জনজাগরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, প্রকাশ্যে জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে জনগণকে জাগ্রত করে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান করতে গিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেছে। এজন্য এই উপন্যাসে অঞ্চলভিত্তিক জীবনকথা বহুল অংশে পরিবেশিত হলেও উপন্যাসটি কখনোই আঞ্চলিক উপন্যাসের সীমানায় আবদ্ধ হয়ে পড়েনি। এখানে উপন্যাসের প্রয়োজনে অঞ্চল এসেছে, যা ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য পুরণে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটিকে কেউ-ই সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলে মত দেন নি। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে উপন্যাসটির আলোচনার শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, উপন্যাসটি একটি ব্যক্তি

কেন্দ্রিক উপন্যাস — ''ধাত্রীদেবতা'য় জমিদারের ছেলে শিবনাথের শৈশব থেকে কৈশোর পর্যন্ত পরিণতির কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।''[১২৭] অবশ্য শিবনাথের এই পরিণতির কাহিনি অনেকটাই রাঢ়ভূমি বীরভূমের একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে এই আলোচনার শেষে তিনি যে উক্তি করেছেন তাতে উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতার লক্ষণকে স্বীকার করেছেন বলেই মনে হয় — ''কলেরার আক্রমণে গ্রামবাসীদের ত্রস্ত, অসহায় ভাব, ইতর শ্রেণীর মধ্যে, পারিবারিক বন্ধন-ছেদের, সনাতন ধর্মসংস্কারের নিকট ব্যাকুল, অন্ধ আত্মসমর্পণ, উত্তেজিত কল্পনার সম্মুখে নানা অর্ধ-অবাস্তব বিভীষিকার ছায়ামূর্তি-পরিগ্রহ — এই সমস্ত মিলিয়া এক ভীতিশিহরণস্পন্দিত, শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়াছে। অমাবস্যারাত্রে রক্ষাকালী পূজার বর্ণনায়, অনাবৃষ্টিতে শুষ্যমান শস্যক্ষেত্রের সোঁ সোঁ ধ্বনিতে এক অতিপ্রাকৃত উপস্থিতির ভীষণ আভাস ছায়াপাত করিয়াছে। সর্বশুদ্ধ উপন্যাসটি আদর্শপ্রবণতার আতিশয্য সত্ত্বেও — বা উহারই জন্য — করুণ-গভীর আবেদনে মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে।''[১২৮] এই উক্তিটিতে তারাশঙ্কর রাঢ় অঞ্চলের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা বিষয়ের উল্লেখ করে বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর পাঠকসমাজের প্রচুর অজানা বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন, যেগুলি একমাত্র উপন্যাসে গৃহীত রাঢ়বঙ্গের ঐ অঞ্চলটিরই পরিচয় বহন করে। এজন্য সমালোচকরা 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার লক্ষণ নিয়ে খুব বেশি আলোচনা না করলেও বাংলা উপন্যাসের আঞ্চলিকতার আলোচনায় 'ধাত্রীদেবতা'কে নিয়ে কিছু বলার সাহস হয়। তাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটির আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস প্রভৃতি পরিচয়কে সামনে রেখে একে বাংলা সাহিত্যের একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলা না গেলেও একটি আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাস হিসেবে অভিহিত করাই যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'কালিন্দী'** উপন্যাসটি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি সম্পর্কে 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন — ''দুই বিবদমান জমিদার বাড়ির কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। নদীর বুকে একটি চরকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের অবসান ঘটল।

সামন্ততান্ত্রিক জীবনের কতকগুলি উপাদানের প্রতি তারাশঙ্করের মমতা এবং জমিদার ও শিল্পপতির দ্বন্দ্বে জমিদারের পরাজয়ের জন্য বেদনাবোধ উপন্যাসে স্পষ্ট। তবে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে তারাশঙ্কর সচেতন।''[১২৯] তারাশঙ্করের বেশির ভাগ উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসটির পটভূমিও পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল। তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসে রাঢ়বঙ্গের বীরভূম জেলা প্রাধান্য পেলেও 'কালিন্দী'তে আছে পুরুলিয়া জেলার কথা। এই জেলার রায়হাট অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে ব্রাহ্মণী নদী, যার স্থানীয় নাম কালিন্দী। তবে এই অঞ্চলের লোকেরা কালিন্দীকে 'কালী নদী' নামে ডাকে। এই কালী নদীর বুকে সদ্য জেগে ওঠা একটি চরকে কেন্দ্র করে সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ছবি ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে এঁকেছেন। এটা করতে গিয়ে তিনি এখানে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা জমিদার নিয়ন্ত্রিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি রূপকে যেমন তুলে এনেছেন, সেইসঙ্গে ঐ ব্যবস্থা ও আধুনিক পুঁজি নির্ভর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধকেও এখানে দেখিয়েছেন। পাশাপাশি উপন্যাসের শেষে নায়ক অহীন্দ্রের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে দরিদ্র সাধারণ মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-এর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু রাজনৈতিক কার্যাবলীর মাধ্যমে সমকালীন ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ছবিও স্থান পেয়েছে। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর উপন্যাসটির এবং এর লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। তবে যে যাই বলুক, এটা ঠিক যে তারাশঙ্কর কালিন্দীর বুকে জেগে ওঠা চরটির প্রেক্ষিতে তাকে কেন্দ্র করে সেখানকার মানুষজনের জীবনচর্যার বিবরণ তুলে ধরে এখানে আঞ্চলিক বাতাবরণ তৈরি করেছেন। তাই উপন্যাসটিতে ঐ চরটি এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের প্রকৃতি থেকে শুরু করে সেই অঞ্চলের মানুষজন ও তাদের জীবনচর্যার নানা বিষয় স্থান পেয়েছে। অবশ্য সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই মানুষগুলির জীবনধারারও পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে।

উপন্যাসটির কাহিনি গড়ে উঠেছে কালিন্দী অর্থাৎ কালী নদীর উপর সদ্য জেগে ওঠা একটি চরকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসে এই নদীটি যে জায়গাটির উপর দিয়ে বয়ে গেছে তার দু'পাশে রয়েছে দু'টি গ্রাম — রায়হাট ও চক আফজলপুর। তবে এখানে মূলত রায়হাটের জীবনচিত্রের কথাই পরিবেশিত হয়েছে। রায়-বংশ এবং

চক্রবর্তী-বংশ — এই দু'টি বংশ ঐ অঞ্চলের জমিদার। এর মধ্যে রায়-বংশ বহু প্রাচীনকাল থেকেই সেই অঞ্চলের জমিদার — সে জন্য উপন্যাসে তাদের ১০৫ জন শরিকের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে একটি শরিকের কর্তা হলেন ইন্দ্র রায়, যিনি ঐ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা ধুরন্ধর ও কূটকৌশলী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। ইন্দ্র রায়ের বংশানুক্রমিক প্রতিপক্ষ হল চক্রবর্তী-বংশ, যে বংশের কর্তা হলেন রামেশ্বর চক্রবর্তী। ইনি এককালে ইন্দ্র রায়ের সমকক্ষ হলেও পুরো উপন্যাসে একজন বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ হিসেবে উপস্থাপিত। ইন্দ্র রায় এবং রামেশ্বর চক্রবর্তীর মধ্যে শ্যালক-ভগ্নিপতির সম্পর্ক হলেও রামেশ্বরের বাড়ি থেকে ইন্দ্রের বোনের অন্তর্ধানের পর থেকে সেই সম্পর্কে চিড় ধরে। রামেশ্বর বিকৃত মস্তিস্ক হওয়ায় এই উপন্যাসে নায়েব যোগেশ মজুমদারের সাহায্যে রামেশ্বরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুনীতিকে দুই নাবালক পুত্র মহীন্দ্র ও অহীন্দ্রকে নিয়ে তাদের পক্ষের জমিদারী সামলাতে দেখা যায়। এরমধ্যে ছোট ছেলেটি অর্থাৎ অহীন্দ্র অত্যন্ত মেধাবী। উপন্যাসে উল্লিখিত চরটি চক আফজলপুরের যে অংশে চক্রবর্তীদের জমিদারি ছিল সেদিকে জেগে ওঠায় তাতে চক্রবর্তীদের বেশি দাবী গড়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও ইন্দ্র রায় চরটির প্রতি নিজের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য ননী পাল নামে এক ব্যক্তিকে চরের কিছুটা অংশ আইনত দান করেন। চর পেয়ে ননী পাল চক্রবর্তীদের অপমান করতে গিয়ে ইন্দ্র রায়ের বোন অর্থাৎ মহীন্দ্রের বিমাতা রাধারাণী সম্পর্কে কুকথা বলে। এতে বিমাতার সম্মান বাঁচাতে মহীন্দ্র তাকে খুন করে এবং বিচারে তার দ্বীপান্তর হয়। এরপরেই ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে চক্রবর্তীদের সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠে। এতসব ঘটনার মাঝেই চরটিতে সাঁওতাল প্রজার আগমন ঘটে। এদের মোড়ল কমল মাঝি। এই সাঁওতালরা চরের জঙ্গল কেটে কিছু চাষোপযোগী জমি তৈরি করে সেখানে নানা ধরনের ফসল, শাক-সব্জি চাষাবাদ করে, চরের উপর নিজেদের বসত বাড়ি বানায়। একদিন অহীন্দ্র চর দেখতে গেলে এই সাঁওতালরা তাকে তাদের 'রাঙাঠাকুর' মনে করে সম্মান দেয় এবং সেই চর বিলি-ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করে। এই রাঙাঠাকুর অর্থাৎ সোমেশ্বর চক্রবর্তী আসলে অহীন্দ্রের ঠাকুরদা, যিনি একসময় ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহে সাঁওতালদের হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। যাই হোক, অহীন্দ্র নিজেদের জন্য চরের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট অংশটি রেখে বাকিটা সাঁওতালদের মধ্যে বিলি-ব্যবস্থা করে দেয়,

অবশ্য এই বিলি-ব্যবস্থায় রংলাল, নবীনের মতো তার গ্রামের মানুষগুলিও কিছু জমি পায়। তখন সাঁওতালরা ঐ চরটির নতুন নামকরণ করে 'রাঙাঠাকুরের চর'।

এদিকে তারই বোনের সম্মান রক্ষার্থে রামেশ্বরের ছেলে মহীন্দ্র মানুষ খুন করে সাজা পেয়ে দ্বীপান্তরে গেলে ইন্দ্র রায় হয়তো অনুশোচনায় পড়ে চক্রবর্তী-বংশের প্রতি সমস্ত বৈরিতা ত্যাগ করে সদ্য জেগে ওঠা চরটির উপর নিজের দাবী ত্যাগ করেন এবং রামেশ্বরের পরিবার যাতে চরটি ভোগ করতে পারে সেজন্য সচেষ্ট হন। এর পেছনে ইন্দ্র রায়ের স্ত্রী হেমাঙ্গিনীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাদের এই সচেষ্টতা মহীন্দ্রের বিচারের সময় থেকেই শুরু হয়। এর ফলে দীর্ঘদিন পর দু'টি পরিবার কাছাকাছি আসে। এদিকে মহীন্দ্রের মামলার খরচ জোগাতে গিয়ে চক্রবর্তীদের নায়েব যোগেশ মজুমদার কারণে-অকারণে প্রচুর ঋণ করেন, যা পরিশোধ করতে গিয়ে রামেশ্বরের সম্পত্তির সিংহভাগ বিক্রী করতে হয়। অবশ্য এই সম্পত্তি নায়েব যোগেশ মজুমদার বেনামে কিনে ফেলে। আর্থিক টান পড়ায় চরটিতে হাত পড়ে। অহীন্দ্র বিমল মুখার্জ্জী নামক কলকাতার এক ধনী ব্যবসায়ীকে চরটির কিছু অংশ বিলি-ব্যবস্থা করে দেয়। বিমলবাবু সেখানে চিনি কারখানা খোলার তোড়জোড় শুরু করেন। ফলে চরটিকে কেন্দ্র করে নানা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হয়। বিমলবাবু ছলে-বলে-কৌশলে সাঁওতালদের বিলি-ব্যবস্থা করা জমিগুলিরও দখল নেন। এতে সাঁওতালরা কৃষিজীবী থেকে কারখানার শ্রমিকে পরিণত হতে থাকে এবং একসময় সেই চর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এদিকে সেই চরের স্বত্ত্বকে কেন্দ্র করে জমিদারের সঙ্গে শিল্পপতির আইনি লড়াই শুরু হয়। যার একদিকে ছিলেন চক্রবর্তীদের পক্ষে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিভূ জমিদার ইন্দ্র রায়, আর অপরপক্ষে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি পুঁজিপতি বিমলবাবু। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই মামলার রায়ে শেষপর্যন্ত ইন্দ্র রায়ের পরাজয় ঘটে। এরপর বিমলবাবু জোরকদমে চিনি কারখানার কাজ শুরু করে দেন। ফলে সে অঞ্চলে রাস্তাঘাট, যানবাহন থেকে শুরু করে আধুনিক সভ্যতার অনেক উপকরণের প্রবেশ ঘটতে শুরু করে। এরসঙ্গে ঢোকে আধুনিক সভ্যতার ব্যাভিচারগুলিও। এদিকে মামলা হেরে ইন্দ্র রায় সবকিছু ছেড়ে তার জমিদারী স্বত্ত্ব ত্যাগ করে কাশীবাসী হতে মনস্থ করেন। ইন্দ্র রায় রায়হাট ত্যাগ

করার বাসনা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অঞ্চল থেকে সামন্ততন্ত্র একরকম অবসানের পথে এগিয়ে যায়।

এই উপন্যাসের আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে একদিকে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিরোধের প্রসঙ্গ থাকলেও অন্যদিকে অহীন্দ্রের কার্যকলাপের মধ্যে সে সময়কার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গও আছে। মহীন্দ্রের দ্বীপান্তর হওয়ার পর ইন্দ্র রায় চক্রবর্তীদের কাছাকাছি এলে তাদের এই ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তায় পর্যবসিত হয় — ইন্দ্র রায় রামেশ্বরের ছোট ছেলে অহীন্দ্রের সঙ্গে নিজের কন্যা উমার বিয়ে দেন। অহীন্দ্র সেই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, মেধাবী তথা উজ্জ্বল ছেলে হিসেবে পরিগণিত হলেও বিয়ের কিছুদিন আগে থেকেই অহীন্দ্রের মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। হয়ত সেই অঞ্চল ছেড়ে বাইরে গিয়ে পড়াশুনা করার কারণেই জগতের বিচিত্র সব পরিবর্তন তার চোখে ধরা দিতে থাকে। পাশাপাশি সেই অঞ্চলে বিমলবাবুর কার্যকলাপ, সাঁওতালদের জীবনধারার বিপর্যয় থেকে শুরু করে গরীব অসহায় মানুষগুলির দুরবস্থা, তাকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবাতে শুরু করে। এজন্য সে এক নতুন জীবন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়। তাই ইন্দ্র রায়ের মেয়ে উমা বিয়ের আগে পর্যন্ত অহীন্দ্রকে যেভাবে পেতে চেয়েছিল, বিয়ের পর আর তাকে সেভাবে পায় না। অহীন্দ্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র বিল্পব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সহিংস কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এবং দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করে। উপন্যাসের শেষে সে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরাও পড়ে। অহীন্দ্রের এই গ্রেপ্তারির সংবাদ শোনার পর তার বাবা রামেশ্বর চক্রবর্তীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঠিক হয়ে যায়। তার মুখ থেকেই জানা যায় যে, তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী অর্থাৎ ইন্দ্র রায়ের বোন রাধারাণীকে আর তার সন্তানকে সে গলা টিপে মেরে বাড়ির কুয়োর মধ্যে পুঁতে দিয়েছিল। তার বিশ্বাস এতে রাধারাণীর অভিশাপে যে পাপ তার লেগেছিল দুই পুত্র – – মহীন্দ্র ও অহীন্দ্রের কারাবরণে সেটা কেটে গেছে। উপন্যাসের শেষে কালিন্দীর রূপেও পরিবর্তন ঘটেছে। কালিন্দীর বুকে আগে আকাশ, নদীতীরের গাছ–গাছালির ও পাখিদের ছবি ভাসত; আর আজ উদয় সূর্যের আলোয় আলোকিত কলের চিমনী এবং চিমনীতে ওঠা ধোঁয়ার রাশির ছবি ভাসে।

এই উপন্যাসটি আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর সম্পর্কে খানিকটা বিরূপ মন্তব্য করে বলেছেন — ''পরবর্তী উপন্যাস 'কালিন্দী' (১৯৪০) অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের।''[১৩০] হয়তো উপন্যাসটির কিছু দোষ-ত্রুটি আছে, তবে উপন্যাসটিকে 'নিম্নস্তরের' বলা হয়তো যায় না। যাই হোক, 'কালিন্দী' উপন্যাসটির বেশ কিছু গুণ আছে, যেগুলি পাঠককে মুগ্ধ করে। এই গুণগুলির মধ্যে অন্যতম হল উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক পটভূমির ব্যবহার। ঔপন্যাসিক তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসের মত এই উপন্যাসটিও রাঢ়বঙ্গের একটি বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে রচনা করেছেন — রাঢ়বঙ্গের ব্রাহ্মণী নদীর দুই তীরে অবস্থিত রায়হাট এবং চক আফজলপুর নামক দু'টি গ্রামের কথা এখানে আছে। সেইসঙ্গে সদ্য জেগে ওঠা একটি চরের কথাও আছে, যার বর্ণনায় বলা হয়েছে — ''গ্রামের কোলেই কালিন্দী নদীর অগভীর জলস্রোত পার হইয়া খানিকটা বালি ও পলিমাটিতে মিশানো তৃণহীন স্থান, তার পরেই আরম্ভ হইয়াছে চর। সমগ্র চরটা বেনাঘাস আর কাশের ঘন জঙ্গলে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহারই মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে — অসংখ্য কীট-পতঙ্গ আর সাক্ষাৎ মৃত্যুদণ্ডের মত ভয়ঙ্কর নানা ধরনের বিষধর সাপ।''[১৩১] এই উপন্যাসে চরটির ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি এবং তাকে কেন্দ্র করে মানুষজনের ক্রিয়াকলাপের বিবরণ আছে। এই চরটি রায়হাটের জমিদারদের মধ্যে একপক্ষ চক্রবর্তীদের সীমানায় ওঠে। রংলাল পাল, নবীন বাগ্‌দীর মতো চক্রবর্তীদের প্রজারা চরটির প্রতি লোভ ও দাবী করে। এর খবর পেয়ে সাঁওতালরা সেখানে এসে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ-বাসের উপযোগী করে তোলে। চক্রবর্তীদের পক্ষে রামেশ্বর চক্রবর্তীর ছোট ছেলে অহীন্দ্র নিজেদের চাষাবাদের জন্য কিছু অংশ রেখে বাকিটা সাঁওতালদের ও নিজের প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দেয়। সাঁওতাল প্রজারা অহীন্দ্রের পিতামহ সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সোমেশ্বর চক্রবর্তীর নামে এই চরটির নাম দেয় 'রাঙাঠাকুরের চর'। অবশ্য কেউই জমির উপর নিজের সত্তা ধরে রাখতে পারে না — কলকাতার ব্যবসায়ী বিমল মুখার্জি সেখানে চিনির কল বসায়। উপন্যাসটির অল্প কিছু ঘটনা কলকাতাসহ বাইরে ঘটলেও বেশিরভাগ ঘটনা এই 'রাঙাঠাকুরের চর', রায়হাটে গ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ঘটেছে। ঔপন্যাসিক এখানে সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক

প্রকৃতি ও মানুষজনের জীবনচর্যার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ আঞ্চলিক সীমা সংহতির প্রশ্নে আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণকেই বহন করে।

'কালিন্দী' উপন্যাসটিতে দুই জমিদার বংশ — রায়-বংশের ইন্দ্র রায়, হেমাঙ্গিনী, অমল, উমা ও অন্যান্য শরিকের কিছু লোকজন এবং চক্রবর্তী-বংশের রামেশ্বর, সুনীতি, মহীন্দ্র, অহীন্দ্র প্রমুখের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই দুই বংশের মানুষজন ছাড়াও এই উপন্যাসে যেমন আছে ব্যবসায়ী বিমল মুখার্জি, চক্রবর্তীদের নায়েব যোগেশ মজুমদার, অচিন্ত্য বাবু, দোকান দার শ্রীবাস পাল ও তার ছেলে গণেশ প্রমুখদের মত সুবিধাবাদী ভদ্রশ্রেণির মানুষ, তেমনি আছে রংলাল, ননী পালের মত চাষিরা। এদের পাশাপাশি আছে দুই উপজাতি সম্প্রদায় বাগ্‌দী ও সাঁওতালরা। ঔপন্যাসিক বাগ্‌দীদের জীবন কথা দু'একটি আঁচড়ে শেষ করেছেন। এরা লেঠেল, জমিদারের হয়ে লাঠিয়াল বৃত্তি এদের জীবিকা। তাই জমিদারের প্রয়োজন হলে এরা যখন তখন লাঠি হাতে বেরিয়ে আসে। এই উপন্যাসে সাঁওতালদের জীবনকথাই মুখ্য। তারাশঙ্করের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে 'কালিন্দী'র বিষয়ে বলতে গিয়ে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাঁওতালদের সম্পর্কে বলেছেন — ''বীরভূমের গ্রামীণ অর্থনীতি বাংলার আর পাঁচটা জেলার মত কৃষিনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও বীরভূমের সাধারণ ভাগচাষিকে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় সাঁওতালদের সঙ্গে — যেটাও এ অঞ্চলেরই নিজস্ব ব্যাপার। অল্প মজুরিতে কঠিন শ্রমের সাহায্যে এরা বীরভূমের কাঁকুরে বিমুখতাকে ব্যর্থ করে দেয়। একদিকে ধ্বংসমুখী সামন্ততন্ত্র এবং অপরদিকে সাঁওতাল কৃষকদের ঘর তুলতে গিয়ে যাযাবরত্ব ত্যাগের বাসনায় ইতিহাসের একটা পর্যায় স্পষ্ট।''[১৩২] এই উপন্যাসে সাঁওতালদের জীবন ও জীবিকার অনেকটাই বিস্তারিত ছবি আছে। উপন্যাসে বিমলবাবু এবং অচিন্ত্যবাবু বাইরের লোক। বাকিরা প্রায় সবাই ঐ অঞ্চলের লোকজন। দুই জমিদার-বংশের উচ্চবর্ণের মানুষগুলি ও অন্যান্য সুবিধাভোগী লোকজন এবং বাগ্‌দী ও সাঁওতালরা সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে।

এখানে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, ভদ্র-অভদ্র নানা ধরনের চরিত্র থাকলেও একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে, এর প্রধান চরিত্র কালী নদীর উপর সদ্য জেগে ওঠা চরটি, সাঁওতালরা যার নাম দেয় 'রাঙাবাবুর চর', যা শুনে অহীন্দ্র নাম দেয় 'রাঙাঠাকুরের

চর'। সমালোচকেরা ইন্দ্র রায় এবং অহীন্দ্রের মধ্যে কাকে নায়কের মর্যাদা দেওয়া যায়, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করলেও সকলের অজান্তে কখন এই চরটি নায়কত্বের দাবী নিয়ে হাজির হয় তা বোঝা যায় না। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসে চরটির গুরুত্ব বোঝাতে চেয়ে বলেছেন — ''বস্তুতঃ এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দুইটি — এক, মানুষ রামেশ্বর; ও দ্বিতীয় জড়প্রকৃতি কালিন্দীর চর।''[১৩৩] উপন্যাসটি শুরু হয়েছে এই চরটির বিবরণ দিয়ে —

''নদীর ও-পারে একটা চর দেখা দিয়াছে।

রায়হাট গ্রামের প্রান্তেই ব্রাহ্মণী নদী — ব্রাহ্মণীর স্থানীয় নাম কালিন্দী, লোকে বলে কালী নদী; এই কালী নদীর ও-পারে চর জাগিয়াছে। এখন যেখানে চর উঠিয়াছে পূর্বে ওইখানেই ছিল কালী নদীর গর্ভভূমি। এখন কালী রায়হাটের একাংশ গ্রাস করিয়া গ্রামের কোলে কোলে বহিয়া চলিয়াছে। গ্রামের লোককে এখন বিশ হাত উঁচু ভাঙন ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে নামিতে হয়।

ওই চরটা লইয়া বিবাদ বাধিয়া উঠিল। . . . ''[১৩৪]

আর উপন্যাসটি শেষ হয়েছে এর অন্যতম চরিত্র রামেশ্বরের দৃষ্টিতে চরটির বর্ণনায় — ''ওই দূরে — নতুন ওঠা সর্বনাশা চরটার কোল ঘেঁষিয়া শীর্ণা কালিন্দীর বারোমেসে অগভীর অপরিসর জলধারা বহিয়া চলিয়াছে। মন্থর তাহার গতি এখন। কালের ভগ্নী কালিন্দী! কালিন্দীর জলস্রোতের মধ্যে নূতন চরটার ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। . . . আগে যেখানে কালিন্দীর জলে শুধু আকাশ ও নদীতীরের গাছ-গাছালি তৃণবনের ছায়া ভাসিত, আকাশে ওড়া বকের সারির ছবি ভাসিত — আজ সেখানে কালিন্দীর সেই স্রোতধারার উদয় সূর্যের আলোয় আলোকিত কলের চিমনী এবং চিমনীতে ওঠা ধোঁয়ার রাশি একটা অনির্দেশ্য শাসনের মত ভাসিতেছে বলিয়া মনে হইল।''[১৩৫] এই দুই-এর মাঝে উপন্যাসের বিবাদ-বিসম্বাদ, লড়াই-সংঘর্ষ, মামলা-মোকদ্দমা থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত ঘটনা সংঘটনের পেছনে চরটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। দীর্ঘদিন পর রামেশ্বর চক্রবর্তীর পরিবার এবং ইন্দ্র রায়ের পরিবারের মধ্য সৌহার্দ্য ও ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক তৈরির পিছনেও চরটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। চিনির কল স্থাপনের মধ্য দিয়ে সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যে কাজকর্ম শুরু হয়েছে

তার পেছনেও আছে এই চরটি। উপন্যাসে প্রাচীন কালের সঙ্গে নবীন কালের বিরোধকে এই চরের প্রেক্ষাপটেই উপস্থাপন করা হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসটিতে চরটির এইরকম অনিবার্য প্রভাবের দিকে নজর দিয়ে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''অবশ্য গ্রামের চাষি প্রজার মধ্যে ইহা, একটা লোলুপতার তুফান বহাইয়াছে, কাহারও কাহারও চক্ষে শ্বাপদ-সুলভ হিংস্র দীপ্তিও জ্বালাইয়াছে কাহাকেও কাহাকেও প্রলুব্ধ করিয়া সর্বনাশের রসাতলে পাঠাইয়াছে। যাযাবর সাঁওতাল-সম্প্রদায় অল্পদিনের জন্য ইহার আতিথেয় বক্ষে নীড় রচনা করিয়া আবার ইহার স্নেহ শীতল, অথচ পিচ্ছিল অঙ্ক হইতে দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে — চর ইহাদিগকে মাতার ন্যায় আহ্বান করিয়া বিমাতার ন্যায় বিসর্জন দিয়াছে। কলওয়ালা মিঃ মুখার্জির লৌহ-শাসনে ইহা নিজ বন্য প্রকৃতি হারাইয়া যান্ত্রিক সভ্যতার কবলে আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং যন্ত্রোচিত নির্মমতার সহিত পূর্বতন প্রভুর সর্বনাশ-সাধনের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং উপন্যাস মধ্যে কালিন্দীর চর যে একটি সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।''[১৩৬] সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'কালিন্দী' উপন্যাসে কালিন্দীর বুকে জেগে ওঠা চরটিই কাহিনিতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিয়েছে। এজন্য উপন্যাসটি থেকে চরটিসহ ঐ অঞ্চলটিকে কোনভাবেই সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না, চরটিকে সরিয়ে নিলে 'কালিন্দী' উপন্যাসটি আর উপন্যাস থাকে না। এটা আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠারই লক্ষণ।

এসবের পাশাপাশি উপন্যাসটিতে সেই অঞ্চলের মানুষদের জীবন-জীবিকারও পরিচয় আছে। এখানে প্রথমদিকে জমিদার নিয়ন্ত্রিত কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বিস্তারিত পরিচয় আছে। অবশ্য পরবর্তীকালে বিমলবাবুর প্রবেশের পর চিনির কল স্থাপন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কৃষিসভ্যতা ছেড়ে শিল্পসভ্যতার পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সে সময় কৃষকেরা শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে। ঐ অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনে কালিন্দী অর্থাৎ কালী নদী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই কৃষিজীবী রংলালের মুখে শোনা যায় — ''কালী তো আমাদের সাধারণ নদী লয় দাদাবাবু, উনি হলেন সাক্ষাৎ যমের ভগ্নী।''[১৩৭] এই কালী নদীর বুকে জেগে ওঠা 'রাঙাঠাকুরের চর'টিকে কেন্দ্র করেই ঐ অঞ্চলের মানুষগুলির জীবিকার বর্ণনা দেওয়া

আছে। সাঁওতালরা প্রথম এই চরটিকে চাষ-বাসের উপযোগী করে তোলে। সেখানে তারা ধান, গম, ভুট্টা, আখসহ নানা মরসুমী সব্জি চাষাবাদ করে -- ''ইহারই মধ্যে প্রায় সমস্ত জমি সবুজ ফসলে ভরিয়া উঠিয়াছে। চষিয়া খুঁড়িয়া নিড়ান দিয়া তাহারা ভুট্টা, সন, অড়হর বুনিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে; জমির ধারে সারিবন্দী চারা, তাহাতে শিম, বরবটি, খেঁড়ো, কাঁকুড়ের অঙ্কুর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ধানের জমিগুলি চাষ দিয়া একেবারে প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে। বাড়িঘরের চালে নূতন খড় চাপানো হইয়া গিয়াছে, কাঁচা সোনার রঙের নূতন খড়ের বিছানি অপরাহ্নের রৌদ্রে ঝকঝক করিতেছে।''[১৩৮] এরা বর্ষার সময় মহাজনের কাছে খোরাকি ধান নেয়, তারপর মনের আনন্দে চাষ চষে এবং ফসল উঠলে সুদসহ ধার শোধ দেয়। আবার এরা নিজেদের কাজের ফাঁকে জমিদারের জমিতেও চাষাবাদের কাজে বেগার খাটে। অবশ্য বিমলবাবুর খপ্পরে পড়ে এদের আর কৃষক থাকা হয় না, কেউ কেউ কলের শ্রমিক হয়ে যায়, বাকিরা সে অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। উপন্যাসে সাঁওতালদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে বাসগৃহ, খাদ্যাভ্যাস, খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদের কিছু কিছু বিবরণ আছে। এরা খড়ের চালার ছোট ছোট ঘর-বাড়ি তৈরি করে বসবাস করে। প্রত্যেকের বাড়িতে এক টুকরো উঠোন থাকে। তবে সবকিছুই তাদের লেপা-মোছা ও নানা কর্মকুশলতার কারণে নিকানো-গুছানো ও অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

খাবার-দাবারের ক্ষেত্রে এরা নিজেদের চাষকরা খাদ্যশস্য ও শাক-সব্জিকেই প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়াও মুরগি পোশাক কারণে মুরগির মাংসের পাশাপাশি চরটির বনাঞ্চল থেকে ধরা ইঁদুর, খরগোসের মাংসও রান্না করে অথবা পুড়িয়ে খায়। উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় তো বটেই অন্যান্য সময়েও দেশি মদ হাঁড়িয়া বা পচানীকে এরা পানীয়ের মধ্যে প্রথমে রাখে। অবশ্য বিমলবাবুর সৌজন্যে বিদেশি মদের সঙ্গেও এদের পরিচয় হয়। পোশাক-পরিচ্ছদের বিস্তারিত বিবরণ তেমন না থাকলেও ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন যে, সাঁওতাল মেয়েরা সাজ-গোজ করতে অত্যন্ত ভালোবাসে। সাজ-গোজের অলংকার হিসেবে তারা স্থানীয় নানা ধরনের রঙ-বেরঙের সুগন্ধি ফুল ব্যবহার করে।

এই উপন্যাসে স্থানীয় ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকরুচি, লোককথা প্রভৃতির বিবরণও আছে। উচ্চবর্ণের লোকজনদের ক্ষেত্রে এখানে হিন্দু-সংস্কৃতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। জমিদার ইন্দ্র রায়ের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে রাঢ়ের তান্ত্রিক শাক্ত সাধনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অহীন্দ্র-উমার বিয়ে সংক্রান্ত নানা আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার-বিশ্বাস, লোক-লৌকিকতায় উচ্চবর্ণের হিন্দু সংস্কৃতির পরিচয় ঔপন্যাসিক দিয়েছেন। তবে সাঁওতালদের জীবনচর্যার বর্ণনায় তিনি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এক্ষেত্রে একদিকে তিনি যেমন তাদের মোড়ল কমল মাঝির মুখ দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি সংক্রান্ত তাদের বিশ্বাস তথা পুরাকথাকে শুনিয়েছে, তেমনি দু'একটি অনুষ্ঠান-পরবের বিবরণও দিয়েছেন। অহীন্দ্রের পড়াশুনার কথা শুনে তার জাত ভাইদের সামনে একবার কমল মাঝি তার কাছে জানতে চায় — ''হ্যাঁ বাবু, এই যি পিথিমীটি, এই যি ধরতি-মায়ী — ইকে কে গড়লে? কি লেখা আছে পুঁথিতে তুদের?''[১৩৯] তার এই প্রশ্নের উত্তরে অহীন্দ্র পৃথিবী সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখা দিতে শুরু করলে কমল মাঝি তাকে থামিয়ে দেয় এবং বলে — ''উঁহু, তুকে এখনও অনেক পড়তে হবে। পিথিমীতে আগে ছিল জল। কিছুই ছিল না, শুধুই ছিল জল। তার পরে হ'ল কি জানিস? বলি শোন।''[১৪০] এসব বলে পৃথিবীর উৎপত্তি সংক্রান্ত একটা গল্পের অবতারণা করে। বাচন ভঙ্গির কারণে এই গল্পে তার তো বটেই সেখানকার সমস্ত সাঁওতালদের আন্তরিক বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই গল্পটিকে ঐ অঞ্চলের সাঁওতালদের পুরাণকথা হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

উপন্যাসে সাঁওতালদের নিজস্ব উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে 'বাতুলী' পরবের উল্লেখ আছে। এর ব্যাখ্যায় মোড়ল কমল মাঝি বলেছে — ''নাম বটে 'বাতুলী' পরব। আবার 'কদ্‌লেতা' পরবও বুলছে। 'রোওয়া' পরবও বলে। 'বাইন' পরবও বুলছে। যারা যেমন মনে করে, বুলে।''[১৪১] শুধু তাই নয় এই পরব কোথায় কীভাবে পালিত হবে তার বিবরণও এখানে আছে — ''জাহন সারনে' — আমাদের দেবতার থানে গো পূজো হবে। 'এডিয়াসিম' — আমাদের মোরগকে বলে 'এডিয়াসিম', ওই মোরগা কাটা হবে, পচুই মদ দিব দেবতাকে, শাক দিব দু-তিন রকম। তারপরে রাঁধা-বাড়া হবে উই দেবতাথানে, লিয়ে খেঁয়েদেয়ে সব নাচগান করব।''[১৪২]

সাঁওতালরা যে আদতে একটি ফূর্তিবাজ গোষ্ঠী তার পরিচয়ও উপন্যাসটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এজন্য দেখা যায় কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তারা সময় সুযোগ পেলেই আনন্দে মেতে ওঠে, নাচ-গান করে — পুরুষরা মাদল বাজায় আর মেয়েরা নানা সুরে বিভিন্ন ধরনের গান গায়। উপন্যাসের একটি অংশে অহীন্দ্র সাঁওতালদের জমির বন্দোবস্ত করে দিলে তারা আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছে — ''নদীর ধারে আসিয়া মাদলের শব্দে ও সাঁওতাল-মেয়েদের গানের সুরে তাহার চিন্তার একটানা ধারাটা ভাঙিয়া গেল। ও-পারের চরে আজ প্রবল সমারোহে উৎসব হইয়াছে, আজিকার দিন তাহাদের একটি পরমকাম্য শুভদিন, তাহাদের দেবতাকে তাহারা পূজা দিয়াছে। পাঁচটি লাল রঙের মুরগি, একটি লাল রঙের ছাগল বলি দিয়া নাকি পূজা হইয়াছে, তাহার পর আকণ্ঠ পচুই মদ খাইয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়াছে। অদ্ভুত জাত।''[১৪৩] 'কালিন্দী' উপন্যাসটিতে সাঁওতালদের এইসমস্ত পরিচয়ের দিকে নজর দিয়েই অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন — ''সাঁওতালগোষ্ঠির জীবনযাত্রা ও সমাজবন্ধনের বর্ণনায় অভিনবত্বের চিত্রসৌন্দর্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তাহাদের উদ্ভট কল্পনা, সরল আমোদ-প্রমোদ ও বিচিত্র সমাজব্যবস্থা লেখকের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দেয়।''[১৪৪]

উপন্যাসটি সাধুভাষায় রচিত। ভদ্র চরিত্রেরা মার্জিত রাঢ়ী ভাষায় অর্থাৎ মান্য চলিত বাংলায় কথা বলেছে। তবে নিম্নতর চরিত্রের সংলাপ রচনায় ঔপন্যাসিক রাঢ়ী উপভাষার স্থানীয় আঞ্চলিক রূপকেই গ্রহণ করেছেন। রংলাল পাল, ননী সাহা, নবীন বাগ্‌দীর মত স্থানীয় নিম্ন বর্ণের এবং নিম্ন বৃত্তির মানুষেরা এই ভাষায় কথা বলেছে। যেমন, রংলাল বলেছে — ''এই তো ক বছর হল গো বাবু মশায়, একটা বাছুর কি রকম ছটকিয়ে গিয়ে পড়েছিল চরের উপর। বাস্, আর যায় কোথা, ইয়া এক পাহাড়ে চিতি — ধরলে পিছনের ঠ্যাঙে। আঃ, সে কি বাছুরটার চেঁচানি! বাস্, বার কতক চেঁচানির পরই ধরলে পাক দিয়ে জড়িয়ে। দেখতে দেখতে বাছুরটা হয়ে গেল ময়দার নেচির মত লম্বা। কিন্তু কারু সাহস হল না যে এগিয়ে যাই।''[১৪৫] সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষগুলিও স্থানীয় আঞ্চলিক রাঢ়ী উপভাষায় কথা বলেছে। তবে তাদের ভাষায় নিজেদের সম্প্রদায়ের ছাপ স্পষ্টভাবে পড়েছে। যেমন, কমল মাঝি বলেছে —

''হুঁ ঠিক সেই পারা, তেমুনি মুখ, তেমুনি আগুনের পারা রঙ, তেমুনি চোখ! হুঁ, ঠিক বেটে, ঠিক বলেছিস তু মোড়ল।''[১৪৬] চূড়া মাঝি বলেছে -- ''টাকা লইলে কিছু হয় না বাবু, টাকা নাই। খেপে কি করব? আর বাবু খেপে মরেই যদি যাব তো খেপলম কেনে বল্? বুদ্ধি করলম ইবার আমরা।''[১৪৭] যুবতী মেয়ে সারী বলেছে — ''কেনে ঝগরা করবে না কেনে? চ'লে যাবে না কেনে? তু বাবু, বিচার ক'রে দে! বুড়া-বুড়ীর করণ দেখ্।''[১৪৮] এই ভাবে আঞ্চলিক কথ্যরীতির ভাষারীতিকেও তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে তুলে এনেছেন। এটা আঞ্চলিক উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তকে পূরণ করে।

এভাবে 'কালিন্দী' উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠার অনেকগুলি শর্ত পালিত হয়েছে। তবে উপন্যাসটি একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হতে পারে নি। এই উপন্যাসের সমস্যা যতক্ষণ পর্যন্ত কালিন্দীর চর অর্থাৎ 'রাঙাঠাকুরের চর' এবং তার ভাগ-বাটোয়ারার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতা রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু বিমলবাবুর আগমন এবং অহীন্দ্রের কর্মধারা উপন্যাসের পটকেই বদলে দিয়েছে। ফলে উপন্যাসটিতে এক মহাকাব্যোপম বিশাল পটভূমির ছায়া পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উপন্যাসটির নাম 'কালিন্দী'। এই নামকরণের মধ্য দিয়ে কালিন্দী নদী এবং তার বুকে জেগে ওঠা চরটির কথাই বারবার ব্যঞ্জিত হয়। উপন্যাসটিতে এর সার্বিক গুরুত্বও আছে। এটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, এগুলি উপন্যাসটির আঞ্চলিক ধর্মের পরিচয়কে অনেকটা উদ্‌ঘাটিতও করেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত 'কালিন্দী' উপন্যাসটি আঞ্চলিকতার গণ্ডীকে অতিক্রম করে গেছে। কারণ বিমলবাবুর আগমনে উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির আঞ্চলিকতা ভেঙে যেতে শুরু করেছে -- আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণ-বৈশিষ্ট্যের বিচারে এটি মেনে নেওয়া গেলেও অহীন্দ্রের পরিবর্তিত কার্যকলাপ শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক উপন্যাসের পরিপন্থী বলেই মনে হয়। ফলে আঞ্চলিকতার নিরিখে বিচার করলে তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' উপন্যাসটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস না হয়ে আঞ্চলিকতার লক্ষণধর্মী উপন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'টি বিশিষ্ট উপন্যাস হল **'গণদেবতা'** ও **'পঞ্চগ্রাম'**। এর মধ্যে 'গণদেবতা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে অর্থাৎ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে। আর 'পঞ্চগ্রাম' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫০ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে অর্থাৎ ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারীতে। এই উপন্যাস দু'টির কাহিনি অংশের মধ্যে সম্পূর্ণ সংযোগ আছে। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসটি 'গণদেবতা'র পরিপূরক হওয়ায় এ দু'টিকে একটি উপন্যাস ধরা যেতেই পারে। ঔপন্যাসিক নিজেও সেরকমই ভেবেছিলেন। তাই তিনি প্রথমটির নাম 'চন্ডীমণ্ডপ' এবং দ্বিতীয়টির নাম 'পঞ্চগ্রাম' রেখে দু'টিকে একসঙ্গে 'গণদেবতা' রাখার কথা বলেছিলেন — ''গণদেবতা' বইখানি 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে। এটি তাহার অংশবিশেষ; — 'চন্ডীমণ্ডপ' নামাঙ্কিত অংশ। দ্বিতীয় অংশ 'পঞ্চগ্রাম' নামে বাহির হইতেছে।''[১৪৯] এজন্য পৃথক পৃথক আলোচনায় না গিয়ে অনায়াসেই এই উপন্যাস দু'টির একত্রে আলোচনা করা যায়। অধিকাংশ সমালোচকও সেটাই করেছেন। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাস দু'টির পৃথকভাবে আলোচনা করলেও উপন্যাস দু'টির সম্পর্ককে অস্বীকার করেননি। 'গণদেবতা'র প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন — ''গণদেবতা' (১৯৪২) উপন্যাসে পল্লীজীবনের আর একটা সমস্যাসংকুল দিক্ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এখানে আধুনিক অবস্থা-পরিবর্তনের প্রভাবে গ্রাম্যসমাজের প্রাচীন রীতি-নীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কথা আলোচিত হইয়াছে; গ্রাম্যপঞ্চায়েতের আত্মনিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টা, সমাজশৃঙ্খলারক্ষার প্রয়াস বর্তমান যুগের অনুপযোগী প্রতিবেশে কিরূপে প্রতিহত হইয়াছে তাহাই উপন্যাসের বর্ণনার বিষয়।''[১৫০] আর 'পঞ্চগ্রাম'-এর প্রসঙ্গে বলেছেন — ''পঞ্চগ্রাম' (জানুয়ারী, ১৯৪৪) 'গণদেবতা'য় পল্লীসমাজের যে ধারাবাহিক জীবনযাত্রা চিত্রিত হইয়াছে তাহারই অনুবর্তন। এই উপন্যাসে পল্লীজীবনের অভ্যস্ত কক্ষাবর্তন কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনের চাপে সংকটময় পরিণতির উগ্রতর আবেগ ও দ্রুততর গতিবেগ অর্জন করিয়াছে।''[১৫১] সমালোচক শিশিরকুমার দাশ তাঁর 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' গ্রন্থে এই উপন্যাস দু'টির পৃথকভাবে পরিচয় দিলেও এগুলির সম্পর্কের কথাও বলেছেন। 'গণদেবতা' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল — ''বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের প্রকৃতি ও

তার ক্রমিক পরিবর্তনের কাহিনী। কেমন করে গ্রাম-সমাজের প্রাচীন রূপ ভাঙছে, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণে বিভাজিত সমাজে বিদ্রোহ-সুর ধ্বনিত হচ্ছে — ন্যায়রত্ন থেকে পৌত্র বিশ্বনাথ, এই তিনপুরুষের জীবনের মধ্য দিয়ে সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীর বিস্তার চরিত্রগুলির স্পষ্টতা এবং লেখকের মানবতাবোধ সব মিলে উপন্যাসটি এক অসামান্য মহত্ত্ব লাভ করেছে।''[১৫২] আর 'পঞ্চগ্রাম' সম্পর্কে তিনি বলেছেন — ''গণদেবতা উপন্যাসের পরবর্তী অংশ। তারাশঙ্কর তুলে ধরেছেন গ্রামবাংলার সমাজ জীবনের সমগ্রতা। কৃষক সমাজের দুর্বলতা এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ সংহতি, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, জমিদারের কূট রণনীতি সর্বোপরি গ্রামের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক — তার নীচতা, ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও আবেগময় মহত্ত্ব — এই সব মিলিয়ে কাহিনীতে এক মহাকাব্যের বিশালতা।''[১৫৩] সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গণদেবতা'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছেন — ''গণদেবতা' (১৯৪২), শুধু তারাশঙ্করের নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যেরই একটি যুগ পরিচায়ক উপন্যাস। একটা দেশ একটা জাতির মোড় ফেরার আশ্চর্য আলেখ্য এই উপন্যাস। আশ্চর্য এই ঔপন্যাসিকের সমাজবোধ, ইতিহাসের ছন্দজ্ঞান।''[১৫৪] 'পঞ্চগ্রাম'কে এর অনুগামী উপন্যাস বলে তাঁর বক্তব্য হল — ''অনুবর্তী উপন্যাস 'পঞ্চগ্রাম'-এ (১৩৫০) তারাশঙ্কর তাঁর পটভূমিকাকে আরো বিস্তৃতি দিয়েছেন। ভৌম অর্থনৈতিক সম্পর্কের জট ও জটিলতাকে আরো প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।''[১৫৫] অবশ্য অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসকে প্রায় সর্বত্র একসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি এই উপন্যাস দু'টির প্রশংসায় এগুলি বাংলা উপন্যাসের মোড় ফিরিয়েছে বলে মনে করেছেন — '' . . . তারাশঙ্কর লিখেছিলেন তাঁর দুই প্রধান উপন্যাস 'গণদেবতা' (১৯৪২) ও 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৩)। এ দুটি উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের মোড় ফিরিয়েছে। এই প্রথম গোটা লোকজীবন, গ্রামীণ সমাজ উপন্যাসে রূপ পেল।''[১৫৬]

'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' — দু'টি উপন্যাসেরই রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম ও সেখানকার সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের ছবি স্থান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন — ''ধাত্রীদেবতা থেকে

গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম পর্যন্ত তারাশঙ্করের পটভূমি এবং বিষয় বিংশ শতকের গোড়ার দিকের বীরভূমের পল্লীজীবন — যেখানে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের আভিজাত্য-বোধের ভগ্নাবশেষ যেমন আছে, তেমনি আছে উঠ্‌তি ব্যবসায়ীদের ও কলকারখানার মালিকদের সঙ্গে মুমূর্ষু জমিদার তন্ত্রের অসম সংগ্রাম। অন্যদিকে আছে গ্রামের দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য ও অশিক্ষা।''[১৫৭] অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন — ''গণদেবতা (১৯৪২) পঞ্চগ্রামে (১৯৪৩) তারাশঙ্কর গোটা জনপদকেই কাহিনীর প্রধান চরিত্ররূপে গড়ে তোলেন। ময়ূরাক্ষীর তীরবর্তী বীরভূম-জনপদের মানুষ এক বিশেষ কালের মধ্যে (১৯২২-২৩) আশা আকাঙ্ক্ষা সংগ্রাম ব্যর্থতা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক জীবনের ভেতর ভেতর যে সংঘর্ষ ঘটছে তাতে গ্রাম্যজীবনের ভিত্তিমূল বিচলিত হয়ে যাচ্ছে। পুরোনো মূল্যবোধের অবসান ও নতুন আদর্শের অভ্যুত্থানের পটে সামাজিক-আর্থনীতির সংঘর্ষ কীভাবে গ্রামের মানুষদের বদলে দিচ্ছে তারই অন্তরঙ্গ কাহিনী এ দুটি উপন্যাস।''[১৫৮] এদের দু'জনেরই বক্তব্য থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট যে, তারাশঙ্করের বেশির ভাগ উপন্যাসের মত এই দু'টি উপন্যাসেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালীন পরবর্তী বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় বিবর্তনের প্রেক্ষিতে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা জমিদার নির্ভর সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আধুনিক পুঁজি নির্ভর ধনতন্ত্রের বিরোধের প্রসঙ্গ এসেছে। সেই সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ডের রাজনীতি থেকে শুরু করে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রসঙ্গও এসেছে। 'গণদেবতা'য় বেশি প্রাধান্য পেয়েছে শিবকালীপুর গ্রামের প্রকৃতি ও মানুষজনের জীবনচর্যা। আর 'পঞ্চগ্রাম'-এ শিবকালীপুরের কথা তো আছেই, তার পাশাপাশি কঙ্কনা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম ও দেখুড়িয়া — এই চারটি গ্রামের প্রকৃতি ও মানুষজনের জীবনচর্যার কথাও প্রাধান্য পেয়েছে। এভাবে উপন্যাস দু'টিতে এই পাঁচটি গ্রামের জীবনকথা পরিবেশিত হয়েছে। এজন্য এদের পরিচয় দিতে গিয়ে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় আরও বলেছেন — ''ময়ূরাক্ষী বাঁধের ওপারে আধা-শহর, রেলওয়ে জংশন; এপারে শিবকালীপুর গ্রাম, ক্রোশখানেক দূরে কঙ্কনা গ্রাম। এই শিবকালীপুর গ্রামের মানুষদের সুখ দুঃখ প্রতারণা ষড়যন্ত্র ঈর্ষা ভালবাসা আত্মত্যাগ-মেশানো জীবনের কাহিনী গণদেবতা পঞ্চগ্রাম। ১৯২২-৩২ সালের সময়সীমায় বাধা

এই গ্রামজীবনকে অবলম্বন করেই তারাশংকর গোটা সমাজের ভাঙা-গড়ার ছবি এঁকেছেন।''[১৫৯]

তারাশঙ্কর 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসটির ভূমিকায় স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তাঁর 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম' উপন্যাস প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল — ''সমাজের পটভূমিকায় পল্লীর কথা বলিবার আরও অনেক কিছু আছে। কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে সব কথা বলা সম্ভবপর হয় নাই। এবং এতবড় পুরাতন দেশ ও সমাজের অতি প্রাচীন ইতিহাসের সব কথা আমার জানাও নাই। তাই অকথিত অনেক কিছু থাকিল। তবে যাহার কথকতা করিয়াছি — তাহার বাস্তব রূপ সম্বন্ধে আমার দাবী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার।''[১৬০] এই সংক্রান্ত আলোচনায় বলা যায় যে, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তারাশঙ্কর জাতীয় কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসেন। এরপর কংগ্রেসের সেবামূলক কাজে যোগ দিয়ে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করে কংগ্রেসের আঞ্চলিক সংস্থার সংগঠন এবং ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে সার্বিকভাবে গ্রামের উন্নয়নের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এইসব কাজের সুবাদেই বাংলার গ্রামজীবনের নানা সমস্যার স্বরূপ ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তাঁর মনে বিশেষভাবে দাগ কাটে। ফলে তাঁর রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে দেশের মানুষ এবং তাদের সমাজ সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসা তৈরি হয়। এই জীবন অভিজ্ঞতাই তাঁকে 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাস রচনার প্রেরণা জোগায়। পরস্পরের পরিপূরক এই দু'টি উপন্যাসে তিনি বাংলার গ্রাম সমাজের একটি সামগ্রিক রূপ চিত্রণে অগ্রণী হয়েছেন। এই প্রসঙ্গেও অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য স্মরণ করা যায় — '' . . . গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় তিনি অভিজ্ঞতার শিল্পী, আর অভিজ্ঞতার কোনো ফাঁক বা ত্রুটি নেই। যে পরিবর্তমান জীবনকে তিনি গভীরভাবে দেখেছেন, তাকেই তিনি রূপ দিয়েছেন।''[১৬১] এদের পূর্বে রচিত তারাশঙ্করের কোনো কোনো ছোটগল্প ও উপন্যাসে গ্রাম্য চাষির সুখ-দুঃখ, জমিদারতন্ত্রের সমৃদ্ধি ও অবক্ষয়, বৈষ্ণব জীবনের বিষাদ ও মাধুর্য-এর মতো বিষয়গুলি এলেও সেগুলিতে গ্রামীণ জীবনকথার পূর্ণাঙ্গরূপ আসেনি। 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসেই তারাশঙ্কর প্রথম গ্রামীণ জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপ চিত্রণ করেন। অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ও একথা মেনে নিয়েছেন — ''গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম জনপদ-জীবনের প্রথম সামগ্রিক আলেখ্য। গোটা মানুষ, সজীব

প্রকৃতি আর সমাজ-পরিবর্তনের খরস্রোত চিত্রণে তারাশঙ্করের নৈপুণ্য তাঁকে তাঁর কালের ক্রনিক্লার করে তুলেছে। বাংলা উপন্যাসে এটি নতুন ধারা। সমাজের ভাঙন, শতাব্দী-সঞ্চিত শাসন ও শৃঙ্খলার অবসান, গ্রাম্যসমাজে ধনের প্রাধান্য, উচ্চবর্ণের মহিমার বিলুপ্তি, আর্থনীতিক স্বনির্ভরতার স্থানে কল-কারখানার সস্তা জিনিসের প্রাবল্যে গ্রাম্যশিল্পীর অসহায়তা ও বিদ্রোহ, জমিদার ও ধনী চাষির সঙ্গে গরীব চাষির লড়াই, কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে শিবকালীপুর গ্রামের চাষিদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ-সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পচ্যুতি, প্রবলের কাছে দুর্বল গরীবের আত্মসমর্পণ, আদর্শবাদী দেবু ঘোষের নেতৃত্বের প্রতি গরীব চাষির অনাস্থা, ময়ূরাক্ষীর বানের মুখে, খরা ও কলেরার আক্রমণে অসহায় গ্রামবাসীর পরাজয় — সব মিলিয়ে গোটা গ্রাম্যজীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়, তারই মাঝে গোটা মানুষের অভ্যুদয় বাংলা উপন্যাসের প্রতিমায় নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল।''[১৬২] তিনি আরও বলেছেন — ''গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে তারাশঙ্কর দেখালেন গ্রামীণ সমাজ কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, আধুনিক ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে সংরক্ষিত গ্রামীণ সমাজের শাসন ও অবরোধকে ভেঙে দিচ্ছে, কীভাবে আধুনিক নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য মুক্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে গ্রামের অবহেলিত মানুষকে সমাজ ভেঙে আসতে প্রলুব্ধ করছে, কীভাবে জীবনের গভীরে প্রোথিত শতাব্দী-সঞ্চিত সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি মূল আল্‌গা হচ্ছে, তা এখানে চিত্রিত হয়েছে। দুর্বার সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের তরঙ্গাঘাতে গ্রামীণ সমাজ ধীরে অথচ নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে বদলে যাচ্ছে, তার বিশ্বস্ত ছবি এখানে পাই।''[১৬৩] তাই তারাশঙ্করের অগ্রজ কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা মাথায় রেখেও বলা যায় যে, বাংলা উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের পূর্ণাঙ্গরূপ প্রথম চিত্রিত হয়েছে 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' — এই উপন্যাস দু'টিতে।

এগুলিতে একদিকে আছে অসংখ্য বিচিত্র মানুষের শোভাযাত্রা, অপরদিকে আছে রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের একটি বিশেষ অঞ্চলের আঞ্চলিক পটভূমিকায় গ্রাম-বাংলার সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, লোকাচার-লোকবিশ্বাস, পূজা-পালা-পার্বণের বিস্তারিত পরিচয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে দুই কালের প্রেক্ষাপটে বাংলার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় যে ভাঙন ধরেছিল, তার বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক দলিল হল এই দু'টি উপন্যাস।

বাংলা সাহিত্যে এই দু'টি উপন্যাসের পূর্বে যে সমস্ত উপন্যাস রচিত হয়েছে, সেগুলিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলিতে ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দেবনাথ ঘোষ ওরফে দেবু পন্ডিতের কথা মাথায় রেখেও বলা যায় যে, এই দু'টি উপন্যাসে পৃথক পৃথক ব্যক্তির সুখ-দুঃখ নিয়ে তৈরি হয়েছে 'গণ'; এই 'গণ'ই হলেন দেবতা, যিনি সমাজের রথের রশি টেনে নিয়ে চলেন। এখানে দেবু, অনিরুদ্ধ, পাতু, দুর্গা, হরেন, এরসাদ, শ্রীহরি, পদ্ম, ন্যায়রত্ন, দ্বারিক চৌধুরী, যতীন প্রমুখদের নিয়ে তৈরি হয়ছে যে গণশক্তি — তার নামই 'গণদেবতা'। ঔপন্যাসিক এই দু'টি উপন্যাসে সেই গণদেবতারই গাথা রচনা করেছেন। আর তা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, বিবর্তনের অনিবার্য ধারা মেনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলার গ্রামসমাজের পরিবর্তনকে। সেখানে এতদিনকার ভূমি নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জায়গা নিতে শুরু করে পুঁজি নির্ভর ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। ফলে গ্রামীণ সমাজ ভেঙে পড়ে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে প্রাচীন রীতিনীতি সম্পর্কে মূল্যবোধ হারাতে থাকে, ধনীর দাপট বাড়ে, গ্রাম্য চন্ডীমন্ডপ, তার গ্রামের ন্যায়নীতি-আইনের রক্ষকের ভূমিকা ত্যাগ করে নব্য জমিদারের কাছারি বাড়িতে পরিণত হয়। নতুন ও পুরোনো জীবনাদর্শের সংঘাতে পুরোনো জীবনাদর্শ পিছু হটে, নব্য ধনিক শ্রেণির বিরুদ্ধে শ্রমজীবীদের আন্দোলন দানা বাধতে শুরু করে। এসব চিত্র সমকালীন বাংলার যে কোনো অঞ্চলের সামগ্রিক গ্রামীণ চিত্র হয়ে উঠেছিল। তবে এই উপন্যাস দু'টিতে তারাশঙ্কর এসব কিছুকেই রাঢ়বঙ্গে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক পটভূমিকায় পরিবেশন করেছেন। তিনি এগুলিতে এই সমস্ত সামাজিক পরিবর্তনগুলির পাশাপাশি ঐ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও মানুষজনের জীবনচর্যার সঙ্গে যুক্ত নানা পালা-পার্বণ, বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার, লোককথা, কাহিনি-কিংবদন্তীকেও তুলে এনেছেন। তাই এই উপন্যাস দু'টিতে রাঢ় অঞ্চলের স্থানীয় জনজীবনের একটা সামগ্রিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে।

তারাশঙ্করের এই উপন্যাস দু'টিতে আঞ্চলিকতার নানা দিক উঠে এসেছে। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসের মত এগুলিরও পটভূমি রাঢ়বঙ্গের বীরভূম জেলা। তবে এগুলিতে তিনি সমগ্র বীরভূম জেলাকে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেন নি — বীরভূম জেলার একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রেক্ষিতে কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর ও

দেখুড়িয়া — এই পাঁচটি গ্রামকে গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে 'গণদেবতা'য় মূলত শিবকালীপুর প্রাধান্য পেয়েছে। আর 'পঞ্চগ্রাম'-এ কমবেশি পাঁচটি গ্রামের প্রসঙ্গই এসেছে। 'গণদেবতা'য় এই পাঁচটি গ্রামের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — ''গ্রাম হইতে বাহির হইলে বিস্তীর্ণ পঞ্চগ্রামের মাঠ। দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় মাইল — প্রস্থে চার মাইল; কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর ও দেখুড়িয়া এই পাঁচখানা গ্রামের অবস্থিতি; এবং পাঁচখানা গ্রামের সীমানার মাঠ ময়ূরাক্ষী নদীর ধার পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। মাঠখানার দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিমে অর্থাৎ তিনদিকে ময়ূরাক্ষী নদী। ময়ূরাক্ষী নদীর তীরভূমি জুড়িয়া এই মাঠখানার উর্বরতা অদ্ভুত। অংশের নামই হইল 'অমরকুণ্ডর মাঠ' অর্থাৎ মাঠে ফসলের মৃত্যু নাই। . . . শিবকালীপুর নামেমাত্র দুইখানা গ্রাম; শিবপুর ও কালীপুর, দুই গ্রামের বসতির মধ্যে কেবল একটা দীঘির ব্যবধান। কালীপুর গ্রাম খানাই বড়, ওই গ্রামেই লোকসংখ্যা বেশি, শ্রীহরি, দেবু প্রভৃতি সকলেই বাস করে এখানে।''[১৬৪] ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসদ্বয়ে রাঢ়বঙ্গের পাঁচটি গ্রামকেই শুধু গ্রহণ করেন নি, সেইসঙ্গে সুযোগ পেলেই গ্রামগুলির বিস্তারিত বিবরণ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। যেমন, একজায়গায় যতীনের দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনায় লিখেছেন — ''যতীন জামা গায়ে দিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। অতিক্রম করিয়া আসিয়া পড়িল মাঠে। দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠে। মাঠের প্রান্তে ময়ূরাক্ষীর বাঁধ, বাঁধের গায়ে কচি সবুজ শরবনের চাপ। তাহারই ভিতর হইতে উঠিয়াছে তালগাছের সারি। মধ্যে মধ্যে পলাশ-পালতে-শিমূল-শিরীষ-তেঁতুলের গাছ। গাছগুলির মাথার উপরে অস্পষ্ট আলোয় উদ্ভাসিত আকাশের গায়ে জংশন-শহরের কলের চিমনী।''[১৬৫] এইভাবে মাঝেমাঝেই অঞ্চলটির ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রকৃতির বর্ণনা করে আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধানতম শর্ত আঞ্চলিক সীমা-সংহতির ব্যবহারকে অনেকটাই পূরণ করা হয়েছে।

এই উপন্যাসদ্বয়ে গৃহীত অঞ্চলটির ভৌগোলিক পরিবেশ ও প্রকৃতিতে ঔপন্যাসিক সেই অঞ্চলের নানা বর্ণের, নানা বৃত্তির অসংখ্য চরিত্রের অবতারণা করেছেন। এই রকম চরিত্রদের উপস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — ''গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে বিচিত্র চরিত্রের মিছিল — ব্রাহ্মণত্বের প্রতিনিধি মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন, মহিমাভ্রষ্ট অথচ আত্মমর্যাদাবিশিষ্ট

প্রাক্তন জমিদার দ্বারিক চৌধুরী, আভিজাত্যকামী নিষ্ঠুর ছিরু ওরফে শ্রীহরি পাল, অন্তজীর্ণ গ্রামসমাজের শাসনবিরোধী অনিরুদ্ধ কামার, অন্যায়-বিরোধী স্বৈরিণী দুর্গা মুচিনী, অনিরুদ্ধর স্ত্রী পদ্ম কামারনী, রাজবন্দী যতীন, ধনী মুসলমান চাষি দৌলত শেখ, আদর্শবাদী দেবু ঘোষ, ব্রাহ্মণ্য গৌরব-ভ্রষ্ট উপবীতবর্জনকারী ন্যায়রত্ন-পৌত্র বিশ্বনাথ, ইরসাদ, রহম চাচা, জোসেফ নগেন্দ্র রায় — সকলেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। রুক্ষ্ম রাঢ়ভূমি, শ্যামল ধানক্ষেত, ময়ূরাক্ষীর আকস্মিক বান, ঘেঁটুর গান, নবান্ন উৎসবের ঢাকের শব্দ, ঘন আঁধারে ডাকাতের সংকেতধ্বনি — সমস্ত মিলে এক চমৎকার পরিবেশ গড়ে তুলেছে।''[১৬৬] এতসব লোকজনের মধ্যে দেবনাথ ঘোষ ওরফে দেবু পণ্ডিত নায়ক হিসেবে পরিগণিত হয়। তার মধ্যে নায়কোচিত নানা বৈশিষ্ট্য থাকলেও বারবার মনে হয় সে যেন ঐ অঞ্চলটির মধ্যেই আবদ্ধ — উপন্যাসদ্বয়ে গৃহীত অঞ্চলটিকে বাদ দিলে তার ভিন্ন কোনো অস্তিত্ব নেই। এজন্য মনে হয় দেবু পণ্ডিত নয়; রাঢ়বঙ্গের সেই অঞ্চলটির গ্রামসমাজই নায়কের ভূমিকা পালন করেছে। একথা সমালোচকরাও মেনে নিয়েছেন — ''গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম উপন্যাসের পটভূমি অনেক ব্যাপক বিস্তীর্ণ। এখানে তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রকে ছাড়িয়ে গেছেন। সমাজবোধে উদ্দীপ্ত যুগ-পরিবর্তন সচেতন এক শিল্পীর এখানে দেখা পাই। দেবু ঘোষ এ দুই উপন্যাসের নায়ক বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পরিবর্তনশীল গ্রামীণ সমাজই নায়ক। এখানেই তারাশঙ্কর যথার্থ আধুনিক জীবনশিল্পী, যুগের রূপকার, জনপদ-জীবনের আলেখ্যকার।''[১৬৭] তিনি এটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রামসমাজকেন্দ্রিক উপন্যাস 'পল্লীসমাজ'-এর নায়ক রমেশের সঙ্গে দেবু ঘোষের তুলনায় বলেছেন — ''শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬)-এর নায়ক রমেশ আর তারাশংকরের 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম' (১৯৪২-৪৩)-এর নায়ক দেবু ঘোষ, এ দুজনের জীবনদৃষ্টির তুলনামূলক বিচারে অনুধাবন করা যায়, শরৎচন্দ্রে তারাশংকরে তফাৎটা কোথায়। শরৎচন্দ্রে কেবল সহানুভূতি, দরদ; তারাশংকরে আছে সমাজবোধ, যুগ-পরিবর্তন-সচেতনতা, বাস্তব আনুগত্য।''[১৬৮] সুতরাং আঞ্চলিক উপন্যাসে যেমন ব্যক্তি মানুষের চাইতে উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটিই সর্বাঙ্গীণ প্রভাব বিস্তার করে নায়কত্বের মর্যাদা লাভ করে, তার পরিচয়ও এই উপন্যাসদ্বয়ে আছে।

এই উপন্যাসদ্বয়ের চরিত্রদের জীবন-জীবিকার পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক মূলত জমিদার নিয়ন্ত্রিত কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থার ছবি এঁকেছেন। তবে উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে যে সময়টিকে গ্রহণ করা হয়েছে, সে সময় বাংলাদেশ থেকে জমিদার নিয়ন্ত্রিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদায় নিচ্ছিল এবং পুঁজি নিয়ন্ত্রিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাড়ম্বরে তার স্থান গ্রহণ করছিল। সে সময় ধীরে ধীরে গ্রাম্য চন্ডীমন্ডপীয় সংস্কৃতির স্থান নিচ্ছিল আধুনিক যন্ত্রনির্ভর কলকারখানা। তাই উপন্যাসদ্বয়ে কঙ্কণার জমিদারগণ, ছিরু পাল প্রমুখের জমিদারী কাজকর্মের যেমন উল্লেখ আছে, তেমনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে কৃষক থেকে শুরু করে কামার, কুমোর, নাপিত, মুচি ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পেশার ও বৃত্তির কাজকর্মের বিবরণের পাশাপাশি সে অঞ্চলে সদ্য স্থাপিত কলকারখানায় সেখানকার মানুষজনের কাজ গ্রহণ করার কথাও এসেছে। সেইসঙ্গে দেবু পন্ডিত, রাজবন্দী যতীন, ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সেই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করার প্রবণতাও দেখা যায়।

এই উপন্যাসদ্বয়ে হিন্দু ও মুসলমান — বাংলার এই দুই প্রধান ধর্মবিশ্বাসের মানুষজনকে ঔপন্যাসিক চিত্রিত করেছেন। এর মধ্যেও বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে হাড়ি, ডোম, বাগ্‌দিদের মতো নিম্নবর্ণের নানা সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। তবে শুধু উল্লেখই নয়, এদের সম্প্রদায়গত নানা কার্যাবলীর উল্লেখও আছে। যেমন, দেখুড়িয়া গ্রামের ভল্লাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে — ‘‘ভল্লা — অর্থাৎ বাগ্‌দীর দল। বাংলাদেশে ভল্লা বাগ্‌দীরা বহু বিখ্যাত শক্তিমান সম্প্রদায়। দৈহিক শক্তিতে, লাঠিয়ালির সুনিপুণ কৌশলে, বিশেষ করিয়া সড়কি চালনায় নিপুণতায় ইহারা এককালে ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ ছিল। এখনও দৈহিক শক্তি ও লাঠিয়ালির কৌশলটা পুরুষ পরম্পরায় ইহাদের বজায় আছে। ডাকাতিটা এককালে ইহাদের গৌরবের পেশা ছিল। ইংরেজ আমলে — বাংলা-দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের নব-জাগরণের সময় নব্য আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজ-নেতাদের সহযোগিতায় শাসক সম্প্রদায় বাংলার নিম্নজাতির দুর্ধর্ষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই ভল্লাদের বহুল পরিমাণে দমন করিয়াছেন। তবুও ইহারা একেবারে মরে নাই। আজ অবশ্য তাহাদের শক্তির ঐতিহ্য অত্যন্ত গোপনে পোষে; মেয়েদের মত ঘাঘরা-কাঁচুলী পরিয়া রায়বেশের দল

গড়িয়া নাচিয়া বেড়ায়। ক্ষেত্রবিশেষে একটু বেশি পুরস্কার পাইলে দৈহিক শক্তি ও লাঠি খেলায় নিপুণতার কসরৎ দেখায়। সাধারণত এখনও ইহারা চাষি; বাহ্যত অত্যন্ত শান্তশিষ্ট, কিন্তু মধ্যে মধ্যে — বিশেষ করিয়া এই বর্ষাকালে কঠিন অভাবের সময় তাহাদের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি জাগিয়া ওঠে। তখন তাহারা পরস্পরের সঙ্গে কয়েকদিন অভাব অভিযোগের দুঃখ ব্যথার কথা বলিতে বলিতে কখন যে ডাকাতির পরামর্শ আঁটিয়া বসে; সেকথা নিজেরা বুঝিতে পারে না। পরামর্শ পাকিয়া উঠিলে তাহারা একদা বাহির হইয়া পড়ে। ভল্লা বাগ্‌দী ছাড়াও অবশ্য এই ধারার সম্প্রদায় আছে; ডোম আছে, হাড়ি আছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই শ্রেণীর দল আছে, আবার সকল সম্প্রদায়ের লোক মিশ্রিত দলও আছে।''[১৬৯] বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও পঞ্চগ্রামের মানুষজন মিলেমিশে পরস্পরের সহাবস্থানেই বাস করত। হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে তেমন কোন বিরোধও ছিল না — ''পাঁচখানা গ্রাম — মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, দেখুড়িয়া, কুসুমপুর ও কঙ্কণা, এই লইয়া এককালে হিন্দু সমাজের পঞ্চগ্রাম গঠিত ছিল। তারপর কবে কেমন করিয়া সমগ্র কুসুমপুর মুসলমানের গ্রাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে ইতিহাস অজ্ঞাত না হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে অবান্তর, হিন্দু সামাজিক বন্ধন হইতে কুসুমপুর দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তবুও একটা নিবিড় বন্ধন ছিল কুসুমপুরের সঙ্গে, এককালে কুসুমপুরের মিঞা সাহেবরাই এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। কুসুমপুরের মিঞাদের প্রদত্ত নাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তরের জমি এ অঞ্চলে বহু ব্রাহ্মণে এবং বহু দেবস্থান আজও ভোগ করিতেছে। আবার কুসুমপুরের প্রান্তে যে মসজিদটি দেখা যায়, সেটির নিম্নাংশ যে এককালে কোনো দেবমন্দির ছিল সেটি দেখিবামাত্র বুঝা যায়। ধর্মকর্ম, পালা-পার্বণ এবং বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপে দুই সমাজের মধ্যে লৌকিকতার আদান-প্রদানও ছিল, বিশেষত বিবাহাদি ব্যাপারে দুই পক্ষে সহযোগিতা ছিল নিবিড়। . . . হিন্দুদের পূজা অর্চনায় পূজার ব্যাপার চুকিয়া গেলে মুসলমানেরা প্রতিমা দেখিতে আসিত, বিসর্জনের মিছিলে যোগ দিত, এককালে মিঞাসাহেবদের দলিজার সম্মুখ পর্যন্ত বিসর্জনের মিছিল যাইত, মিঞাসাহেবরা প্রতিমা দেখিতেন, হিন্দুদের জন্য সেখানে তামাকের বন্দোবস্ত থাকিত। মুসলমানের মহরমের মিছিলও হিন্দুদের গ্রামে আসিত, তাজিয়া নামাইয়া তাহারা লাঠি খেলিত, তামাক খাইত।''[১৭০]

হিন্দুধর্মের নানা লোকবিশ্বাস, লোককথা ও লোক-উৎসবের কথাও এই উপন্যাসদ্বয়ে আছে। গৃহীত অঞ্চলের লোক-উৎসব ও পূজা-পার্বণের মধ্যে 'ইতুলক্ষ্মী', 'ঘেঁটু পূজা', 'গাজন', ধর্মপূজা', 'ব্রতলক্ষ্মী', 'পৌষ-উৎসব', 'অম্বুবাচী' প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এগুলি কমবেশি বাংলার সর্বত্র দেখা গেলেও গৃহীত অঞ্চলটির প্রেক্ষিতে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। যেমন, 'ইতুলক্ষ্মী'র বর্ণনায় বলা হয়েছে — ''অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে 'ইতুলক্ষ্মী' পর্ব আসিয়া গেল। অন্যান্য প্রদেশে — বাংলাদেশের বিশেষ অঞ্চলে কার্তিক-সংক্রান্তি হইতেই ইতু বা মিত্র ব্রত আরম্ভ হয়, শেষ হয় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে। রবি শস্যের কল্যাণ কামনা করে সূর্য দেবতার উপাসনা হইতেই নাকি ইহার উদ্ভব। দেবুদের দেশে কিন্তু সমগ্র মাস ধরিয়া সূর্য দেবতার আরাধনার প্রচলন নাই। এদেশে রবি শস্যের চাষেরও বিশেষ প্রসার নাই; ধান-চাষ এখানকার প্রধান কৃষি-কর্ম। ইতুপর্বকে এখানকার ইতুলক্ষ্মী বা ইতু সংক্রান্তি পর্ব বলা হয়। হৈমন্তী ধান মাড়াই ও ঝাড়াই করিবার শুভ প্রারম্ভের পর্ব এটি এবং রবিশস্যের আবাহনও বটে। চাষিদের আপন খামারে ইহার অনুষ্ঠান। খামারের ঠিক মধ্যস্থলে শক্ত একটি বাঁশের খুঁটি পুতিয়া সেই খুঁটির তলায় আলপনা দিয়া সেইখানে লক্ষ্মীর পূজার ভোগ হয়। ধান মাড়াইয়ের সময় ওই খুঁটিটির চারদিকেই ধানসুদ্ধ পোয়াল বিছাইয়া দেওয়া হইবে এবং গরু মহিষগুলি ওই খুঁটাতে আবদ্ধ থাকিয়া বৃত্তাকারে পোয়ালের উপর পাক দিয়া ফিরিবে। তাহাদের পায়ের খুরের মাড়াইয়ে খড় হইতে ধান ঝাড়াই হইয়া থাকবে।''[১৭১] এই অঞ্চলের ঘন্টাকর্ণ অর্থাৎ ঘেঁটুপুজার বর্ণনায় তারাশঙ্কর লিখেছেন — ''চৈত্র মাসে ঘন্টাকর্ণের পূজা। ঘেঁটু পূজা, — পঞ্জিকার 'ঘন্টাকর্ণ' — বসন্ত রোগ-নিবারক মহাবল ঘন্টাকর্ণের পূজা। এই 'ঘন্টাকর্ণ' — ঘেঁটু গাজনের অঙ্গ। বিষ্ণু বিরোধী শিবভক্ত ঘন্টাকর্ণ ছিল পিশাচ। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া রুদ্র দেবতার এবং বিষ্ণু দেবতার উভয়েরই প্রসাদ লাভ করিয়াছিল। এই একাধারে ভক্ত ও পিশাচ ঘন্টাকর্ণের পূজা করে বাংলার নিম্ন জাতীয়েরা। সমস্ত মাস ধরিয়া ঘেঁটুর গান গাহিয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়। চাল ডাল সিধা মাগিয়া মাসান্তে গাজনের সময় উৎসব করে।''[১৭২] চৈত্রমাসের গাজন উৎসব রাঢ় অঞ্চলে এক আশ্চর্য পরিবেশ তৈরি করে। ভোর থেকেই সেই অঞ্চলের আবাল বৃদ্ধ বণিতা এই উৎসবের আমেজে মেতে ওঠে।

রাজবন্দী কলকাতার ছেলে যতীনের কাছে এটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ঔপন্যাসিক তাঁর দৃষ্টিতে গাজনের বর্ণনা দিয়েছেন — ''ঢাকের বাজনার শব্দে ভোরবেলাতেই — ভোর বেলা কেন — তখনও খানিকটা রাত্রি ছিল, যতীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গাজনের ঢাক। পূর্বে চৈত্রের প্রথম দিন হইতেই গাজনের ঢাক বাজিত। . . . সে আশ্চর্য হইয়া গেল, — গ্রামখানায় এই শেষ রাত্রেই জাগরণের সাড়া উঠিয়াছে। ঢেঁকিতে পাড় পড়িতেছে; মেয়েরা ইহারই মধ্যে পথে বাহির হইয়াছে। হাতে জলের ঘটি। চন্ডী-মন্ডপে জল দিতে চলিয়াছে। রাঙাদিদি বড় বড় করিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম করিতেছে — এখান হইতে শোনা যাইতেছে। জনকয়েক গাজনের ভক্ত স্নান শেষ করিয়া ফিরিতেছে — তাহারা ধ্বনি দিতেছে — বলো শি — বো — শি — বো — শিবোহে! হর — হর বোম্ — হর — হর বোম্।''[১৭৩] ধর্মপূজা রাঢ় অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট লোক-উৎসব। অনেকের মতে এটি রাঢ়ের ডোম সম্প্রদায়ের জাতীয় পূজাও বটে। এজন্য ধর্মঠাকুরের পূজাপ্রচার সংক্রান্ত ধর্মমঙ্গল কাব্যকে অনেকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্যও বলতে চান। এই উপন্যাসদ্বয়ে ধর্মপূজার কথাও আছে। তবে অবশ্যই সেটা উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে। ধর্ম আরাধনার বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''হরিজন-পল্লী মজলিসের স্থান — ওই ধর্মরাজ ঠাকুরের বকুল গাছতলা। বহুদিনের প্রাচীন বকুল গাছটি পত্র পল্লবে পরিধিতে বিশাল; কাণ্ডটার অনেকাংশ শূন্যগর্ভ এবং বহুকাল পূর্বে কোন প্রচণ্ড ঝড়ে অর্ধোৎপাটিত ও প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু বিস্ময়ের কথা, সেই গাছ আজও বাঁচিয়া আছে। ইহা নাকি ধর্মরাজের অসীম মহিমা! এমন শায়িত অবস্থায় কোথায় কোন্ গাছকে কে জীবিত দেখিয়াছে? গাছের গোড়ায় স্তূপীকৃতর মাটির ঘোড়া; মানত করিয়া লোকে ধর্মরাজকে ঘোড়া দিয়া যায়; বাবা বাত ভাল করিয়া থাকেন।''[১৭৪] বাঙালি গৃহস্থ পরিবারের বধূদের কাছে লক্ষ্মীর ব্রতপালন একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় কর্তব্য বলে গণ্য হয়। এই উপন্যাসদ্বয়েও লক্ষ্মীব্রত পালনের কথা আছে। অনিরুদ্ধ কামারের স্ত্রী পদ্মর এই লক্ষ্মীর ব্রত পালনের বিবরণে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''ব্রত কথাটি মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে আশা-আকাঙ্ক্ষায় বুক বাঁধিয়া পরিতুষ্ট মনেই পদ্ম লক্ষ্মীর আয়োজন করিল। ঘর-দুয়ার, খামার হইতে গোয়াল পর্যন্ত আলপনা আঁকিয়া এবার সে যেন

একটু বেশি বিচিত্রিত করিয়া তুলিল, দুয়ার হইতে আঙিনার মধ্যস্থল পর্যন্ত আলপনায় আঁকিল চরণ-চিহ্ন। ঐ চরণ-চিহ্নে পা ফেলিয়া লক্ষ্মী ঘরে আসিবেন। ঘরের মধ্যস্থলে সিংহাসনের সম্মুখে আঁকিল প্রকাণ্ড এক পদ্ম। অপরূপ তাহার কারুকার্য। মা আসিয়া বিশ্রাম করিবেন। শাঁখ ধুইল, ধূপ বাহির করিল, প্রদীপ মার্জনা করিল, সিন্দুর রাখিল, কাজল পরিল। এদিনের আয়োজন শেষ করিয়া গুড়ে নারিকেলে, গুড়ে তিলে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবে, দুধ জ্বাল দিয়া ক্ষীর হইবে। কত কাজ, কত কাজ।''[১৭৫] রাঢ়ের কৃষিভিত্তিক জীবনে এসব অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা। সেখানে অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে পৌষেরও আরাধনা করা হয় — ''তাহার ঘরে সোনার পৌষ চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে পূজা করিয়া বাঁধিতে হইবে। 'না যেয়ো ছাড়িয়ে পৌষ — না যেয়ো ছাড়িয়ে।' পনেরো মাস পরে তো সে ফিরিয়া আসিবে। তখন তাহাকে যে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়া কটোরা ভরিয়া অন্ন সাজাইয়া দিতে হইবে।''[১৭৬] এই উপন্যাসদ্বয়ে সেই অঞ্চলটির প্রেক্ষিতে বর্ষাকালে ধান রোপনের প্রাক্কালের লোক-উৎসব 'অম্বুবাচী'র বিবরণও আছে। 'অম্বুবাচী' যেন উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষদের কাছে খুশির বার্তা বয়ে আনে। তারা নানারকম উৎসব-অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে — ''আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। সাত তারিখে অম্বুবাচী পড়িল। ধরিত্রী নাকি এই দিনটিতে ঋতুমতী হইয়া থাকেন।. . . অম্বুবাচীর তিনদিন হলকর্ষণ নিষিদ্ধ। গ্রামে গ্রামে ঢোল বাজিতেছে, লড়াইয়ের ঢোল। -- অম্বুবাচীতে চাষিদের মধ্যে কুস্তি-প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। চলতি ভাষায় ইহাকে বলে 'আমুতির লড়াই'। এখানকার মধ্যে কুসুমপুর ও আলেপুরেই সমারোহ সর্বাপেক্ষা বেশি। এই দুইখানি মুসলমানের গ্রাম। অম্বুবাচীর লড়াই হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের সমারোহের বস্তু। চাষের পূর্বে চাষিরা বোধ হয় শক্তি পরীক্ষা করে। এই অঞ্চলের মধ্যে ভরতপুরে হয় সর্বাপেক্ষা বড় লড়াইয়ের আখড়া। বিভিন্ন স্থান হইতে নামকরা শক্তিমান চাষিরা — যাহারা এখানে কুস্তিগীর বলিয়া খ্যাত, তাহারা যোগ দেয়। ভরতপুরে যে বিজয়ী হয়, সে-ই এ অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে।''[১৭৭] এই উপন্যাসদ্বয়ে এইরকম অসংখ্য ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর উপন্যাসের গৃহীত পাঁচটি গ্রামের মানুষজনের লোক-সংস্কৃতি, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোককথার পরিচয় দিয়েছেন।

এই উপন্যাসদ্বয়ে কিছু ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত গানেরও ব্যবহার করেছেন। যেমন, ঘণ্টাকর্ণ বা ঘেঁটু পূজা উপলক্ষে সতীশ বাউরির দল গেয়েছে —

''এক ঘেঁটু তার সাত বেটা।
সাত বেটা তার সাতান্ত
এক বেটা তার মহান্ত।
মহান্ত ভাই রে,
ফুল তুলতে যাই রে,
যত ফুল পাই রে,
আমার ঘেঁটুকে সাজাই রে!''[১৭৮]

তাদের গানে স্থানীয় বিশেষ ঘটনার কথাও উঠে এসেছে —

''হায় এ জল কোথা ছিল।
জলে জলে বাংলা মুলুক ভে-সে গেল।[১৭৯]

শুধু তাই নয়, বহুদিন আগে রেললাইন পাতার সময়কার গানও এরা নিজেদের সঙ্গীতচর্চার অন্তর্ভুক্ত করেছে —

সাহেব রাস্তা বাঁধালে;
ছ'মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে।''[১৮০]

এমনকি দেবু পণ্ডিতকে পুলিশে ধরলে এই গায়কের দল সেই ঘটনা অবলম্বনেও গান রচনা করেছে — ''দেবু ঘোষে বাঁধল এসে পুলিশ দারোগা,
বলে, কানুনগোর কাছে হাত জোড় করগা।
দেবু ঘোষ হেসে বলে 'না'।। . . .''[১৮১]

'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে পদ্মের ভাবনায় সেই অঞ্চলে প্রচলিত বেঙা-বেঙির গানের কথাও এসেছে। এইসমস্ত গানকে ঐ অঞ্চলের মানুষ নারী-পুরুষের ভাব-ভালোবাসার সঙ্গে একাত্ম করে ভাবে। এসব গানে বেঙির জবানীতে বলা হয় —

''যেও না যেও না বেঙা — আমাদিগে ছেড়ে,
মুই নারী অভাগিনী ভাসি যে পাথারে —

ও হায় কচি কাচা নিয়ে!''[১৮২]

কিন্তু বেঙা কোনো কিছুই শোনেনা, সে গম্ভীর গলায় বেঙিকে শাসন করে বলে —

''মর্—মর্—একি জ্বালা—পিছে ডাকিস্ কেনে?
কেতাখ করেছ আমায় — ছেলেপিলে এনে—
মরতে কেন করলাম বিয়ে!''[১৮৩]

এই সঙ্গীত যেন, রাঢ়ের বাস্তব জীবন থেকে উঠে আসা সঙ্গীত। অনিরুদ্ধ–পদ্মর সম্পর্কটি এ অবস্থাতেই পৌঁছেছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই উপন্যাসদ্বয়ে গৃহীত অঞ্চলটির লোকসংস্কৃতি, লোক–বিশ্বাস, লোককথা, লোকাচারের পাশাপাশি লোকসঙ্গীতও স্থান পেয়েছে।

এই উপন্যাস দু'টিতে চরিত্রদের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকার বিবরণে রাঢ়ের প্রচলিত খাবার–দাবারের উল্লেখই আছে। পাশাপাশি এরা পোশাক–পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিক রাঢ়বঙ্গের পোশাকরীতিকে গ্রহণ করেছেন। তবে সম্প্রদায় ভেদে খাদ্যতালিকা ও পোশাক–পরিচ্ছদের বিবরণ বদলে গেছে। তারাশঙ্কর উপন্যাস দু'টি সাধু গদ্যরীতিতে রচনা করেছেন। তবে চরিত্রদের মুখের সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে তিনি দু'রকম রীতি গ্রহণ করেছেন — দেবু পণ্ডিত, ন্যায়রত্ন, দ্বারিক চৌধুরী, জগন ডাক্তার, যতীন, বিশ্বনাথ, কঙ্কনার বাবুগণ প্রমুখদের মত ভদ্র এবং উচ্চবর্ণের চরিত্রদের এবং বিভিন্ন সরকারী কর্মচারীদের মুখে তিনি রাঢ়ী উপভাষার মান্যচলিত রূপটি ব্যবহার করেছেন। আর পঞ্চগ্রামের অনিরুদ্ধ কামার, গিরীশ ছুতোর, পাতু বায়েন, রাম ভল্লা, তিনকড়ি, সতীশ, রামহরি, ছিদাম, ভূপাল, দৌলত শেখ, ইরসাদ, রহম, বিলু, পদ্ম, দুর্গা, দুর্গার মা, পাতুর স্ত্রী, রাঙাদিদি, শ্রীহরির স্ত্রীর মত অজস্র স্থানীয় নারী–পুরুষদের মুখে তিনি রাঢ়বঙ্গ বীরভূমে প্রচলিত আঞ্চলিক রাঢ়ী উপভাষার সংলাপ দিয়েছেন। শ্রীহরি এবং হরেন ঘোষালের সংলাপ এই উপন্যাস দু'টির বিশেষ দিক। শ্রীহরি ছিরু পাল রূপে আঞ্চলিক রাঢ়ী উপভাষায় কথা বললেও যখনই নিজেকে সে শ্রীহরি ঘোষ রূপে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে, তখন মান্যচলিত রাঢ়ীতে কথা বলেছে। আর হরেন ঘোষাল একটু উত্তেজিত হলেই বাংলার সঙ্গে সঙ্গে দু'একটি ইংরেজি শব্দ জুড়ে দিয়ে কথা বলেছে। যেমন —

১। ''Doctor, look, one চালা!—একটা ছোট ঘরের চাল ভাসিয়া চলিয়াছে। — There — there — ওই একটা — ওই একটা। ওই আর একটা। By God — a big গাছের গুঁড়ি।''[১৮৪]

২। ''হোয়াট্ ইজ্ দ্যাট টু ইউ? সে খবরে তোমাদের কি দরকার! সেল্‌ফিশ পিপ্‌ল সব!''[১৮৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই দুই উপন্যাসে খাদ্যাভ্যাস-খাদ্যতালিকার বর্ণনা, চরিত্রদের পোশাক-পরিচ্ছদের বিবরণ, স্থানীয় নারী-পুরুষের সংলাপের মত বিষয়গুলিতেও ঔপন্যাসিক আঞ্চলিকতাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এজন্য দু'টি উপন্যাসেই রাঢ়বঙ্গের গ্রামজীবনের চিত্র উঠে এসেছে। এই বিষয়টি অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতেও ধরা পড়েছে। তিনি 'গণদেবতা'র আলোচনাকালে লিখেছেন — ''. . . কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় স্বার্থসংঘাতে ক্ষুব্ধ, অনিয়ন্ত্রিত, দ্রুত-রসাতলগামী পল্লীসমাজের চিত্র খুব বাস্তবানুযায়ী হইয়াছে।''[১৮৬] আর 'পঞ্চগ্রাম' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য — ''তারাশঙ্করের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব সমগ্র সমাজ-প্রতিবেশের চিত্রণে। 'গণদেবতা'তে সমাজবন্ধন কেমন করিয়া শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, সামাজিক দলাদলির ক্রূরতা ও দুর্নীতিতে তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। 'পঞ্চগ্রাম'-এ ধ্বংসোন্মুখ সমাজ যে কয়েকটি অসাধারণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাতে ইহার অন্তর্জীর্ণতা ও যুগধর্মের সহিত ব্যবধান আরও নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।''[১৮৭] হয়তো অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে এই দু'টি উপন্যাসেও কিছু ভুল-ত্রুটি পাওয়া যাবে, কিন্তু সব দিক থেকে সামগ্রিকভাবে বিচার করতে বসলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাস দু'টি আঞ্চলিকতার নিরিখে অনেকটাই সফলতার পথে এগিয়ে গেছে। তাই এই উপন্যাস দু'টিকে সম্পূর্ণ সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস না বলা গেলেও অবশ্যই এগুলিকে আঞ্চলিকতার লক্ষণসম্পন্ন উপন্যাস বলতে হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস **'কবি'**। বেশির ভাগ সমালোচক এই উপন্যাসটিকে প্রসংশায় ভরে দিয়েছেন। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটিকে তারাশঙ্করের একটি 'মনোরম সৃষ্টি' বলে করে মন্তব্য

করেছেন — ''কবি' (মার্চ, ১৯৪২) তারাশঙ্করের আর একটি মনোরম সৃষ্টি। বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, রামায়ণ-মাহাভারত-পুরাণের প্রভাব কেমন করিয়া সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, আপামর জনসাধারণের মনে সৌন্দর্যবোধ ও সরলতার সঞ্চার করিয়াছে, বাংলার কবিয়াল-সম্প্রদায়ই তাহার চমৎকার প্রমাণ। গ্রন্থে এইরূপ একটি নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধির মধ্যে কবিত্বশক্তিস্ফুরণের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।''[১৮৮] অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ 'কবি' উপন্যাসটিকে তারাশঙ্করের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মন্তব্য করেছেন — ''ডোম সম্প্রদায়ের একজন যুবকের কবিরূপে প্রতিষ্ঠা এবং দুটি নারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক এই উপন্যাসের কথাবস্তু। আখ্যানের নিপুণ বিন্যাস, চরিত্রগুলির উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং গানের সহজ কথার সঙ্গে জড়িত সংরাগ ও বেদনা সব মিলে এই উপন্যাসটি তারাশঙ্করের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা।''[১৮৯] এই দু'জনের কথাতেই উপন্যাসটিতে বাংলার নিম্নবর্ণের একজন যুবকের কবিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ এসেছে। এই উপন্যাসটি অবশ্য সেই যুবক অর্থাৎ নিতাই কবিয়ালের জীবন কাহিনি অবলম্বনেই রচিত। তবে ঔপন্যাসিক নিতাই কবিয়ালের জীবন কাহিনিটি পরিবেশন করেছেন রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের আঞ্চলিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে।

'কবি' উপন্যাসটি প্রথমে 'প্রবাসী'র কার্তিক, ১৩৪৭ সংখ্যায় একটি ছোটগল্প রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে 'বসন' অর্থাৎ বসন্ত চরিত্রটি ছিল না। পরে এর সঙ্গে বসন্ত চরিত্রটি যোগ করে উপন্যাসের রূপ দেওয়া হয়। উপন্যাসরূপে প্রকাশের সময় এটি পাটনার 'প্রভাতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বের হয় এবং ১৩৫০ বঙ্গাব্দে প্রথম উপন্যাসরূপে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তারাশঙ্কর উপন্যাসটি বিখ্যাত কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারকে উৎসর্গ করে উৎসর্গপত্রে লেখেন — ''সত্য ও সুন্দরের উপাসক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার শ্রদ্ধাভাজনেষু।''[১৯০] মোহিতলালকেও 'কবি' উপন্যাসটি নানাভাবে মুগ্ধ করেছিল। তিনি নানা সময়ে উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। একসময় তো 'কবি'কে নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধও লেখেন। এই প্রবন্ধে তাঁর মুগ্ধতার পেছনে উপন্যাসটির যে সকল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হল 'কবি'-র আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। মোহিতলালের মতে 'কবি' উপন্যাসে বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলের একেবারে 'মাটির গন্ধ' লেগে

আছে। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই অঞ্চলটি অবশ্যই তারাশঙ্করের অত্যন্ত প্রিয় জন্মভূমি রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের গ্রামাঞ্চল। মোহিতলাল ছাড়াও বহু সমালোচক তারাশঙ্করের এই উপন্যাসটির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। এই উপন্যাসে নিতাই কবিয়াল নামে একটি চরিত্র সৃষ্টি করে তারাশঙ্কর তার জীবন পরিক্রমার মধ্য দিয়ে রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের গ্রামীণ অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষজনের জীবনচর্যার বিবরণ দিতে গিয়ে বিশেষ করে সেই অঞ্চলের লোকসঙ্গীত, লোককথা, লোকবিশ্বাস তথা লোকসাহিত্যকে উপস্থাপন করেছেন।

এটা তো ঠিকই যে, তারাশঙ্করের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের কোনো কথাসাহিত্যিক তাঁর মত করে নিজেদের গল্প-উপন্যাসে গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি, মানুষজন ও তাদের গ্রামীণ সংস্কৃতি, লোককথা, লোকবিশ্বাস, লোকসঙ্গীতের মত বিষয়গুলিকে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে তুলে আনেন নি। 'কবি' উপন্যাসে তিনি পশ্চিমবাংলার রাঢ়ভূমি বীরভূমের একটি অখ্যাত গ্রামের পটভূমিকায় সে অঞ্চলে অন্ত্যজ বলে পরিচিত ডোমবংশজাত নিতাই কবিয়ালের বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে নিতাই-এর জীবনের নানা অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা রাঢ়বঙ্গের সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত কবিগান, ঝুমুর গান, তরজা, খেউড়ের মতো লোকসঙ্গীতের গ্রামীণ পরিবেশটি মূর্ত করে তুলেছেন। ঐ অঞ্চলের হাড়ি, ডোম, বাগ্‌দির মতো তথাকথিত অন্ত্যজ বা নিম্নশ্রেণির মানুষগুলির অশিক্ষার কারণজাত আপাত রুক্ষতা, কাঠিন্যের আড়ালেও যে শিক্ষা ও সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ, সরলতা, সৌন্দর্যবোধ, কবিপ্রাণতা প্রভৃতি গুণ বিদ্যমান, তার বাস্তবচিত্র তিনি এই উপন্যাসে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। সেইসঙ্গে সেখানকার রুক্ষ লালমাটিতে যে আবহমান কাল ধরে লোকসঙ্গীত ও লোকসাহিত্যের উৎস লুকিয়ে আছে তার প্রমাণও রেখেছেন। উপন্যাসের নায়ক নিতাই কবিয়াল, ঠাকুরঝি, বসন প্রমুখদের চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে তাদের জীবনের যে ঘাত প্রতিঘাতের ছবি তিনি এখানে এঁকেছেন, তাতে ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট ভূ-প্রকৃতি এবং সেখানকার মানুষদের জীবনচর্যা প্রাধান্য পেয়ে 'কবি' উপন্যাসটির একটি আঞ্চলিক পটভূমিকা রচিত হয়েছে।

উপন্যাসটির কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, নায়ক নিতাইচরণ নিচুজাতের ডোমবংশের ছেলে। তবে শহরাঞ্চলে ডোম বলতে যাদের বোঝানো হয়, নিতাইয়ের পূর্বপুরুষেরা ঠিক সে জাতের নয়, — তারা লেঠেলের জাত এবং নবাবের আমলে পল্টনে থেকে এরা বীরত্বের খ্যাতি কুড়িয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তারা যুদ্ধ ব্যবসা ছেড়ে ডাকাতি শুরু করে। নিতাইয়ের বাবা ছিল সিঁদেল চোর, ঠাকুর্দা ছিল ঠ্যাঙাড়ে – – যে নিজের জামাইকে হত্যা করেছিল, মামা ছিল ডাকাত; আর মা-র বাবা ছিল খুনি। এই রকম কীর্তিমান বংশের ছেলে হল নিতাই। তার চেহারা দীর্ঘ, কালো দেহে কঠিন সবল পেশী বর্তমান থাকলেও চোখে সকরুণ বিনয় সর্বদা লেগে থাকে। সে পারিবারিক পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে প্রথম দিকে কবিদলের আসরে বসে থাকত, দোয়ারদের দলে মিশত, কাঁসি বাজানো আর দোয়ারের কাজ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখত। পরে বংশানুক্রমিক পেশায় না গিয়ে নিজেই সে অঞ্চলের বিখ্যাত কবিয়াল হয়ে ওঠে। অবশ্য নিতাই সহজে একজন কবিয়াল হতে পারে নি , শৈশবে জমিদারের কাছে কাপড় পাওয়ার লোভে বীরবংশী ডোমের ছেলেদের সঙ্গে নিতাই নৈশ-বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বছর তিনেক পড়াশুনা করে। এখানে সে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, জন্তু-জানোয়ারের গল্প মুখস্থ করে, যেগুলি কবি হওয়ার সময় তার ভীষণ কাজে লাগে। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী নিতাইয়ের কাছে পরিবারের তরফ থেকে ডাকাতিতে ঢোকার আহ্বান এলেও বিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই কবিগানের প্রতি তার মন যায়। এজন্য অবশ্য বাড়িতে তার স্থান হয় না — সে বাড়ি ত্যাগ করে রেল স্টেশনের পয়েন্টম্যান বন্ধু রাজা মুচির কাছে ওঠে। এই স্টেশনে দুধ দিতে আসে পাশের গ্রামের রাজার পঞ্চদশী বিবাহিতা কিশোরী শ্যালিকা ঠাকুরঝি, যার সঙ্গে পরে নিতাই-এর একটা আন্তরিক হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

রাজার কাছে থাকার সময় নিতাই স্টেশনে মোট বওয়ার কাজ করে। তবে তার মনে কবিত্বের সুপ্ত স্বপ্ন লেগেই থাকে। এজন্য সময় সুযোগ পেলেই সে স্টেশনেই গান গেয়ে ওঠে — এক্ষেত্রে কখনও প্রচলিত গান গায়, আবার কখনও বা নিজেই গান তৈরি করে নেয়। আর যেখানেই কবিগানের আসর বসার সংবাদ পায়, সেখানেই গিয়ে হাজির হয়। এসব আসরে অনেক সময় সে দোয়ারের কাজও পায়। এরূপ চলতে চলতে এক কবিগানের আসরে হঠাৎই একদিন নিতাই কবি হিসেবে

প্রতিষ্ঠা পায়। এতে চেনাশোনা লোকজনের নিতাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়, বন্ধু রাজাও অত্যন্ত খুশি হয়। তবে সব থেকে বেশি খুশি হয় ঠাকুরঝি। এইসময় নিতাইয়ের বাড়ির লোকও তাকে বাড়িতে এসে থাকতে বলে। কিন্তু নিতাই বাড়িতে না গিয়ে আরও বেশি করে কবিযশপ্রার্থী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। তখন সে ঠাকুরঝির সঙ্গে একটা বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সংকল্পও করে। ফলে হৃদয়ে ঠাকুরঝির জন্য একটা আলাদা টান অনুভব করে। তবে নিতাইয়ের নৈতিকতা তাকে বিবাহিতা ঠাকুরঝির সঙ্গে মিলিত হওয়ার সম্মতি দেয় না।

এরপরেই উপন্যাসে এসে হাজির হয় এক ঝুমুরের দল। এই দলটির প্রধান আকর্ষণ বসন অর্থাৎ বসন্ত নামের একটি মেয়ে। এটি একটি ভ্রাম্যমান দল। এরা যেমন আসর বসিয়ে গান করে, তেমনি এই দলের মেয়েরা দেহ ব্যবসাও করে। এইদলের মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেপরোয়া হল বসন, যে নিতাইকেও আকর্ষণ করে। বসনকে পেয়ে স্বভাবরসিক নিতাই ভাবে — এতদিনে সে একটি রসিকতার যোগ্য পাত্রী পেয়েছে। একদিকে গানের প্রতি আগ্রহ, অপরদিকে বসনের প্রতি টান — এই দ্বিবিধ কারণ থেকেই নিতাই এই ঝুমুরের দলটির সঙ্গে যোগ দেয়। এইসময় নিতাই গান গায়, আর বসন সেই গানের তালে তালে নেচে দর্শক মনোরঞ্জন করে। এতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বসনের সঙ্গে নিতাই-এর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। ফলে নিতাই-এর জীবন থেকে ঠাকুরঝি অনেকটা দূরে সরে যায়। এদিকে গ্রামাঞ্চলে অশ্লীলতা কবিগানের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হলেও নিতাই প্রথম থেকেই এ থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। তার অশ্লীল বিষয়ের চেয়ে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, জীবজন্তু প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিই আগ্রহ ছিল বেশি। কিন্তু একদিন কবির লড়াই-এ বিপক্ষ দলের অশ্লীল গালিগালাজের কাছে নিতাই-এর ঝুমুরের দল পরাস্ত হলে বসনের কাছে পুরস্কার হিসেবে একটি চড় তার কপালে জোটে। এতে প্রবল অপমানিত হয়ে নিতাই আকণ্ঠ মদ খেয়ে তার বীরবংশী রক্তের উগ্রতায় চরম অশ্লীলতায় কবিগানের আসর মাত করে এসে বসনকে জড়িয়ে ধরে। বসনের ঘরেই সেদিন সে রাত কাটায়। এরপর থেকে বসন ও দলের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে নিতাই অনেকটা সহজ হয়ে উঠলেও সম্বিৎ ফিরে এলে তার নিজের প্রতিই ঘৃণা জন্মায় এবং নিতাই দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে বসন অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং

নিতাইয়ের প্রতি অতৃপ্ত প্রেমকে সঙ্গে নিয়েই মৃত্যুবরণ করে। বসনের মৃত্যুর পর তাদের দল ভেঙে যায় এবং হয়তো প্রায়শ্চিত্ত করার বাসনাতেই নিতাই সবকিছু ছেড়ে কাশী রওনা দেয়। তবে কাশীতে থেকেও সে শান্তি পায় না, বারবার তার দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা, ঠাকুরঝির কথা মনে আসে। এসবের প্রতি টান থেকেই শেষপর্যন্ত সে ফিরে আসে। কিন্তু ফিরে এসে বন্ধু রাজার কাছে জানতে পারে যে, নিতাই ঝুমুরের দলে যোগ দেওয়ার পর ঠাকুরঝি পাগল হয়ে যায় এবং এ থেকেই তার মৃত্যু হয়। এসব শুনে সে গেয়ে ওঠে —

''এই খেদ আমার মনে —
ভালবেসে মিটল না এ সাধ, কুলাল না জীবনে।
হায় — জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে।''[১৯১]

গানের মাধ্যমে নিতাইয়ের এই প্রশ্নের উত্থাপনের মধ্য দিয়েই তারাশঙ্কর তাঁর 'কবি' উপন্যাসটি শেষ করেছেন।

এইভাবে এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তাঁর নায়ক নিতাই কবিয়ালের জীবনকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের আঞ্চলিক পরিবেশের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এটা ঠিকই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীকে অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর অনেকটা জুড়ে গ্রাম-বাংলার মানুষ কবিগানকেই বিনোদনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের রুক্ষ্মভূমিই ছিল এই কবিগান ও কবিওয়ালাদের প্রধান ধাত্রীভূমি। বীরভূমের মাটিতে একদিকে যেমন বৈষ্ণব-বাউলরা আখড়া জমিয়েছিল, তেমনি সেখানেই কবিগান, ঝুমুরগান, টপ্পা, খেউড় প্রভৃতিও বিকশিত হয়েছিল। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর এই উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে বীরভূমের গ্রামাঞ্চলকেই গ্রহণ করেছেন। তবে অন্যান্য আঞ্চলিক উপন্যাসের মত একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার প্রকৃতিকেই এর মূল উপজীব্য করেন নি; উপন্যাসটির প্রেক্ষিতে বোধহয় সেটা সম্ভব ছিলও না। উপন্যাসটির অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে একটি ছোট রেলস্টেশনে। বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে ডোমসন্তান নিতাইচরণ সেই স্টেশনে বন্ধু রাজার কাছে ওঠে। সেখানেই ঠাকুরঝির সঙ্গে তার হৃদয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই

স্টেশনে থেকেই সে ‘কবিয়াল’ স্বীকৃতি পায় এবং ঝুমুর গানের দলটির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং সেই দলে যোগদান করে। এরপর অবশ্য সে ভ্রাম্যমান ঝুমুর দলটির সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে অনুষ্ঠান করে এবং সেই দলের প্রধান আকর্ষণ বসনের মৃত্যুর পর দল ছেড়ে কাশী রওনা দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত দেশের টানে নিতাই সেই স্টেশনেই ফিরে আসে। সুতরাং ‘কবি’ উপন্যাসটি কখনোই আঞ্চলিক সীমা-সংহতির কবল থেকে মুক্ত হতে পারে নি। হয়তো উপন্যাসটির এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি দিয়েই মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন যে, উপন্যাসটিতে বাংলার একটা অঞ্চলের একেবারে মাটির গন্ধ লেগে আছে।

এই উপন্যাসে তারাশঙ্করের উদ্দেশ্য ছিল নিতাই কবিয়ালের জীবনকে চিত্রিত করা। তিনি এখানে নিতাইকে রাঢ়বঙ্গের অন্যতম পরিচিত সম্প্রদায় ডোম সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে নিয়ে এসেছেন। এই সম্প্রদায়টির পরিচয় প্রদানের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন — ‘‘যে বংশে নিতাইচরণের জন্ম, সে বংশটি হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের ডোমবংশ, তবে শহর অঞ্চলে — ডোম বলিতে যে স্তরকে বোঝায়, ইহারা সে স্তরের নয়। এ ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল — প্রাচীনকাল হইতেই বাহুবলের জন্য ডোমেরা বিখ্যাত। ইহাদের উপাধি — বীরবংশী। নবাব পল্টনেও নাকি বীরবংশীরা বীরত্বে বিখ্যাত ছিল। কোম্পানীর আমলে নবাবী আশ্রয়চ্যুত হইয়া দুর্ধর্ষ যুদ্ধ ব্যবসায়ীর দল পরিণত হয় ডাকাতে। পুলিশের ইতিহাস ডোমবংশের কীর্তিকলাপে পরিপূর্ণ। এই গ্রামের ডোম-পরিবারগুলির প্রত্যেকের রক্তে রক্তে এখনও সেই ধারা প্রবাহিত।’’[১৯২] তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে নিতাইয়ের জীবনকে বিকশিত করতে গিয়ে অনেক মানুষকেই নিয়ে এসেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ তথাকথিত সভ্যসমাজের মানুষ হলেও বেশির ভাগই রাঢ়ের স্থানীয় প্রকৃতির মানুষ। নিতাই ছাড়াও এই উপন্যাসে আমরা যে সমস্ত চরিত্রের সম্মুখীন হই তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — নিতাইয়ের পরিবারের লোকজন, নিতাইয়ের বন্ধু রাজা, তার স্ত্রী ও ছেলে, ঠাকুরঝি, স্টেশনে বিভিন্ন পেশায় থাকা নানা অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষজন, মহান্ত, বিভিন্ন কবিগানের আসরে উপস্থিত কবিয়াল, তাদের দোয়ার এবং অন্যান্য সঙ্গী-সাথীগণ, বসনসহ ভ্রাম্যমান ঝুমুর গানের দলটির সদস্যগণ প্রমুখ। নিতাই তো বটেই, রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে এইরকম মানুষজন আগের শতকেও পর্যন্ত দেখা

যেত, এমনকী কোথাও কোথাও আজও এদের অস্তিত্ব আছে। ঔপন্যাসিক এখানে ঝুমুর গানের মেয়েদের সম্পর্কে লিখেছেন — ''ঝুমুর দলের মেয়ে, সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ইহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোনো শিক্ষাই নাই; কিন্তু সঙ্গীত ব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে। পালা গানের মধ্যে দিয়া ইহারা পুরাণ জানে, পৌরাণিক কাহিনীর উপমা দিয়া ব্যঙ্গ শ্লেষ করিলে বুঝিতে পারে, প্রশংসা সহানুভূতিও উপলব্ধি করে।''[১৯৩] তাঁর এই বক্তব্য যে সর্বাঙ্গীণ সত্য, তা বীরভূমের ঝুমুর দলগুলির ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করলেই জানা যায়। তিনি এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রদের বাস্তব জীবন থেকেই গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 'আমার সাহিত্যজীবন' রচনায় 'কবি' উপন্যাসের 'পরিচারিকা'য় জানিয়েছেন যে, নিতাই তাঁর পরিচিত সতীশ ডোম, তার সঙ্গে লেখকের আলাপও ছিল; ঠাকুরঝি ভিন গাঁ থেকে দুধ বেচতে আসা এক মুচি বউ। বসন এক ঝুমুর দলের মেয়ে, যাকে তিনি নিজে হাতে শুশ্রূষা করেছিলেন কলেরা রোগাক্রান্ত হলে; রাজন চরিত্রের মূল ছিল রাজা মিঞা নামের এক পয়েন্টম্যান, জাতিতে মুসলমান। এই চরিত্ররা প্রায় সবাই 'কবি' উপন্যাসটিতে তাদের রাঢ় অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সহযোগেই হাজির হয়েছে।

আঞ্চলিক উপন্যাসে বেশির ভাগ সময় ব্যক্তিচরিত্রকে ছাপিয়ে উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটি নায়কত্বের সীমায় উত্তীর্ণ হয়। অবশ্য 'কবি' উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের এ সুযোগ তেমন ছিল না। তবে এখানে নিতাই কবিয়াল অত্যন্ত সার্থকভাবে রাঢ় অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই বিষয়টি সমালোচকদেরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তাই অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিতাই সম্পর্কে বলেছেন — ''নিতাই-এর চরিত্রে তাহার হীনজাতি ও বিনয়কুণ্ঠিত আচরণের মধ্য দিয়া চরিত্রগৌরব এবং কবির মানস আভিজাত্য ও অতৃপ্তি চমৎকার ফুটিয়াছে।''[১৯৪] সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় নিতাই সম্পর্কে বলেছেন — ''ডোমজীবনের অন্ধকার পটে নিতাইয়ের ব্যক্তিত্ব বিকাশের কাহিনীই 'কবি' উপন্যাসের প্রধান কথা। নিজ সমাজের কাছে তার ব্যক্তি জীবনের সামাজিক দান একটি পরম স্বকীয়তায় মূল্যবান হয়ে উঠুক, এই সুপরিচ্ছন্ন নৈতিক জিজ্ঞাসায় কবির নায়ক নিতাই বিশিষ্ট।''[১৯৫]

অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় নিতাই কবিয়ালের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ়ের ঝুমুর গানের নায়িকাদের প্রতিনিধি বসন্ত ওরফে বসনেরও প্রশংসা করে বলেছেন — ''কবি' উপন্যাসের নায়িকা বসন্ত — বসন। ঝুমুর গানের দলের নর্তকী-নায়িকা বসন। উঠে এসেছিল সমাজের নিচুতলা থেকে। তার না ছিল শাস্ত্রজ্ঞান, না ছিল অধ্যাত্মব্যাকুলতা, না ছিল মুক্তিবাসনা। লোভে ঈর্ষায় ভালোবাসায় জীবনমোহে বসন ছিল বন্দী, ঝুমুর গানের দলে এসেছিল নিতাই কবিয়াল। জাত-ব্যবসা ছেড়ে হল ঝুমুর দলের গায়ক। বসন্ত ভালোবাসল নিতাই কবিয়ালকে। ভালোবেসে স্বৈরিণী মদ্যপায়ী নর্তকী বসন্ত হয়ে উঠল প্রেমিকা। বসন্তের এই আশ্চর্য রূপায়ণ, নিতাই কবিয়ালের এই জন্মান্তর — 'কবি' উপন্যাসের মূল কথা।''[১৯৬] একথা ঠিকই যে, ঔপন্যাসিক যতটা দরদের সঙ্গে নিতাই কবিয়াল ও বসনকে চিত্রিত করেছেন, তাতে এদের সর্বাঙ্গে রাঢ়ের মাটির গন্ধ লেগে আছে। রাঢ়ভূমি বীরভূম ছাড়া এরূপ চরিত্রের কল্পনাই করা যায় না। তাই নিতাই এবং বসন দু'জনেই সার্থক আঞ্চলিক চরিত্র হয়ে উঠেছে। তবে শুধু এরা নয়, এদের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য মানুষগুলি নিজেদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যথাযথ রূপেই বজায় রেখেছে।

এই উপন্যাসে সেই অর্থে একটি অঞ্চলের সামগ্রিক চিত্র না থাকায় কোনো সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের মত একটি অঞ্চলের মানুষের সামগ্রিক জীবন-জীবিকার ছবি নেই। তবে এখানে রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষজনের উল্লেখ আছে। যেমন, উপন্যাসের শুরুতেই নিতাইয়ের বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর ডোম সম্প্রদায়ের বীরবংশীদের দুর্ধর্ষতার উল্লেখ করেছেন। এখানে মূলত কবিগান, খেউড়, ঝুমুর প্রভৃতির বিস্তারিত পরিচয় আছে। কবিগান যে বাংলার অশিক্ষিত, অন্ত্যজ মানুষদের অত্যন্ত প্রিয় বিষয়, তা জানাতে ঔপন্যাসিক ভোলেন নি — ''বাংলার অশিক্ষিত সম্প্রদায় কবিগানের ভক্ত। কিন্তু সে প্রীতি তাহাদের অশ্লীল রসিকতার প্রতি আসক্তি।''[১৯৭] আবার ঝুমুর গানের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন — ''ভ্রাম্যমান দল। নাচ ও গানের ব্যবসায়ের সঙ্গে দেহের বেসাতি করিয়া বেড়ায় — গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে। কবে কোন্ পর্বে, কোন্ পথে কোথা হইতে কোথায় যাইতে হইবে সেও ইহাদের নখদর্পণে। বীরভূম হইতে মুর্শিদাবাদ,

পদব্রজে, গরুরগাড়িতে, ট্রেনে, নৌকায় — মালদহ পর্যন্ত ঘুরিয়া আষাঢ়ের প্রারম্ভে বাড়ি ফেরে।''[১৯৮] এই ঝুমুর গানের মেয়েরা আবার দেহব্যবসায়িনী। ঔপন্যাসিক এই দলের শ্রেষ্ঠ মেয়ে বসন সম্পর্কে লিখেছেন — ''বসন্ত দাঁড়াইল। নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনী; পথে পথে ব্যবসায়ের বিপণি পাতিয়া যাহাদের ব্যবসায় করিয়া ঘুরিতে হয় — লজ্জা তাহাদের থাকে না, থাকিলে চলে না। পথে নামিয়া লজ্জাকে প্রথম পথের ধুলায় হারাইয়া দিয়া যাত্রা শুরু করে।''[১৯৯] এভাবে তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চলের লোকসঙ্গীতকে বৃত্তি করা যাযাবর শ্রেণীর মানুষগুলির কথা, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-হতাশার কথা বিবৃত করেছেন।

ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের সাধারণ নিয়ম মেনে বিশিষ্ট কোনো ধর্মবিশ্বাসের কথাও বলেন নি। তবে এখানে হিন্দু ধর্মের ডোম সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। কবিয়ালরা, ঝুমুর গানের শিল্পীরা সাধারণত ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় তাদের সেই অর্থে বিশেষভাবে ধর্মাচরণ করারও তেমন সুযোগ থাকে না। এজন্য আঞ্চলিক লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকরুচি, লোককথার বিস্তৃত পরিচয় আশা করাও এই উপন্যাসের কাছে বৃথা। তবে কবিগান বা ঝুমুর গানের আসরের দৌলতে বেশ কিছু মেলার উল্লেখ এই উপন্যাসে আছে। যেমন, একটি মেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''রাসপূর্ণিমায় আলেপুরের মেলা বিখ্যাত মেলা। কাতারে কাতারে লোক যায় আসে। চতুর্দশীর প্রায় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মধ্যেও দুই মাইল দূরবর্তী মেলাটার উপরের আকাশখণ্ড আলোর আভায় ঝলমল করিতেছে। . . . কেবল আলো — আলো আর আলো, সেই আলোর ছটায় উজ্জ্বল পণ্য সম্ভারভরা সারি সারি দোকান, আর পথে ঘাটে মাঠে শুধু লোক — লোক আর লোক। মেলাটার স্থানে স্থানে নানা আনন্দের আসর — যাত্রা, কবি পাঁচালি, ঝুমুর। চারিপাশে কাতারে কাতারে দর্শক।''[২০০] 'কবি' উপন্যাসটিতে এইরকম আরও কিছু মেলা এবং কবিগান ও ঝুমুরের দলের আসরের উল্লেখ আছে।

এই উপন্যাস সেইভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিশিষ্ট খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকার বিবরণ নেই। তবে কবিয়াল ও তাদের সঙ্গীসাথীরা এবং ঝুমুর দলের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই যে মদ্যপান করত তার পরিচয় আছে। এখানে মূলত

ভবঘুরে শ্রেণীর যাযাবর প্রকৃতির লোকশিল্পীদের জীবনচিত্র বর্ণিত হওয়ায় তাদের বাসস্থানেরও তেমনভাবে উল্লেখ নেই। তবে ঔপন্যাসিক ঝুমুর শিল্পীদের অস্থায়ী আস্তানার বিবরণ দিয়েছেন — ''আসর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিতাই ঝুমুর দলের আস্তানায় বসন্তের খুপরির দুয়ারে দাঁড়াইল। খড়ের আগড়টা আধখোলা অবস্থায় রহিয়াছে। ভিতরে একটা লণ্ঠন মৃদুশিখায় জ্বলিতেছে।''[২০১] ঔপন্যাসিক একটি বিশেষ অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকা এবং বাসস্থানের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার তেমন সুযোগ না পেলেও কবিয়ালগণ ও তাদের সঙ্গীসাথী এবং ঝুমুর শিল্পীদের পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ পেয়ে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, যা থেকে কবিয়াল এবং তাদের দোয়ারসহ অন্যান্য সঙ্গীদের স্পষ্ট ছবি আমাদের চোখে ভেসে ওঠে। পাশাপাশি এই পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য ঝুমুর শিল্পীরাও আমাদের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

উপন্যাসটি লেখক বাংলা সাধু গদ্যতেই রচনা করেছেন। উপন্যাসের নায়ক নিতাই, ঠাকুরঝি, বসনের মতো প্রধান চরিত্ররা এবং উপন্যাসের ভদ্র চরিত্ররা রাঢ়ী উপভাষার মান্যচলিত রূপে কথা বললেও তাদের উচ্চারণে সেই অঞ্চলের প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয়। নিতাইয়ের পরিবারের লোকজন, রাজনের স্ত্রী, স্টেশনের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষজন, কবিয়ালদের বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীসাথীরা, ঝুমুরের দলের অন্যান্য সদস্যরা তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাঢ়ী উপভাষার আঞ্চলিক রূপেই কথা বলেছে। তারাশঙ্করের অন্যান্য উপন্যাসের মত এই উপন্যাসেও এই কথ্য রাঢ়ী উপভাষায় ছোট ছোট সংলাপের মধ্য দিয়ে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপনের কারণেই এই গৌণ চরিত্রগুলি স্বল্প উপস্থিতিতেও অত্যন্ত জীবন্তরূপে প্রতিভাত হয়। নিতাইয়ের আশ্রয়দাতা বন্ধু রাজা ওরফে রাজনের ভুল হিন্দিমিশ্রিত সংলাপগুলি উপন্যাসটির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তাই বলা যায় যে, চরিত্রদের মুখের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিক এখানে আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য মেনে চলেছেন। তবে আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারের চেয়েও স্থানীয় লোকসঙ্গীতের ব্যবহার উপন্যাসটিকে একটি অন্য মাত্রা দান করেছে। তারাশঙ্কর নিতাইসহ অন্যান্য কবিয়ালদের মুখে যে সমস্ত লোকসঙ্গীত ব্যবহার করেছেন, তাতে তাঁকে একজন লোকসঙ্গীতের বিদগ্ধ স্রষ্টা বললেও কম বলা হয়। এই রকম কিছু সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত হল —

১। ''সেই মেলাতে কবে যাব
ঠিকানা কি হায় রে!
যে মেলাতে গান থামে না
রাতের আঁধার নাই রে।
ও রসময় ভাই রে!''[২০২]

২। ''সংসারে যে সহ্য করে সে-ই মহাশয়।
ক্ষমার সমান ধর্ম কোন ধর্ম নয়।।''[২০৩]

৩। ''আমি ভালবেসে এই বুঝেছি—
সুখের সার সে চোখের জল রে।''[২০৪]

৪। ''কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে।''[২০৫]

৫। ''আহা—ভালবেসে—এ বুঝেছি
সুখের সার সে চোখের জলে রে—
তুমি হাস—আমি কাঁদি
বাঁশী বাজুক কদম তলে রে।. . .''[২০৬]

৬। ''ও আমার মনের মানুষ গো!
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর!
ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশান,
আমার হেথা টানে নিরন্তর।''[২০৭]

৭। ''বলতে তুমি ব'লো নাকো, (আমার) মনের কথা থাকুক মনে।
(তুমি) দূরে থাকো সুখে থাকো আমিই পুড়ি মন-আগুনে।''[২০৮]

৮। ''করিল কে ভুল—হায় রে!
মন মাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল।
করিল কে ভুল। হায় রে!''[২০৯]

৯। ''ধর্ম কথায় যখন মন ওঠেনা—বসে না—তখন দিতে হয় গাল।
ছুঁচের মত মিহি ধারে যখন কাজ হয় না তখন চালাতে হয় ফাল!
যখন ঠান্ডা জলে গলে না ডাল —
তখন কষে দিতে হয় তেঁতুল কাঠের জাল!''[২১০]

১০। ''তোমার চোখে জল দেখিলে সারা ভুবন আঁধার দেখি!
তুমি আমার প্রাণের অধিক জেনেও তাহ জানি নাকি?[২১১]

১১। ''এই খেদ আমার মনে —
ভালবেসে মিটল না এ সাধ, কুলাল না এ জীবনে।
হায়—জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে।''[২১২]

এইরকম অজস্র গান এই উপন্যাসে আছে। এই গানগুলির ক্ষেত্রে তিনি যেমন সেই অঞ্চলের কবিয়ালদের মধ্যে প্রচলিত কিছু বৈষ্ণব পদ, শাক্ত পদ, বাউল সঙ্গীত, নিধুবাবুর টপ্পা, খেউড়কে গ্রহণ করেছেন, তেমনি নিজেও অনেক গানের চরণ রচনা করেছেন। নায়ক নিতাই কবিয়াল অনেক সময় সংলাপের বদলে দু'-এক কলি গানের মধ্য দিয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করেছে। স্বাভাবিক ভাবে সেক্ষেত্রে গানের বক্তব্য স্বল্প হয়েছে; তবে সেগুলি নিতাইকে তো বটেই ঐ অঞ্চলের কবিয়ালদের চিনতে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

এভাবে বিশ্লেষণ করলে ‘কবি’ উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেক বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয়। তবে বাংলা কথাসাহিত্যের বিচারে ‘কবি’ উপন্যাসকে শুধু আঞ্চলিকতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয় — সমগ্র বাংলা সাহিত্যের নিরিখে এই উপন্যাসটির যে একটি স্বতন্ত্র আবেদন আছে, তা সব সমালোচকই স্বীকার করে নিয়েছেন। উপন্যাসটির এই স্বাতন্ত্রের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এর নায়ক নিতাই কবিয়াল। বাংলা উপন্যাসে এর পূর্বে নিতাইয়ের মত নায়ক খুব একটা বেশি দেখা যায় নি। এ সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ‘‘নিতাই কবি, সমস্ত সত্যিকারের কবির মত, স্বাভাবিক সুরুচি ও সুকুমার অনুভূতির অধিকারী — জীবনের প্রত্যেক অভিজ্ঞতা, ভাবের প্রতি উচ্ছ্বাস তাহার মনে অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে, গীতি-গুঞ্জনে রূপান্তরিত হয়। তাহার মনের এই দ্রুত, অবাধ সংবেদনশীলতা ও উদাস, উদার নির্লিপ্ততা তাহাকে প্রকৃত কবির সগোত্রীয় করিয়াছে।’’[২১৩] তবে নিতাই-এর কবিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ়ের ছবিও যে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা জানাতেও তিনি ভোলেন নি — ‘‘এই কবিত্ববিকাশের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে যে উত্তেজনাময় সুন্দরে-কুৎসিতে মিশ্রিত প্রতিবেশ ইহার সূতিকাগৃহ, তাহার চমৎকার ছবি দেওয়া হইয়াছে। অশিক্ষিত, ইতর শ্রোতৃবৃন্দের অশ্লীল রুচি ও যৌনলালসামিশ্র ভক্তি কবিয়ালদের কাব্যানুশীলনের অন্তর্নিহিত প্রেরণা; এই বিকৃত ছাঁচেই তাহাদের সৌন্দর্যবোধের অভিব্যক্তি। ঝুমুরের দলের যে ছবি লেখক আঁকিয়াছেন তাহা যেমনি বাস্তব তেমনি চিত্তাকর্ষক; ইহার বীভৎস কদাচারের মধ্যে সত্যিকারের শিল্পানুরাগ ও খানিকটা নিয়মানুবর্তিতা ও আদর্শবাদ আছে।’’[২১৪] সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ‘কবি’ উপন্যাসের আলোচনায় নিতাইকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন — ‘‘কবি’-র মূল কথা নিতাইয়ের আত্মাবিষ্কার, ডোম-জীবনের অন্ধকার পট, বসনের মাসির দলের ডোরাকাটা জীবন — এরই মাঝখান দিয়ে নিতাইকে চলতে হয়েছে। চিনতে হয়েছে নিতাইকে।’’[২১৫] অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তারাশঙ্করের ‘রসকলি’ গল্পটির পাশাপাশি ‘কবি’ উপন্যাসটিকে লোকজীবনানুগত্যের পরিচায়ক বলে মন্তব্য করেছেন – – ‘‘লোকসংস্কৃতির ভিত্তিতে রচিত ‘রসকলি’ গল্প আর ‘কবি’ উপন্যাস

তারাশংকরের লোকজীবনানুগত্যের উৎকৃষ্ট শিল্প-পরিচয়।''[২১৬] বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তাঁর আলোচনার লক্ষ্যও হল নিতাই কবিয়াল। আমাদের আলোচনাতেও বারবার বলা হয়েছে যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কবি' উপন্যাসে নিতাইয়ের মাধ্যমে রাঢ়ের সমগ্র কবিয়ালদের জীবনকে চিত্রিত করেতে চেয়েছেন। নিতাই সেই অঞ্চলের একজন কবিয়ালদের প্রতিনিধি। তার মধ্য দিয়ে একজন সত্যিকারের রাঢ় অঞ্চলের মানুষ আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই প্রথাগত আঞ্চলিক উপন্যাসের মত 'কবি' উপন্যাসে আঞ্চলিকতার সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট না হলেও এর শ্রেণি নির্ণয় করলে উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে মেনে নেওয়াই যায়।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **'উপনিবেশ'** উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। নিম্নবঙ্গের পটভূমিকায় তিনখণ্ডে রচিত এই উপন্যাসটিকে অনেকেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে মত দিয়ে থাকেন। এই উপন্যাসটি তাঁকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাতেও উপন্যাসটির শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে — ''নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস উপনিবেশ। কারো কারো মতে সর্বশ্রেষ্ঠ এই কারণে যে এই উপন্যাস তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সম্মানে উন্নীত করেছে।''[২১৭] এই উপন্যাসাটির শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়েরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তিনি ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশংসা করতে গিয়ে এই উপন্যাসটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন — ''নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই প্রথম উপন্যাসই তাঁহার অসামান্য শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। শব্দপ্রয়োগের তীক্ষ্ণ সংকেতময়তা ও চিত্রধর্মিতায়, বর্ণনার আবেগময় গতিবেগ, প্রতিবেশরচনার কুশলতায় ও অতীত ইতিহাসের বর্ণাঢ্য উদ্‌ঘাটনে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন সর্বত্র।''[২১৮] অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ'-এর প্রশস্তি এখানেই শেষ হয় নি, এই উপন্যাসটির আলোচনাকালে তিনি ঔপন্যাসিকের নূতন জীবনদৃষ্টিরও খোঁজ পেয়েছেন — ''উপনিবেশ' — তিন খণ্ড (১৯৪৪) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম রচনা এবং ইহাতেই তাঁহার নূতন জীবনদৃষ্টি নিঃসন্দিগ্ধভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই

উপন্যাসত্রয়ীতে তিনি বাঙালির রক্তে আদিম বন্য প্রাণোচ্ছলতার দুর্বার আবেগটি আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।''[২১৯] এই উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশও এর শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি স্বীকার করে নিয়েছেন — ''নিম্নবঙ্গের প্রকৃতি ও মানুষ, আদিম প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির লড়াই-এর কাহিনী। বিচিত্র চরিত্র, আবেগের প্রাবল্য এবং প্রকৃতির হিংস্রতার এক নিপুণ মিশ্রণে রচিত উপন্যাস। অনেকের মতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা।''[২২০] উপন্যাসটি সম্পর্কে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য হল — ''বিষয়ের নবীনতায় উপস্থাপনায় ইতিহাস চেতনায় জীবনবোধে 'উপনিবেশ' বিশিষ্ট সৃষ্টি।''[২২১] সুতরাং 'উপনিবেশ' যে ঔপন্যাসিকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা এ সংক্রান্ত সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এই শ্রেষ্ঠত্বের পিছনে উপন্যাসটির অনেক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এগুলির মধ্যে একটি অবশ্যই এর আঞ্চলিকতার দিকটি। এখানে ঔপন্যাসিক পটভূমি হিসেবে নিম্নবঙ্গের তেঁতুলিয়া নদী তীরস্থ চর ইস্‌মাইল নামক একটি দ্বীপকে বেছে নিয়ে সেখানকার জীবনচিত্রণে প্রয়াসী হয়েছেন। ফলে এই উপন্যাসে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে স্বতন্ত্র একটি অঞ্চল এবং সেখানকর জীবনচর্যার ছবি তুলে ধরার প্রসঙ্গ এসেছে। সেই সঙ্গে উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতার নানা লক্ষণও প্রকাশ পেয়েছে। আঞ্চলিকতার এই লক্ষণগুলি অনুসন্ধানের পূর্বে উপন্যাসটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

'উপনিবেশ' উপন্যাসটির কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, ঔপন্যাসিক এখানে বাংলার সুদূর ভৌগোলিক সীমান্তে অবস্থিত নিম্নবঙ্গের সুন্দরবনের আরণ্যক অঞ্চলকে পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সেখানকার আরণ্যক সীমানায় সমুদ্রের পটভূমিকায় তেঁতুলিয়া নদীর মোহনায় জেগে ওঠা চর ইস্‌মাইল নামক একটি চরকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটির অধিকাংশ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই চর ইস্‌মাইলে নানা ধরনের মানুষের সহাবস্থান ঘটে। এখানে বাস করে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় আসা 'হার্মাদ' জলদস্যু পর্তুগীজদের কিছু আধুনিক বংশধরগণ, আদিম-অসামাজিক আরাকানী ও মগ রক্তধারার উত্তর পুরুষ কয়েকটি বর্মী নরনারী, চাকুরি ও ব্যবসা সূত্রে যাওয়া কয়েকজন বাঙালি মানুষজন এবং চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি অঞ্চল থেকে

আসা কিছু ভাগ্যান্বেষী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন। এই উপন্যাসে ডি–সুজা, লিসি, জোহান, গঞ্জালেস প্রমুখেরা হল পর্তুগীজ চরিত্র, বর্মী সুন্দরী মা–ফুন ও কিছু বর্মী মানুষজন আরাকানী–মগ রক্তধারার উত্তরপুরুষ, তহশীলদার মণিমোহন, বলরাম কবিরাজ, মুক্তো, হরিদাস পোস্টমাস্টার, গাজী সাহেব, কেরামদ্দি প্রমুখ হল আধুনিক বাঙালি মানুষজন, যারা চাকুরী অথবা ব্যবসা সূত্রে চর ইস্‌মাইলে গিয়ে হাজির হয়েছিল। আর আছে মজাঃফর, কাসেম খাঁর ব্যাটা প্রমুখের মত স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা ভাগ্যান্বেষণে চট্টগ্রাম–নোয়াখালি থেকে চর ইস্‌মাইলে গিয়ে হাজির হয়ে বসতি তৈরি করে রীতিমতো সেখানে বসবাস শুরু করে। এই সমস্ত মানুষদের উপরেই চর ইস্‌মাইলের আদিম বন্য পরিবেশ এক অমোঘ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে এরা আধুনিক যুগের মানুষ হয়েও এমন সব আচরণ করে যা সভ্যসমাজ সহজে অনুমোদন করে না — এদের সমস্ত কার্যকলাপ একমাত্র সেই চর ইস্‌মাইলের আদিম বন্য পরিবেশেই সম্ভব।

উপন্যাসটির কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, একটা সময় চর ইস্‌মাইল ছিল পর্তুগীজদের ঘাঁটি। বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজত্ব এবং তার অনেক আগে থেকেই পর্তুগীজ ‘হার্মাদ’ জলদস্যুরা নদী বা সমুদ্র পথে লুঠতরাজ করার পাশাপাশি অনেক সময় জাহাজে পাল তুলে বাংলার গ্রামগুলিতেও হানা দিত। এইসমস্ত অপরাধমূলক কাজকর্ম পরিচালনা করবার জন্য এবং নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদে সুন্দরবন অঞ্চলের অনেকগুলি চরে তারা সুরক্ষিত কেল্লা নির্মাণ করেছিল। এই কেল্লাগুলি থেকেই তারা সমস্ত অপরাধমূলক কাজকর্ম চালাত। উপন্যাসে পটভূমি হিসেবে গৃহীত এই চর ইস্‌মাইলও একসময় ছিল পর্তুগীজদের শক্ত ঘাঁটি। তবে উপন্যাসটিতে যে সময়কালটিকে গ্রহণ করা হয়েছে, তখন চর ইস্‌মাইলের নোনা জল ও নোনা মাটির দেশে পর্তুগীজ জলদস্যু ‘হার্মাদ’দের দুর্গের ভগ্নাবশেষ, প্রকাণ্ড গীর্জার খানিকটা অবশেষ, বালির মধ্যে পুঁতে যাওয়া একটা কামান প্রাচীন কীর্তিকে বহন করে চললেও তাদের রমরমা অস্তমিত; সে সময় পূর্বপুরুষদের স্মৃতি বহন করে শুধু আট দশ ঘর পর্তুগীজকে চর ইস্‌মাইলে বাস করতে দেখা যায়। তবে এদের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাদের বাইরে থেকে দেখে সহজে পর্তুগীজ বলে চেনাও যায় না। চর ইস্‌মাইলে এই পরিবর্তিত পর্তুগীজদের সঙ্গে চট্টগ্রাম আর নোয়াখালি

থেকে আসা একদল দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী মুসলমান, কিছু মগ জাতীয় বর্মী এবং একদল জেলে বাস করে। চাকরি ও অন্যান্য জীবিকাসূত্রে সভ্য জগৎ থেকে বেশ খানিকটা দূরে এই প্রায় আদিম দুর্গম দ্বীপ খণ্ডে কয়েকজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি গিয়ে হাজির হয়, যাদের মধ্যে একজন হল মণিমোহন। 'উপনিবেশ'-এর কাহিনি তিনটি ধারায় বিকশিত হয়েছে — সরকারী কর্মোপলক্ষে সভ্যসমাজ থেকে যাওয়া তহশিলদার মণিমোহনের অভিজ্ঞতার কাহিনি, বলরাম কবিরাজ ভিষকরত্ন, মুক্তো, নুরুল গাজীর কাহিনি এবং পর্তুগীজ নারী লিসিকে কেন্দ্র করে ডি-সিলভা, ডি-সুজা, জোহান ও গঞ্জালেসের কাহিনি।

প্রথম কাহিনিটিতে অর্থাৎ সরকারী তহশীলদার মণিমোহনের অভিজ্ঞতার অংশটিতে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের ছেলে মণিমোহন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি.এস.সি পাশ করে চর ইস্‌মাইলপুরের খাসমহল কাছারির তহশিলদার হয়ে আসে। একদিন কালুপাড়ায় জেলে মুসলমান ও মগ প্রজাদের থেকে টাকা আদায় করতে এসে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। সেখানে তার কাছে আঠারো-উনিশ বছর বয়সের একটি উগ্রযৌবনা মগের মেয়েকে বিচারের জন্য আনা হয়। মেয়েটির নাম মা-ফুন। মেয়েটির অপরাধ, সে তার স্বামীর মাথায় ইট মেরেছে। মণিমোহন তাকে দেখে চমকে ওঠে; কারণ চর ইস্‌মাইলের আদিম হিংস্র সুন্দরী রূপটি যেন এই মা-ফুনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঘটনাক্রমে এই মা-ফুনের সঙ্গে মণিমোহনের ঘনিষ্ঠতা হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে এক প্রচণ্ড ঝড়ের রাত্রে মা-ফুনের ঘরে রাত্রিবাস করার সময় মণিমোহন তার রূপটির আরও বিস্তারিত পরিচয় পায় — সে রাত্রে কামনা-তপ্ত আলিঙ্গনের সময় স্ত্রী রানীর মুখ মনে পড়ায় মণিমোহন মা-ফুনের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায়। কিন্তু কোমরে রাখা ছোরার ভয় দেখিয়ে মা-ফুন মণিমোহনকে ছাড়ে না। এতে মণিমোহন বুঝে যায় 'ইহাদের প্রেম ভালোবাসা নয়'। ধীরে ধীরে মণিমোহনকে বিদেশিনী মা-ফুনের রূপ আকৃষ্ট করে। সে তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সিভিল ম্যারেজের আইনে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু বর্মী মেয়ে মা-ফুন বোঝে এই অসামাজিক প্রেম বা ভালো লাগা চর ইস্‌মাইলে সম্ভব হলেও কলকাতার সভ্যসমাজ তা অনুমোদন করবে না। তাই মণিমোহনের অগোচরেই সে অন্ধকারে বোট থেকে

নেমে জল-জঙ্গল, অন্ধকার ও আরণ্যক-প্রকৃতির কোলে ফিরে যায়। পরবর্তী সময়ে মণিমোহন সুন্দরী স্ত্রী এবং শিশুপুত্রকে সঙ্গে করে হাকিমের পদ নিয়ে চর ইস্‌মাইলে ফিরে আসে। সে সময় একবার মামুদপুরের দারোগার সঙ্গে আগস্ট আন্দোলনের ফেরার আসামীকে ধরতে গেলে মা-ফুনের সঙ্গে তার আবার দেখা হয়। এতে চর ইস্‌মাইলের মোহময় আদিমতায় তার বুক আবার উত্তাল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে আর মা-ফুনের কাছে যেতে চায় না — সেখান থেকে পালানোর কথা ভাবে। এভাবে এই উপন্যাসে চর ইস্‌মাইলের বাইরের চরিত্র সভ্যজগতের মণিমোহন সেখানকার বন্য পরিবেশে সাময়িকভাবে মোহাচ্ছন্ন হলেও শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না।

এই উপন্যাসে চর ইস্‌মাইলে বসবাসকারী একজন মধ্যবিত্ত বাঙালি চরিত্র বলরাম মণ্ডল ভিষক্‌রত্ন। তার আদি বাড়ি ফরিদপুর জেলায়। সে চর ইস্‌মাইলপুরে তার কবিরাজী ব্যবসা ফলাও করে ছড়িয়ে দিয়েছে। দশ বছর আগে বিপত্নীক হওয়া বলরাম তার নারীসঙ্গহীন নিরাত্মীয় জীবনে একদিন হঠাৎ দেশ থেকে মুক্তো নামে মধ্যম মাপের সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে আসে। আপাতভাবে তাকে দেখাশোনা করার জন্য সে মুক্তোকে আনে, তবে সে শারীরিক ও মানসিক ভাবে তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যেই মুক্তোকে ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু মুক্তো প্রৌঢ় বলরাম কবিরাজকে পুরোপুরি মেনে নেয় না। তাই দেখা যায় যে, বলরামকে দেহদান করে তার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেও একদিন কী এক অনির্দেশ্য কারণে তাকে পরিত্যাগ করে মুক্তো ধনী ব্যবসায়ী বৃদ্ধ নুরুল গাজীর আশ্রয়ে গিয়ে ওঠে। তবে নুরুল গাজীর কাছেও সে থাকতে পারে না। দীর্ঘদিন বাদে শরীর ও মনের সর্বত্র ক্ষত-লাঞ্ছনা নিয়ে সে পুনরায় বলরাম কবিরাজের কাছে ফিরে আসে। বলরাম কবিরাজও তাকে চর ইস্‌মাইলের সঙ্গীহীন জীবনে বিনা প্রশ্নে পুনরায় গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। এ রকমটা একমাত্র চর ইস্‌মাইলের মত সভ্য সমাজ থেকে দূরে থাকা কোন অঞ্চলেই সম্ভব।

এই উপন্যাসের কাহিনি অংশের তৃতীয় ধারাটি পর্তুগীজ মেয়ে লিসিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। চর ইস্‌মাইলে বসবাসকারী পর্তুগীজ ডি-সিলভার নাতনী লিসিকে বিয়ে করতে চায় বছর চল্লিশের পেট মোটা ডি-সুজা। এদিকে ডি-সিলভার ইচ্ছে বিখ্যাত জলদস্যু সেবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের বংশধর তার বন্ধু ডেভিডের পুত্র স্যামুয়েল

গঞ্জালেসের সঙ্গে লিসির বিয়ে দেবে। এতে গঞ্জালেসেরও সম্মতি আছে। কিন্তু লিসি ও জোহান পরস্পরকে ভালোবাসে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। জোহান এই বিয়েকে নিয়ে রঙিন স্বপ্ন বোনে। তবে তার এই স্বপ্ন পূরণ হয় না — ডি-সিলভার চোরাকারবারের অংশীদার এক বর্মীর ধারালো দায়ের কোপে জোহানের জীবনান্ত ঘটায় এই স্বপ্ন ব্যর্থ হয়। জোহানকে মেরে সেই বর্মী লিসিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। নাতনীর এই অন্তর্ধান ডি-সিলভা সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে যায়। একদিন সেও চর ইস্‌মাইল ত্যাগ করে — তাকে আর কেউ দেখতে পায় না। এদিকে লিসিকে না পাওয়ায় স্যামুয়েল গঞ্জালেসের মনেও এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতা থেকে তাঁর রক্তে পূর্বপুরুষ অর্থাৎ সেবাস্টিয়ান গঞ্জালেস ও অন্যান্য 'হার্মাদ'দের উন্মত্ত দুঃসাহসিকতা উঁকি দেয়। সে লিসিকে খুঁজে আনবার জন্য প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা পূরণ হয় না। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে চর ইস্‌মাইলেও নেমে আসে। ফলে দেখা দেয় নানা বিপর্যয়। বুভুক্ষু মানুষেরা খেতে না পেয়ে ধানের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে মহাজন মজঃফর মিঞার কাছারি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সে সময় গঞ্জালেস ভাবে একটি মেয়ের জন্য অকারণে বিলাপ করে নিজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নষ্ট করার কোনো দরকার হয় না। ফলে সে আর লিসির সন্ধানে আত্মনিয়োগ না করে নিজেকে কোনোখানে আর বেধে না রেখে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবে। এরপর থেকে তাকেও আর চর ইস্‌মাইলে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এভাবে উপস্থাপিত 'উপনিবেশ' উপন্যাসটির কাহিনি ধারার মধ্যেই আঞ্চলিকতার নানা লক্ষণ ধরা পড়েছে। তবে সেই লক্ষণগুলি অনুসন্ধানের পূর্বে উপন্যাসটি সম্পর্কে ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজের মনোভাবটি জেনে নেওয়াও অত্যন্ত জরুরি। উপন্যাসটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন — ''উপন্যাস লেখার কথা সেই দিনই আমার মনে এসেছিল — যেদিন প্রথম অনুভব করেছিলাম পৃথিবীটা অনেক বড়।''[২২২] এই বড় পৃথিবীতে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে সভ্যসমাজের জীবনচর্যার ছাপ তেমনভাবে পড়েনি। সেরকমই এই বড় পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত অথচ সভ্যসমাজের অজানা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি সেখানকার অধিবাসীদের বিচিত্র জীবনচর্যার সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই

তিনি ‘উপনিবেশ’ রচনায় হাত দেন। তাই এই উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছেন নিম্নবঙ্গের সুন্দরবন সংলগ্ন একটি চরভূমি চর ইস্‌মাইল এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষজনের বিচিত্র জীবনচর্যাকে। এই সম্পর্কে উপন্যাসটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন — ‘‘নিম্ন বাংলার নদী সমুদ্রের দেশে মাটির মতোই সমাজ আর জীবন যেখানে অপরিণত, তার সঙ্গে কী করে যে একদিন মিখেইল শোলোকভের যোগাযোগ ঘটল, তা আজ আর আমার ভালো করে মনে পড়ছে না। কিন্তু ডন কোজাক্‌দের নিয়ে শোলোকভের সেই আশ্চর্য সৃষ্টি — সেখানে ব্যক্তি চরিত্র মুখ্য নয়, আলোড়িত বিলোড়িত একটা বিপুল গোষ্ঠীর প্রাণ-বন্যায় ব্যক্তি-সত্তার স্বাতন্ত্র্য মুছে গেছে এবং বিলেতি অর্কেস্ট্রার বহু যন্ত্রে হার্মনির মতো বিচিত্রের অখণ্ডতা যেখানে ধ্বনিত হয়েছে সেই রকম ভাবে একটা সমগ্র মানবতাকে স্পর্শ করতে আমি প্রলুব্ধ হয়ে উঠলাম। চর ইস্‌মাইলের পটভূমি তার আদিমতার স্বরলিপিতে বহুচরিত্রের যন্ত্রকে ঐকতানে বাজিয়ে তুলল। তাই এই উপন্যাসের, অন্তত প্রথম খণ্ডের মানুষগুলি উপনিবেশেরই সৃষ্টি — তারা উপনিবেশকে গড়ে তোলেনি।’’[২২৩] ‘নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী’ প্রথম খণ্ডের প্রকাশের সময় ভূমিকা অংশে ‘উপনিবেশ’ উপন্যাস সম্পর্কে গ্রন্থটির যুগ্ম-প্রকাশকদ্বয় লিখেছেন — ‘‘উপনিবেশ’ লেখকের প্রধান ক্লাসিক রচনাগুলির অন্যতম। কারও কারও মতে শ্রেষ্ঠতম। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গে, বা নিম্নবঙ্গে বললেই ভাল হয়, প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে মাঝে মাঝেই চর দেখা দেয়। কখনও পুরাতন চর মিলিয়ে যায় নদীগর্ভে, কখনও বা কোন চরের জীবদ্দশা দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী হয়। চর ইসমাইল এই রকমই একটি চর। এই চর, তার বিচিত্র অধিবাসীরা, তাদের বিচিত্রতর জীবনযাত্রা, চার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খ্যাপাটে নদী তেঁতুলিয়া — এদের সকলের কথা নিয়েই এই ‘উপনিবেশ’ উপন্যাস।’’[২২৪] ঔপন্যাসিকের উপন্যাসটি সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য এবং যুগ্ম-প্রকাশকদ্বয়ের কথা থেকেই স্পষ্ট যে ‘উপনিবেশ’ উপন্যাসটির পটভূমি হিসেবে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানাকারণে বিচ্ছিন্ন কোনো একটি অঞ্চলকে গ্রহণ করা হয়েছে, সমগ্র উপন্যাসে এই অঞ্চলটি চর ইস্‌মাইল নামে বিরাজ করেছে। উপন্যাসটির তিনটি খণ্ড থেকেই এই মূল জনসমাজের মধ্যে থেকেও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলটির ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দিক থেকে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়।

ঔপন্যাসিক তাঁর প্রথম উপন্যাসেই পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন নিম্নবঙ্গ সুন্দরবনের আরণ্যক প্রতিবেশে তেঁতুলিয়া নদীর মোহনায় সমুদ্র তীরবর্তী একটি চরকে। উপন্যাসে যার নাম চর ইস্‌মাইল। এই চর ইস্‌মাইল যে মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন তা অধ্যাপক শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় — ''তাঁহার তিন পর্বে সমাপ্ত 'উপনিবেশ' উপন্যাসটি এই ভূগর্ভলুপ্ত খরতর চেতনাধারাকে, এই আদিম আরণ্য সংস্কারকে, নূতন করিয়া উপলব্ধি করার একটি চমকপ্রদ প্রচেষ্টা। অবশ্য এই উদ্দেশ্যটি পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে বাঙলাদেশের ভৌগোলিক সীমান্তে, সুন্দরবনের আরণ্য সর্পিলতার শেষ ফণাশীর্ষে, সমুদ্র গর্ভ হইতে সদ্য-জাগিয়া-ওঠা, কর্দমাক্ত-পিচ্ছিল, জল-স্থল-আকাশের দুর্দম আসঙ্গলিপ্সাপ্রসূত, অপরিণত ভ্রূণ পিণ্ডের ন্যায় অবয়বহীন চর ইসমাইলে। এখানে মানবজীবনের উপর প্রকৃতি-পরিবেশেরই একাধিপত্য — সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস মানবিক হৃদয়োচ্ছ্বাসের ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে, দুর্দম ঝটিকালীলার গতিবেগ মানুষের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সংক্রামিত হয়।''[২২৫] মূল উপন্যাসের মধ্যেও নানাসময়ে চর ইস্‌মাইল তার স্বতন্ত্র প্রকৃতি নিয়ে হাজির হয়েছে। ঔপন্যাসিক এই চরটির পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন — ''নদী — অশান্ত এবং চঞ্চল। জলের আস্বাদ যেমন আঁশটে, তেমনই নোনা। ভাঁটার সময় আবার সে জলের রঙ নীলাভ হইয়া আসিতে চায়। আর বিচিত্র বর্ণগন্ধ সমন্বিত সেই জল অন্তহীন বিস্তারে চর ইসমাইলকে সমস্ত জগৎ হইতে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে বলিলেই চলে। বাস্তবিক পক্ষে, ইহার সহিত বৎসরের মাত্র ছয় মাস পৃথিবীর সত্যিকারের যোগ-সূত্রটা বজায় থাকে। আশ্বিনের শেষ হইতে ফাল্গুনের শেষ — সময় বলিতে ইহাই। যেই নদীর বুকের উপর হইতে কুয়াশার পর্দাটা একটু একটু করিয়া সরিয়া যায় আর চরের গায়ে এখানে ওখানে দু'চারিটি বুনো ফুল ফুটিতে শুরু করে, অমনি পাটির মত শান্ত নদীটির চেহারা যায় বদলাইয়া। হয়তো চৈত্রের এক বিকালে আকাশের ঈশান কোণে কে একবিন্দু কালি ছিটাইয়া দেয় — আর তারপরেই গোঁ গোঁ করিয়া চাপা একটা কান্নার মতো শব্দ নদীর তলা হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে। ক্রমে সেই শব্দ বাড়িতে থাকে, বাড়িতেই থাকে, — সঙ্গে সঙ্গে বাতাসেরও আগড় খুলিয়া যায়। সেই তাণ্ডবে একবার পড়িলে এক

গাছের শাল্‌তি নৌকাও প্রাণ লইয়া ফিরতে পারে না। আর ঝড় না উঠিলেই বা কী আসে যায়। তেঁতুলিয়া, মেঘনা, ইল্‌সা কিংবা কালাবদরের মুখে যখন তখন যে এক একটা দমকা উঠিয়া আসিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কী আছে।''[২২৬] কখনো কখনো এই চর ইস্‌মাইল শান্তভাবে থাকে, মনে হয় যেন ঘুমোচ্ছে — ''সামনে সকালের নদী শান্ত ও উজ্জ্বল বিস্তারে যেন ঘুমাইয়া আছে। ঝড়ের গর্জন নয় — রাক্ষসী ভৈরবী মূর্তি নয়। জলের মৃদু কলধ্বনি যেন সঙ্গীতের মতো বাজিতেছে। ওপারে দিকচক্রবালে শ্যামল বনরেখার ধু-ধু আভাস দেখা যাইতেছে — মাথার উপর নির্ভাবনায় উড়িয়া চলিয়াছে মাছরাঙা আর গাং শালিখের ঝাঁক।''[২২৭]

এখানে সরকারী চাক্‌রী সুত্রে হাজির হয়ে সভ্যজগতের সন্তান মণিমোহন বুঝতে পারে — এ তার বাংলা নয়; এর প্রকৃতি ভিন্ন, স্বতন্ত্র — ''এখানে আসিয়া মণিমোহন এই সত্যটা সকলের আগে অনুভব করিল যে পাকুড় প্যাসেঞ্জার আর বর্ধমানের প্রশস্ত ধানক্ষেতের বাহিরে পৃথিবীর আর একটা রূপ আছে। সে রূপ মানুষকে নিতান্ত মুগ্ধ করে না — দিকে দিকে রাক্ষসীর মতো করাল জিহ্বা বিস্তৃত করিয়া সে ফুঁসিয়া ওঠে — গর্জন করিয়া ওঠে। সে মূর্তির দিকে তাকাইলেও বুকের ভিতরটা আতংকে থরথর করিয়া দুলিতে থাকে।''[২২৮] উপন্যাসে পর্তুগীজ স্যামুয়েল গঞ্জালেসের দৃষ্টিতেও চর ইস্‌মাইলের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়েছে — ''সামনে বিল। বর্ষায় তেঁতুলিয়ার জল আসিয়া বিল আর নদীকে একত্রে করিয়া দেয়, তারপর বর্ষার অবসানে ছোট বড় অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন জলখণ্ড লইয়া বিলের সৃষ্টি হয়। মাটির নিবিড় স্পর্শে নোনা জল মিঠা হইয়া উঠিয়াছে, শালুক পাতা আর গাঢ় সবুজ কল্‌মী শাক লক্‌ লক্‌ করিতেছে। . . গঞ্জালেস্‌ একটি ঢিবির উপর আসিয়া বসিল। সাদা সাদা মেঘে সারা আকাশটা ছাইয়া আছে, আর সেই আকাশ একটা গম্বুজের মত বাঁকিয়া দূরে নদীর মধ্যে নামিয়া গেছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইতে পারে, আকাশটা আর কিছু নয় — ওই নদীটাই ওখান দিয়া বাঁকিয়া উঠিয়া মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেছে, সাদা মেঘগুলি ঢেউয়ের মতো সূর্যের আলোয় জ্বলিয়া উঠিতেছে।''[২২৯] চর ইস্‌মাইলের ভৌগোলিক পরিবেশ, সেখানকার মৃত্তিকা, সেখানকার প্রকৃতি যেমন সভ্যজগতের চিন্তাভাবনার সঙ্গে মেলে না, তেমনি এখানকার আবহাওয়াও ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে

হাজির হয়। এখানে যখন ঝড় ওঠে তখন রীতিমত তাণ্ডব শুরু হয় — ''সমুদ্রের ওপারে ওই যে বিরাট্ জলসাটা বসিয়াছিল। সেখানে যাহাদের নাচিবার কথা ছিল তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে! একটা দম্‌কা ঝাপটায় পিছনের সমস্ত বাগানটা তারস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল — অনেকগুলি পায়ের নূপুরের ঝঙ্কার আকাশ কাঁপানো একটা শাঁ শাঁ শব্দ করিয়া সম্মুখে বহিয়া গেল। একরাশ ধুলা-বালি ও শুক্‌নো পাতা আসিয়া চোখে-মুখে উড়িয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণের জন্য ধুলার একটা ঘূর্ণ্যমান আবরণ ছাড়া সামনে আর কিছুই রহিল না।''[২৩০] চর ইস্‌মাইল তার স্বতন্ত্র প্রকৃতি, রীতি-নীতি নিয়ে নিজের নিয়মেই চলে — ''এখানকার বসন্ত আসে ঝড়ের সঙ্কেত লইয়া। ফাল্গুনের বৈকাল এখানে ভাঁট ফুলের গন্ধে মদির হইয়া ওঠে না, কাল বৈশাখীর তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতে দিগন্তে কালো মেঘ ফেনার মত ফাঁপিয়া ওঠে। চঞ্চল-কটাক্ষের মধ্য দিয়া এখানে যে প্রেমের সূচনা হয়, প্রখর কামনার বিপ্লবের আঘাতে তাহার নিশ্চিত পরিণতি ঘটে। পৃথিবীর সমস্ত রীতি-নীতি, সমস্ত সমাজ-শৃঙ্খলার বাহিরে এই চর ইস্‌মাইল।''[২৩১] একসময়ে নদীর মোহনায় সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠা নিছক একটি চর থেকে ধীরে ধীরে চর ইস্‌মাইলে জনবসতি গড়ে উঠলেও সভ্য জগতের ছোঁয়া সেখানে খুব বেশি লাগে না। তার সবকিছু নিয়ে চর ইস্‌মাইল সভ্যসমাজের বাইরেই থেকে যায়। এটা ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে জানিয়েছেনও — ''কম করিয়াও এখন প্রায় হাজার দেড়েক মানুষের বসতি। সপ্তাহে একদিন খুব বড় করিয়া হাট বসে, আশেপাশের চরে বালাম ধান আর মহিষের বাথান লইয়াই যারা দিন গুজরান করে, এই একটি দিনে এখানে আসিয়া তাহারা প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের অনেক কিছু কেনা-কাটা করিবার সুযোগ পায়। অনেক সময় এখানে আসে বড় বড় মহাজনী নৌকা — আশা করা যায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছু কিছু প্রসার ঘটিলে হয়তো বা আর্-এস্ এন্ কোম্পানী এই পর্যন্ত স্টিমারের একটা লাইন খুলিলেও খুলিতে পারে। কিন্তু এত করিয়াও চর ইস্‌মাইল সভ্য জগতের খুব কাছে আগাইয়া আসিতে পারে নাই। নদীর নিবিড় ও গভীর স্নেহ ইহাকে চারিদিক হইতে জড়াইয়া আছে। সে স্নেহের কঠিন বাহুপাশ হইতে ছিনাইয়া নিয়া সম্পূর্ণভাবে ইহাকে আত্মসাৎ করা মানুষের ক্ষমতার

বাহিরে।''[২৩২] এভাবে এই উপন্যাসের পটভূমিকায় মূল জনসমাজ থেকে ভৌগোলিক এবং প্রকৃতিগত কারণে বিচ্ছিন্ন থাকা একটি অঞ্চলকে তুলে আনা হয়েছে।

উপন্যাসটির চরিত্রদের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এখানে ঔপন্যাসিক পর্তুগীজ জলদস্যু 'হার্মাদ'দের ভারতে থেকে যাওয়া কিছু উত্তরপুরুষদের চিত্রিত করেছেন। এদের মধ্যে বেশ কয়েক ঘর চর ইস্‌মাইলে রীতিমতো ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করেছে। ডি-সুজা, ডি-সিলভা, জোহান, গঞ্জালেস, লিসি প্রমুখরা হল এসব মানুষ। একমাত্র গঞ্জালেস বাদে এরা সকলেই চর ইস্‌মাইলে বসবাস করেছে এবং সেটাকেই তাদের বাসস্থান মনে করেছে। তবে সেখানে বসবাস করতে করতে এরা তাদের পর্তুগীজ পরিচয় প্রায় ভুলতে বসেছে — ''এই চর ইসমাইলে এখনো আট দশ ঘর পর্তুগীজ বাস করে। বাহির হইতে চট্‌ করিয়া দেখিলে তাহাদের চেনা কঠিন। নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামের মুসলমানদের সহিত রক্ত-সম্পর্ক ঘটিয়া একটি বিচিত্র সঙ্কর জাতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহারা। পরে লুঙ্গি, কানে গুঁজিয়া রাখে গোলাপী বিড়ি, পিতৃপুরুষের ভাষার শেষ অক্ষরটি পর্যন্ত চাটিয়া খাইয়াছে বলা চলে। কথায় কথায় কেবল মেরীর নামে শপথ এবং বিবর্ণ একটা ঘর্মসিক্ত কালো কারের সহিত গলায় ঝুলাইয়া রাখা নিকেলের ক্রস্‌ তাহাদের ক্যাথলিক ধর্ম-বিশ্বাসের পরিচয় দেয়।''[২৩৩] এখানে কিছু আরাকানী মগ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারীরাও বাস করে। উপন্যাসে তাদের বর্মী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আঠারো-উনিশ বর্ষীয়া সুন্দরী মা-ফুন এদের প্রতিনিধি। চর ইস্‌মাইলে থাকতে থাকতে এদের প্রকৃতিতেও পরিবর্তন হয়েছে। সভ্যজগতের ছেলে মণিমোহন তাদের সম্পর্কে ভেবেছে — ''এখানকার প্রকৃতি অমার্জিত — এখানে মানুষ নদী আর সমুদ্রের সমস্ত রুদ্রতার সহিত মুখোমুখি সংগ্রাম করিয়াই টিকিয়া আছে। ছোট ঘরের সীমানায় ছোট এতটুকু প্রেম কি এখানে মানাইত? সমস্ত নীতি, সমস্ত শৃঙ্খলাকে ভাঙিয়া যে বর্বর যৌবন এখানে মুক্তি পাইয়াছে, স্বামীর মাথা ইঁটের ঘায়ে ভাঙিয়া দিয়াই তাহা পটভূমির মর্যাদা রাখে! জীবনের কোন্‌ রূপটা যে ভালো, আজ যেন সেটা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।''[২৩৪] চর ইস্‌মাইলে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি থেকে ভাগ্যান্বেষণে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ গিয়ে হাজির হয়। মজঃফর, কাশেমের ব্যাটা প্রমুখের মত মানুষগুলি সেখানকার

জীবনযাত্রার সঙ্গে একাত্ম হলেও সবাই তা করতে পারে না। তাই কেরামদ্দি ভাবে — ''এই চর ইস্‌মাইল তাহারও নিজের দেশ নয়, এখানকার কাহারো সঙ্গে সে যে নিজের ভাষা বা মনের ছন্দটাকে সমানভাবে মিলাইতে পারে তাহাও নয়।''[২৩৫] পোস্টমাস্টার হরিদাস, মণিমোহনের সহকারী গোপীনাথেরাও এই চরের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। মণিমোহন জীবিকা সূত্রে এই চরের সঙ্গে কিছুটা মানিয়ে নিলেও বাইরের মানুষই থেকে গেছে — ''এখানকার যোগ্য নয় মণিমোহন। এই হিংসা আর পশুত্বকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় জাগে, কিন্তু শ্রদ্ধা আসে না। আদিম অমার্জিত যাহা — তাহার মধ্যে বিশালত্ব আছে, কিন্তু রূপ নাই। তাহা আগুন লাগিতে পারে, আলো জ্বালাইতে পারে না।''[২৩৬] হয়তো একারণেই মণিমোহন শেষ পর্যন্ত চর ইসমাইলকে আপন করে নিতে পারে নি, এই চর ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে — ''সে পালাইবে। আজ তাহার জীবন বদলাইয়াছে, তাহার যৌবন নাই। চর ইসমাইলকে সে রক্তের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না, মানিয়া নিতে পারে না কাল-বৈশাখীর তরঙ্গ-তাণ্ডবে উন্মত্ত এই ভয়ানক নদীর দিগন্ত-বিস্তারকে, এখানকার বর্বর প্রাণোল্লাসকে।''[২৩৭] অবশ্য বলরাম মণ্ডল ভিষক্‌রত্ন কবিরাজ, নুরুল গাজী, মুক্তো প্রমুখেরা বাইরে থেকে এখানে এলেও শেষ পর্যন্ত চরটিকে আপন করে নিয়েছে। সবচেয়ে পরিবর্তন হয়েছে মুক্তোর। বলরাম সম্পূর্ণ নারীসঙ্গহীন ও নিরাত্মীয় জীবনে নিজের একাকীত্ব দূর করার উদ্দেশ্যে মুক্তোকে চর ইস্‌মাইলে নিয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম মুক্তো সেই চরটিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি এবং তাকে সভ্যজগতে ফিরিয়ে আনার জন্য বলরামের কাছে বায়না করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, সে বলরামকে দেহদান করে তার সন্তান গর্ভে ধরেছে, এক সময় বলরামকে ত্যাগ করে ধনী নুরুল গাজীর ঘরে উঠেছে এবং সবশেষে পুনরায় বলরামের কাছে ফিরে এসেছে। বলরামও তাকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করেছে। সভ্যসমাজ থেকে দূরে অবস্থিত কোনো জনসমাজের চরিত্রের পক্ষেই এসব সম্ভব। এভাবে মুক্তো শেষপর্যন্ত চর ইস্‌মাইলের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পুরোপুরি সেই অঞ্চলের মানুষ হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসটির তিন খণ্ডে হিন্দু, মুসলিম, পর্তুগীজ, বর্মী মিলে অনেক চরিত্রই আছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে লক্ষ করা যায় এখানে কোনো নায়ক নেই।

মণিমোহনের মধ্যে কিছুটা নায়কোচিত বৈশিষ্ট্য থাকলেও সে এমন কিছু কাজ করেনি যে, তাকে নায়কের মর্যাদা দেওয়া যায়। পাশাপাশি সে চর ইস্‌মাইলের ভূমিপুত্র নয় -- বাইরে থেকে সেখানে গিয়েছে এবং সেখানকার বিচিত্র জীবনচর্যাকে দেখে আকৃষ্ট হলেও শেষ পর্যন্ত বাইরের মানুষই থেকে গেছে। এজন্য উপন্যাসের নায়ক ঠিক করতে হলে তেঁতুলিয়া মোহনায় তৈরি সেই চর ইস্‌মাইলকেই বাছতে হয়; কারণ সবকিছু ছাপিয়ে উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভূ-খণ্ডটি তার অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী'র যুগ্ম-প্রকাশকদ্বয়ের দৃষ্টিতেও এই বিষয়টি ধরা পড়েছে -- ''এই চরের অধিবাসীদের মধ্যে আছে যেমন স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান, তেমনি আছে আরাকানী মগ, পর্তুগীজদের অবলুপ্তমান বংশধরেরা। আছে কার্যোপলক্ষে শহরের সরকারী কর্মচারীদের সাময়িক উপস্থিতি, তেমনি আছে গাঁজা-আফিমের চোরাই চালানকারীদের গোপন আসা-যাওয়া। . . . 'উপনিবেশ' ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা পরিবার কেন্দ্রিক উপন্যাস নয়। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল ও বিভিন্ন বিপরীতধর্মী মানুষদের নিয়ে এই চরের অধিবাসী সমাজের যে জীবন-প্রবাহ চর ইস্‌মাইলে অহরহ স্পন্দিত, তা-ই এই উপন্যাসের নায়ক বা প্রাণ।''[২৩৮]

উপন্যাসে চর ইস্‌মাইলের অধিবাসীদের জীবন যাপন প্রণালীতেও বিশিষ্টতা আছে। সভ্যসমাজের কড়াকড়ি, চোখরাঙানি, নীতির শাসন এখানে অনুপস্থিত। চরের নিকটবর্তী সমুদ্রের মতই এখানকার জীবন উদ্দামতায় ভরা। সভ্যজগৎ থেকে জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে ঔপন্যাসিক লিখেছেন -- ''মিশিবার মতো লোক এখানে নাই। ভদ্রলোক যাহারা আছেন তাহারা পত্নীসঙ্গহীন প্রবাস-জীবন যাপন করে। অবশ্য তাই বলিয়া নারীসঙ্গহীন নয়। তিন শতাব্দী আগে পর্তুগীজদের সঙ্গে যে আরাকানীর দল এখানে আসিয়াছিল, বাংলাদেশের মাটির স্যাঁতসেঁতে স্পর্শ লাগিয়া বংশক্রমে নোনা ধরিয়াছে তাহাদের। সামান্য কিছু ব্যয় করিলে তাঁহাদের মধ্য হইতে নৈশ-সঙ্গিনী সংগ্রহ করা কঠিন নয়।''[২৩৯] ঔপন্যাসিক এই অঞ্চলটির বিশিষ্টতা সম্পর্কে আরও জানিয়েছেন -- ''প্রকৃতির আত্মকেন্দ্রিক অসীম স্বতন্ত্রতার সঙ্গে সঙ্গে সব রকম সামজিকতার বন্ধনই এখানে ঢিলা হইয়া গিয়াছে। অনুকূল পৃথিবী ও সমাজের গণ্ডিটির মাঝখানে সেখানে

প্রাচুর্য আছে, চরিত্রহীনতার নিন্দা সেখানেই সম্ভব; কিন্তু স্থানকালপাত্র হিসাবে সমাজের সংজ্ঞাটাই এখানে বদলাইয়া গিয়াছে।''[২৪০] এখানে আইন বা নিয়ম-কানুনের বালাই তেমন নেই — ''এ হচ্ছে পাণ্ডব-বর্জিত দেশ, পৃথিবীর বাইরে। এখানে কোনো আইন-কানুনের বাঁধাবাঁধি নেই — কেউ কিছু জানবে না।''[২৪১] এর প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়া আরাকানী যুবতী মা-ফুনের আচরণেও তেমন নীতি নৈতিকতার বালাই দেখা যায় না। সুন্দরী মা-ফুন যেমন অনায়াসেই তার কুৎসিৎ স্বামীর মাথায় ইটের আঘাত করতে পারে, তেমনি নির্দ্বিধায় বাইরের লোক মণিমোহনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়। এক্ষেত্রে মণিমোহনের আপত্তিকেও সে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। এক ঝড়ের রাত্রে মা-ফুন মণিমোহনকে নিজের বিছানায় আহ্বান জানায়। প্রথমে মণিমোহন আগ্রহ দেখালেও স্ত্রী রানীর মুখ মনে পড়ায় তাকে ছেড়ে যেতে চাইলেও মা-ফুন তাকে ছাড়ে না — ''চকিত হইয়া সে নিজেকে সেই বাহুপাশ হইতে ছিনাইয়া নিতে চাহিল — তাহার মনের সামনে রানীর মুখখানা সিনেমার ছবির মতো আসিয়া দেখা দিতেছে। . . . কিন্তু ছাড়াইতে চাহিলেও সে ছাড়াইতে পারিল না। বাহিরের সমস্ত গর্জনের মধ্য দিয়াও স্পষ্ট শুনিতে পাইল : এখন তুমি আমার — আমার। জোর করে আমাকে ছাড়াতে পারবে, কিন্তু আমার কোমরের ছোরাখানাকে ছাড়াতে পারবে না।

ভয়ে তাহার সমস্ত দেহ হিম হইয়া গেল।

ইহাদের প্রেম ভালোবাসা নয়। উপনিবেশের বন্য ও উদ্দাম কামনার আগুন জ্বলিয়াছে। এ আগুনে জ্বলিয়া সুখ আছে কিনা কে জানে; কিন্তু অন্ধকারে মণিমোহন একখানা জ্বলজ্বলে ছোরা যেন চোখের সামনেই দেখিতে পাইতেছিল।

বাহিরে তখন প্রবল ঝড়ের গর্জন চলিতেছিল। সেই ঝড়ের তাণ্ডব ঘরের মধ্যেও ভাঙিয়া পড়িল।''[২৪২]

অথচ মা-ফুন চরটির বাইরের জীবনে মণিমোহনকে আপন করে নিতে চায় নি। তাই মণিমোহন তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সিভিল ম্যারেজ আইনে বিয়ে করতে চাইলে সে বিয়েতে রাজী হয় না। ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''বর্মী মেয়ে জড়োসড়ো হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সমস্ত ঘটনাটাই যেন মন্ত্রবলে ঘটিয়া

চলিয়াছে। মণিমোহনকে তাহার ভালো লাগিয়াছে সত্য — কিন্তু তাহার পশ্চাতে আছে উপনিবেশের এই পটভূমিকা। এই বর্বরতার মাঝখানে সে সভ্য-জগতের আলো লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেই সভ্য জগতে? যেখানে মণিমোহনকে আর দশজনের মধ্যে একজন, যেখানে বহুর মধ্যে বৈশিষ্ট্যহীন একটা বুদ্বুদ হইয়া মিলাইয়া যাইবে সে, সেখানে? নিজের বন্য মনকেই কি সে বিশ্বাস করে? রেঙ্গুন-মৌলমিন-পেগু হইতে নিজেকে সে একদিন ছিনাইয়া আনিয়াছিল — আজ আবার উপনিবেশকেও ছাড়াইয়া যাইতে চায়? নূতন জীবনেই কি বাঁধা পড়িবে সে? নদীর মতো সে বহিয়া আসিতেছে, পুরোনো চর ভাঙিয়া নূতন চরকে সে রচনা করিতেছে প্রত্যহ — মণিমোহন কি অনড় হইয়া থাকিবে সেই স্রোতের মুখে।''[২৪৩] এই সমস্ত ভাবনা থেকেই সে মণিমোহনকে ত্যাগ করে।

চর ইস্‌মাইলের জীবনযাত্রার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সাজুয্য রেখে চলে সেখানকার প্রকৃতি। এখানকার ঋতু পরিবর্তনের ধারায় বসন্ত ঋতু খুব সমারোহ নিয়ে হাজির হয় না — ''চর ইসমাইলে বসন্ত আসিয়া গেল। অবশ্য খুব সমারোহ করিয়া নয়। নোনা মাটিতে ফুল ফুটিতে চায় না। আশেপাশে গাঙের জলে টান ধরিয়া যায়, নদীর ঘন গৈরিক বর্ণ স্বচ্ছ হইয়া আসিবার উপক্রম করে। নদীর ধারে নরম পলিমাটির উপর ত্রিশূলের মতো ছোট ছোট পদচিহ্ন আঁকিয়া স্নাইপের দল শিকার খুঁজিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে বড় বড় পাখা দুলাইয়া ফুটফুটে শাদা একরাশ পেঁজা তুলার মতো এক এক জোড়া চখা-চখী আসিয়া এখানে ওখানে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আবার তেমনি করিয়া জ্যোৎস্না রাত্রিতে ঈথার-সমুদ্রে শব্দের ঢেউ তুলিয়া দিয়া হাঁসের দল অনির্দেশ অভিমুখে ফিরিয়া যায় — হয়তো কাশ্মীরে, হয়তো মানস-সরোবরে, হয়তো বা আরো দূরে।''[২৪৪] এই বসন্ত চর ইস্‌মাইলের জীবন তরঙ্গেও তেমন প্রভাব ফেলতে পারে না — ''চর ইস্‌মাইলে বসন্ত আসিয়াছিল। . . . এখানকার বসন্ত আসে ঝড়ের সঙ্কেত লইয়া। ফাল্গুনের বৈকাল এখানে ভাঁট ফুলের গন্ধে মদির হইয়া ওঠে না, কালবৈশাখীর তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতে দিগন্তে কালো মেঘ ফেনার মতো ফাঁপিয়া ওঠে। চঞ্চল কটাক্ষের মধ্য দিয়া এখানে যে প্রেমের সূচনা হয়, প্রখর কামনার বিপ্লবের আঘাতে তাহার নিশ্চিত পরিণতি ঘটে। পৃথিবীর সমস্ত রীতি-নীতি, সমস্ত শৃঙ্খলার বাহিরে এই

চর ইস্‌মাইল। তাই এখানকার মাটিতে কখনো সোনার ফসল দেখা যায় না; সৃষ্টির বীজ এখানকার গর্ভকোষের সংস্রবে আসিয়া অনাসৃষ্টিতে পল্লবিত হইয়া ওঠে।''[২৪৫] এখানকার মানুষের জীবনের উপরেও এই প্রকৃতির প্রভাব পড়ে। তাই লিসিকে নিয়ে রোমান্টিক মোহাচ্ছন্ন গঞ্জালেসের মধ্যে পূর্বপুরুষের পর্তুগীজ রক্ত উছলে উঠলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সে সহজেই লিসির ভাবনা ত্যাগ করতে পারে — ''কী হইবে একটা মেয়ের জন্য অকারণে বিলাপ করিয়া, নিজের সমস্ত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিয়া? পৃথিবী অনেক বড় — পৃথিবীতে অনেক মেয়ে। একজনকে যদি না পাও, তাহার প্রতিনিধি হিসাবে আরো দশজনকে আয়ত্ত করিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া আনা এমন কিছু কঠিন কথা নয়। . . . নতুন করিয়া জীবন শুরু হইল গঞ্জালেসের। কোনোখানে বাঁধা পড়িয়া নয় — পৃথিবীময় ছড়াইয়া। নিজের মধ্যে আশ্চর্য একটা উল্লাস তাহার মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল — কালো রাত্রির কালো স্রোত দৃষ্টির অগোচরে বিশাল পৃথিবীর মহা আবর্তে তাহাকে লীন করিয়া দিল — আরো অনেক বিদ্রোহী শিশুর মতোই চরইস্‌মাইল আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না কোনোদিন।''[২৪৬] এদিকে বলরাম মণ্ডল ভিষক্‌রত্নের উপরেও এই বন্য প্রকৃতি প্রভাব ফেলায় নুরুল হাজি ফেরৎ মুক্তোকে পুনরায় গ্রহণ করতেও সে দ্বিধা করে না — ''আজ মুক্তো তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে — আজ আবার তাহাকে তিনি গ্রহণ করিবেন। এই চরইস্‌মাইলে যেখানে সমাজ নাই, মানুষের বাঁধাধরা নিয়মের দোহাই মানিয়া যেখানে জীবন সরলরেখাতেই বহিয়া যায় না — সেখানে মুক্তোকে নতুন করিয়া গ্রহণ করিতে তাঁহার দ্বিধা নাই; সংশয়ও নাই।''[২৪৭] চর ইস্‌মাইলের জীবনের এই রূপ সভ্যসমাজের সঙ্গে কখনোই মেলে না; তা নিজের বিচিত্র রূপ নিয়ে স্বতন্ত্রই থেকে যায়।

এই চরে একসঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের লোকজনের সহাবস্থান দেখা যায়। এখানে বসবাসকারী বেশির ভাগ মানুষ মুসলমান ধর্মাবলম্বী। তবে বলরাম কবিরাজের মতো কিছু হিন্দুও সেখানে আছে। পর্তুগীজরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। আর বর্মীদের ধর্ম বৌদ্ধ। এই অঞ্চলের ধর্মীয় দেবদেবীর পরিচয়েও আঞ্চলিকতার ছাপ আছে। ঔপন্যাসিক চর ইস্‌মাইলপুরের কালুপাড়ার হাটখোলার বর্ণনায় লিখেছেন — ''সব জায়গাতেই গ্রামের

হাটখোলায় একটি না একটি বারোয়ারী দেবতার স্থান দেখা যায়, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। হাটের মাঝখানে বড় গাজী কায়েমি হইয়া বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে শুক্রবার দিন তাঁহার 'শিরণী' হয়। গাজী, দক্ষিণরায়, কালুরায় ও বন-বিবি, এই চারটি দেবতা বা অর্ধদেবতা মিলিয়া আজও অপ্রতিহত প্রতাপে নিম্ন-বঙ্গ শাসন করিতেছেন; শিব, কালী, পীর সকলকে ছাড়াইয়াই ইঁহাদের সম্মান।''[২৪৮] আরকানী মগজাতীয় বর্মীদের সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন — ''ইহারা বৌদ্ধ — আচার বিচারে মুসলমানদের সঙ্গে খুব যে বেশি তফাৎ আছে তা নয় — তবু নিজেদের হিন্দু বলিয়াই মনে করে।''[২৪৯] তবে চর ইস্‌মাইলে মানুষদের মধ্যে ধর্মীয় ভেদাভেদ তেমন নেই। এজন্য পর্তুগীজ খ্রিস্টান ডি-সিলভা, বৌদ্ধ বর্মীরা এবং মুসলমান নুরুল গাজীকে একসঙ্গে অনায়াসেই চোরা কারবার করতে দেখা যায়, মুক্তো হিন্দু মেয়ে হিসেবে মূল জনসমাজে অবস্থানের কারণে ধর্মীয় রীতি-নীতি মানলেও চর ইস্‌মাইলে ধাতস্থ হওয়ার পর বলরাম কবিরাজকে ছেড়ে নুরুল গাজীর ঘরে যেতে দ্বিধা করে না। তবে সভ্যসমাজ থেকে যাওয়া মানুষদের মধ্যে ধর্মীয় সংকীর্ণতার দিকটি এই উপন্যাসেও আছে। তাই মণিমোহনের অধস্তন গোপীনাথ মণিমোহনের মুসলমান বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া ও খাওয়া-দাওয়া করার মিথ্যে কথাটি মন থেকে মেনে নিতে পারে না।

এই উপন্যাসে স্থানীয় সংস্কৃতি তথা জীবনচর্যার বিবরণ থাকলেও আলাদাভাবে আঞ্চলিক লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি, লোকাচার, লোককথার বিবরণ তেমন নেই। তবে ধর্মভেদে এখানকার মানুষদের সংস্কৃতি আলাদা। তাই মা-ফুনের বাড়ির বিবরণে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''বর্মাদেশ-সুলভ ইহাদের বিচিত্রভাষা এবং বিচিত্রতর রীতি-নীতি প্রতিবেশিদের কাছে অনেকটা অপরিচিত বলিয়াই তাহাদের সংস্রব কম।''[২৫০] এই উপন্যাসে অন্তত দু'টি ক্ষেত্রে স্থানীয় লোককথার উল্লেখ আছে — পর্তুগীজ স্যামুয়েল গঞ্জালেসের পূর্বপুরুষ সেবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের জীবনকথা পরিবেশনে এবং নুরুল গাজীর পূর্বপুরুষ সিকন্দর গাজীর সে অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার সংক্রান্ত গল্পে। প্রথমটির ক্ষেত্রে পর্তুগীজ জলদস্যু তথা 'হার্মাদ' সেবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের দুঃসাহসিক ডাকাতি করতে গিয়ে হিন্দু বাড়ির এক নববধূ সাজে সজ্জিতা মেয়েকে অপহরণের

কথা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কীভাবে নিম্নবঙ্গে ফকির-দরবেশদের মাধ্যমে মুসলিম ধর্ম বিকাশ লাভ করেছিল তা বলতে গিয়ে সিকন্দর গাজীর অসমসাহসী ও নিষ্ঠুর কার্যকলাপের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

উপন্যাসটির পাত্রপাত্রীদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান প্রভৃতির বর্ণনায় তেমন অভিনবত্ব নেই। হিন্দু, মুসলিম, পর্তুগীজ, বর্মী — এই উপন্যাসের সবাই বাঙালি খাদ্যরীতি গ্রহণ করেছে। ভাত, সব্জি, মাছ, মাংস প্রভৃতি এখানকার মানুষদের খাদ্যতালিকায় থাকে। বর্মীরা মাটির নিচে মাছ পচিয়ে 'ঙাপ্পি' বানিয়ে খায়। এছাড়াও সভ্যসমাজের মত চা খাওয়ার রীতি-রেওয়াজও সেখানে চালু আছে। তবে চর ইস্মাইলের অধিকাংশ মানুষ গরীব হওয়ায় এদের খাদ্যতালিকায় বৈচিত্র্য কম। তাই মণিমোহনের কাছে দ্বীপ থেকে খেয়ে আসার কথা শুনে তার অধস্তন কর্মচারী গোপীনাথ ভাবে — ''এই গ্রামে এমন কোন লোক আছে যে সরকারীবাবুকে খাইতে দিবে! সন্ধ্যার সময় এক এক কাঁসি পান্তা ভাত গিলিয়াই তো ইহারা নিশ্চিন্তে রাত কাটাইয়া দেয়।''[২৫১] স্থানীয় মদ 'তাড়ি' এখানকার প্রায় সবাই পানীয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং তা খেয়ে কমবেশি মাতলামিও করে। এখানকার পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে লুঙ্গি অপরিহার্য হিসেবে গণ্য হয়। বর্মী নারীরা নিজেদের পরনের ঘাঘ্রার সঙ্গে কোমরে একটি ছোরাও রাখে। এই দ্বীপের বাসভূমিগুলি মূলত টিনের তৈরি। তবে বাইরের মানুষ তহশীলদার মণিমোহন সরকারী খাজনা আদায় করতে গিয়ে নৌকাতেই বসবাস করেছে।

উপন্যাসটির বর্ণনা রীতিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চর ইস্মাইলের বিচিত্র প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গতিময় ভাষা ব্যবহার করলেও চরিত্রদের মুখে স্থানীয় ভাষারীতির সংলাপ ব্যবহার করেন নি। হিন্দু, মুসলিম, বর্মী, পর্তুগীজ — সবাই মান্য চলিত গদ্যে কথা বলেছে। মা-ফুন নিজের ভাষা সম্পর্কে মণিমোহনকে বলেছে — ''এমন চমৎকার বাংলা বলতে শিখলুম কোথা থেকে তা তো জিজ্ঞাসা করলে না।''[২৫২] তাই বলা যায় যে, এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চরিত্রদের ভাষা-সংলাপের ক্ষেত্রে আলাদা কোনো আঞ্চলিক রূপ সৃষ্টি করেন নি। তবে

মান্যচলিত ভাষাতে হলেও তাদের কথাবার্তার মধ্যে সবসময় বাংলার মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ঐ অঞ্চলটির আলাদা একটা ছাপ পড়েছে।

এভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' উপন্যসটিতে আঞ্চলিকতার অনেক লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির মূল্যায়নে বলেছেন — ''উপনিবেশ' উহার বিচ্ছিন্ন খন্ডাংশে মহনীয়, ইহার ব্যঞ্জনাশক্তিতে রমণীয়, লেখকের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিতে প্রত্যাশা-চমকিত, কিন্তু ইহার দ্বৈপায়নতা আর কোন অখন্ড মহাদেশের সহিত আপনাকে সংযুক্ত করিতে পারে নাই।''[২৫৩] এই 'অখন্ড মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত' না হওয়া অবশ্যই উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার দিকনির্দেশ করে। এই উপন্যাসটির দিকে লক্ষ রেখেই সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধায় এবং 'গঙ্গা'র স্রষ্টা সমরেশ বসুর সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়ে লিখেছেন — ''শিল্পী-স্বভাবের বিশেষত্বে তারাশঙ্কর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সমরেশ বসু তিনজনের মধ্যেই গভীর মিল দেখতে পাওয়া যায়।''[২৫৪] তবে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসটির মধ্যে মহাকাব্যোপম উপন্যাসের প্রতিশ্রুতি লক্ষ করেছেন — ''উপনিবেশে'র চর ইসমাইলের কাহিনীতে যে বিষয়ীর সম্ভাবনা তা মহাকাব্যোপম উপন্যাসের প্রতিশ্রুতিতে যুক্ত।''[২৫৫] আর শুদ্ধস্বত্ত্ব বসু 'উপনিবেশ'-এ আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণ দেখতে পেলেও উপন্যাসটিতে সমগ্র বাঙালি জীবন চরিত্রের সগোত্র অনেক কিছুর সন্ধান পেয়ে একে বিশুদ্ধ আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে মানতে চান নি — ''যদি স্থান বিশেষের কিছু কিছু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, কিছু কিছু সামাজিক রীতিনীতির কথা থাকে, আর বাকি এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে — যা সমগ্র বাঙালি জীবন চরিত্রেরই সগোত্র — তাকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা ঠিক হবে না, যেমন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ'। এখানে বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী তাদের নিজস্ব জীবনবোধ নিয়ে উপন্যাসের ঘটনায় অংশ নিয়েছে, নিজেদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে — তাই এটি বিশুদ্ধ আঞ্চলিক উপন্যাস হয় নি।''[২৫৬]

আমাদেরও বক্তব্য হল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' সম্পূর্ণভাবে সার্থক একটি আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। তবে বিশ শতকের চল্লিশের দশকে, বিশেষত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭ খ্রিঃ)-র পূর্বে লেখা এই উপন্যাসটির বহু ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। উপন্যাসটির পটভূমি গ্রহণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। তবে শুধু পটভূমি হিসেবে বাংলা মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চল বা এলাকাকে তিনি গ্রহণ করেন নি, সেই সঙ্গে তিনি ঐ অঞ্চলটির সামগ্রিক জীবনচিত্রও তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং সেই কাজে অনেকটাই সফল হয়েছেন। এই উপন্যাসটি রচিত না করলে চর ইস্‌মাইলের সেই বিচিত্র জীবনের কথা বাঙালি পাঠকের কাছে অজানাই থেকে যেত। তাই 'উপনিবেশ' উপন্যাসটি পাঠের পর চর ইস্‌মাইলের প্রকৃতি, মানুষজন ও তাদের জীবনচর্যা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতির মত সমস্ত কিছুই পাঠককে এক আলাদা জগতের স্বাদ এনে দেয়। বলা বাহুল্য, এই আলাদা জগৎ হল আঞ্চলিকতারই জগৎ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'** উপন্যাসটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি যে বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস — এ সম্পর্কে খুব একটা দ্বিমত নেই। উপন্যাসটির আলোচনায় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (আষাঢ়, ১৩৫৪) — তারাশঙ্করের উপন্যাসাবলীর মধ্যে কেবল যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে তাহাই নয়, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।''[২৫৭] সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই উপন্যাসটির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়ে বলেছেন — ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' তারাশঙ্করের অন্যতর প্রধান সৃষ্টি।''[২৫৮] উপন্যাসটির এই শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে অনেকগুলি কারণ আছে, যেগুলির মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এর আঞ্চলিকতা। 'সংসদ বাংলা সাহিতসঙ্গী' গ্রন্থে এই উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন — ''বীরভূমের কাহার সম্প্রদায়ের জীবন, তাদের সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, আচার-আচরণ, লোককথা এই উপন্যাসের মূলাধার। একদিকে এই সম্প্রদায়ের আত্মবিরোধ, পরিবর্তন ও বিলুপ্তি যেমন কাহিনীর একটি

প্রধান ধারা, আর একটি ধারা হল প্রাচীন সমাজের সঙ্গে নতুন পরিবর্তমান জগতের সংঘাত। স্থানিক বর্ণে এই উপন্যাস উজ্জ্বল, উজ্জ্বল বিচিত্র চরিত্রগুলি। সেই সঙ্গে আছে এক আদিম মানবিক সংরাগ, আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তারের প্রবৃত্তি, মানুষ ও প্রকৃতির এক নির্মম সম্পর্কের রূপায়ণ। এই উপন্যাসের কাহিনীতে আছে যথার্থই এক বিস্তার।''[২৫৯] অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে লিখেছেন — ''একটা সমগ্র গোষ্ঠীর প্রাণস্পন্দন ও মর্মরহস্য, সমগ্র সমাজবিন্যাসের মূলতত্ত্ব ও অন্তরপ্রেরণা এই যুগান্তকারী উপন্যাসে স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয় নাই, ব্যক্তি এখানে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলেও গৌণ; সমাজের পারিপার্শ্বিক চাপ প্রত্যেকের উপরেই গভীর রেখায় মুদ্রিত। এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক হিন্দুধর্মের নিম্নবর্ণীয় সমাজ — যে সমাজ বহু শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষায় কর্মে ও চিন্তায়, জীবনাদর্শের সর্বস্বীকৃত ও প্রাণমূল জড়িত প্রভাবে, এক জীবন্ত, অত্যাজ্য সংস্কৃতির আধাররূপে বিকশিত হইয়াছে।''[২৬০]

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটিকে তারাশঙ্করের তো বটেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করার পেছনে এর আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়। উপন্যাসটির আলোচনাকালে সমস্ত সমালোচকের বক্তব্যে এর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কথা উঠে এসেছে। এরমধ্যে অলোক রায়ের 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থে উপন্যাসটি সম্পর্কে বলা হয়েছে — ''তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বীরভূমের একটি অঞ্চলের বিশিষ্ট প্রকৃতি উপন্যাস-বর্ণিত নিম্নশ্রেণীর কাহারদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। ব্যক্তি-বিশেষের নয়, হিন্দুধর্মের নিম্নবর্ণের এক সমাজের সংস্কৃতির কথাই এখানে মুখ্য। এখানকার সকল অধিবাসীই এক অদৃশ্য দৈবশক্তির হাতের পুতুলমাত্র। বনোয়ারি করালী সুচাঁদ পাখি নসুবালা কালাবৌ পরম প্রভৃতি চরিত্রকে নিয়ে আকাশচারী কালারুদ্র ও কর্তাবাবা যদৃচ্ছ খেলা করেছেন, আর ঐ বিশিষ্ট অঞ্চলের প্রকৃতির প্রতীক চরিত্র হয়ে উঠেছে তারা। প্রেক্ষাপট ও জনগোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ যোগে উপন্যাসটি সার্থক।''[২৬১] অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী জানিয়েছেন — ''উপন্যাসটি আমাদের বহুকালের চেনা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই লেখাটি প্রথম প্রকাশ

পেয়েছিল ১৯৪৬-এর শারদ সংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। পরের বছরেই হয় দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৯৫১ সালে প্রকাশ পায় তৃতীয় সংস্করণ। প্রতিটি সংস্করণেই লেখক যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেছিলেন উপন্যাসটির। এই উপন্যাস তারাশঙ্করের শিল্পীজীবনের এক তাৎপর্যময় সৃষ্টি। লেখাটি জনপ্রিয়ও হয়েছিল। তারাশঙ্করের জীবৎকালেই 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র নয়টি সংস্করণ হয়। প্রতিটি সংস্করণেই কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন লেখক, এমনকি নবম সংস্করণেও।''[২৬২] উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার বিষয়টি অধ্যাপিকা চক্রবর্তীর এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়। এর জনপ্রিয়তার পেছনে অবশ্যই এর অচেনা পটভূমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ঔপন্যাসিক এখানে পটভূমি হিসেবে একটি অচেনা জগৎকে গ্রহণ করেছেন বলে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় মন্তব্য করেছেন — ''তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) অনেকটাই আমাদের অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত।''[২৬৩] যাই হোক, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করার পূর্বে উপন্যাসটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

তারাশঙ্কর এই উপন্যাসটি বীরভূমের আর এক কৃতি সন্তান কবিশেখর কালিদাস রায়কে উৎসর্গ করেন। এ বিষয়ে তিনি এর উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন — ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' আপনার অজানা নয়, সেখানকার মাটি, মানুষ, তাদের অপভ্রংশ ভাষা — সবই আপনার সুপরিচিত। এই মানুষদের কথা শিক্ষিত সমাজের কাছে কেমন লাগবে জানি না।''[২৬৪] ঔপন্যাসিকের এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয় যে, এই উপন্যাসের পটভূমিটি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই গৃহীত হয়েছে। উপন্যাসটিতে গৃহীত এই প্রকৃতি এবং মানুষের কথা বীরভূমের আঞ্চলিক প্রকৃতির সঙ্গে সুপরিচিত কবি কালিদাস রায়দের মতো মানুষদের কাছে নিতান্ত অপরিচিত নয়। তবে বাংলার বৃহত্তর শিক্ষিত জনমণ্ডলীর কাছে এই প্রকৃতি, সমাজ ও সেখানকার মানুষদের জীবনচর্যা অজ্ঞাত। অবশ্য 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি প্রকাশের পরে পরেই শিক্ষিত সমাজ উপন্যাসটিকে লুফে নেয় এবং এরূপ এক মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা কারণে বিচ্ছিন্ন ও অজ্ঞাত স্থানের বিশিষ্ট প্রকৃতি এবং

মানুষজনের জীবনচর্যার বিস্তারিত পরিচয় পেতে ও তার স্বাদ গ্রহণ করতে প্রবল আগ্রহী হয়ে ওঠে।

বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'কালের অভিজ্ঞতার শিল্পী' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন — পুরাতনকাল ও নতুনকালের দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে জন্মভূমি রাঢ় অঞ্চলটির যে পরিবর্তন তিনি দেখেছিলেন, তাঁর বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাসে তাকেই রূপদান করে গেছেন। একথা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনি এই উপন্যাসটি সম্পর্কে নিজের স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন — ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মানুষদের পর্যন্ত আমার এইভাবে জানার সুযোগ হয়েছিল। ঐ সুচাঁদ এবং আমি বসে গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি। . . . পথে নসুবালার সঙ্গে দেখা হয়, সে চুল বেঁধে নাকছাবি পরে থমকে দাঁড়ায়, বলে — হেই মাগো! এখন এল্যা? বলি মনে পড়ল আসতে? ছেলেরা ভালো আছে? তোমার শরীর এমন কাহিল হ'ল ক্যানে?''[২৬৫] এই অভিজ্ঞতাজাত কোপাই তীরবর্তী হাঁসুলী বাঁক অঞ্চলটির প্রকৃতি এবং সেখানকার কাহার সম্প্রদায়ের মানুষজনের জীবনচর্যার বিবরণ দুই কালের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে তারাশঙ্কর উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন। পুরাতন ও নতুন — এই দুই কালের দ্বন্দ্বে এই উপন্যাসে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রবীণের সকরুণ পরাজয় ঘটেছে এবং নতুনের সদম্ভ অগ্রগতি ঘটেছে — ঔপন্যাসিক এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিকতার রঙে রাঙিয়ে পরিবেশন করেছেন।

বীরভূমের কোপাই নদীর তীরবর্তী 'হাঁসুলী বাঁক'-এর মত আকৃতি গ্রহণ করা বাঁশবাদি গ্রামের পটভূমিকায় ঐ গ্রামে বসবাসকারী তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণী কাহার সম্প্রদায়ের মানুষগুলির জীবনযাত্রা, সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনীতি, বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস, নিজস্ব বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার, প্রেম-ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আনন্দ-উৎসব, লোককথা-লোকরুচি প্রভৃতির সামগ্রিক চিত্র ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর তাঁর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে এঁকেছেন। নতুন কালের আবর্ত-সংঘাতে কীভাবে ঐতিহ্যাশ্রয়ী, আদিম বিশ্বাস পুষ্ট এই কাহার সমাজের অনিবার্য ধ্বংসময় পরিণতি ঘটে, সেটাও এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। আর তা দেখাতে গিয়েই এই উপন্যাসটিতে রাঢ়ের একটি বিশেষ অঞ্চল-প্রকৃতির ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি সেখানকার

আঞ্চলিক পরিবেশ, তথাকথিত অন্ত্যজ অধিবাসীদের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য, কোনো একটি চরিত্রের মুখে 'উপকথা'র বর্ণনার আকারে ঐ অধিবাসীদের আবহমান কালের ইতিহাসকে তুলে ধরা এবং দেশের বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে ঐ জনগোষ্ঠীর সকরুণ পরিণামের মত বিষয়গুলি আঞ্চলিক জীবনের সামগ্রিক তাৎপর্য নিয়ে এই উপন্যাসটির মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা কোনো একটি অঞ্চলের প্রেক্ষিতে এইরকম একটি জনজাতির যুগ-যুগান্তরের সামগ্রিক জীবনচর্যার বর্ণনা ও অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যাওয়া বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিরল ঘটনা। এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর সেই বিরল ঘটনারই অবতারণা করেছেন।

উপন্যাসটির কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, রাঢ়ভূমি বীরভূমের উপর দিয়ে বয়ে চলা কোপাই নদীর হাঁসুলী বাঁকের মতো আকৃতির একটি উপত্যকায় গড়ে ওঠা বাঁশবাঁদি গ্রামের সঙ্কীর্ণ পরিবেশে নানাবিধ লৌকিক সংস্কার, দৈব বিশ্বাস, উচ্চজাতির মানুষজনের প্রতি আনুগত্য, মদ্যাসক্তি, চৌর্যবৃত্তি, অবৈধ যৌনলালসার মতো বিষয়গুলিকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর সমাজের প্রেক্ষিতে অন্ত্যজ কাহার সম্প্রদায়ের মন্থরগতির জীবনপ্রবাহ এগিয়ে চলে। এই গতানুগতিক জীবন প্রবাহে প্রথম বিপর্যয় ডেকে আনে কাহার যুবক করালী। সে প্রথম তাদের পিতৃ-পিতামহের পেশা ত্যাগ করে চন্দনপুরে রেলের গ্যাংম্যানের কাজ নেয়। করালী কাহার সম্প্রদায়ের সন্তান হলেও অতিমাত্রায় খামখেয়ালি প্রকৃতির যুবক। কাহারদের অতীত ইতিহাস, পিতৃপুরুষের আচার-আচরণ, দৈব-বিশ্বাসের মতো কাহার সংস্কৃতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত কোনো কিছুর প্রতিই তার আস্থা নেই। সে বুদ্ধি আর গায়ের জোরে সব কিছুর সমাধান করতে চায়। সে হল নতুন কালের প্রতিনিধি। এইরকম মানসিকতা ও নানাবিধ আচার-আচরণের কারণে করালীর সঙ্গে কাহার সম্প্রদায়ের মোড়ল বনওয়ারীর সংঘর্ষ বাধে। তবে নিজের কোনো পুত্রসন্তান না থাকার কারণে অথবা করালীর শৌর্যত্বের কারণে বনওয়ারী তাকে অন্যান্য কাহার যুবকদের চেয়ে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে, করালীর প্রতি তার একধরনের প্রচ্ছন্ন মমতাও জন্মায়। এজন্য করালীকে 'কোলগত' করে নেওয়ার মনোগত ইচ্ছাও সে করে। এদিকে করালীও মনে মনে গোষ্ঠীপতি বনওয়ারীকে ভয় ও ভক্তি করে। কিন্তু তাদের বিরোধ এড়ানো যায়

না। করালীর নানা হঠকারী আচরণ কাহার সমাজের আচার-অনুষ্ঠান-অনুশাসনের প্রতিপালক বনওয়ারীকে ক্ষিপ্ত করে তোলে এবং এর ফলে উভয়ের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এর ফলশ্রুতিতে করালী বাঁশবাঁদি গ্রাম ত্যাগ করে চন্দনপুরে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

ইতিমধ্যে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। এই মহাযুদ্ধের ঢেউ সমগ্র ভারতবর্ষের পাশাপাশি কোপাই তীরবর্তী বাঁশবাঁদি গ্রামের কাহার জনগোষ্ঠীর উপরেও এসে লাগে। ফলে বন্যা, ঝড়, অভাব, দারিদ্র্যের মতো প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও যে কাহার সমাজ বাঁশবাঁদির ছায়াচ্ছন্ন আদিমতার মধ্যে এতকাল ধরে সমস্ত কিছুর মোকাবিলা করে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়ে আসছিল, বহিরাগত শক্তির আঘাতে এবার তাদের অস্তিত্বে টান ধরে — এদের অভাব ও দারিদ্র্য সীমাহীন হয়ে ওঠে। অনেকেই বাঁশবাঁদি ছেড়ে চন্দনপুরের কারখানায় মজুরি খাটতে চলে যায়। এদিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে বাঁশবাঁদির বাঁশের ঝাড়, বট-অশ্বত্থ গাছ, কাহারদের রক্ষাকর্তা 'কর্তাঠাকুর'-এর থানের বেলগাছ, বাবাঠাকুরের থান — সমস্ত কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার স্বপ্ন রচনার স্থান আর থাকে না। বনওয়ারীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী গোপাখি, নয়নের মা মারা যায়, করালীর বউ পাখি আত্মহত্যা করে, সুচাঁদ বুড়ি চন্দনপুরের রেল স্টেশনে অথবা লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে হাঁসুলী বাঁকের উপকথার গল্প বলে বেড়াতে শুরু করে। অবশেষে একদিন কাহার সমাজের সমাজপতি শূর বীর বনওয়ারীরও মৃত্যু ঘটে। বনওয়ারীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আলো-অন্ধকারের আদিম অরণ্যের মত বহু যুগ ধরে গড়ে ওঠা কাহার গোষ্ঠী এবং তাদের সভ্যতা নিজের ঐতিহ্য বিশ্বাস নিয়ে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়।

উপন্যাসটি অবশ্য এখানেই শেষ হয় নি। কাহার সংস্কৃতির বিনষ্টিই এর মূলকথা নয়। তারাশঙ্করের উপন্যাসে নতুন ও পুরাতনের সংঘর্ষে বরাবরই পুরাতন পিছু হটেছে। এই উপন্যাসেও পুরাতনের প্রতীক বনওয়ারী পিছু হটেছে। কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসে আকীর্ণ বনওয়ারীর কাহার-কুল এবং তাদের বাঁশবাঁদি গ্রাম যে একদিন ধ্বংস হবে, তারাশঙ্কর সেই অনিবার্যতার কথা জানতেন। কিন্তু বরাবরের মতো এই উপন্যাসেও তিনি পুরাতনের পতনের জন্য তাঁর দীর্ঘশ্বাস গোপন করেন নি। এজন্য তিনি কাহারদের এই ধ্বংস, বিনষ্টি, বিলুপ্তির মধ্যেও নব সম্ভাবনার সঙ্কেত

দিয়েছেন। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার সবকিছু শেষ হয়েও যেন শেষ হয় নি। তাই উপন্যাসের শেষদিকে দেখা যায় — ''সুচাঁদ গাছতলায় ব'সে ব'লে যায় হাঁসুলী বাঁকের উপকথা। . . . আঃ হাঁসুলী বাঁক শেষ — আমিও শেষ, কথাও শেষ! আঃ—আঃ! কিন্তু — । বলতে বলতে থেমে যায় সুচাঁদ। আকাশের দিকে চেয়ে ভাবে। ভাবে, শেষ কি হয়? কিছুর শেষ কি কখনও হয়েছে? চন্দ্র সূর্য্যি যত কাল, তার পরেও তো শেষ নাই; তার পরে আছেন যে মহাকাল। বাবা কালারুদ্দের চড়ক পাটায় ঘোরা। সে ঘোরার শেষ নাই। আলো নাই অন্ধকার নাই তবু পাটা ঘোরার শেষ নাই। সেই ঘোরাতেই তো কখনও প্রলয় কখনও সৃষ্টি! আঁধারে সৃষ্টি ডোবে, আবার আলোতে ওঠে। তবে শেষ কি ক'রে হবে? সে ভাবে।''[২৬৬] এইরকম অবস্থায় প্রায় বছর দুয়েক পর নসুবালা ছুটে এসে তার নূপুর জোড়াটা চায়। তখন সুচাঁদ কথা শেষ করে 'সব শেষ লো — সব শেষ!' বললে নসু হেসে ঢলে প'ড়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠে — ''আমি কি দেখে এলাম শোন্। দেখে এলাম, বাঁশবাদির বাঁধের বেড়ে বালি ঠেলে বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে। আর কচি কচি ঘাস। আর দেখে এলাম সে ডাকাবুকোকে।''[২৬৭] — করালী হাঁসুলী বাঁকে ফিরে আসে। নসু জানায় করালী একা লুকিয়ে গিয়ে সবল হাতে গাঁইতি চালিয়ে বালি কাটছে আর মাটি খুঁজছে। ঔপন্যাসিকের মন্তব্য — ''উপকথার কোপাইকে — ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে। নতুন হাঁসুলী বাঁক।''[২৬৮]

এই উপন্যাসটির আলোচনাকালে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন — ''আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য এই উপন্যাসে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে — ১. একটি বিশিষ্ট পরিবেশ-ধৃত জনগোষ্ঠীর সামূহিক বিশ্বাস — বিশেষ সেই গোষ্ঠীর সৃষ্টি এবং ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় বহুকালাগত স্মৃতি; ২. তাদের জীবিকার সার্বিক পরিচয়; ৩. তাদের অসংস্কৃত অনুভূতির রূপায়ণের ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য। এর সঙ্গে আর একটি যোগ করা যায় — যা প্রায় প্রধান আঞ্চলিক উপন্যাসেই দেখা যায় — বৃহত্তর দেশকালের হস্তক্ষেপে আঞ্চলিকতা ভেঙে যাচ্ছে।''[২৬৯] শ্রদ্ধেয় সমালোচকের এই বক্তব্য তো অবশ্যই মানতে হয়, সেই সঙ্গে এটাও বলতে হয় যে, এই উপন্যাসে এগুলির বাইরে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। এখানে পটভূমি হিসেবে তো মূল জনসমাজের বাইরের কোনো একটি

অঞ্চলকে গ্রহণ করা হয়েছেই, সেই সঙ্গে সেখানে বসবাসকারী কাহার সম্প্রদায়ের জীবনচর্যার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কিছুকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রকাশ করেছেন। এই উপন্যাসে সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিত হাঁসুলি বাঁক অঞ্চলটিও একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। এজন্য উপন্যাসটির আঞ্চলিকতা নির্ণয়ের প্রসঙ্গে এগুলির আলোচনা করতেই হয়।

এই উপন্যাসের শুরু থেকে সুযোগ পেলেই ঔপন্যাসিক উপন্যাসে গৃহীত হাঁসুলী বাঁক অঞ্চলটি যে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা কারণে বিচ্ছিন্ন, সেদিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করে গেছেন। এজন্য তিনি মাঝে মাঝেই এই অঞ্চলটির আঞ্চলিক প্রকৃতির বিবরণ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। উপন্যাসের শুরুতেই অঞ্চলটির বিবরণে বলেছেন — ''কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক — অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প-পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গয়নার মত। বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি-গোলা জলভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয়, শ্যামলা মেয়ের গলায় সোনার হাঁসুলী; কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে জল যখন পরিষ্কার সাদা হয়ে আসে — তখন মনে হয় রূপোর হাঁসুলী। এইজন্যে বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক।''[২৭০] এরপর সেখানে অবস্থিত বাঁশবাঁদি গ্রামটির পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্য লিখেছেন — ''নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াই শো বিঘা জমি নিয়ে মৌজা 'বাঁশবাঁদি', লাটজঙ্গলের অন্তর্গত, বাঁশবাঁদির উত্তরেই সামান্য খানিকটা ধানচাষের মাঠ পার হয়ে জাঙল গ্রাম। বাঁশবাঁদি ছোট গ্রাম; দুটি পুকুরের চারিপাড়ে ঘর তিরিশেক কাহারদের বসতি; জাঙল গ্রামে ভদ্রলোকদের সমাজ — কুমার সদ্‌গোপ, চাষি-সদ্‌গোপ এবং গন্ধবণিকের বাস, এ ছাড়া নাপিত-কলুও আছে এক এক ঘর, এবং তন্তুবায় দুঘর। জাঙলের সীমানা বড়; হাঁসিল জমিই প্রায় তিনহাজার বিঘা, পতিতও অনেক — নীলকুঠির সায়েবদের সায়েবডাঙার পতিতই প্রায় তিনশ বিঘা।''[২৭১] সে অঞ্চলের প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি লিখেছেন — ''হাঁসুলী বাঁকের দেশ কড়াধাতের মাটির দেশ। . . . 'খরা' অর্থাৎ প্রখর গ্রীষ্ম উঠলে নদী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়, ধূ ধূ করে বালি — . . . মাটি তখন হয়ে ওঠে পাষাণ, ঘাস যায় শুকিয়ে, গরম হয়ে ওঠে আগুনে পোড়া লোহার মত, কোদাল কি

টামনায় কাটে না; কোপ দিলে কোদাল-টামনারই ধার বেঁকে যায়; গাঁইতির মত যে যন্ত্র সে দিয়ে কোপ দিলে তবে খানিকটা কাটে, কিন্তু প্রতি কোপে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে।''[২৭২] এই হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদি গ্রামে মাঝে মাঝে বন্যা হানা দেয় — ''সাঁওতাল পরগণার পাহাড়িয়া নদী কোপাইয়ে ওই দু-তিন বৎসর অন্তর যে আকস্মিক বন্যা আসে — যাকে বলে 'হড়পা বান', সেই বন্যার স্রোতে পড়ে ক্বচিৎ কখনও এক-একটা 'গুলবাঘা' ভেসে এসে হাঁসুলীর বাঁকের এই খাপছাড়া, বাঁশবাঁদি গাঁয়ের নদী কুলের বাঁশবনের বেড়ার মধ্যে আটকে যায়।''[২৭৩] এই হাঁসুলী বাঁকের পাশেই আছে একটা দহ, যাকে হাঁসুলী বাঁকের মানুষেরা ভয় ও ভীতির চোখে দেখে -- ''হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদির ঘাটের পাশে যে দহটা আছে সেখানে আসে সর্বনেশে মানুষ-গরু-খেকো বড়ো কুমীর — এখানকার লোকে বলে 'ঘড়িয়াল'।''[২৭৪] হাঁসুলী বাঁক অঞ্চলটিকে আধুনিক সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ রেল-ব্যবস্থা মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। রেললাইনের ওপারেই আছে চন্দনপুর গ্রাম — ''রেলের লাইনটা চলে গেছে গাঁয়ের পূবদিক দিয়ে। চন্দনপুর স্টেশন ছাড়িয়ে লাইনটা কোপাই নদীর উপর ব্রিজ বেঁধে পার হয়ে চলে গিয়েছে। হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবাঁদির নীলের বাঁধ পুকুরের পাড় থেকে বেশ দেখা যায় ব্রিজটা।''[২৭৫] এই হাঁসুলী বাঁক যে মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ঔপন্যাসিক সেটা প্রমাণেও উদ্যোগী হয়েছেন — ''পাথুরের মাটির ঢলন একটা — খানিকটা উঁচু — খানিকটা নীচু, আবার খানিকটা উঁচু — লাল কাঁকরে ভরা — ঢেউ খেলানোর ভঙ্গীতে একটা ঢলন যেন নেমে এসেছে সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ের দেশ থেকে। পশ্চিম থেকে পূবে চলে এসেছে একটা ব-দ্বীপের চেহারা নিয়ে। এ ঢলনের আশেপাশে বাংলা দেশের মাটি। সেখানেই দেশের চাষের মাঠ, সে সব মাঠে নানা ফসল ফলে। হাঁসুলীর বাঁকে — এই লাল মাটির একটা ফালি এসে শেষ হয়েছে হাঁসুলীর বাঁকের পশ্চিম উত্তর মাথায়।''[২৭৬] এভাবে উপন্যাসটিতে অজস্র স্থানে হাঁসুলী বাঁক ও তার তীরের বাঁশবাদী গ্রামকে স্বতন্ত্ররূপে দেখানো হয়েছে।

এই উপন্যাসে পটভূমি হিসেবে মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চলকে গ্রহণ করে সেখানকার ভৌগোলিক পরিচয় প্রদানের পাশাপাশি সেই অঞ্চলের প্রকৃতি

ও মানুষগুলির উপর তার প্রভাবের কথাও আছে — ''হাঁসুলী বাঁকে পৃথিবীর সঙ্গেই যথা নিয়মে রাত্রি প্রভাত হয়। . . . গাছে গাছে পাখি ডাকে, ঘাসের মাথায় রাত্রের শিশিরবিন্দু ছোট ছোট মুক্তার দানার মত টলমল করে। বাঁশবনের মাথা থেকে বনশিরিষ, নিম আম জাম কাঁঠাল শিরিষ বট পাকুড়ের মাথা থেকে টুপ টাপ ক'রে শিশিরবিন্দু ঝ'রে পড়ে মাটির বুকে। যে ঋতুতে যে ফুল ফোটার কথা সেই ফুল ফোটে। পূর্ব দিকে নদীর ধার পর্যন্ত অবারিত মাঠের ওপারে — কোপাইয়ের ওপারের গ্রাম গোপগ্রামের চারিপাশে গাছপালার মাথায় সূর্য ওঠে। কিন্তু কাহারেরা জাগে সূর্য ওঠার অনেক আগে।''[২৭৭] ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলটির প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে — ''কার্তিক-অগ্রহায়ণে হাঁসুলীর বাঁকের উপকথায় পলেনেও মাঠের রঙ হয় সোনার বরণ। ঝিরঝিরে হিমেল বাতাস, পাকা ধানের গন্ধে ভুরভুর করে। গোবিন্দভোগ, বাদশাভোগ, কনকচুর, রামশাল, সিঁদুরমুখী, নয়নকলমা — কত রকমের ধান। . . . সোনার বরণ ধানভরা মাঠের বুকে বেড় দিয়ে কাচ-বরণ জল রূপার হাঁসুলী টলমল — কোপাই নদীর বাঁক। . . . খালে নালায় ঝিরঝিরে ধারা জল বয়, রূপার কুচির মত ছোট মাছ ঝাঁক বেঁধে নেমে চলে নদীর সন্ধানে। আউশের মাঠে আউশ ধান উঠে গিয়ে রবি ফসলের সবুজে ভ'রে ওঠে। গম, কলাই, আলু, যব, সরষে, মসন, তিষির অঙ্কুর-রোমাঞ্চ দেখা যায়। হিলহিলে বাঁশবনের মাথা উত্তরে বাতাসে দুলতে থাকে, ক্যাঁ ক্যাঁ — কট কট শব্দে, কখনও বা বাঁশীর মত সুর তুলে। আকাশে উড়ে নেচে বেড়ায় নতুন পাখির দল। . . . দুপুরে রোদ চনচন করে, রাত্রিবেলা গা সিরসির করে।''[২৭৮] এই হাঁসুলী বাঁকের প্রকৃতির সঙ্গে সেখানকার বাঁশবাঁদি গ্রামের কাহার সম্প্রদায়ের মানুষগুলির প্রকৃতির যে অঙ্গাঙ্গী যোগ ছিল সেকথা জানাতেও ঔপন্যাসিক ভোলেন নি। এই জন্য কাহার মেয়েদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন — ''কাহারদের এক-একটা ঝিউড়ি মেয়ে হঠাৎ যেমন এক-একদিন বাপ-মা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে, পাড়া-পড়শীকে শাপ-শাপান্ত ক'রে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের কাপড় যায় খ'সে, চোখে ছোটে আগুন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছুঁড়ে মারে ইট-পাটকেল পাথর, দিগ্‌বিদিক্‌শূন্য হয়ে ছুটে চলে কুলে কালি ছিটিয়ে দিয়ে তেমনি ভাবেই সেদিন ওই

ভরা নদী অকস্মাৎ ওঠে ভেসে। তখন একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনী। ক্ষমা নাই-ঘেন্না নাই। দিগম্বরীর মত হাঁক ছেড়ে ডাক পেড়ে, শতমুখে কলকল খলখল শব্দ তুলে দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে। . . . কাহারদের মেয়েও যেমন রাগ পড়লে এসে চুপ ক'রে গাঁয়ের ধারে বসে থাকে, তারপর এক-পা, দু-পা ক'রে এগিয়ে এসে বাড়ির কানাচে কানাচে গুনগুন ক'রে কাঁদে কি গান করে, ঠিক ধরা যায় না — তেমনই ভাবে কোপাইও দুদিন বড়জোর চারদিন পরে আপন কিনারায় নেমে আসে, কিনারা জাগিয়ে খানিকটা নীচে নেমে কুলকুল শব্দ করে ব'য়ে যায়। . . . কোপাই নদীর পাগলামির ছোঁয়াচ কাহার-মেয়েদের জীবনে ঘোচে না।''[২৭৯] ঔপন্যাসিক আরও লিখেছেন — ''বউয়ের রোজকার, বিটির রোজকার কাহার পাড়ায় 'শাক-ঢাকা মাছ'। . . . কোপাই নদীর পাগলামির ছোঁয়াচ কাহার-মেয়েদের জীবনে ঘোচে না।''[২৮০] তিনি কাহার পাড়ার নারী কালো শশীর চোখের গভীরতাকে বাঁশবাঁদির দহের গভীরতার সঙ্গে তুলনা করেছেন — ''কালো বউয়ের চোখ যেন কোপাই নদীর দহ। তলাতে কিছু যেন খেলা করছে, উপরে তার ঝিলিক দেখা যায়, কিন্তু ঠিক কিছু বুঝতে পারা যায় না।''[২৮১] এই অঞ্চলটির প্রকৃতি যে, এই কাহার সম্প্রদায়ের মানুষগুলির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়েছিল এসব উদ্ধৃতি সেটাই প্রমাণ করে।

এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক চরিত্র হিসেবে মূলত বাঁশবাদির অন্ত্যজ শ্রেণির কাহার সম্প্রদায়ের মানুষদেরই চিত্রিত করেছেন। ঘোষমশায়, চৌধুরীদের মতো দু'চারটি উচ্চবর্ণের মানুষের কথা এই উপন্যাসে এলেও তাদের জীবন কাহিনি পরিবেশন করা তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল না; তিনি তা করেনও নি। এরা সবাই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির বাইরের মানুষ। বনওয়ারী, করালী, নসুবালা, সুঁচাদ, বসন, গোপাখিবালা, কালোশশী, সুবাসী, পাখি, নয়ন, নয়নের মা, পরম, পাগল, রতন, প্রহ্লাদ, পানু প্রমুখেরা সবাই কাহার সম্প্রদায়ের মানুষ। ঔপন্যাসিক এখানে তাদের বিশিষ্ট প্রকৃতি ও চেহারার বর্ণনাও দিয়েছেন। কাহার পাড়ার মাতব্বর বনওয়ারী সম্পর্কে তিনি লিখেছেন — ''বনওয়ারী কোশ-কেঁধেদের বংশের ছেলে, পাকা বাঁশের মত শক্ত মোটা হাড়ের কাঠামো তার। কাহারপাড়ায় — শুধু কাহারপাড়ায় কেন, কাহারপাড়া, আটপৌরেপাড়া, জাঙল তিন জায়গায় তার মত জোরালো মুনিষ নাই; বনওয়ারী শক্ত

মুঠোয় লাঙল ক'ষে টিপে ধরলে টানতে মাঝারি বলদের পিঠ ধনুকের মত বেঁকে যায়, ঘাড় লম্বা হয়ে যায়।''[২৮২] কাহারপাড়ার সবচেয়ে উদ্যমী, সবল ও সতেজ চরিত্র করালী — ''লম্বা দীর্ঘ চেহারা, সাধারণ হাতের চার হাত খাড়াই তাতে কোন সন্দেহ নাই, সরু কোমর, চওড়া বুক, গোলালো পেশীবহুল হাত, সোজা পা দুখানি, লম্বা আমের মত মুখ, বড় বড় চোখ, নাকটি খাঁদা, কিন্তু তাতেই চেহারাখানিকে করেছে সবচেয়ে মিষ্টি, তারও চেয়ে মিষ্টি তার ঠোঁট আর দাঁত। হাসলে সুন্দর দেখায় করালীকে।''[২৮৩] এই করালীর পিসতুতো ভাই নসুবালা। এই চরিত্রটি তারাশঙ্কর নিজের ব্যক্তিগত জীবন থেকে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসে কাহার নসুবালার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন — ''নসুবালা করালীর পিসতুতো ভাই। আসল নাম নসুরাম। অদ্ভুত চরিত্র নসুরামের। ভাবে ভঙ্গীতে কথায় বার্তায় একেবারে মেয়েদের মত। মাথায় মেয়েদের মত চুল, তাতে সে খোঁপা বাঁধে, নাকে নাকছাবি পরে, কানে মাকড়ি পরে, হাতে পরে কাঁচের চুড়ি লাল রুলি, মেয়েদের মত শাড়ী পরে। মেয়েদের সঙ্গে গোবর কুড়ায়, কাঠ ভাঙে, ঘর নিকায়, চন্দনপুরে দুধের যোগান দিতে যায়, মজুরনী খাটতে যায়। কণ্ঠস্বরটি অতি মিষ্টি — গান গায়, নাচে। গান আর নাচ — এই তার সবচেয়ে বড় নেশা। ঘেঁটুর দলে নাচে, ভাঁজোর নাচনে সেই মেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে সেরা নাচিয়ে। মেয়েদের সঙ্গেই সে ব্রত পার্বণ করে।''[২৮৪] এদের তিনজনের ছাড়াও কাহারপাড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত পাগল সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য — ''হাঁসুলী বাঁকের পাঁচালীকার পাগল কাহার মজার মানুষ। মনখানি তার নীলের বাঁধের জলের মত। আকাশের রঙেই তার রঙ। . . . কাহার পাড়া তার কাছে আকাশ। কাহার পাড়া হাসলে সে হাসে, কাঁদলে সে কাঁদে।''[২৮৫] কাহারেরা রেগে গেলে তাদের চোখ যে বন্য শ্বাপদের মত জ্বলে তার প্রমাণ পরম কাহার। যখন কালোশশীকে কেন্দ্র করে বনওয়ারী ও পরমের লড়াই বেঁধেছিল, তখনকার পরমের প্রকৃতি সম্পর্কে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে পরম। চোখ জ্বলছে শ্বাপদের মত। অন্ধকারে পরমের হাঁসা চোখ বুনো বিড়ালের মত জ্বলে।''[২৮৬] কাহারপাড়ার একজন গুরুত্বপূর্ণ নারীচরিত্র হল সুচাঁদ। ঔপন্যাসিক তার মুখ থেকেই কাহারদের পিতৃপুরুষের কাহিনি পরিবেশন করেছেন। কাহার পুরুষদের

পাশাপাশি মহিলারাও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে যে আকণ্ঠ মদ খেত, তা এই সুচাঁদের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন — ''মেয়েরাও মদ খেয়েছে। তাদেরও বসেছে স্বতন্ত্র আসর। আসরের মূল গায়েন সুচাঁদ; সে খুব খুশী। কত্তার পূজো হয়ে গিয়েছে, পূজোর মত পূজো, বলিদান, ঢাক, মদ, কোনো খুঁত নেই। . . . সুচাঁদ নাচছে কখনও, কখনও বলছে সেকালের রোমাঞ্চকর গল্প।''[২৮৭] এভাবে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের প্রায় সমস্ত আঞ্চলিক চরিত্রদের (কাহারদের) সঙ্গে হাঁসুলী বাঁক অঞ্চলটির অঙ্গাঙ্গী যোগকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

এই উপন্যাসের নায়ক সংক্রান্ত আলোচনায় পণ্ডিতদের মধ্যে আজও বিতর্ক শেষ হয় নি। কেউ মনে করেন বনওয়ারী এই উপন্যাসের নায়ক, আবার কেউ মনে করেন করালী এই উপন্যাসের নায়ক। কিন্তু এদের দু'জনের মাঝে থেকে কখন যে, হাঁসুলী বাঁক অঞ্চলটিই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, তা অনেকেই লক্ষ করেন নি। বনওয়ারী, করালী থেকে শুরু করে এই উপন্যাসের সমস্ত কিছুর গড়ে ওঠার পেছনে এই অঞ্চলটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র আলোচনায় বনওয়ারীর প্রশংসা করে বলেছেন — ''সমাজপতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাহার মধ্যে রূপায়িত — সমগ্র কাহার-সমাজের কল্যাণকামনা তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ অতিক্রম করিয়া তাহার একাগ্র সাধনার বিষয়। তাহার চরিত্র-পরিকল্পনায় সমাজসত্তা ও ব্যক্তিসত্তা এরূপ নিবিড় একাত্মতায় মিশিয়া গিয়াছে, যাহা উপন্যাস-সাহিত্যে দুর্লভ। কাহার-বংশের সমস্ত সংস্কার-বিশ্বাস, সমস্ত ঐতিহ্যগত মানসরূপ বনোয়ারিতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রে যতটুকু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-অনুশীলনের ফল, কতটাই বা সমষ্টিগত সমাজ-প্রেরণার পরিণতি তাহার ভেদরেখানির্ণয় অসম্ভব। বনোয়ারিই কাহার-সমাজ, এবং কাহার-সমাজে ব্যক্তিগত উৎকেন্দ্রিকতা বাদ দিলে যে সর্বসাধারণ সারাংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাই বনোয়ারি।''[২৮৮] কিন্তু তিনি সরাসরি তাকে এই উপন্যাসের নায়ক বলেন নি। বরং নায়ক সংক্রান্ত আলোচনায় বলেছেন — ''এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে, হাঁসুলি বাঁকের প্রাকৃতিক পরিবেশ, অধ্যাত্ম ভাবমণ্ডল ও এই উভয়ের বেষ্টন-রেখায় সংহত একটি মানব-সমাজ। বাস্তবিক সমস্ত সমাজ-মনের এরূপ

ভাবঘন, অন্তঃসংগতিশীল, নিবিড় নিশ্ছিদ্র চিত্র যে কোন দেশের কথাসাহিত্যে বিরল। প্রতিটি ব্যক্তিচরিত্রের ভিতর দিয়া এই সমগ্র সংস্কৃতি ও জীবনদর্শন আংশিক বা পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত। তাহাদের হিংসা-দ্বেষ, কলহ-বিরোধ, লোভ-অসংযম, স্বার্থসংঘাত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবই এক সমীকরণকারী জীবনবোধের অন্তর্ভুক্ত।''[২৮৯] এটা ঠিক যে, বনওয়ারী বা করালী নয়; হাঁসুলী বাঁকের আঞ্চলিক প্রকৃতিই এই উপন্যাসের নায়ক। বনওয়ারী, করালীর মত সবাই এই অঞ্চলটিকে ভিত্তি করেই বিকাশ লাভ করেছে — অঞ্চলটি ছাড়া তাদের কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই। উপন্যাসটি থেকে অঞ্চলটিকে সরিয়ে নিলে এটি উপন্যাস হয়ে ওঠার অনেক গুণই হারায়। ফলে সবকিছু মিলিয়ে হাঁসুলী বাঁক অঞ্চলটিই এই উপন্যাসের নায়ক।

এই উপন্যাসে হাঁসুলী বাঁকের ভৌগোলিক পরিচয়, আঞ্চলিক প্রকৃতি ও সেখানকার কাহার সম্প্রদায়ের মানুষগুলির পরিচয়ের পাশাপাশি তাঁদের জীবন-জীবিকার বিস্তারিত পরিচয় আছে। এই অঞ্চলের কাহারদের আবির্ভাব প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''১২৫০ সালের কাগজে দেখা যায় — এক নতুন জমাপত্তন — নীলকর শ্রীযুক্ত জেনকিন্স সাহেবের নাম। সেই জমার মধ্যে জাঙলের যাবতীয় পতিত ভূমি, তার সঙ্গে গোটা বাঁশবাঁদি মৌজাটাই প্রায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে . . . বাঁশবাঁদি মৌজা বন্দোবস্ত নিয়ে সাহেবেরাই ওখানে ওই পুকুর কাটায় এবং বাঁশবাঁদির সমস্ত পতিতকে নীলচাষের জন্য হাঁসিল ক'রে তোলে। সেই হাঁসিল করবার জন্যই এই কাহার পাড়ার লোকেরা বাঁশবাঁদিতে আসে।''[২৯০] প্রথমদিকে কাহাররা নীলচাষ সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত হলেও নীলচাষের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এদের জীবিকাও বদলায়। পরবর্তী সময়ে এরা গৃহস্থ বাড়িতে জন-মুনিষ খাটার কাজে এবং পাল্‌কি বওয়ার কাজে যোগ দেয়। তবে কাজের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাজনও আছে — ''বাঁশবাঁদি পুরোপুরি কাহারদের গ্রাম — গ্রাম ঠিক নয়, ওই জাঙ্গল গ্রামেরই একটা পাড়া। তবে জমিদারী সেরেস্তায় মৌজা হিসেবে ভিন্ন ব'লে — ভিন্ন গ্রাম ব'লেই ধরা হয়। দুটি পুকুরের পাড়ে দুটি কাহার-পাড়া। বেহারা-কাহার এবং আটপৌরে কাহার। বেহারা-কাহার পাড়াতেই চিরকাল লোকজন বেশি, প্রায় পঁচিশ ঘর বসতি। . . . কোশবেঁধে-বাড়ির বনওয়ারী বেহারা-পাড়ার মুরুব্বি। বেহারা কাহাররা পাল্কী বয়। . . .

বেহারা-পাড়া থেকে রশিখানেক পশ্চিমে আট-পৌরে কাহারদের বসতি। আটপৌরেরা পাল্কি কাঁধে করে না, ওরা বেহারাদের চেয়ে নিজেদের বড় বলে জাহির করে।''[২৯১] তবে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাহারদের জীবিকাতেও পরিবর্তন থাবা বসায়। তাই কাহার যুবক করালীকে রেল কোম্পানীতে কাজ নিতে দেখা যায়। করালীই প্রথম কাহার সম্প্রদায়ের মানুষ যে নিজেদের 'পিত্তিপুরুষের' পেশাকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র কাজ নেয়। পরে করালীর দেখাদেখি অনেক কাহারই সেই জীবনের প্রতি আগ্রহী হয়।

কাহারদের জীবন পরিক্রমায় অনিবার্যভাবে প্রেম-ভালোবাসার প্রসঙ্গ আসে। এদের প্রেম-ভালোবাসা তথাকথিত সভ্যসমাজের ভালোবাসা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির — ''এ দেশের এরা, মানে হাঁসুলী বাঁকের মানুষেরা, নরনারীর ভালোবাসাকে বলে 'রঙ'। — রঙ নয় — বলে 'অঙ'। . . . মেয়ে-পুরুষের ভালোবাসা হলে ওরা বলে — অঙ লাগয়েছে দুজনাতে। . . . ভালোবাসলে সে ভালোবাসা লজ্জা বল, ভয় বল, পাড়া পড়শীর ঘৃণা বল, কোন কিছুর জন্যই — ঢাকতে জানে না কাহারেরা।''[২৯২] এই প্রেম-ভালোবাসার মধ্যে অনিবার্য ভাবে কামনার আদিমতা ছায়া ফেলে — ''বাঁশবাঁদির বাঁশবনে আজও জমে আছে আদিম কালের অন্ধকার। সে অন্ধকার রাত্রে এগিয়ে এসে বাঁশবাঁদির কাহারপাড়াকে আচ্ছন্ন করে। সেই অন্ধকারের মধ্যেও কাহারদের দৃষ্টি কিন্তু ঠিক চলে, ওদের চোখেও তখন জেগে ওঠে সেই আদিম যুগের অর্থাৎ অগ্নি আবিষ্কারের পূর্বযুগের মানুষের চোখের অন্ধকার-ভেদী আরণ্য-জন্তুর দৃষ্টিশক্তি।''[২৯৩] এই আদিমতা বনওয়ারী-কালোশশীর সম্পর্কে যেমন দেখা যায়, তেমনি করালি-পাখির সম্পর্কের মধ্যেও দেখা যায়। কাহার পাড়ার মাতব্বর বনওয়ারী একসময় নয়নের মা-র সঙ্গেও এই আদিম কামনা পঙ্কিল প্রেমে লিপ্ত হয়েছিল এবং এ থেকেই নয়নের জন্ম বলে কাহার পাড়ায় একটা লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। কাহারদের জীবন পরিক্রমায় একটা অদ্ভুত রীতি প্রচলিত আছে — এদের পুরুষেরা স্ত্রী বর্তমান থাকতে বিয়ে করলে স্ত্রীরাও স্বামীর অপেক্ষায় আর থাকে না, তারা গাল দিতে দিতে অন্যপুরুষের ঘরে ওঠে — সতীনের সঙ্গে তারা ঘর করে না — ''কাহার পাড়ার স্বামী যদি স্ত্রী থাকতে বিয়ে করে, তবে স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে শাঁখা নোয়া খুলে ছুঁড়ে

ফেলে দিয়ে স্বামীকে গাল দিতে দিতে চ'লে যায় — অন্য কোন কাহার-মরদের ঘরে গিয়ে ওঠে। সতীনের সঙ্গে ঘর কাহার মেয়েরা করে না। . . . কাহার পাড়ার মেয়েরা ফেলনা নয়, স্বামীকে তাদের ভাত দিতে হয় না, নিজেরাই তারা খেটে খায়, রূপ-যৌবন ছাড়া 'গতরের' অর্থাৎ পরিশ্রমের ক্ষমতার একটা কদর আছে।''[২৯৪] মানুষের জীবন পরিক্রমায় এইরকম রীতি-নীতির প্রচলন কেবল আঞ্চলিক জীবনপটেই সম্ভব; তথাকথিত সভ্যসমাজ এসব অনুমোদন করে না।

এই উপন্যাসের কাহার সম্প্রদায়ের মানুষেরা হিন্দুধর্মেরই উপাসক। তবে তাদের ধর্মাচরণের রীতি-নীতি বা নিয়ম-কানুন মূলস্রোতের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মেলে না। এদের ধর্মসংক্রান্ত উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা বলতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''নবান্নে এবার হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাঁদিতে খুব ধুম গিয়েছে। নবান্নে তাদের ধুম চিরকালের। সদ্‌জাতের অনেক ধুমধাম, এক পুজোর পর আর এক পুজো, তাতে কাহারেরা আনন্দ করে, পূজাস্থানে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তাদের নিজের ঘরে সে ধূমের দেবতার চরণের ছাপ পড়ে না। ওদের ধুম গাজন, ধরম পূজো, আমূতি অর্থাৎ অম্বুবাচী, মা বিষহরির পূজো, ভাদ্র মাসে ভাঁজো পরব, অগ্রহায়ণে নবান্ন, পৌষে লক্ষ্মী। মোটমাট সাতটা পরব। এ ছাড়া ষষ্ঠী আছে, মঙ্গলচন্ডী আছে, — সে শুধু মেয়েদের বেরতো, তাও তাদের করতে হয় ওই সদ্‌জাতের মা-লক্ষ্মীদের বেরতো-স্থানের 'পাটা আঙনে' অর্থাৎ পাট-অঙ্গনের এক প্রান্তে ব'সে। নবান্নই ওদের বড় পরব। নতুন ধান কেটে লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার পূজা করে, কালারুদ্দু বাবাঠাকুরের ভোগ দিয়ে নতুন অন্নের পাঁচ 'দব্য প্রস্তুত' ক'রে আনন্দ ক'রে খাওয়ায়।''[২৯৫] তবে এই অন্ত্যজ মানুষগুলির জীবনে সর্বাধিক প্রভাব ফেলে কত্তাবাবা 'কালারুদ্দুর'। ভয়ে-ভক্তিতে কাহার পাড়ার সকলে এই দেবতাকে মানে। তাই করালীর দ্বারা একটি বিশালাকায় চন্দ্রবোড়া সাপ পুড়ে মরলে সকলে সেটিকে বাবা কালারুদ্দুরের বাহন বলে মনে করে এবং আতঙ্কিত হয়। এরপর কাহার পাড়ায় যত বাধা বিঘ্ন নেমে এসেছে, তার পেছনে এই ঘটনাটির যোগ আছে বলে সকলে মনে করেছে। এর কোপ থেকে বাঁচতেই খুব ধুমধাম করে কত্তাবাবা কালারুদ্দুরের অকালে পূজার আয়োজন করা হয় — ''বাবাঠাকুর-তলায় ভোরবেলার 'ঝুঁজকি' ডাকতে অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই ঢাকী

ভোরের বাজনা তুমুল বাজাতে শুরু করলে। রবিবার অমাবস্যা — ক্ষণ মিলেছে ভাল, বাবাঠাকুরের পূজো হবে। ফুলে বেলপাতায়, তেলে সিঁদুরে, ধূপে প্রদীপে, আতপে চিনিতে দুধে রম্ভায়, মদে মাংসে, কাপড়ে দক্ষিণায় — সমারোহ ক'রে পুজো।''[২৯৬] এই পূজায় কাহারপাড়ার সবাই খুব ধুমধাম করে। কেউ পাঁঠা, কেউ ভেড়া, আবার কেউ কেউ হাঁস মানত হিসেবে বলি দেয়। মদ-মাংস সহযোগে খুব ধুমধাম করেই কত্তাবাবা কালারুদ্দুরের এই অকাল পূজা হয়। এই কত্তাবাবা আসলে দেবাদিদেব মহাদেবেরই আঞ্চলিকরূপ, যার উপাসনা পদ্ধতি কাহারেরা নিজেদের মত করে নিয়েছে। কত্তাবাবা কালারুদ্দুরের বাৎসরিক পূজা হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কের গাজনের সময়। এইসময়েও খুব ধুমধাম হয় — ''বড় বড় ঢাকের পিঠে কাক-চিল-বক পক্ষীর পালক দিয়ে সাজানো ফুল্কো ডাঁটির মাথায় চামরের চুল বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচে। কাঁশী বাজে, শিঙা বাজে, ধূপের ধোঁয়ায় মৌ-মৌ করে বাবা কালারুদ্দুর থান, 'পাটাগানে' অর্থাৎ পাট-অঙ্গনে ভক্তরা নাচে — হাতে বেতের দণ্ড, গলায় 'উতুরী' অর্থাৎ উত্তরীয়, পরণে গেরুয়া কাপড়, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গঙ্গামাটির 'তিপুন্ডক', রুখু চুল, উপবাসে শুকনো মুখ, তবু বাবার মহিমায় ধেই-ধেই ক'রে নাচে। . . . চৈত্র-সংক্রান্তি শেষ হয়ে গেল। বছরের শেষ রাতটি 'পেভাত' অর্থাৎ প্রভাত হ'ল, গোটা রাতটি নাচলে কালারুদ্দের ভক্তরা। শিবো হে, কালারুদ্দুর হে, বম্ বম্ বম্ — বম্-ববম্ বম্-ববম্ বম্। চড়কের পাটা পাক দিয়ে 'চক্কর' অর্থাৎ চক্রের মত ঘুরল বন-বন ক'রে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে-বনে আদ্যিকালের অন্ধকার 'চ'কে চ'কে অর্থাৎ চমকে চমকে উঠল।''[২৯৭]

এই উপন্যাসে কাহারদের এরূপ ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি তাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত নানা বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার, লোককথা, লোকাচারের বিবরণও আছে। ভূত-প্রেত সম্পর্কিত সংস্কার কাহারদের রক্তের মধ্যে থাকে — ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় দিন গেলে যে রাত্রি নেমে আসে, তার সঙ্গে জাঙ্গল-চন্দনপুরের রাত্রির অনেক তফাৎ। বাঁশবন জোগান দেয় তার তলায় লুকিয়ে-থাকা আদ্যিকালের অন্ধকার রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে। তার মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, হরেক রকম পোকা ডাকে, তক্ষক ডাকে টক্-টক্ টক্-টক্ শব্দ করে, প্যাঁচা ডাকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে, আবার গভীর রাত্রে

ডাকে হুম হুম পাখি। বাঁশবনে পাতা উড়িয়ে নেচে বেড়ায় 'বা-বাউলী' অর্থাৎ অপদেবতা। নদীর ধারে 'দপদপিয়ে' অর্থাৎ দপদপ ক'রে জ্বলে বেড়ায় 'পেত্যা' অর্থাৎ আলেয়া। মধ্যে মধ্যে শাঁখচুন্নির চিলের মত ডাক শোনা যায় শ্যাওড়া-শিমুলের মাথা থেকে। বাঁশবনে ক্যাঁ-ক্যাক ক্যাঁ-ক্যাক ডাক ওঠে, কাহারেরা মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পায় — গেছো পেত্নী কি কোন ছোকরা ভূত বাঁশের ডগাটা একবার মাটিতে ঠেকাচ্ছে, আবার ছেড়ে দিচ্ছে — সেটা উঠে যাচ্ছে সোজা উপরে।''[২৯৮] কালোশশীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর কাহারদের জীবনে তার প্রেতযোনি সংক্রান্ত সংস্কারের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথার কালো বউয়ের প্রেতযোনি তো অলীক নয়। পিতিপুরুষের কথার মধ্যে আছে ওরা আছে, তারা চোখে দেখছে। ঘরের কোণে, বাঁশবনের তলায়, হাঁসুলী বাঁকের মাঠে, জলার পাশে — কেউ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ কাঁদে, কেউ গান করে, কেউ ঘরের চালে ব'সে পা ঝুলিয়ে দেয়, কেউ মাঠে আগুন লুফে খেলা ক'রে ছুটে বেড়ায়, কেউ জলে জলে পদক্ষেপের শব্দ তুলে ঘুরে বেড়ায়, কেউ মাঠে মাঠে আগুন লুফে খেলা ক'রে ছুটে বেড়ায়, কেউ জলে জলে পদক্ষেপের শব্দ তুলে ঘুরে বেড়ায়। এ ছাড়া আছে 'ভুলো', সে দিক ভুলিয়ে নিয়ে যায় বিপথে — অপমৃত্যুর সম্ভাবনার দিকে। . . . হাঁসুলী বাঁকের অলৌকিক জগতের পরিধি বহু বিস্তৃত — আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত, প্রেতলোক থেকে নরলোক পর্যন্ত।''[২৯৯] কাহারদের জীবন পরিক্রমায় অপদেবতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় — ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় মানুষের দৃষ্টিতে কত অপদেবতা দেখা দেয়, বর্ষার আকাশে 'হাতী নামা' ধরা পড়ে, কোপাইয়ের বন্যায় বড় মশাল জ্বালিয়ে যক্ষের নৌকা আসা দেখতে পায়।''[৩০০] সুতরাং দেখা যাচ্ছে আঞ্চলিক উপন্যাসের রীতি মেনে এই উপন্যাসে আঞ্চলিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার, লোককথা, লোকরুচির মত সমস্ত প্রসঙ্গই এসেছে।

এই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির সামগ্রিক জীবনের পরিচয় প্রদানের জন্য সেখানকার কাহার সম্প্রদায়ের মানুষদের খাদ্যাভ্যাস-খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান প্রভৃতির উল্লেখও ঔপন্যাসিক করেছেন। এই অন্ত্যজ শ্রেণির গরীব মানুষগুলি মূল ভূখণ্ডের সাধারণ নিম্ন শ্রেণির মানুষজনের মত খাদ্যরীতিই অনুসরণ করে। তবে

মদ-মাংসকে এরা জীবনের অপরিহার্য উপাদান বলে গ্রহণ করে। মাঝে মাঝে এরা বুনো শুয়োর শিকারেও উদ্যোগী হয় — ''বুনো শুয়োর মারবার আশ্চর্য কৌশল ওদের।''[৩০১] পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও এদের মূল জনসমাজের অন্ত্যজ মানুষদের থেকে খুব একটা পৃথক করা যায় না। 'টিন আর বাঁশের ছেঁচা বেড়া' দিয়ে কাহারেরা নিজেদের বাড়ি তৈরি করে। কাহারপাড়ায় করালী প্রথম মাটির দেওয়ালের বাড়ি দিতে উদ্যোগী হয়। এভাবে এই উপন্যাসে কাহারদের খাদ্যরুচি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থানের বিবরণেও আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ এসেছে।

এই উপন্যাসটি প্রথম পুরুষ কথন রীতি বা সর্বজ্ঞ রীতিতে রচিত। এর বর্ণনার ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক চলিত গদ্যরীতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু চরিত্রদের সংলাপের ভাষায় তিনি বাংলা রাঢ়ী উপভাষার কথ্যরীতিকে গ্রহণ করে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। উপন্যাসটির ভাষাপ্রয়োগ সম্পর্কে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''মহৎ ঔপন্যাসিকের মতই তারাশঙ্কর দেশজ বাগ্‌রীতির উপর তাঁর আশ্চর্য অধিকারকে শুধু সপ্রমাণ করেননি, তাকে শিল্পশুদ্ধ করে তুলেছেন।''[৩০২] এই ভাষারীতি সম্পর্কে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য হল — ''উপন্যাসের সংলাপ ও মন্তব্য বিশ্লেষণে বীরভূম জেলার কোপাই তীরবর্তী আদিম নরগোষ্ঠীর বাগ্‌রীতির চমৎকার ও অব্যভিচারী প্রয়োগ হয়েছে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য়। এই ভাষা বাংলা ভাষারই একটি আঞ্চলিক প্রতিরূপ।''[৩০৩] সত্যি সত্যিই তারাশঙ্করের এই ভাষারীতি দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। কিছু দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয় — ''এবা খ্যানত হ'লে আগে তোমার ঐ চৌধুরী বাড়িতেই হবে'', (পৃঃ ১১) ''ইবার যে পুজোটি গেল মুরুব্বি, তার পাঁঠাটি খুঁতো ছিল'', (পৃঃ ১১) ''বস্ বস্ হারামজাদা, তু বস্'' (পৃঃ ১৫), ''আজ্ঞে উ একটা হয়ে গেল আর কি'', (পৃঃ ২৯) ''অ্যাল-লাইনে কুলী-গ্যাঙে কাজ করি'', (পৃঃ ৪১), ''পিত্তিপুরুষদের ভিটে থাকল 'মন্তরায়', এই ভাগ্যি'', (পৃঃ ৫৫), ''কাঠ-ভুঁই দু পুসুরি খোল দিয়েছে, 'সালপেট আলুমিনি' দিয়েছে'' (পৃঃ ৬৬), ''তোমার বাহন মারার পিতিবিধেন হল না বাবা'', (পৃঃ ৮১), ''আমি কি অল্যায় কি বললাম'', (পৃঃ ৯৩) ''লয়ানের আমি সাঙা দিয়ে দোব বাসিনী বউ'', (পৃঃ ৯৫), ''আমার আউশের ভুঁইখানা ছামনেই, দিই কেটে

ঢুকিয়া, ই একেবারে জমির সালসা'', (পৃঃ ১০০) ''এ যে 'রিন্দভোবন' ক'রে ফেলালছে করালী'', (পৃঃ ১১০) ''লারায়নের যেমন লারদ'', (পৃঃ ১১৪) ''বসন আমার প্যাটের বিটি'', (পৃঃ ১৩৩) '' — হে — ঝড় — ঝড়! ব্যানোকাকা! পেলয় ঝড়!'', (পৃঃ ১৪৮) ''নামোতে আন্না হবে, হাঁড়িকুড়ি থাকবে'', (পৃঃ ১৫৭), ''দূর কর্, ছামনে থেকে দূর কর্ — '' (পৃঃ ১৭২), ''পে — ল — য় ঝড় আসছে, 'সাকোলন' 'সাইকোলন'' (পৃঃ ২৫৭) ইত্যাদি মত অসংখ্য সংলাপে হাঁসুলী বাঁকের একান্ত আঞ্চলিক কথ্য ভাষার রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

উপন্যাসের গানগুলির বিষয়বস্তুতে সেই অঞ্চলটির মানুষগুলির জীবনের সঙ্গে যুক্ত নানা বিষয় স্থান পেয়েছে, তেমনি এগুলির ভাষাভঙ্গিতেও সেখানকার আঞ্চলিকতা রক্ষিত হয়েছে। নিচে এই উপন্যাসে ব্যবহৃত কিছু গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল —

১। ''তাই ঘুনাঘুন — বাজলো নাগরী
ননদিনীর শাসনে, — চরনের নূপুর থামিতে চায় না।
ঘরে থাকিতে মনো চায় না। ও তাই — তাই ঘুনাঘুন।''[৩০৪]

২। ''হায় কলিকালে কতই দেখালে —
দেবতার বাহন পুড়ে ম'ল অকালে, তাও মারলে রাখালে।. . .''[৩০৫]

৩। ''চোখের জলে লরম হল মাটি—
সেই মাটিতে কুড়িয়ে পেলাম হারানো পিরিত।''[৩০৬]

৪। ''মন হারিয়ে গিয়েছিলাম কোপাই নদীর তীরে হে—
কে পেয়েছে, ও সইয়েরা, দাও আমায় ফিরে হে!''[৩০৭]

৫। ''ও সায়েব আস্তা বাঁধালে!
হায় কলিকালে!
কালে কালে সায়েব এতে আস্তা বাঁধালে — ''[৩০৮]

৬। ''জাতি যায় ধরম যায় মেলোচ্ছ কারখানা
ও-পথে যেয়ো না বাবা, কত্তাবাবার মানা।''[৩০৯]

৭। ''আমার মনের অঙের ছটা
তোমার ছিটে দিলা না—
পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হে —
সে জল পাতা নিলা না—. . .''[৩১০]

৮। ''হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী, যাই বলিহারি—
বাঁধিল নতুন ঘর দক্ষিণ-দুয়ারী।. . .''[৩১১]

৯। ''চৈতে মথর মথর, বৈশাখে ঝড় পাথর
জষ্ঠিতে মাটি ফাটে, তবে জেনো বর্ষা বটে।''[৩১২]

১০। ''যে অঙ আমার ভেসে গেল
কোপাই নদীর জলে হে!
সে অঙ আমার ভেসে গেল
কোপাই নদীর জলে হে!. . .''[৩১৩]

এসব লক্ষণের কারণেই 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে উপন্যাসটির শ্রেণি নির্ণয় করতে বসে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপধ্যায় বলেছেন —

''হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' গভীর সাঙ্কেতিক তাৎপর্যমণ্ডিত ও মহাকাব্যের সংঘাতধর্মী উপন্যাস।''[৩১৪] অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মত অবশ্যই স্বীকার্য। সত্যি সত্যিই কাহার সম্প্রদায়ের সামগ্রিক জীবনকথা নিয়ে লেখা এই উপন্যাসটিতে সাঙ্কেতিকতার মাধ্যমে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি এসেছে। তবে এটাও কেউ অস্বীকার করবেন না যে, এই মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি তৈরিই হয়েছে কোপাই নদের তীরবর্তী হাঁসুলী বাঁক অঞ্চলটির সামগ্রিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। এই হাঁসুলী বাঁক তো অবশ্যই মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল। উপন্যাসটিতে এখানকার ভূ-প্রকৃতি থেকে শুরু করে তার অধিবাসীদের সামগ্রিক জীবনচর্যার কথাই পরিবেশিত হয়েছে। এদিকে লক্ষ রেখেই সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''আঞ্চলিক পটভূমির অনুপুঙ্ক্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান, ভূমিব্যবস্থার এবং গ্রামীণ আর্থনীতিক প্যাটার্নের সঠিক চিত্র অঙ্কন ইত্যাদি এই উপন্যাসের সার্বিক পরিবেশকে জমাট করে তুলেছে। তা এত জমাট যে, এই উপন্যাসের কোনোটি থেকে কোনোটিকে পৃথক করা যায় না।''[৩১৫] অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে — ''গোটা মানুষ, সজীব প্রকৃতি আর সমাজ-পরিবর্তনের খরস্রোত চিত্রণে তারাশংকরের অসাধারণ নৈপুণ্য তাঁকে তাঁর কালের ক্রনিক্লার করে তুলেছে। . . . এই বক্তব্য পুনর্বার সমর্থিত হয় তাঁর পরবর্তী বড় উপন্যাস 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য়। উপন্যাসের নাম 'উপকথা'। সন্দেহ নেই, টেল-ধর্মী কাহিনীতে এক নরগোষ্ঠীর আদিম বিশ্বাস সংস্কার ধর্মভাবনা অনুস্যূত হয়ে আছে। সন্দেহ নেই, এই উপন্যাস আঞ্চলিক উপন্যাস বলে চিহ্নিত।''[৩১৬] অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় শুধু এখানেই থেমে থাকেন নি, তিনি তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটিকে সরাসরি আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন — ''আঞ্চলিক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় (১৯৪৭) মানুষ ও প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী যোগ সাধিত হয়েছে; ভৌগোলিক সত্তা এখানে পটভূমি নয়, স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে দেখা দিয়েছে; প্রকৃতি এখানে কাহিনী-দিগ্বলয়কে বেষ্টন করে ক্ষান্ত হয় নি, কাহিনীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। প্রকৃতির পরিবেশ বদ্ধমূল অ-প্রাকৃত সংস্কার, যুগযুগ প্রচলিত কিংবদন্তী, লোকশ্রুতি ও পুরাণকাহিনী উপন্যাসটিকে এক অনন্য মর্যাদা দিয়েছে। অন্ত্যজ কাহারগোষ্ঠীর লৌকিক ও অ-

প্রাকৃত সংস্কার ও বিশ্বাস এবং ময়ূরাক্ষীর বেড়ে অবস্থিত কোপাইদহ বেষ্টিত বাঁশবাদি গ্রাম এই নরগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সর্বোপরি এক রহস্যময় জীবনবোধের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার হয়েছে এই উপন্যাসে। আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে এ গ্রন্থ সার্থক।''[৩১৭] এজন্য বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে বসলে সবার উপরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসকেই স্থান দিতে হয়। একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের সমস্ত গুণ এই উপন্যাসটিতে আছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর তথা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস **'ঢোঁড়াই চরিত মানস'**। দুই চরণে রচিত এই উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনা শুরুর পূর্বে একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, এর প্রথম চরণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় চরণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বিশ শতকের দুই অর্ধে এই উপন্যাসের দু'টি চরণ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু চরণ দু'টি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত এবং এদের কোনোভাবেই আলাদা করা সম্ভব নয়, তাই বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা উপন্যাসের আলোচনা অংশেই সমগ্র 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটিকে অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হতে হল।

এই উপন্যাসটি যে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত। তাই দেখা যায় যে, যাঁরাই এই উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরাই এই এর উচ্চকিত প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি সমালোচকরা এর স্রষ্টা সতীনাথেরও প্রশংসা করতে ভোলেন নি। এদের মধ্যে সবার আগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার আচার্য সুকুমার সেনের কথা উল্লেখ করতে হয়। তিনি এ সংক্রান্ত আলোচনায় লিখেছেন — '' . . . 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' (দুইখণ্ড ১৯৪৯, ১৯৫১) ও অন্যান্য উপন্যাস ও গল্পে সতীনাথ নিজস্ব চিন্তার, সহানুভূতির ও কল্পনার সমুজ্জ্বল পরিচয় দিয়াছেন।''[৩১৮] অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। তবে খুব সংক্ষেপে উপন্যাসটি সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তাতে এই উপন্যাসটিকে পৃথক কোনো শ্রেণীর মধ্যে না ফেললেও বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' এবং প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক'-এর সঙ্গে এই উপন্যাসটিকেও 'উচ্চাঙ্গের উপন্যাস' বলে মন্তব্য করেছেন — ''কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ফেলা যায় না এমন কয়েকখানি

উচ্চাঙ্গের উপন্যাস সাম্প্রতিককালে রচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিমল মিত্রের 'সাহেব-বিবি-গোলাম', প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক' ও সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'।''[৩১৯] সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন — ''অবশ্যই 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৪৯) সতীনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।''[৩২০] অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন — ''ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ীর শক্তিমত্তার সার্থক পরিচয়স্থল দু খণ্ডে প্রকাশিত 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (প্রথম চরণ বা খণ্ড, বৈশাখ ১৩৫৬, দ্বিতীয় চরণ ১৩৫৮)। বিহারের গ্রামজীবনের অন্তরঙ্গ ছবি এই উপন্যাস।''[৩২১] আধুনিক সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের মতে — '' . . . যদি বলি ঢোঁড়াই চরিত মানস সতীনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, তাহলে হয়তো খুব একটা মতান্তর হবে না। অন্তত একথা আমরা সহজেই বলতে পারি যে এমন সার্থক বিস্তারধর্মী উপন্যাস, এমন এপিক লক্ষণাক্রান্ত — বলা বাহুল্য, একালের এপিক — বাংলা সাহিত্যে খুবই দুর্লভ।''[৩২২] আবার অলোক রায়ের মতে — ''বাংলা দশটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে ঢোঁড়াই চরিত মানসের স্থান সুনিশ্চিত।''[৩২৩] এদিকে অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ তাঁর 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' গ্রন্থে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটির শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি এর বিষয়বস্তু সম্পর্কেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। উপন্যাসটির পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন — ''বিহারের শহর জিরানিয়া, তার থেকে কিছু দূরে তাৎমাটুলি। তাৎমাদের বৃত্তি ঘরামি আর কুয়োর বালি ছাঁকা। তারা জাতে তাঁতি। তার পাশেই ধাঙড়টুলি। এই পরিবেশে পিতৃহীন, মাতৃ পরিত্যক্ত ঢোঁড়াই বড় হয়। এই তাৎমা ঢোঁড়াইকে লেখক গড়ে তুলেছেন রামচন্দ্রের নতুন সংস্করণ করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষপর্ব এর কাল-পরিধি। সমাজের নিম্নতর স্তরে রাজনৈতিক চেতনা কীভাবে প্রবেশ করে বদলে দেয় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবর্তিত করে এক ঢোঁড়াইকে 'রামায়ণজী'তে, তার এক অসাধারণ আখ্যান এই গ্রন্থ। এই কাহিনীতে অন্তর্লীন হয়ে আছে তুলসীদাসের রামচরিতমানস। রাজনীতি ও সমাজ পরিবর্তন এবং রামচরিতমানসের সঙ্গে আধুনিক কাহিনীর অন্তর্বয়ন এই তিনদিক থেকে এই আখ্যান বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির

অন্যতম।''[৩২৪] আর এর স্রষ্টা সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য — ''তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস ঢোঁড়াইচরিত মানস (১ম খণ্ড ১৯৪৯, ২য় খণ্ড ১৯৫১) সতীনাথের শ্রেষ্ঠরচনা হিসেবে সমালোচক মহলে বন্দিত। তুলসীদাসের রামচরিতমানস এই উপন্যাসের অন্তর্লীন গঠন। পূর্ববিহারের সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, এক সাধারণ মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়ে নায়ক হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত এই মহাকাব্যের মতো বিস্তৃত ও জটিল উপন্যাসটিকে এক অসামান্য মহিমা দিয়েছে।''[৩২৫]

সতীনাথ ভাদুড়ী এবং তাঁর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' সম্পর্কে পণ্ডিত-সমালোচকের এসব আলোচনায় উপন্যাসটির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সম্পর্কে এর নানা গুণের কথা উঠে আসে। তবে এসব গুণাবলীর মধ্যে অবশ্যই এর আঞ্চলিক সীমা-সংহতির কথাটিও পড়ে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য অলোক রায়ের 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থের 'আঞ্চলিক উপন্যাস' অংশে এই উপন্যাসটি সম্পর্কে বলা হয়েছে — ''সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'ও একখানি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস। বিহারের তাৎমাটুলির শিক্ষা-দীক্ষাহীন সরল গ্রাম-জীবনের ছবি এখানে অঙ্কিত। বিহারের এই অঞ্চল তার সকল বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ে ঢোঁড়াই-এর চরিত্রকে গড়ে তুলেছে। অন্যান্য চরিত্রেও অঞ্চলের প্রভাব সর্বত্র।''[৩২৬] যাই হোক, 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর আঞ্চলিকতার দিকগুলি অনুসন্ধানের পূর্বে উপন্যাসটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা দরকার।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ থেকে ২৬শে ভাদ্র পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রথম চরণ বের হয়। তখন এর নাম ছিল 'সটিক ঢোঁড়াই চরিত মানস'। এর দ্বিতীয় চরণও সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় বের হয় — সময়কাল ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ থেকে ৩০শে ভাদ্র। ঔপন্যাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর তৃতীয় চরণও বের করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু প্রথম দু'টি চরণের সাফল্য প্রত্যাশিত পথে না যাওয়ায় তিনি আর সে পথে হাঁটেন নি। রসজ্ঞ পাঠক ও সমালোচকের দৃষ্টিতে উপন্যাসটি সতীনাথ ভাদুড়ীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে বিবেচিত হলেও বৃহত্তর পাঠক সমাজে এটি তেমন প্রভাব ফেলতে পারে নি —

জনপ্রিয়তার দিক থেকে ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ তার পূর্বে প্রকাশিত সতীনাথের অপর উপন্যাস ‘জাগরী’র ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারে নি। অথচ ঔপন্যাসিক নিজে এই উপন্যাসটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে মনে করতেন। সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি এই উপন্যাসটির জন্যেই সতীনাথকে ‘লেখকের লেখক’ বলে অভিহিত করেছেন। আসলে ঔপন্যাসিকের জীবনের বেশির ভাগ সময় বর্তমান বিহারের পূর্ণিয়ায় কেটেছে। জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার পর তিনি খুব কাছে থেকে সে অঞ্চলের গ্রামগুলি এবং সেখানকার জীবনচর্যাকে দেখেছিলেন। উপন্যাসটি লেখার সময় সে সবকেই অত্যন্ত জীবন্তভাবে তুলে এনেছেন। তবে এই উপন্যাসের ভিতর তিনি এতদিন বাঙালি পাঠকের কাছে যে অপরিজ্ঞাত অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষের অপরিচিত নামধাম সহ জীবনযাত্রা, প্রকৃতি, বিশ্বাস-সংস্কার, ফুটনোটসহ আঞ্চলিক হিন্দুস্থানি উপভাষার রূপ চিত্রণ করেছেন সে সবের সঙ্গে এই পাঠকসমাজ সম্পৃক্ত হতে পারে নি। এজন্য অনেকের কাছেই ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ দুরূহ উপন্যাস থেকে গেছে। তবে বাংলা সাহিত্যের এটা সৌভাগ্য যে, সতীনাথ নিছক জনপ্রিয়তার কথা না ভেবে একনিষ্ঠভাবে একজন প্রকৃত শিল্পীর কর্ম করে গেছেন। ফলে বাংলা সাহিত্য এইরকম একটি বিশিষ্ট আঞ্চলিক লক্ষণযুক্ত মানুষের জীবনকথা দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। এজন্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ শতকের মাঝামাঝি রচিত আঞ্চলিক জীবন নির্ভর উপন্যাসগুলির সারণীতে ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ উপন্যাসটিকে রেখে মন্তব্য করেছেন — ‘‘আঞ্চলিক জীবন এবং প্রায়ই অন্ত্যজ জীবন অথবা পরিচিত শ্রমজীবীজীবনকে অবলম্বন করে নবীন লেখকদের হাতে যে ক’টি উপন্যাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে আলোচনার যোগ্য বা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস তিনটি — সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’, ‘অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ এবং সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’।’’[৩২৭]

বিহারের গ্রামাঞ্চলে আজকের দিনেও তুলসীদাসের ‘রামচরিত মানস’ অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসটি ‘রামচরিত মানস’-এর আদলেই রচনা করেছেন। রামায়ণে যেমন ‘আদিকাণ্ড’, ‘বালকাণ্ড’, ‘অযোধ্যাকাণ্ড’, ‘অরণ্যকাণ্ড’ প্রভৃতি বিভাগ আছে, তেমনি এই উপন্যাসেও ‘আদিকাণ্ড’, ‘বাল্যকাণ্ড’, ‘পঞ্চায়েত কাণ্ড’, ‘রামিয়া কাণ্ড’, ‘সাগিয়া কাণ্ড’ ‘লঙ্কা

কাণ্ড' প্রভৃতি বিভাগ আছে। আবার প্রতিটি কাণ্ডের অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের নামকরণেও রামায়ণের প্রভাব আছে। যেমন 'জিরানিয়ার বিবরণ', 'তাৎমাটুলির কাহিনী' 'ধাঙড়টুলির বৃত্তান্ত', 'বৌকা বাওয়ার আদিকথা', 'ঢোঁড়াইয়ের জন্ম', 'বস্ত্রলাভের উপাখ্যান' 'গুরু–শিস্য সংবাদ', 'গানহী বাওয়ার বার্তা', 'গানহী বাওয়ার আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য বর্ণন', 'তাৎমা ধাঙড় সংবাদ', 'তাৎমানীদের 'ধানকাটনী'র রাজ্যে যাত্রা' প্রভৃতি। উপন্যাসের নায়ক ঢোঁড়াইকে ঔপন্যাসিক অন্ত্যজ শ্রেণীর কাছে রামায়ণ কাহিনির শ্রীরামচন্দ্রের আধুনিক বিকল্প হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। আর তা করতে গিয়ে উপন্যাসটি জিরানিয়ার তাৎমাটুলিতে ঢোঁড়াইয়ের জন্মকথা থেকে শুরু করে পিতৃহীন অবস্থায় মা কর্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থায় বৌকা বাওয়ার আশ্রয়ে বেড়ে উঠে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত গানহী বাওয়ার (গান্ধীজী) আদর্শে দেশ সেবার আত্মনিয়োগ করার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।

উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে বিহারের মফঃস্বল শহর জিরানিয়া থেকে মাইল চারেক দূরের তাৎমাটুলিতে। এই তাৎমাটুলিতে তাৎমারা বাস করে। এরা জাতিতে তাঁতি; কুয়োর বালি ছাঁকা এবং ঘরামির কাজ হল এদের প্রধান জীবিকা। তাৎমাটুলির পাশেই বড় রাস্তার ওপারে ধাঙড়টুলিতে থাকে ওঁরাও গোষ্ঠীর ধাঙড়েরা। সাহেব বাড়িতে মালি কিংবা মজুরের কাজ হল এদের প্রধান জীবিকা। এদের মধ্যে অনেকেই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাৎমারা ধর্মে হিন্দু। এই দুই পাড়ার তাৎমা ও ধাঙড়দের মধ্যে বিরোধ চিরকালের। তাৎমারা স্নান করে না বলে ধাঙড়রা তাদের 'নোংরা জানোয়ার' বলে, আর ধাঙড়দের তাৎমারা 'বুড়বক কিরিস্তান' বলে গালাগালি করে। এই তাৎমাটুলির সন্তান ঢোঁড়াই। মাত্র দেড় বছর বয়সে তার বাবা মারা গেলে, মা বুধনী তাৎমাদের রীতি মেনে আবার বিয়ে করে। ফলে ছোট্ট ঢোঁড়াইয়ের আশ্রয় হয় গ্রামের পূজারী বৌকা বাওয়ার কাছে এবং সে তার ভিক্ষান্নে বড় হয়। একসময় সে রামিয়াকে ভালোবেসে বিয়ে করলেও সে বিয়ে টেকে না। ঘটনাক্রমে ঢোঁড়াই গ্রাম ত্যাগ করে 'পাক্কী' ধরে বিসকিন্ধার কোয়েরী টোলায় এসে হাজির হয়। এখানে এসে সে স্বামীহারা মমতাময়ী যুবতী সাগিয়াকে ভালোবেসে ফেলে। এক সময় কোয়েরীদের সঙ্গে রাজপুতদের বিরোধ বাঁধলে সে কোয়েরীদের নেতা হয়ে ওঠে। ক্রমে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে রাজনৈতিক জীবনে দীক্ষিত হয়ে ঢোঁড়াই

ক্রান্তিদলে যোগ দিয়ে 'রামায়ণজী' নাম নেয়। এ সময় পলাতক ফেরারি জীবন কাটাতে গিয়ে ফিরিঙ্গি ছেলে এ্যান্টনীকে দেখে তাকে নিজের পুত্র ভেবে বসে তার প্রতি পুত্রস্নেহ অনুভব করে। অবশ্য তাৎমাটুলিতে পুনরায় ফিরে এলে ঢোঁড়াইয়ের ভুল ভাঙে। এরপর নিরালম্ব শূন্যজীবনে সে পুলিশের কাছে সারেন্ডার করার জন্য রওনা দেয়। এবারে সাগিয়ার সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়া তার উদ্দেশ্য ছিল। এভাবেই সমগ্র উপন্যাসে ঢোঁড়াইয়ের জীবন পরিক্রমাকে তুলে ধরা হয়েছে। দরিদ্র, উপেক্ষিত, পিছিয়ে থাকা, কু-সংস্কারগ্রস্ত একটি মানব-সমাজের জাগরণ পরিবেশিত হয়েছে ঢোঁড়াইয়ের আত্মোপলব্ধি সংক্রান্ত এই উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে।

ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের দু'টি চরণেরই পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন মূল ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিকে থেকে স্বতন্ত্র তথা বিচ্ছিন্ন একটি অঞ্চলকে। উপন্যাসে অঞ্চলটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে বিহারের জিরানিয়া নামে (সম্ভবত সতীনাথের আবাসস্থল বিহারের পূর্ণিয়া এখানে জিরানিয়া নাম গ্রহণ করেছে)। উপন্যাসটির শুরুতেই তিনি জিরানিয়ার স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়ে লিখেছেন — ''অযোধ্যাজী নয়, এখনকার জিরানিয়া। রামচরিতমানসে এর নাম লেখা আছে 'জীর্ণারণ্য'। . . . তখনও যা ছিল এখনও প্রায় তাই। বালিয়াড়ি জমির উপর ছেঁড়া ছেঁড়া কুলের জঙ্গল। রেল-গাড়ি ইস্টিশানে পৌঁছবার আগেই ঘুমন্ত যাত্রীদের ঠেলে তুলে দিয়ে লোকে বলে 'জঙ্গল আ গেয়া, জিরানিয়া আ গেয়া' (জঙ্গল এসে গিয়েছে, জিরানিয়া এসে গিয়েছে)।

তাৎমাটুলির লোকেরা একেই বলে 'টৌন' (টাউন)। যেমন-তেমন হেঁজিপেঁজি শহর নয় — 'ভারী সাহার', পীরগঞ্জ থেকেও বড়, বিসারিয়া থেকেও বড়।''[৩২৮]

তবে উপন্যাসটিতে শহর জিরানিয়ার কথা উঠে আসে নি; জিরানিয়া থেকে মাইল চারেক দূরের শহরতলি তাৎমাদের বাসভূমি তাৎমাটুলি হল উপন্যাসের ঘটনাস্থল — ''এ হেন শহরের শহরতলি, তাৎমাটুলি; শহর যখন, তার শহরতলি থাকবে না কেন? জিরানিয়া আর তাৎমাটুলির মধ্যে আর কোনো গাঁ নেই। সেইজন্যই তাৎমাটুলিকে বলছি শহরতলি। শহর থেকে মাইল চারেক দূরে হবে; তাৎমারা বলে 'কোশভর'। তাৎমাটুলির পশ্চিমে শিমূলগাছ-ভরা বকরহাট্টার মাঠ, তারপর ধাঙড়টুলি। দক্ষিণ ঘেঁষে গিয়েছে কোশী-শিলিগুড়ি রোড। তাৎমাটুলির লোকেরা এই

রাস্তাকে বলে 'পাক্কী'।''[৩২৯] উপন্যাসটির নানা স্থলে এই তাৎমাটুলি ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত অঞ্চলের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ আছে। সেই অঞ্চলের অত্যন্ত পরিচিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''এর পর বহুবার বকরহাট্টার মাঠ সবুজ হয়ে গেলে 'মরণাধারে' জল এসেছে, বহুবার কুল পাকার সময় শিমূল বনে ফুলের আগুন লেগেছে, লু বাতাসে শিমূল তুলো উড়ে যাওয়ার সময় 'পাক্কী'র ধারের নেড়া অশ্বত্থ গাছগুলো তাৎমাদের আচার খাওয়ার জন্য কচি কচি ডগা ছেড়েছে।''[৩৩০] উপন্যাসে তাৎমাদের জীবনে সেই অঞ্চলের 'ধানকাটনি'র রাজ্য এক রহস্যময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে — ''অদ্ভুত এই 'ধানকাটনী'র রাজ্য। নতুন পোয়াল আর পচা পাঁকের গন্ধে ভরা দহের ধার রোজ রাতে কুয়াশায় ঢেকে যায়। আগুনের 'ঘুর'-এর ক্ষীণ আলোয়, কারো মুখ চেনবার উপায় নেই, অথচ কাটা ধানের পাহাড়ের উপর তাদের ছায়া নড়ে। সোনার পাহাড়গুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো হাতির মতো দেখতে লাগে। ধানখেগো হাঁসগুলোর ডাক হঠাৎ ছোট ছেলের কান্না বলে ভুল হয়। খড়ের গাদার মধ্যে সর্বাঙ্গ ঢুকিয়ে রাতে ঘুমুতে হয়। জলের মধ্য দিয়ে 'পানডুব্বী' ভূত রাত দুপুরে ছপ্‌ছপ্‌ করে চলে বেড়ায় — সেই শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। দহের উপর 'রকস্‌' ভূত আলো জ্বালিয়ে হাতছানি দেয় — এই এখানে, তো পরের মুহূর্তে 'হুই-ই-ই' সাঁওতালটুলির ধারে চলে গিয়েছে। 'ঘর' এর ধারে গল্প জমে ওঠে। সব তাৎমার অভিজ্ঞতা একই রকম, — রাতে যখন সে মাঠে গিয়েছিল, তখন তাকে একটা মেয়ে ইশারা করে সঙ্গে যেতে বলে। দেখেই বোঝা গিয়েছে যে মেয়েটা 'শাঁখড়েল'। তার ডাকে সাড়া না দেওয়ায় সে ঐ পুবের শিমূল গাছটায় উঠে গেল। সকলের গা ছমছম করে।''[৩৩১] তাৎমাটুলির তাৎমারা বহির্বিশ্বের খুব একটা খবর পায় না; রাখতেও চায় না — নিজেদের অঞ্চলটিই তাদের কাছে সব। তারা সে অঞ্চলের সমস্ত নদীনালাকেই 'কোশী' বলে ডাকে। কোশী নদীকে তারা মাতৃত্বের মর্যাদা দেয় — ''জিরানিয়া জেলার পশ্চিমে যত নদীনালা সবগুলোর নামই 'কোশী'। রগচটা 'কোশীমাই' পুরুবের 'বাঙাল মুলুক' থেকে বাপের বাড়ির দিকে চলেছেন হোঁচট খেতে খেতে। চোখের জলে অজস্র নদীনালায় রেখে যাচ্ছেন তাঁর নামের, আর চলার পথের চিহ্ন। রাগটা পড়লেই তিনি আবার ফিরবেন, একথা জিরানিয়া জেলার

প্রত্যেক লোকে জানে। . . . যতদিন মা না ফিরে আসে, ততদিন এইসব মরা নদীগুলোকে তারা সাবধানে আগলে বসে থাকবে। তারপর কোশীমাই ফিরে এলে আবার সমৃদ্ধির জোয়ার আসবে এই পথে। এখন তো কেবল বর্ষাকালে মাটির হাঁড়ি বোঝাই নৌকা যায়। তখন আবার বারো মাস পাক্কীর মোটর ট্রাকগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেবে হাজার-মনী নৌকাগুলো। বিরতাহা গোলায় পাটের গাঁইট বাঁধবার পেঁচকলগুলোয় আবার রেড়ির তেল পড়বে।''[৩৩২] কোশী নদীর মতই তাদের কাছে অত্যন্ত জীবন্ত হল গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বড় রাস্তা 'পাক্কী'। এই 'পাক্কী'কে নিয়েই সেই অঞ্চলের মানুষ রোমান্টিক স্বপ্নে মশগুল হয়। 'পাক্কী'কে এরা ভালোবাসে বলেই এর দুরবস্থায় তারা কষ্ট পায়। ঔপন্যাসিক 'পাক্কী'র দুর্দশা দেখে এদের কষ্টের পরিচয় প্রদানের প্রসঙ্গে লিখেছেন — ''পাক্কী' ঢোঁড়াইয়ের কাছে একটা সজীব জিনিস। তার কোনোরকম সন্দেহ নেই যে পাক্কীটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। লোহাতে ঘুণ ধরেছে, সোনাতে মরচে পড়েছে, একি কলির শেষ হয়ে এল নাকি? বাবুসাহেব কাটিয়ে নিয়েছিল পাক্কীর ধারের অনেক আমগাছ। ফৌজের থেকে কাটিয়ে নিল সব সেগুন, শাল আর শিশুগাছগুলো। কুশী থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত পাক্কীর গাছের মৌচাকগুলো একজন বাঙালি ঠিকেদার জমা নিয়েছে। আসামে ফৌজদের জন্য মধু চালান যাবে। ফৌজি হাকিমরা পাক্কীর ধারের জমি কতদূর পর্যন্ত তাদের, তা দিয়ে মাথা ঘামায় না। তাই দুধারের মাটিকাটা গর্তগুলোতে বাবুসাহেব ধান লাগিয়েছে।''[৩৩৩] এই উপন্যাসের দুই চরণেই এমন অজস্র দৃষ্টান্ত আছে, যেগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই উপন্যাসটির পটভূমি বাঙালির সম্পূর্ণ অপরিচিত জগৎ। বাংলা সাহিত্যে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত থেকেও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন অঞ্চল নির্ভর বহু উপন্যাস লেখা হলেও 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর মত পটভূমি খুব কমই গ্রহণ করা হয়েছে। এই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটি সত্যি সত্যিই বাঙালি পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞেয় ছিল।

এই উপন্যাসের চরিত্রদের ঔপন্যাসিক উপন্যাসে গৃহীত বিহারের পূর্ণিয়ার গ্রামাঞ্চল থেকে হুবহু তুলে এনেছেন। তাদের নামগুলিও পুরোপুরি অঞ্চলটির সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন, ঢোঁড়াই, বৌকা বাওয়া, বুধনী, রেবন গুণী, ধনুয়া মাহাতো, বাবুলাল চাপরাসী, রতিয়া ছড়িদার, শনিচরা, বিরসা, শুক্রা, এতোয়ারী, গুদর মাই, সামুয়ের,

রামিয়া, ফুলঝরিয়া, সাগিয়া প্রভৃতি। উপন্যাসের চরিত্রের যে এমন নাম হতে পারে এই উপন্যাসটি প্রকাশের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে তা অজানাই ছিল। শুধু এটুকু নয়, এই উপন্যাসে সতীনাথ ভাদুড়ী 'পাক্কী'র দুই পাশের তাৎমাটুলি আর ধাঙড়টুলির দুই অন্ত্যজ পল্লীর ঝগড়া, বিবাদ, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, দৈনন্দিন জীবনের নানা লৌকিক আচরণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিহারের গ্রাম জীবনের রূপকেও জীবন্তভাবে তুলে এনেছেন। এসবের পাশাপাশি পুরো তাৎমা ও ধাঙড় সমাজও তাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখানে উঠে এসেছে। তাই উপন্যাসটির আলোচনায় অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — ''সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৪৯-৫০) উপন্যাসের নায়ক বুধনীর ছেলে ঢোঁড়াই তাৎমাটুলির তাৎমা-সম্প্রদায়ভুক্ত। ঘরামির কাজ, কুয়ো পরিষ্কার আর ধান কাটার কাজ করে তাৎমারা। লেখক কোনো রোমান্টিক আলো ফেলেন নি তাৎমা-সম্প্রদায় ও প্রতিবেশি ধাঙ্গর-সম্প্রদায়ের জীবনে। প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত, অলৌকিক বিশ্বাস-শাসিত, অন্ধ সংস্কার-চালিত তাৎমা সম্প্রদায়ের একটি পিতৃহীন মাতৃপরিত্যক্ত কিশোর কীভাবে বড় হয়ে উঠল, বাহির বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হলো, 'গানহি বাবা'র আন্দোলনে যোগ দিয়ে জীবনের বিশালতাকে উপলব্ধি করলো, তার বস্তুনিষ্ঠ আলেখ্য 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'।''[৩৩৪]
এই উপন্যাসের নায়ক হিসেবে অবশ্যই ঢোঁড়াইকে ধরতে হয়। কিন্তু এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ঢোঁড়াই-এর জীবন থেকে সেই অঞ্চলটিকে সরিয়ে নিলে তার নায়কোচিত অনেক বৈশিষ্ট্যই লোপ পায়। ঢোঁড়াই পুরোপুরি জিরানিয়ার সেই গ্রামাঞ্চলটির সন্তান, সে সেই অঞ্চলটির সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যসহ উপন্যাসে হাজির হয়েছে। তাই উপন্যাসটি থেকে জিরানিয়ার সেই পল্লী অঞ্চলটিকে কোনোভাবেই সরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

ঔপন্যাসিক এখানে তাৎমাদের জীবন জীবিকারও নানা পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাৎমাদের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন — ''বোধ হয় তাৎমারা জাতে তাঁতি। তারা যখন প্রথম আসে, তখন খালি একজনের কাছে ছিল একটা ভাঙাচোরা গোছের গামছা বোনার তাঁত। দ্বারভাঙা জেলার রোশরা গ্রামের কাছ থেকে অনেক দিন আগে এখানে এসেছিল দল বেঁধে — পেটের ধান্ধায়। না এদের কেউ কোনো দিন কাপড় বুনতে দেখেছে, না এরা স্বীকার করত যে এরা তাঁতি। এরা চাষবাস করে না,

বাসের জমি ছাড়া জমি চায় না। আর বাড়িতে একবেলার খাওয়ার সংস্থান থাকলে কাজে বেরোয় না। সেটুকুও বোধহয় জুটছিল না দ্বারভাঙা জেলায়। তাই এসে 'ধন্না' দিয়েছিল ফুকন মণ্ডলের কাছে।''[৩৩৫] তাৎমাটুলির দৈনন্দিন জীবন প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য — ''তাৎমাটুলিতে ঢুকতে হবে পালতে মাদারের ডাল থেকে মাথা বাঁচিয়ে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার বাইরের দুর্গন্ধটা ঢেকে যায় — শুকনো পাতা পোড়ার গন্ধে। খড়ের ঘরগুলো বাঁকা নড়বড়ে — দেশলাইয়ের বাক্স পায়ের তলায় চেপটে যাবার পর আবার সোজা করবার চেষ্টা করলে যেমন হয় তেমনি দেখতে। ফর্সা কাপড় পরা লোক দেখলে, এখানকার কুকুর ডাকে; কোমরে ঘুনসি বাঁধা ল্যাংটো ছেলে ভয়ে ঘরের ভিতর লুকোয়; বাঁশের মাচার উপর যে কঙ্কালসার রুগ্ন বুড়োটা ল্যাংটো হয়ে রোদ্দুরে শুয়ে থাকে, সেও উঠে বসতে চেষ্টা করে আদাব করবার জন্য। মেয়েরা কিন্তু একটু অন্যরকম। এর বাড়ির উঠোনে আর ওর বাড়ির পিছন দিয়ে তো যাওয়ার পথ। ধোঁদলের হলদে ফুলে ভরা একচালার নিচে যে মেয়েটা তামাক খাচ্ছে, সে না হুঁকোটা নামায়, না চিরকুট কাপড়কানা সামলে গায়ে দেবার চেষ্টা করে। ইদাঁরাতলার ঝগড়া সেই রকমই চলতে থাকে, কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না; তেলের বোতল হাতে কুঁজো বুড়িটা ফিক্ করে হেসে হয়ত জিজ্ঞাসাও করে ফেলতে পারে যে বাবু কোন্‌দিক যাবেন।''[৩৩৬] 'রোজা', 'রোজগার' এবং 'রামায়ণ' -- এই তিনটি বিষয় নিয়ে এই তাৎমাদের জীবন কাটে — ''তাৎমাটোলার লোকেরা বলে — রোজা, রোজগার, রামায়ণ, এই নিয়েই লোকের জীবন। অসুখে বিসুখে বিপদে আপদে এদের দরকার রোজার। রোজাকে বলে গুণী। রোজগার এদের 'ঘরামি'র কাজ আর কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ। জিরানিয়ার অধিকাংশ বাড়িরই খোলার চাল, আর প্রত্যেক বাড়িতেই আছে কুয়ো। তাই কোনো রকমে চলে যায়। লেখাপড়া জানে না, কিন্তু রামায়ণের নজীর এদের পুরুষের কথায় কথায়, বিশেষ করে মোড়লদের।''[৩৩৭] তাৎমাটুলির পাশে বড় রাস্তা 'পাক্কী'র পাশেই আছে ধাঙড়টুলি। এই ধাঙড়দের সঙ্গে তাৎমাদের বিবাদ চিরন্তন। এই ধাঙড়দের জীবনযাপন প্রণালীর বিবরণও এই উপন্যাসে আছে — ''ধাঙড়টুলির সঙ্গে তাৎমাটুলির ঝগড়া, রেষারেষি চিরকাল চলে আসছে। ধাঙড়দের পূর্বপুরুষরা আসলে ওরাওঁ। কবে তারা সাঁওতাল পরগণা থেকে

গঙ্গার এপারে আসে কেউ জানে না। তবে সাঁওতাল পরগণার ওরাওঁদের ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার মিল আছে। ধাঙড় ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলবার সময় তারা হিন্দীতে কথা বলে। ধাঙড়দের মধ্যে কয়েকঘর খ্রীস্টান। অধিকাংশ ধাঙড়ই সাহেবদের বাড়ি মালীর কাজ করে, যারা মালীর কাজ না পায় বা না পছন্দ করে তারা অন্য অন্য কাজকর্ম করে। কুলের ডাল কাটা থেকে আরম্ভ করে মৌচাক কাটা পর্যন্ত কোন কাজেই তাদের আপত্তি নেই। সকলেরই গায়ে অসীম ক্ষমতা, আর কাজে ফাঁকি দেয় না বলে, সকলেই তাদের মজুর রাখতে চায়। ধাঙড়রা তাৎমাদের বলে নোংরা জানোয়ার। তাৎমারা ধাঙড়দের বলে — 'বুড়বককিরিস্তান' (বোকা খ্রীস্টান)।''[৩৩৮]

তাৎমাদের জীবিকা সম্পর্কে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''কার্তিক অঘ্রাণ মাসে তাৎমা পুরুষদের রোজগার কিছু অনিশ্চিত হয়ে আসে। ঘরামির কাজ কমে যায় অথচ কুয়ো পরিষ্কারের কাজ তখনও আরম্ভ হয় না। বোধহয় সেইজন্যই তাৎমা মেয়েরা অঘ্রাণে যায় ধান কাটতে। তারা ফিরে আসে পৌষের শেষাশেষি। পুবেই যায় বেশি, — মায়সী, জামৌর, রুৎবা থানাতে। ওদিকে রোজগার বেশি, 'বাঙ্গাল মুলুকের' কাছে কিনা, সেই জন্য; কিন্তু রোজগার বেশি হলে কি হয়, 'পানি বড্ডা লরম আওর বড্ডা বুখার।' তার ওপর ওদিকে 'মিয়া' বেশি। সব সময় 'জাতপাঁত' বাঁচিয়ে চলাও শক্ত, ঐ 'পাট আর পানি'র দেশে। তাই অধিকাংশ বছরেই তাৎমা মেয়েরা যায় পচ্ছিমের কমলদাহা, বড়হড়ী, ধোকড়-ধারা এসব থানায়।''[৩৩৯] পল্লীর পাশ দিয়ে বয়ে 'পাক্কী' এদের জীবনে অত্যন্ত গভীর প্রভাব ফেলে। এরা এই 'পাক্কী'কে জীবন্ত চরিত্র হিসেবে দেখে — ''সত্যিই 'পাক্কীর' সঙ্গে তার নাড়ী বাঁধা। লাঙলের ফালের দাগ যেন 'পাক্কী', আর তার দু-পাশের গাছের সার, হলরেখার দু-ধারের উঁচু মাটি। জীবন কেটেছে ঐ গাছের আওতায়, গোঁসাইথানে, শীতের হিমে, বর্ষার জলে, গ্রীষ্মের লু-বাতাসে। . . . বর্ষায় দু'ধার জলে ডুবে গেলেও মাথা উঁচু করে থাকে রাস্তাটা। পাক্কী ঢোঁড়াইয়ের কাছে নির্বিঘ্নতা, দৃঢ়তা আর বিশালতার প্রতীক।''[৩৪০] এ সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের আরও পর্যবেক্ষণ হল — ''ক্ষেতের রঙ বদলায়, লোকের মন বদলায়, আজকের ছোট ছেলেটা কাল জোয়ান হয়ে ওঠে, রোজার 'তাকত' কমে, রোজগারের ধারা বদলায়, তাৎমাদের মোড়ল গরুর গাড়ি চালায়, দুনিয়ার সব জিনিস বদলায়।

বদলায় না কেবল ‘পাক্কী’ আর রামায়ণ। এ দুটোর সঙ্গে যে নাড়ি বাধা তার। এগুলো চিরকাল এক রকম।’’[৩৪১]

অবশ্য সেই অঞ্চলের জনজীবনে জমিদারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ঔপন্যাসিক সুকৌশলে এই অঞ্চলের জমিদারী ব্যবস্থার একটা রূপকেও দেখিয়েছেন — ‘‘আইনত এ অঞ্চলের জমিদার রাজপারভাঙা। সরসৌনিতে, যেখানে সেকালে উইলসন সাহেবের নীলকুঠি ছিল, সেইখানেই জমিদারের ‘সার্কেল কাছারি। . . . আইনের চোখে যাই হোক, আসলে কিন্তু গাঁয়ের জমিদার বচ্চন সিং — গাঁয়ের ‘বাবুসাহেব’। জোত আর রায়তি জমি মিলিয়ে এঁর জমি হবে প্রায় তিন হাজার বিঘা। . . . বাবুসাহেবের জমি এখনও বাড়ছে। ও যে বাড়তেই হবে। জমি যে মানুষের পরিবারের মত। ছেলেপিলে হয়ে ক্রমাগত বেড়ে চলে, না হয় মরে হেজে ছোট হয়ে আসে। একই রকম কখনও থাকে না। যার লাঠি তার মোষ। স্বাভাবিক নিয়মেই এই সব জমি চলে যাচ্ছে বাবু সাহেবের পেটে।’’[৩৪২] বিসকিন্ধার কোয়েরিটোলার মানুষদের উপর জমিদারের প্রভাবের কথা জানানোর প্রসঙ্গ ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ‘‘তিনি সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁর সম্মুখে কোয়েরী টোলার লোকদের এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবার কথা। ডান পা দিয়ে বাঁ পায়ের হাঁটুটাকে জড়িয়ে দু’হাত জোড় করে দাঁড়ানো জমিদারের সম্মুখে, এটা কেবল এ গাঁয়ের রেওয়াজ নয়, এ মুল্লুকের।’’[৩৪৩]

এভাবে এই উপন্যাসে তাৎমা এবং ধাঙড়দের নিজস্ব জীবন ও জীবিকার পরিচয় যেমন আছে, সেই সঙ্গে ঐ অঞ্চলের জমিদারতন্ত্রেরও একটা বাস্তবরূপকে তুলে ধরা হয়েছে। এসবের মধ্য দিয়ে সে অঞ্চলের সামগ্রিক জীবনযাপনের বাস্তবরূপও উঠে এসেছে। এরূপ মানুষের জীবন ও জীবিকার বিষয়টি মূল জনসমাজের মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে কিছুটা মিললেও অনেক দিক থেকেই স্বতন্ত্র। বাংলা সাহিত্যেও এরূপ জীবনাচরণের ছবি খুব একটা নেই।

এই উপন্যাসে মূলত হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষজনের কথা বলা হয়েছে। এই উপন্যাসের চরিত্রদের মধ্যে তাৎমারা হিন্দু ধর্মের তাঁতি সম্প্রদায়ের মানুষ। অবশ্য ধাঙড়দের মধ্যে কিছু খ্রিস্টান আছে। কোয়েরীটোলায় কিছু কবীরপন্থী মুসলমান

সম্প্রদায়ের কথাও আছে। তবে হিন্দুধর্মের মধ্যে থাকলেও তাৎমাদের ধর্মাচরণের একটা নিজস্বরূপের পরিচয় এই উপন্যাসে আছে। তারা নিজেদের পল্লীতে একেবারে নিজস্ব দেবতার উপাসনা করে — ''তাৎমাটুলির বড় রাস্তার ধারে আছে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ। তার নীচে একটি উঁচু মাটির ঢিবি বেশ করে সিঁদুর মাখানো। ইনি হচ্ছেন তাৎমাদের 'গোঁসাই'। এই গোঁসাইয়ের সম্মুখে পোঁতা আছে একটি প্রকাণ্ড হাড়িকাঠ। এই জায়গাটার নাম গোঁসাই থান; লোকে ছোট করে বলে 'থান'। প্রতি বছর ভাই দ্বিতীয়া না তার পরের দিন এই হাড়িকাঠে তেল-সিঁদুর পড়ে, একটা নিশান পোঁতা হয়, আর চাঁদা করে কেনা একটি ভেড়া বলি দেওয়া হয়। এই 'থানে'ই বৌকা বাওয়ার' আস্তানা। বৌকা বাওয়ার আগে কিংবা পরে তাৎমাদের মধ্যে আর কেউ সাধু সন্ন্যাসী হয় নি। ''[৩৪৪] অবশ্য গান্ধীজী এদের কাছে ঈশ্বরের রূপ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তারা তাঁকে 'গান্হী বাওয়া' বলে দেবতার আসনে বসিয়ে তাঁর সমস্ত কর্মসূচীকে ঈশ্বরের আদেশ বলেই মেনে নিয়েছিল।

উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষজনের লোকবিশ্বাস, লোক-সংস্কার, লোকাচার, লোককথার বিবরণও আছে। যেমন, এক জায়গায় তাৎমাটুলির মানুষদের নিজস্ব বিশ্বাসের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''সেবার মাসখানেক থেকে তাৎমাটুলিতে চড়াইপাখি দেখা যাচ্ছে না। সবাই বলাবলি করে যে একটা বড় অসুখ শিগগিরই আসছে। তার উপর বাড়িতে নম্বর দিয়ে লোক গুনে গিয়েছে। (আদম শুমারি) সকলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। তারপর যা ভাবা গিয়েছিল তাই। জিরানিয়ার, তাৎমাটুলিতে, ধাঙড়টুলিতে, কী অসুখ! কী অসুখ! 'বাই উখড়ানোর' ব্যারাম — বেহুঁশ জ্বর — 'ঝট্দে বিমার পট্দে খতম'।''[৩৪৫] আর এক জায়গায় ধাঙড়টুলির মানুষদের নিজস্ব বিশ্বাসের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''হাসিখুসি-ভরা ধাঙড়টুলিতে হঠাৎ অমঙ্গল আর আশঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে আসে। শনিচরার বাঁশঝাড়টায় ফুল ধরেছে। . . . এত বড় অমঙ্গলের সূচনা ধাঙড়টুলিতে আর কখনও আসেনি। 'বাঙ্গাবাঙ্গী'-র (ধাঙড়দের দেবতা) নির্দেশ আছে পাড়ার বাঁশঝাড়ে ফুল ফুটলেই বুঝবে যে আকাল, না হয় দুঃসময় কাছে। ঐ ফুলের ফসল ছেড়ো না। তাই দিয়ে রুটি তৈরি করে খাবে। তারপর বারো বছরের বেশি সেখানে থেকো না, বারো বার

গাছে তেতুল পাকুক, তারপর তল্পিতল্পা গুটিয়ে, নতুন জায়গায় গিয়ে বসবাস করবার কথা ভাবতে হবে।''[৩৪৬]

এই অঞ্চলে স্থানীয় ওঝারা দোর্দণ্ডপ্রতাপে বিরাজ করে। উপন্যাসে এই ওঝাদের প্রতিনিধি হল রেবনগুণী। সে অঞ্চলের অন্ত্যজ মানুষদের ওঝাদের সম্পর্কে ধারণার পরিচয় দিতে গিয়ে রেবনগুণী প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''রেবনগুণীর নামে পাড়ার লোকে কাঁপে। তাৎমাটুলির আইবুড়ো মেয়েরা তাকে দূর থেকে দেখলে পালায়। মায়েদেরও মেয়েদের উপর সেই রকমই হুকুম। এক তো তুকতাকের ভয়, তার উপর থাকে চব্বিশ ঘন্টা নেশা করে। পরপর ছটা বিয়ে করেছে, এখনও দুটোকে নিয়ে ঘর করে। গোঁসাইথানে যেদিন ভেড়া বলি হয়, সেদিন প্রতি বছর তার উপর গোঁসাই ভর করেন, সেই সময় সে ভেড়ার কাঁচা রক্ত খায়; মুখে গায়ে ভেড়ার রক্ত মেখে সে হুংকার ছাড়ে। সে কি আর করে? তার মধ্যে দিয়ে গোঁসাই কথা বলেন। তার হাতের বেতের ঘেরটা দিয়ে ছুঁয়ে সে যাকে যা বলবে, তা ফলবেই ফলবে। কুমারী মেয়েরা সে সময় পালায় সেখান থেকে। পাঁচবার সে একটা মেয়েকে ছুঁয়ে, তার সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছে। কোনও মা বাবার সাধ্যি নেই যে, সেই সময়কার গোঁসাইয়ের কথার নড়চড় হতে দেয়।''[৩৪৭]

তাৎমারা নিজেদের বিচারব্যবস্থার উপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। এজন্য তাদের পল্লীতে মাঝেমাঝেই পঞ্চায়েত বসে। এসব পঞ্চায়েতে গ্রামের নানা সমস্যার সমাধান করা হয়, বিভিন্ন বিষয়ে নিদান দেওয়া হয় — ''তাৎমাটুলিতে 'পঞ্চায়েতি' নিত্যি লেগেই আছে — এর বৌ ওকে দেওয়া, কোন পক্ষের কোন ছেলেটা মড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখাগ্নি করে নিয়েছে, মৃতের বাড়ির বেড়া আর বাঁশগুলো পাবে বলে; কে জোর করে স্বামীর সাক্ষাতে তার স্ত্রীর কপালে সিঁদুর লাগিয়ে তাকে স্ত্রী বলে দাবী করেছে; আরও কত রকমের দৈনন্দিন জীবনের খুচরো মামলা। . . . সব আসামীই তাৎমাটুলির 'পঞ্চায়েতি'তে আসতে ভয় পায়। শাস্তির প্রথম দফা পঞ্চায়েতের প্রথম বৈঠকের মধ্যেই হয়ে যায়। মোটামুটি 'ফয়সালা' হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসামীর উপর চড়-চাপড় পড়তে আরম্ভ করে। এগুলো কিন্তু আসল শাস্তির ফাউ। এই উপরি পাওনার পর অন্তিম রায় বেরোয়, জরিমানা গাধার পিঠে চড়ানো,

ভোজ — খেলা নয় 'ভাতকা ভোজ' (ভাতের ভোজ) আরও কত কী।''[৩৪৮] তাৎমাদের সমাজে বিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিয়েতে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে পণ দেয়। জানা যায় যে, পণ দিতে না পারায় গ্রাম্য পুরোহিত বৌকা বাওয়ার বিয়ে হয় নি — ''তাৎমাদের বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ টাকা পায় বরপক্ষের কাছ থেকে। তাৎমাটুলির বুড়িরা বলে, 'আহা টাকার অভাবে বিয়ে করতে না পেরে বৌকাটা সন্ন্যাসী হয়ে গেল।' — তাৎমাদের ছেলেরা বিয়ে হলেই সাহেবদের মত মা-বাপের থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই ভয়ে বৌকার মা ভিক্ষায় জমানো আধলাগুলো একদিনও ছেলের হাতে দেয়নি।''[৩৪৯]

উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির অন্ত্যজ মানুষজনের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান প্রভৃতির বিবরণও আছে। তাৎমা বা ধাঙড়রা অত্যন্ত গরীব, এদের উপার্জনও অত্যন্ত কম। তাই এদের খাদ্য তালিকা অত্যন্ত সাধারণ মানের। এরা সাধারণত ভাত খায়। খাবারের সময় মুসুর ডালের সঙ্গে এদের সাক্ষাৎ হয় না। ঢোঁড়াই-এর জন্মের পর তার মা বুধনীর জন্য তার স্বামীকে মুসুরের ডাল আনতে হয়। তবে সে নিজে কোনোদিন মুসুর ডাল খায় নি — ''তার স্বামী কোনোদিন মসুর ডাল খায় নি। সে কেন কোন তাৎমাই খায় না। অত গরম জিনিস খেলে গায়ে কুষ্ঠ হয়ে যাবে এই ভয়ে। খালি খাবে মেয়েরা, ছেলে-পিলে হওয়ার পর কয়েকদিন, তখনি ওদের শরীরে রস শুকোনোর দরকার সেইজন্যে।''[৩৫০] আদা ফোড়ন বা রসুন ফোড়ন দিয়ে এই মসুর ডাল রান্না করা হয়। বিশেষ আনন্দের দিনে এদের মধ্যে মিষ্টি খাওয়া-দাওয়ারও প্রচলন আছে। তাই বুধনীর দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান গুদর জন্মালে তার স্বামী বাবুলাল মিষ্টি নিয়ে আসে। বিভিন্ন পূজা-পার্বণে প্রসাদ হিসেবে 'পেঁড়া' দেওয়া হয়। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে তাৎমা বা ধাঙড়রা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিহারের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষজনের মতই পোশাক-আশাক পরিধান করে। তবে সমাজের বিশিষ্টজনেরা মাথায় একধরনের পাগড়ী পরে। এদের বাসস্থানগুলিও অত্যন্ত সাধারণ মানের। এগুলিতে খোলার চালের আচ্ছাদন থাকে। আর প্রত্যেক বাড়িতে কুয়ো থাকে — ''জিরানিয়ার অধিকাংশ বাড়িরই খোলার চাল,

আর প্রত্যেক বাড়িতেই আছে কুয়ো। তাই কোনোরকমে চলে যায়।''[৩৫১] এভাবে এই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষদের সামগ্রিক জীবনাচরণের ছবি প্রকাশ পেয়েছে।

'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটি ঔপন্যাসিক মান্যচলিত বাংলায় রচনা করেছেন। তবে তিনি পাদটিকাসহ এই উপন্যাসে অনেকগুলি স্থানীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন। অনেকের মতে এরূপ আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার উপন্যাসটিকে সাধারণ পাঠকের কাছে দুরূহ করে তুলেছে এবং সেজন্য উপন্যাসটি প্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। তবে এটা মানতেই হয় যে, এসব আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার কাঠামোকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। এই উপন্যাসে যে সমস্ত আঞ্চলিক শব্দ-বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, তার কিছু দৃষ্টান্ত হল — 'টৌন', 'ভারী সাহার', 'কলস্টর', 'চেরমেন', 'বাং-গালী', 'কোশভর', 'কিসান', 'কৃপা তুমহারি সকল ভগবান', 'ঝোটাহারা', 'পঞ্চায়তি', 'হাভেলি', 'গোঁসাই থান', 'পীপর গাছ' 'আদৌড়ি', 'পাকিট বাত্তিমার', 'ওয়ালেতের রাজা', 'বিলি বাচ্চাটার' 'পুরুখ', 'বৌকা বাওয়া' 'গান্হী বাওয়া', 'তামাম হল্লা', 'বিনা ঘোড়েকা', 'একতিয়ার', 'কিরিয়া করম', 'চুমৌনা', 'রাজা লোগ', 'পরমাৎমা', 'পাকা প্রসাদী', 'করউঁ কাহ মুখ এক প্রশংসা', 'বাই-উখরানো', 'লাট্টুমার রৈলী', 'গাহকীর ভারমার', 'কিরানীবাবু', 'সিনুর', 'মুখিয়ারা', 'ভকত', 'ঝোটাহাররা', 'বরহমভূতবালা', 'ঘরবালী' প্রভৃতি। এই রকম অজস্র স্থানীয় শব্দ এই উপন্যাসে আছে। এই ভাষারীতির দিকে নজর দিয়ে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — ''বিহারের গ্রামাঞ্চল তার সমস্ত লৌকিক ও অলৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে এ উপন্যাসে দেখা দিয়েছে। এ উপন্যাসের প্রতিটি ছত্রে ধুলোমাটির স্পর্শ পাওয়া যায়। আঞ্চলিক উপভাষার শব্দ ব্যবহারে এসেছে স্থানিক রঙ।''[৩৫২]

বাইরের ঘটনার অভিঘাতে আঞ্চলিকতার বাতাবরণে পরিবর্তন আসা যে কোনো সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের একটা বিশেষ দিক। এই উপন্যাসটিতে যে সময়কালটিকে গ্রহণ করা হয়েছে, তখন ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছিল। উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটিতে তার অভিঘাতের প্রসঙ্গও বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছে — ''গান্হী বাওয়ার খবরের বেলায়ও হল এই রকমই। এমনি কেউ নামই শোনেনি। ঐ যে সেদিন রাতে বাবুলালের কাছ থেকে শুনল,

তারপর কিছুদিন চলল নিত্যি নূতন খবর। বিলিতি কুমড়োর খোসায় গান্‌হী বাওয়ার মূরত আঁকা হয়ে গিয়েছে। সবুজের মধ্যে সাদা রঙের মুখের জায়গাটায় মোচের মতনও দেখা যাচ্ছে। আর কোনো ভুল নেই। এখন কি করা যায়? এ রকম করে তো গান্‌হী বাওয়াকে হিমে রোদ্দুরে ফেলে রাখা যায় না। ঠাকুর দেবতার ব্যাপার। . . . থানে কুমড়োটার পূজো হয়, পান সুপুরি গুড় দিয়ে। . . . সে রাত্রে রেবনগুণীর বাড়িতে ভজনের আসর জমে — যা গ্রামের ইতিহাসে আর কখনও হয় নি। ঢোঁড়াই 'ভকত' গান্‌হী বাওয়ার নাম দেওয়া বটোহীর গান গায়। গুণী তার সঙ্গে তান ধরে। সে রেবনগুণীর সঙ্গে সমান হয়ে গিয়েছে গান্‌হী বাওয়ার দৌলতে।''[৩৫৩] ঔপন্যাসিক আরও লিখেছেন — ''তাৎমাটুলির পঞ্চায়তিতে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, আলবৎ উঁচুদরের সন্ন্যাসী গান্‌হী বাওয়া। মুসলমানকেও পিঁয়াজ গোস্ত ছাড়িয়েছে। . . . থানের মতো ঘর-দুয়োর-আঙ্গন 'সাফসুৎরো' রাখতে পারিস তবে না সাধুসন্ত এসে দাঁড়াতে পারে। . . . খালি রবিবারে আঙ্গন সাফ করলেই হবে না। ঝোটহাদেরও একটু 'পাক সাফ' থাকতে হবে। মেয়ে মানুষের জাতটাই এমন। হাজার বলেও ওদের দিয়ে কিছু করাতে পারবে না।''[৩৫৪] শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় — মাসে একদিন স্নান মেয়েদের করতেই হবে। এই গান্‌হী বাওয়া অর্থাৎ গান্ধীজীর খবরে তাৎটুলিতে ব্যাপক আলোড়ন ওঠে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় — ''এর পর নিত্যি নতুন কাণ্ড। আজব আজব খবর গান্‌হী বাওয়ার। . . . প্রকাণ্ড বেলগাছের মগডালের পাতা তিরতির তিরতির করে নড়ছে — তিনটে করে পাতা একসঙ্গে। পাতাগুলোয় কী যেন লেখা লেখার মতই লাগে। ঠিকই গান্‌হী বাওয়ার নাম। জয়, জয় হো! নয়ন সার্থক জীবন সার্থক বাওয়ার আজ। ঢোঁড়াই-এর এত কষ্ট করে আসা সার্থক হয়েছে। জয় হো গান্‌হী বাওয়া। তোমার নামের গুণেই না এত লোক বেলগাছটার ডালে ডালে হুঁকো বেঁধে দিয়ে গিয়েছে। ঐ বেলতলার ধুলো ঢোঁড়াই লাল কাপড়ের খুঁটে করে বেঁধে নিয়ে আসে।''[৩৫৫] শুধু তাই নয় গান্ধীজীর সম্পর্কেও এরা নানা অলৌকিক গল্প ফাঁদে — ''কলির রঘুনাথ মহৎমাজী। তাঁর চেলাদের বলে 'কাংগ্রিস'। . . . মহাৎমাজী আসবেন জিরানিয়ায়। ভূমিকম্পে মুলুকের লোকসান দেখে তার প্রাণ কেঁদেছে। এতবড় 'সন্ত' তিনি যে আঙিনার কোণের সরষে গাছটা পর্যন্ত ঝাঁটা চাপা পড়লে তাঁর প্রাণ

কেঁদে ওঠে। কোথায় থাকেন মহাৎমাজী। — পাক্কী যেখানে শেষ হয়েছে তার থেকেও অনেক দূরে, মুঙ্গের তারাপুর, অযোধ্যাজীর চাইতেও দূরে। পুরুবে ধান-কাটনীর দেশ, গনৌরীর ভাইটা যেখানে কাজ করে, সেই কলকাতা, জিরানিয়া, তাৎমাটুলি, বিসকান্ধা, শোনপুরের মেলা, কুশীজী পার হয়ে গঙ্গাজী পার হয়ে অনেক গাঁ, আর একটা কী যেন খুব ভালো নাম, ভাগলপুর — ভাগলপুর, আর কাঠিহার, আরও কী কী যেন, — এই মুলুকটার ভাল মন্দ দেখাশোনার ভার মহাৎমাজীর উপর। আঙুলের ডগা কেটে গেলে মাথা জানতে পারবে না? তার ব্যথা লাগবে না? তাই মহাৎমাজী আসছেন জিরানিয়াতে।''[৩৫৬]

শুধু 'গান্‌হী বাওয়া' নন, তাঁর চেলা অর্থাৎ কংগ্রেসি ভলেন্টিয়ারদেরও এরা সমীহের চোখে দেখে। তাদের কাছে গান্ধীজীর নির্দেশ সম্বলিত চিঠি এদের আরও আলোড়িত করে তোলে — ''একদিন জিরানিয়া-ফেরৎ একজন বলন্টিয়র ঝোলার ভিতর থেকে বার করে দিল মহাৎমাজীর চিঠি; যে যে 'বোট' দেবে সবার নামে এক-একখান। রামায়ণের হরফের মত লেখা মহাৎমাজীর। . . . ঘরের মধ্যে সাদা বাক্সটাতে প্রণাম করে ঢোঁড়াই চিঠিখানা তার মধ্যে ফেলে। ধন্য হো মহাৎমাজী, ধন্য হো কাংগ্রিসের বলন্টিয়র, যাদের দয়ায় নগণ্য ঢোঁড়াই রামরাজ্য কায়েম করবার কাজে, কাঠবেড়ালির কর্তব্যটুকু করবার সুযোগ পেয়ে গেল। দুঃখে তার বুক ফেটে যায়, সে যদি লিখতে জানত তা হলে নিজে হাতে লিখে দিত মহাৎমাজীকে। এই চিঠির মধ্য দিয়ে মুলুকের এক পারের লোক সেই কোথায় অন্য পারের মহাৎমাজীর কাছে কাছে পৌঁছাতে পারছে, এক সঙ্গে, এক সময়। তাৎমাটুলি, জিরানিয়া, বিসকান্ধা, গঞ্জের-বাজার, ঢোঁড়াই, রামপিয়ারী, পিথো সাঁওতাল, বলন্টিয়র, তিলকুমাঝি, মাস্টার সাহেব একই জিনিস চায়। তারা সকলে একই চিঠি দিয়েছে মহাৎমাজীকে। সরকার, হাকিম, পুলিশ, জমিদার, সার্কিল মানিজর, গিধর, কোয়েরি, বাবু-সাহেব, ইনসান আলি বোধ হয় কিরিস্তান সমুয়র, সব তাদের বিরুদ্ধে। জাতের মিল নেই তবু কত কাছে এসে গিয়েছে তারা। . . . রামজীর রাজ্য জুড়ে পলকা সুতোর জাল বুনে চলেছেন তাঁরই অবতার মহাৎমাজী।''[৩৫৭] এভাবে এই উপন্যাসে স্থানিক প্রেক্ষাপটে বাইরের ঘটনার

প্রভাবের বিবরণ দিয়ে ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক উপন্যাসের ঔপন্যাসিকের দায়িত্বও পালন করেছেন।

এভাবে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে আঞ্চলিকতার অনেক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হলেও এর শ্রেণি নির্ণয়ে সমালোচকরা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন। অনেকেই এই উপন্যাসটিকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে চেয়েছেন; আবার কেউ কেউ উপন্যাসটি আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে মহাকাব্যিক পটভূমির দিকে অগ্রসর হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''. . . সতীনাথের মধ্যে ছিল সেই উচ্চাঙ্গের মানসিকতা, অভিজ্ঞতাকে যা অনাসক্ত জীবন-ভাষ্যের রূপ দিতে পারে। উত্তর-বিহারের এক খণ্ড অঞ্চলকে লেখক ব্যবহার করেছেন তাঁর সমস্ত উপন্যসের ঘটনা ভূমি হিসেবে — রাজনৈতিক, পারিবারিক অথবা আঞ্চলিক এই তিন প্রকার উপন্যাসের কোনো ক্ষেত্রেই ঐ খণ্ড সীমারেখাকে অতিক্রমের প্রয়োজন তাঁর হয় নি। ''[৩৫৮] অধ্যাপক অশুকুমার সিকদার জানিয়েছেন যে, এই উপন্যাসটিতে ঢোঁড়াই-এর মাধ্যমে ঔপন্যাসিক আঞ্চলিকতার গন্ডী অতিক্রম করে গেছেন — ''. . . জন্মের সামান্যতম গণ্ডি অতিক্রম করে যায় যে ঢোঁড়াই, একদিকে উপন্যাসটি তার আত্মানুসন্ধানের কাহিনী। অন্যদিকে আঞ্চলিকতার গণ্ডিকে ছাড়িয়ে নিয়ে এই উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হয়েছে অণু-ভারতবর্ষ, জিরানিয়া বা জীর্ণারণ্য পেয়েছে ব্যাপ্ত ভারতবর্ষের দ্যোতনা।''[৩৫৯] সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'কে সে যুগের উপন্যাসের ক্ষেত্রে নবীন বলে মন্তব্য করে লিখেছেন — ''ঢোঁড়াই চরিত মানসের নবীনত্ব সম্পূর্ণ অন্য গোত্রের, . . . তাৎমাটুলির মধ্যে দিয়ে, হাটে-মাঠে-ঘাটে দীর্ঘ পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে ঢোঁড়াইরাম যেন গোটা দেশের হৃদয়ের সঙ্গে অলক্ষ্য বন্ধনে বাঁধা।''[৩৬০] তিনি উপন্যাসটি সম্পর্কে আরও লিখেছেন যে, এখানে আঞ্চলিকতা বাস্তবতার নামান্তর হিসেবে এসে উপন্যাসটিকে জমিয়ে তুলেছে। তবে ইতিহাসের টান প্রবল হয়ে উঠলে যেমন অঞ্চল পিছনে সরে যায়, এক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে — ''ঢোঁড়াই চরিত মানসে আঞ্চলিক বা পরিবেশ-ভিত্তিক মাত্রা সর্বত্রই উপন্যাসের বাস্তবতাকে জমিয়ে তুলেছে। তবে তার মধ্যেও কম বেশির ভেদ আছে।

ইতিহাসের টান প্রবল হয়ে উঠলে অঞ্চল পেছনে সরে যায়। ঢোঁড়াই চরিত মানসেও তাই।''[৩৬১]

অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর শ্রেণি বিচার প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেছেন — ''তুলসীদাসের রামচরিত মানসের আদলে এটি রচিত : এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এখানে অর্থবহ। রোজা, রোজগার আর রামায়ণ নিয়ে তাৎমাটুলির জীবন। সেই বদ্ধ জীবনে কীভাবে বাইরের স্রোত এল, বুধনীর ছেলে ঢোঁড়াই কীভাবে স্রোতের টানে সীমাবদ্ধ জীবন ছেড়ে বেরিয়ে গেলো, তা লেখক বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত করেছেন।''[৩৬২] তবে একথা বললেও তিনি উপন্যাসটির আঞ্চলিকতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন — ''এই উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবেও দেখা যেতে পারে। আঞ্চলিক উপন্যাসের তিনটি প্রধান উপাদান — অঞ্চলটি সম্পর্কে লেখকের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি, শিল্পগত নির্লিপ্তি। এই তিনটি শর্ত অবশ্য পালনীয়। এইসব উপাদানের সমাবেশ হয়েছে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'এ। বিহারের গ্রামাঞ্চলকে, গ্রামীণ মানুষকে, তাদের মানসিকতা ও সংস্কারকে লেখক নিপুণভাবে উপস্থিত করেছেন। এই গ্রামজীবন ও মানুষ সম্পর্কে সতীনাথের অভিজ্ঞতা নিশ্ছিদ্র, সহানুভূতি সীমাহীন ও নির্লিপ্তি শিল্প-নিয়ন্ত্রিত। এই উপন্যাসে লেখক আমাদের কাছে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতালোক উদ্‌ঘাটিত করেছেন। বিহারের শিক্ষাবর্জিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামের ভীরুচাষি, ক্ষেতমজুর ও মহাজন জোতদার-সম্প্রদায়ের কাছে গান্‌হীবাবা (মহাৎমাজী) নামটি কীভাবে পরিচিত হয়ে উঠল, লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন কীভাবে ভীরু মানুষগুলিকে বদলে দিল, তার জীবনচিত্র এ উপন্যাসে আছে।''[৩৬৩] অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদারও উপন্যাসটির আঞ্চলিকতা ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েছেন — ''ঢোঁড়াইতে আঞ্চলিকতাই কথাবস্তু, আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে নিজের ভাষা মিলিয়ে সহজভাবেই সতীনাথ তার বর্ণনা দেন। কখনোই কথাবস্তু বর্ণনায় লেখকের কৌশলী চাল বলে মনে হয় না। 'আঞ্চলিকতা শুধু ভাষার জিনিস নয়, ভাবের জিনিস' — এ সত্য সতীনাথের লেখায় যত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারুর উপন্যাসেই তা বোঝা যায় না।''[৩৬৪]

সমালোচকেরা নিজেদের মত করে ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ উপন্যাস সম্পর্কে নিজেদের মতামত দিয়েছেন। আমাদের কাজ ছিল অনুসন্ধান চালিয়ে উপন্যাসটির আঞ্চলিকতা ধর্মটি খুঁজে বের করা। একথা স্বীকার করে নিতে কোনো দ্বিধা নেই যে, সতীনাথ ভাদুড়ী এই উপন্যাসে বিহারের পূর্ণিয়া (উপন্যাসে যার নাম জিরানিয়া) সংলগ্ন অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলটির সর্বাঙ্গীণ চিত্র যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, বাংলা সাহিত্যের খুব কম উপন্যাসেই তা আছে। ফলে সে অঞ্চলের তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণি তাৎমা ও ধাঙড়দের প্রকৃতি, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, উপভাষার শব্দচয়ন, সে অঞ্চলের উপর বাহিরের শক্তির প্রভাব প্রভৃতি সব কিছুর বিবরণ এখানে উঠে এসেছে। ফলে ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ উপন্যাসটিকে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে দ্বিরুক্তি করার অবকাশ থাকে না।

বিভূতিভূষণের বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস **‘ইছামতী’** বিশ শতকের প্রথমার্ধের একেবারে শেষে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির জন্য ১৯৫০-৫১ খ্রিস্টাব্দে বিভূতিভূষণ মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার পান। এই পুরস্কার প্রাপ্তি থেকেই মনে হয় ‘ইছামতী’ উপন্যাসটির মধ্যে এমন কিছু আছে, যা উপন্যাসটিকে আর পাঁচটা উপন্যাস থেকে পৃথক করে। আসলে উপন্যাসটি রচনাকালীন সময়ের শতবর্ষ পূর্বের বাংলার নীলচাষকে কেন্দ্র করে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পল্লীবাংলার সমাজ জীবনকে নিয়ে লেখা। এখানে কিছুটা হলেও ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিজীবনের প্রক্ষেপ পড়েছে। আবার ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এখানে তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনাও স্থান পেয়েছে। তবে এসবের পাশাপাশি আঞ্চলিক সাহিত্য হিসেবেও এই উপন্যাসটির বিশেষ মূল্য আছে।

বাংলার বুকে আবহমান কাল ধরে বয়ে চলা নদীগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী হল ইছামতী। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার পূর্বভাগ দিয়ে বয়ে চলা এই নদীটি চুর্ণী, মাথাভাঙা এবং যমুনার জলস্রোতকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। এর যাত্রাপথের কিছু অংশ বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলায় এবং পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় পড়ে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার নীল আন্দোলনের ঢেউ কমবেশি সর্বত্র প্রভাব ফেললেও নদীয়া-

যশোরের বিভিন্ন অঞ্চলে তার দাপট বেশি অনুভূত হয়েছিল। বিভূতিভূষণ 'ইছামতী' উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে এই অঞ্চলের মোল্লাহাটির নীলকুঠি এবং তৎসংলগ্ন গ্রামগুলিকে গ্রহণ করেছেন। এখানে সমকালের প্রেক্ষিতে ইছামতী-তীরস্থ অঞ্চলটির প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষজনের জীবন-জীবিকাসহ লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকরুচি, লোককথার পাশাপাশি পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস-খাদ্যতালিকা, বিশিষ্ট ভাষারীতির মত আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলির বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস আছে।

এই উপন্যাসে একই সমান্তরালে দু'টি কাহিনির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় — ১) নীলচাষ ও নীলকুঠি সংক্রান্ত কাহিনি এবং ২) ভবানী বাঁড়ুয্যের সংসারিক জীবন কাহিনি। এই দু'টি কাহিনির মধ্যে নালু পাল অর্থাৎ লালমোহন পালের একটি উপকাহিনিরও অবতারণা করা হয়েছে, যেখানে শৈশব থেকে মামার বাড়ির আশ্রিতা নালু পাল অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে আপন বুদ্ধি, পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের জোরে সেই অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী হয়ে উঠেছে; এমনকি একসময় নীলকুঠিটি পর্যন্ত কিনে নিয়েছে। অবশ্য বড়লোক হয়ে উঠলেও নালু বা তার স্ত্রী তুলসীর মধ্যে কোন অহংকার জন্ম নেয় নি, তারা সাধারণ গ্রাম্য মানুষই থেকে গেছে। যাই হোক, মূলকাহিনির মধ্যে প্রথমটির পটভূমি মোল্লাহাটি গ্রামের নীলকুঠি, যেখানে নীলকরদের বড়সাহেব শিপটন এবং ছোটসাহেব ডেভিড্ দোর্দণ্ড প্রতাপে গ্রাম্যচাষিদের উপর ক্ষমতা জাহির করে তাদের নীলচাষের কাজ চালিয়ে যায়। এই দু'জন নীলকরের মধ্যে শিপটন অত্যন্ত রাশভারী প্রকৃতির লোক এবং ঐ অঞ্চলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সপ্তাহে তিনদিন নীলকুঠিতে কোর্ট বসিয়ে সে ঐ অঞ্চলের যাবতীয় ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি করে। সেই অঞ্চলের মানুষ শিপটনকে সম্ভ্রম ও ভয়ের দৃষ্টিতেও দেখে। অবশ্য তার আপাত রাশভারি চরিত্রের আড়ালে একটি উদার মন আছে, এজন্য সে সহজে কোনো অন্যায় কাজ করে না এবং কোনো অন্যায় হতেও দিতে চায় না। ঘরে ইংরেজ স্ত্রী লেডি শিপটন থাকলেও গ্রাম্য সুন্দরী গয়ামেমকে সে রক্ষিতা করে রাখে। আর ছোটসাহেব ডেভিড্ কিছুটা দিলখোলা মেজাজের লোক। দীর্ঘদিন বাংলাদেশের গ্রামে কাটানোর ফলে সে গ্রাম্যভাষা এবং গ্রাম্য খাদ্যাভ্যাস আয়ত্ত করে ফেলে। শারীরিক অবয়ব বাদ দিলে তাকে ইংরেজ বলে চেনাও মুশকিল।

তবে আপাত দিলখোলা মেজাজের আড়ালে ডেভিড্ অত্যন্ত নির্মম — দেওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে প্রজাদের জব্দ করার যাবতীয় কুকর্ম সে-ই করে। উপন্যাসে দেওয়ান রাজারাম রায়, সদর আমিন প্রসন্ন চক্রবর্তী, সহিস ভজা মুচি, করিম লেঠেল প্রমুখদের নিয়ে শিপটন ও ডেভিড্ ঐ অঞ্চলে বিস্তৃত তাদের 'নীলের সাম্রাজ্য' চালায়।

এই উপন্যাসের এই কাহিনির শুরুটা হল ১২৭০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরেজির ১৮৬৩ সাল। এখানে প্রথমে নীলকরদের সচ্ছলতার ছবি দেখানো হয়েছে। দেওয়ান, আমিন, সহিস, পেয়াদা, লাঠিয়ালদের নিয়ে বড়সাহেব শিপটন ও ছোটসাহেব ডেভিড্ মোল্লাহাটি অঞ্চলে যেন একটা 'নীলের সাম্রাজ্য' বিস্তার করে। তাদের দাপটে প্রজারা টু শব্দটি করতে পারে না। ঐ অঞ্চলের গ্রাম্য মানুষজন নীলকরদের কতটা ভয় করত, সেটা হাটের রাস্তায় বড় সাহেব শিপটনের গাড়ি দেখে নালু পাল ও সতীশ কলুর ধান ক্ষেতে লুকিয়ে পড়া থেকেই বোঝা যায়। এই নীলকরদের বলে বলীয়ান হয়ে তাদের দেওয়ান রাজারাম রায়ও সেই অঞ্চলের ত্রাস হয়ে ওঠে। এরা কতটা দোর্দণ্ডপ্রতাপী ছিল তা নীলচাষ করতে না চাওয়া রাহাতুনপুর গ্রাম জ্বালিয়ে সেখানকার প্রজাদের শায়েস্তা করার ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয়। এই দুর্ঘটনাটি কার ইঙ্গিতে সম্পন্ন হয়েছে, সেটা সকলে বুঝতে পারলেও কেউ তা মুখে আনে না, এমনকি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সরজমিনে তদন্তে এসেও কিছু প্রমাণ করতে পারে না। তবে এই উপন্যাসে নীলবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে নীলকুঠির সঙ্কটকেও দেখানো হয়েছে। প্রথমে কুঠিয়ালরা একজোট হয়ে নীলবিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস করে। কৃষকদের নেতা তিতুমীরকে সদলবলে তারা বন্দীও করে। তবে শেষপর্যন্ত নীলকরদের রমরমা থাকে না — রাজারাম দেওয়ানকে বাগ্দী প্রজারা একা পেয়ে সড়কি চালিয়ে হত্যা করে, ছোট সাহেব ডেভিড ও বড় সাহেবের মেম দেশে ফিরে যায়। আর শারীরিক অবসন্নতার কারণেই হোক, বা নীলকুঠির প্রতি মায়াতেই হোক শিপটন মোল্লাহাটিতেই থেকে যায়। তার সেবার দায়িত্ব নেয় গয়ামেম। এই গয়া সেই অঞ্চলের এক বাগ্দী পরিবারের অবিবাহিত কন্যা। তার রূপে অনেকে আকৃষ্ট হলেও শিপটনের ভয়ে কেউ তার কাছে ঘেঁষার সাহস পেত না। বুড়ো আমিন প্রসন্ন চক্রবর্তী তার প্রতি অনুরক্ত ছিল। গয়াও তাকে একটু-আধটু প্রশ্রয় দিত। তাই মৃত্যুর আগে শিপটন গয়াকে কিছু জমি লিখে দিতে চাইলে প্রসন্ন চক্রবর্তী সবচেয়ে সেরা জমিটিই

তাকে মেপে দেয়। শিপটন সাহেবের মৃত্যুর পর নীলকুঠি বিক্রী হয়ে যায় এবং এর নতুন মালিক হয় নালু পাল ওরফে লালমোহন পাল, যে একসময় হাটে যাবার পথে শিপটনের টমটমের আওয়াজ পেয়ে মালপত্র ফেলে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ত। সে ওখানে জমিদারী প্রতিষ্ঠা করে।

নীলচাষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই কাহিনিটির পাশাপাশি এই উপন্যাসে ভবানী বাঁড়ুয্যেকে কেন্দ্র করে আর একটি কাহিনি বিকশিত হয়েছে। সে মোল্লাহাটি গ্রামের চন্দ্র চাটুয্যের ভাগ্নে। বিচিত্র প্রকৃতির ভবানী প্রথম জীবনে সন্ন্যাসীর মতো গৃহত্যাগ করে দেশ-বিদেশের নানা স্থান ঘুরে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে মোল্লাহাটিতে এসে উপস্থিত হলে স্ত্রী জগদম্বার পীড়াপীড়িতে নীলকরের দেওয়ান রাজারাম তার তিন অনূঢ়া ভগ্নী — তিলু, নীলু ও বিলুর সঙ্গে ভবানীর বিয়ে দিয়ে মোল্লাহাটিতেই থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। ধনী শ্যালকের আশ্রয়ে থাকলেও ভবানীকে কখনো কোনো অন্যায় সুযোগ নিতে বা লোভের বশবর্তী হয়ে দুষ্কর্ম করতে দেখা যায় না। সে যুগের তুলনায় অনেকটা বেশি বয়সে স্বামীকে পাওয়ার কারণেই হয়ত প্রৌঢ় ভবানীকে পেয়ে তিলু, বিলু ও নীলু তিন বোনই খুব খুশিতে থাকে। তিন স্ত্রীর মধ্যে তিলুর প্রতি ভবানীর কিছুটা বেশি পক্ষপাতিত্ব ছিল। এটা তার অন্য দুই স্ত্রী জানলেও এতে তারা মোটেই অসন্তুষ্ট ছিল না। শুধু পরিবারে নয়, আপন বহুদর্শিতা, উদারতা, মধুর ও আন্তরিক ব্যবহারের মতো নানা চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে ভবানী গ্রামসমাজে একটা সম্ভ্রমের আসন তৈরি করে নেয়। গ্রামস্থ কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে মহিলা মহল পর্যন্ত সকলেই তাকে আপন করে নেয়। সে-ও যেন মোল্লাহাটির মায়ায় জড়িয়ে পড়ে। ক্রমে সস্ত্রীক ভবানী গ্রামের প্রান্তে পড়ে থাকা স্বধর্মনিষ্ঠ অর্ধশিক্ষিত রামকানাই কবিরাজ, খেপী সন্ন্যাসিনী, সাধারণ অবস্থা থেকে ধনী হয়ে ওঠা নালু পাল, গ্রামসামজের বিধিনিষেধ না মেনে চলা নিস্তারিণী, কুসুম প্রমুখের মতো মোল্লাহাটি গ্রামের সকল নারী-পুরুষের আপনজন হয়ে ওঠে। এমনকী দুর্ধর্ষ ডাকাত হলা পেকে-কেও তিলু-ভবানী আপন করে নেয় এবং সেও তাদের বশ্যতা স্বীকার করে। গ্রাম্য দলাদলি তাদের ছুঁতে পারে না — গ্রামস্থ সকলের ঘর থেকেই তাদের কাছে আমন্ত্রণ আসে, গ্রামের লোকেরা তীর্থ যাত্রার বাসনা পোষণ করলে পথপ্রদর্শক পরীক্ষার দায়িত্ব ভবানীর উপর পড়ে, নালু পাল তীর্থযাত্রী দলটিকে

ভোজন করিয়ে পুণ্য অর্জন করতে চাইলে সেই তদারকির ভার পড়ে তিলু ও ভবানীর উপর। অধ্যাত্ম সাধনা ভবানী চরিত্রের আর একটি দিক। সারাজীবন সে ঈশ্বরের সন্ধান চালিয়েছে। তিলুর গর্ভে তার সন্তান খোকন জন্ম নিলে খোকনকে দেখে এবং তার সঙ্গে সময় কাটিয়ে ভবানীর এই আধ্যাত্মিকতার দিকটি যেন পূর্ণতা পায়। এইসময় বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা এবং রেলগাড়ির মত যানবাহন চালু হয়ে গেছে। বিলুর মৃত্যুর পর ভবানী, তিলু ও নীলুর পরিকল্পনায় বুদ্ধিমান খোকনের ইংরেজি পড়ানোর ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে এই উপন্যাসে ভবানী বাঁড়ুয্যের কাহিনি শেষ হয়েছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা আর্থ-সামাজিক অবস্থার পটভূমিকায় লেখা বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' উপন্যাসটি আসলে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সামাজিক আখ্যান। এখানে ইছামতী তীরস্থ বাংলার গ্রামজীবনের যে চিত্র আঁকা হয়েছে, তা এককালের বাংলার সামগ্রিক গ্রামজীবনের বাস্তবচিত্র বলেই গণ্য হত। এই উপন্যাসের মোল্লাহাটির নীলকুঠি এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল যেন সমগ্র বাংলার গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই নিরিখে বলা যায় যে, সেই অর্থে 'ইছামতী' উপন্যাসে আঞ্চলিকতা নেই। তবুও এখানে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলি থেকে উপন্যাসটির আঞ্চলিক লক্ষণ স্পষ্ট হয়। ফলে উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাসের আঞ্চলিকতার আলোচনায় ঢুকে যায়। এই আলোচনায় ঢোকার সময় 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' গ্রন্থে 'ইছামতী' উপন্যাস সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার দাশ যে মন্তব্য করেছিলেন তা স্মরণে রাখতে হয় — ''ইছামতী নদীর তীরবর্তী গ্রামের মানুষের জীবনকথা এই উপন্যাসের মূলজীব্য। কাহিনীর কাল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক চরিত্র, ঘটনা অথবা রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা এখানে নেই। সাধারণ মানুষ, নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ সচরাচর প্রচলিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতিবাদী আখ্যান রচনা করেছেন।''[৩৬৫]

এই উপন্যাসটির আঞ্চলিক লক্ষণগুলির কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এর বিজ্ঞাপন অংশটির দিকে নজর দিতে হয়। সেখানে বলা হয়েছ — ''ইছামতী কি আগে ইচ্ছামতী ছিল? স্বপ্ন-কল্পনায় মেশা এই নদী। বিভূতিভূষণও এই নদীর কাকচক্ষু জলে স্নান করতে করতে বোধ করি সেই স্বপ্নই দেখেছিলেন।

আজ যে নদী দেখছেন কোথাও কোথাও — কচুরিপানায় বুজে যাওয়া সে ইছামতী নয় — স্নিগ্ধ শান্ত স্বপ্নিল নদী যার দুই কূল আচ্ছন্ন করে থাকত বাঁশ-ঝাড় আর অসংখ্য পত্রবহুল ছায়া-ঘন পাছপালা। এইখানে নদীজলে গা ডুবিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন গত একশ বছরে কত মানুষের জীবন সার্থক সফল হয়েছে; কত জীবন হয়েছে ব্যর্থ, কত হাসি কান্না, কত আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র উপল। সেই স্বপ্নেরই ফল এই 'ইছামতী' উপন্যাস।''[৩৬৬] এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই' উপন্যাসটির আখ্যান হল একমাত্র ইছামতী তীরস্থ অঞ্চলটিরই আখ্যান; অন্য কোনো অঞ্চলে এই আখ্যানটি নির্মাণ করা সম্ভব নয়। উপন্যাসটির সূচনাতেও ঔপন্যাসিক ঐ অঞ্চলটির কথা বলেছেন —

''ইছামতী একটি ছোট নদী। অন্ততঃ যশোর মধ্য দিয়ে যে অংশ প্রবাহিত, সেটুকু। দক্ষিণে ইছামতী কুমীর-কামট-হাঙ্গর সংকুল বিরাট নোনা গাঙে পরিণত হয়ে কোথায় কোন্ সুন্দরবনে সুঁদরি গরান গাছের জঙ্গলের আড়ালে বঙ্গোপসাগরে মিশে গিয়েচে, সে খবর যশোর জেলার গ্রাম্য অঞ্চলের কোন লোকই রাখে না।

ইছামতীর যে অংশ নদীয়া ও যশোর জেলার মধ্যে অবস্থিত, সে অংশটুকুর রূপ সত্যিই এত চমৎকার, যাঁরা দেখবার সুযোগ পেয়েচেন তাঁরা জানেন। কিন্তু তাঁরাই সবচেয়ে ভালো করে উপলব্ধি করবেন, যাঁরা অনেকদিন ধরে বাস করচেন এ অঞ্চলে। ভগবানের একটি অপূর্ব শিল্প এর দুই তীর, বনবনানীতে সবুজ, পক্ষী-কাকলীতে মুখর।''[৩৬৭] উপন্যাসের প্রায় সমস্ত ঘটনাই ঘটেছে ইছামতী তীরস্থ নদীয়া-যশোর সীমান্তের মোল্লাহাটির নীলকুঠি ও তৎসলগ্ন গ্রামগুলিতে, যার মধ্যে পাঁচপোতা, রাহাতুনপুর প্রভৃতি গ্রামও পড়ে। প্রকৃতি প্রেমিক ঔপন্যাসিক সময়-সুযোগ পেলেই এখানে ইছামতী নদী ও তার দুই তীরের বর্ণনা দিয়েছেন। পাশাপাশি ইছামতী তীরস্থ মোল্লাহাটি গ্রাম ও তৎসংলগ্ন কৃষিপ্রধান অঞ্চলটির প্রকৃতির বর্ণনাও দিয়েছেন। ঐ অঞ্চলটির বিবরণে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন — ''ভবানী বাঁড়ুয্যে দেড় বছরের মধ্যেই এ গ্রামকে, এ অঞ্চলকে বড় ভালোবাসলেন। এমন ছায়াবহুল দেশ তিনি কোথাও দেখেন নি জীবনে। বৈঁচি, বাঁশ, নিম, সোঁদাল, রড়া, কঁচুলতার বনঝোপ। দিনে রাতে শালিখ, দোয়েল, ছাতারে আর বৌ-কথা-ক পাখির কাকলী। ঋতুতে

ঋতুতে কত কি বনফুলের সমাবেশ। কোনো মাসেই ফুল বাদ যায় না — বনে বনে ধুন্দুলের ফুল, রাধালতার ফুল, কেয়া, বিল্বপুষ্প, আমের বউল, সুঁয়ো, বনচট্‌কা, নাটা-কাঁটার ফুল।''[৩৬৮] এই অঞ্চলটিকে পটভূমি করেই দীনবন্ধু মিত্র তাঁর বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটকটি লিখেছিলেন। তবে বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসটি না লিখলে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে স্বতন্ত্র এই অঞ্চলটির সামগ্রিক পরিচয় আমরা পেতাম না। তিনি এই উপন্যাসে শুধু ঐ অঞ্চলটিকেই তুলে আনেন নি; সেইসঙ্গে সেখানকার 'আঞ্চলিক রঙ'কেও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই উপন্যাসে একটি ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রামসমাজের কথা আছে। প্রধান চরিত্রদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। যেমন, ভবানী বাঁড়ুয্যে, তার তিন স্ত্রী — তিলু, বিলু এবং নীলু, দেওয়ান রাজারাম রায় ও তার স্ত্রী জগদম্বা, চন্দ্র চাটুয্যে, ফণী চক্কত্তি, কবিরাজ রামকানাই চক্রবর্তী, প্রসন্ন চক্রবর্তী প্রমুখ। এরা সবাই উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি। এদের মধ্যে একমাত্র ভবানী বাঁড়ুয্যে বাদে সবাই ঐ অঞ্চলটিরই সন্তান, এমনকি প্রসন্ন চক্রবর্তী আমিন বাদে কারোরই বাইরের জীবন সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। এরা ছাড়াও এই উপন্যাসে সেই অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের কামার, কুমোর, কলু, নাপিত, হাড়ি, ডোম, মুচি, বাগদি, কাওড়া, বুনো, জেলের মত শূদ্র সম্প্রদায়ের তথাকথিত অন্ত্যজ মানুষ এবং কিছু মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের উল্লেখ আছে। যেমন, নালু পাল, সতীশ কলু, ঈশ্বর নাপিত, হরি নাপিত, অঘোর মুচি, রাম বাগদি, ডাকাত হলা পেকে, অক্রূর জেলে, নরহরি পেশকার, তিনকড়ি, নীলমণি সমাদ্দার, নবু গাজি, দবিরুদ্দি-র মতো বিভিন্ন বৃত্তির অজস্র মানুষের উপস্থিতি এই উপন্যাসে আছে। এদের পাশাপাশি গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে বেশ কিছু উচ্চ ও নিম্নবর্ণের নারী। যেমন, নিস্তারিণী, বিরাজমোহিনী, বাগদি কন্যা গয়া মেম ও তার মা, নালু পালের স্ত্রী তুলসী ও তার ননদ, যতীনের বৌ প্রমুখ। এছাড়া বড়সাহেব শিপ্‌টন ও তার মেম, ছোট সাহেব ডেভিড্‌, ডাঙ্কিন প্রমুখ ইংরেজের উপস্থিতিও এই উপন্যাসে আছে। ইংল্যান্ড থেকে এলেও এরা অনেকটাই সেই অঞ্চলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল — ''সাহেবেরা ছোট-হাজারি খেলে বড় অদ্ভুত ধরনের। এক এক কাঁসি পান্তা ভাত এক ডজন লেবুর রস মেখে। রাত্রের টেবিলের ঠাণ্ডা হ্যাম। একটা

করে আস্ত শসা জন পিছু। চার-পাঁচটা করে খয়রা মাছ সর্ষের তেলে ভেজে। বহুদিন বাংলা দেশের গ্রামে থাকবার ফলে ওদের সকলেরও আহারবিহার এ দেশের গ্রাম্য লোকের মত হয়ে গিয়েচে। ওরা আম-কাঁটালের রস দিয়ে ভাত মেখে খায়। অনেকে হুঁকোয় তামাক খায়।''[৩৬৯] তাই বলা যায় যে, এই উপন্যসের প্রায় সব চরিত্রই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে; অন্যত্র এরা তেমনভাবে খাপ খাওয়াতে পারবে না।

উপন্যাসে গৃহীত মানুষগুলির জীবন পরিক্রমার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক তাদের জীবিকার বিবরণও এই উপন্যাসে দিয়েছেন। গ্রামের ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন — ''পাঁচপোতা গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার কেউই চাকরি করেন না। কিছু না কিছু জমি জমা সকলেরই আছে। সন্ধ্যার পর নিজ নিজ চন্ডীমন্ডপে পাশা-দাবার আড্ডায় রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত কাটানো এঁদের দৈনন্দিন অভ্যাস।''[৩৭০] চন্ডীমণ্ডপ এই গ্রামের মানুষগুলির জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ — ''চন্ডীমণ্ডপ হচ্ছে পল্লীগ্রামের একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত নিষ্কর্মা, ব্রহ্মোত্তর বৃত্তিভোগী, মূর্খ ব্রাহ্মণের দল জুটে কেবল তামাক পোড়ায় আর দাবা পাশা (তাসের প্রচলন এ সব পাড়া গাঁয়ে আদৌ নেই, ওটা বিলিতি খেলা বলে গণ্য) চালে। প্রত্যেক গৃহস্থের একখানা করে চন্ডীমণ্ডপ আছে। সকাল থেকে সেখানে আড্ডা বসে। তবে সম্পন্ন গৃহস্থের চন্ডীমণ্ডপে আড্ডা জোর বসে থাকে, কারণ সারাদিনে অন্ততঃ আধসের তামাক যোগাবার ক্ষমতা সব গৃহস্থের নেই।''[৩৭১] ঔপন্যাসিক ব্রাহ্মণদের জীবন পরিক্রমার বিবরণে এখানে ক্ষান্ত দেন নি। তিনি এদের সম্পর্কে আরও জানিয়েছেন — ''এরা সারাদিন এখানে বসে শুধু গল্প করে ও পাশা দাবা খেলে। জীবনসংগ্রাম এদের অজ্ঞাত, ব্রহ্মোত্তর জমিতে বছরের ধান হয়, প্রজাদের কাছ থেকে কিছু খাজনা মেলে, আম কাঠালের বাগান আছে, লাউ কুমড়োর মাচা আছে, আজ মাছ ধারে কিনে গ্রামের জেলেদের কাছে, দু'মাস পরে দাম দেওয়াই বিধি। সুতরাং ভাবনা কিসের? গ্রাম্য কলু ধারে তেল দিয়ে যায় বাখারির গায়ে দাগ কেটে। সেই বাখারির দাগ গুণে মাসকাবারির দাম শোধ হয়। এত সহজ ও সুলভ যেখানে জীবনযাত্রা, সেখানে অবকাশ যাপনের এই সব অলস ধারাই লোক বেছে নিয়েছে।''[৩৭২] চন্ডীমণ্ডপেই এই

নিষ্কর্মা ব্রাহ্মণগুলির দিনের শুরু হয়, আর এখানেই শেষ হয়। সেখানে পরনিন্দা-পরচর্চা থেকে শুরু করে নানারূপ আলাপ আলোচনা হলেও বাইরের জগৎ সম্পর্কে এই অলস, কর্মবিমুখ, অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তানগুলির তেমন কোনো জ্ঞানই নেই। তাদের চন্ডীমণ্ডপীয় আলোচনায় উঠে আসে — '' . . . সাহেবদের দেশে নাকি কলের গাড়ি উঠেচে। কলে চলে। কাগজে ছাপা করা ছবি নাকি সে দেখে এসেচে! . . .কালে কালে কতই দেখবো। আবার শুনেচ খুড়ো, মেটে তেল বলে একরকম তেল উঠেচে, পিদিমে জ্বলে। . . . বলে কলির কেতা, কলকেতা। আমাদের সর্ষে তেলই ভালো, রেড়ির তেলই ভালো, মেটে তেল, কাঠের তেলে আর দরকার নেই বাবাজি।''[৩৭৩] তীর্থদর্শন করতে গেলে এদের পথপ্রদর্শক হিসেবে ঈশ্বর বোষ্টমকে সঙ্গে নিতে হয়। অবশ্য ভবানী বাঁড়ুয্যের জীবনযাপন প্রণালী এদের সঙ্গে মেলে না, সে বহুদর্শী ব্যক্তি। এজন্য ঈশ্বর বোষ্টমকে পরীক্ষা করার দায়িত্ব তার উপরেই বর্তায়। উপন্যাসে ভবানী বাঁড়ুয্যে তার জীবন পরিক্রমা এই মূর্খ ব্রাহ্মণদের চন্ডীমন্ডপীয় আড্ডায় সীমাবদ্ধ না রেখে কখনো নিজের বাড়িতে, কখনো ইছামতীর নির্জন তীরে, কখনো খেপী সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে, আবার কখনো বা স্বধর্মনিষ্ঠ রামকানাই কবিরাজের সঙ্গে ঈশ্বরবিষয়ক চিন্তা ও আলোচনায় মগ্ন রাখে।

তবে ব্রাহ্মণেরা তেমন কোনো কাজকর্ম না করলেও দেওয়ান রাজারামের নিরলস প্রচেষ্টায় বড়সাহেব শিপ্টন এবং ছোটসাহেব ডেভিড্-এর তত্ত্বাবধানে মোল্লাহাটি নীলকুঠির কাজ কিন্তু চলতেই থাকে। ঔপন্যাসিক শিপ্টনের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন — ''মোল্লাহাটির নীলকুঠির বড় সাহেব শিপ্টনকে এ অঞ্চলে বাঘের মত ভয় করে লোকে। লম্বাচওড়া চেহারা, বাঘের মত গোল মুখখানা, হাতে সর্বদাই চাবুক থাকে। এ অঞ্চলের লোক চাবুকের নাম রেখেছে 'শ্যামচাঁদ'। কখন কার পিঠে 'শ্যামচাঁদ' অবতীর্ণ হবে তার কোন স্থিরতা না থাকায় সাহেব রাস্তায় বেরুলে সবাই ভয়ে সন্ত্রস্থ থাকে।''[৩৭৪] আর দেওয়ান রাজারাম সম্পর্কে জানিয়েছেন — ''রায় মশায়ের পুরো নাম রাজারাম রায়। মোল্লাহাটি নীলকুঠির দেওয়ান। সাহেবের খয়েরখাই ও প্রজাপীড়নের জন্য এদেশের লোকে যেমন ভয় করে, তেমনি ঘৃণা করে। কিন্তু মুখে কারো কিছু বলার সাহস নেই। নিকটবর্তী পাঁচপোতা গ্রামে বাড়ি।''[৩৭৫] কুঠিতে

জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এলে তার খাতির-যত্ন থেকে শুরু করে নীলের জমি চিহ্নিত করা, চাষিদের দাদন দেওয়া, কেউ নীলচাষে রাজি না হলে তাকে জব্দ করা প্রভৃতি সমস্ত কাজই দেওয়ান রাজারাম, প্রসন্ন চক্রবর্তী আমিন, রসিক বাগ্‌দি লাঠিয়াল প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে সুনিপুণ দক্ষতায় করে যায়। তার এসব কাজের ফিরিস্তি দিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''কুঠিতে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর আসবেন। দেওয়ান রাজারাম ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন আজ সকাল থেকে। ভেড়া, মাছ, ভালো আম ও ঘি যোগাড় করবার ভার তাঁর ওপর। মাঝে মাঝে এ রকম লেগেই আছে, সাহেবসুবো অতিথি যাতায়াত করচে মাসে দু'বার তিনবার।''[৩৭৬] মুসলিমপ্রধান গ্রাম রাহাতুনপুরের চাষিরা নীলচাষ করতে না চাইলে গ্রামটি আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে — ''রাত্রে রাহাতুনপুর গ্রাম একেবারে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েচে। বড় বড় চাষিদের গ্রাম, কারো বাড়ি বিশ-ত্রিশটা পর্যন্ত ধানের গোলা ছিল — আর ছিল ছ'চালা আটচালা ঘর, সব পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েচে। কিভাবে আগুন লেগেছিল কেউ জানে না, তবে সন্ধ্যারাত্রে ছোট সাহেব এবং দেওয়ানজি রাহাতুনপুরের মোড়লের বাড়ি গিয়েছিলেন; সেখানে প্রজাদের ডাকিয়ে নীল বুনবে না কেন তার কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন। তারা রাজী হয় নি। ওঁরা ফিরে আসে রাত এগারোটার পর। শেষরাত্রে গ্রামসুদ্ধ আগুন লেগে ছাইয়ের ঢিবিতে পরিণত হয়েচে। এই দুই ব্যাপারের মধ্যে কার্যকারণ-সম্পর্ক বিদ্যমান বলেই সকলে সন্দেহ করচে।''[৩৭৭] নীলকুঠীর কাজকর্মের পাশাপাশি এই উপন্যাসে নালু পাল, অঘোর মুচি, অক্রূর জেলে, দীনু মুচিদের মতো নিম্নবর্ণের মানুষগুলির নানা বৃত্তির উল্লেখ আছে। আপন পরিশ্রমের জোরে ব্যবসা করে নালু পাল ও সতীশ কলু সে অঞ্চলের ধনী হয়ে ওঠে; এমনকি একসময় মোল্লাহাটির নীলকুঠিটি কিনে নিয়ে জমিদার হয়ে যায়। ঐ অঞ্চলে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে টাকা-পয়সার প্রচলন থাকলেও সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হত কড়ি। এ প্রসঙ্গে নালু পালের দোকানের বেচাকেনার বর্ণনা উল্লেখ করা যায় — ''দোকানে ওর বড় ভিড় জমে গেল। কড়ির খদ্দের বেশি, পয়সার কম। টাকা ভাঙাতে এলোনা একজনও। কেউ টাকা বার করলে না।''[৩৭৮] ঐ অঞ্চলের চোর-ডাকাতদের উৎপাতের পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক হলা পেকে ও অঘোর মুচির নানা দুঃসাহসিক চুরি-ডাকাতির বিবরণ দিয়েছেন।

এই উপন্যাসে গৃহীত ইছামতী নদী তীরস্থ মোল্লাহাটী ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলটির মানুষগুলির ধর্মবিশ্বাসের পরিচয়ও আছে। এখানে মুসলিম সমাজের কিছু মানুষের উল্লেখ থাকলেও হিন্দুধর্মের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। তখনও ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজে কৌলিন্য প্রথা ব্যাপকভাবে চালু ছিল। দেওয়ান রাজারাম রায় ধনী ব্রাহ্মণ হলেও তার তিন বোন তিলু, বিলু ও নীলু বিয়ের বয়স পার হয়ে গেলেও অনূঢ়া ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সী ভবানী বাঁড়ুয্যের সঙ্গে তিন বোনের বিয়ের কথা উত্থাপিত হলে বড়বোন তিলুর মনোভাবের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''তিলু কত রাত পর্যন্ত ছাদে বসে ভাবলে। ত্রিশ বছর তার বয়স হয়েচে। স্বামীর মুখ দেখা ছিল অস্বপনের স্বপন। এখনো বিশ্বাস হয় না; সত্যিই তার বিয়ে হবে? স্বামীর ঘরে সে যাবে? বোনেদের সঙ্গে, তাই কি? ঘরে ঘরে তো এমনি হচ্চে। চন্দ্রকাকার বাপের সতেরোটা বিয়ে ছিল। কুলীন ঘরে অমন হয়েই থাকে। বিয়ের দিন কবে ঠিক করেচে দাদা কে জানে। বরের বয়স পঞ্চাশ তাই কি, সে নিজে কি আর খুকি আছে এখন?''[৩৭৯] অবশ্য বিয়ের অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ এই উপন্যাসে নেই। তবে ভবানী বাঁড়ুয্যে ও তিলুর সন্তান খোকার অন্নপ্রাশনের বর্ণনা এখানে আছে — ''ভবানী বাঁড়ুয্যে খোকাকে কোলে নিয়ে পাড়া প্রদক্ষিণ করতে চললেন, পেছনে পেছনে স্বয়ং রাজারাম চললেন ফুল আর খই ছড়াতে ছড়াতে। দীনু মুচি ঢোল বাজাতে বাজাতে চললো। বাঁশি বাজাতে বাজাতে চললো তার ছেলে। রায়পাড়া, ঘোষপাড়া ও পুবেরপাড়া ঘুরে এলেন ভবানী বাঁড়ুয্যে অতটুকু শিশুকে কোলে করে নিয়ে। বাড়ি বাড়ি শাঁখ বাজতে লাগলো। মেয়েরা ঝুঁকে দেখতে এলো খোকাকে।''[৩৮০] এই উপন্যাসে খোকার জন্মতিথি পালন এবং সেই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করে মানুষকে খাওয়ানোর প্রসঙ্গও আছে। এসবের পাশাপাশি ব্রাহ্মণদের তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে এবং তীর্থযাত্রা করে ফিরে আসার পর তাদের উৎকৃষ্ট ফলাহার করে নালু পালের তীর্থভ্রমণের পুণ্য করার কথাও এখানে আছে। তবে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মানুষগুলির ধর্মাচরণের পার্থক্য ছিল। নিম্ন বর্ণের খেপি সন্ন্যাসিনীর আশ্রম সম্পর্কে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''মূর্তি নেই, ত্রিশুল বসানো সিঁদুরলেপা একটা উঁচু জায়গা আছে গাছতলায়, আসন বলা হয় তাকেই। ভবানী বাঁড়ুয্যে একমনে বসে থাকবার পরে সন্ন্যিসিনী সেখানে এসে বসলো তাঁর পাশেই। সন্নিসিনীর রং কালো, বয়েস

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, মুখশ্রী তাড়কা রাক্ষসীকে লজ্জা দেয়, মাথার দু'দিক থেকে দু'টি লম্বা জট এসে কোলের উপর পড়েছে।''[৩৮১] ব্রাহ্মণেরা এদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলত। তাই তারা ভবানী বাঁড়ুয্যেকে পরমর্শ দেয় — ''ও সব জায়গায় ব্রাহ্মণের গেলে মান থাকে না। শুনিচি সে মাগী নাকি জাতে বুনো। তুমিও বাবাজি সেখানে আর যেও না।''[৩৮২] এই ব্রাহ্মণেরা ধনী নালু পালের বাড়িতে দুর্গা পূজার প্রসাদ নিতে যেতে অস্বীকার করে। অবশ্য ভবানী বাঁড়ুয্যে এসব সংকীর্ণতার মধ্যে থাকে নি।

উপন্যাসে গ্রাম্য লোকাচার-লোকসংস্কৃতির বিবরণ প্রসঙ্গে 'তেরের পালুনি' অনুষ্ঠানের কথা আছে। ভাদ্র মাসের তেরো তারিখে ইছামতীর ধারে পাঁচপোতা গ্রামের বৌ-ঝিদের বনভোজনের উৎসব হল 'তেরের পালুনি' — ''মেয়েরা পাড়া হিসেবে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বনভোজনের আয়োজন করচে। এখানে আর রান্না হয় না, বাড়ি বাড়ি যার যার যেমন সঙ্গতি — খাবার জিনিস নিয়ে এসে কলার পাতা পেতে খেতে বসে, মেয়েরা ছড়া কাটে, গান গায়, উলু দেয়, শাঁখ বাজায়। এই বনভোজনের একটি চিরাচরিত প্রথা এই, তুমি সম্পন্ন গৃহস্থঘরের বৌ, তুমি ভালো জিনিস এনেচ খাবার জন্যে — যারা দারিদ্র্যের জন্য তেমন কিছু আনতে পারে নি , তাদের তুমি ভাগ করে দেবে নিজের আনা ভালো খাবার। এ কেউ বলে দেয় না, কেউ বাধ্যও করে না — এ একটি অলিখিত গ্রাম্য প্রথা বরাবর চলে আসচে এবং সবাই মেনেও এসেচে।''[৩৮৩] এই পরব উপলক্ষে গ্রামের বৌ-ঝিরা হাসি, ইয়ার্কি, ঠাট্টা, তামাসায় এক আনন্দমুখর দিন কাটায়। কেউ কেউ গান, ছড়া প্রভৃতির মাধ্যমে আসর জমিয়ে তোলে। যেমন ফণি চক্কোত্তির বিধবা বোন বিধূ সেই অঞ্চলে প্রচলিত একটি ছড়া হাত নেড়ে বলতে আরম্ভ করে —

''আজ বলেচে যেতে
পান সুপুরি খেতে
পাতের ভেতর মৌরি-বাটা
ইস্কে বিস্কে ছবি আঁটা
কলকেতার মাথা ঘষা
মেদিনীপুরের চিরুনি

এমন খোঁপা বেঁধে দেবো
চাঁপা ফুলের গাঁথুনি
আমার নাম সরোবালা
গলায় দিব ফুলের মাল — ''[৩৮৪]

এই পরবের মধ্য থেকে ঐ অঞ্চলের লোকাচার এবং লোকসংস্কৃতির ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

এই উপন্যাসে মোল্লাহাটি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের মানুষজনের ঘরবাড়ি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনাও আছে। ঘরবাড়ির পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন যে, সেখানকার অধিকাংশ মানুষই ছিলেন গরীব; তাদের বাড়ি হত মাটির চারচালা বা ছয়চালা। একমাত্র বড়োলোকেরাই আটচালা ঘর বানায় — ''আটচালা ঘর তৈরি করা এ সব পাড়াগাঁয়ে বড়মানিষির লক্ষণ, আর চরম বড়মানুষি অবিশ্যি দুর্গোৎসব করা!''[৩৮৫] অবশ্য প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতে চন্ডীমন্ডপ থাকত। এই উপন্যাসে ফণি চক্কত্তির চন্ডীমন্ডপের বিবরণে লেখা হয়েছে — ''ফণি চক্কত্তির সেকেলে চন্ডীমন্ডপ। একটা বাহাদুরি কাঠের খুঁটির গায়ে খোদাইকরা লেখা আছে — ''শ্রীশিবসত্য চক্কবর্তী কর্তৃক সন ১১৭২ সালে মাধব ঘরামি ও অক্রূর ঘরামি তৈরি করিল এই চন্ডীমন্ডপ ইহা ঠাকুরের ঘর ইহা জানিবা'' — সুতরাং চন্ডীমন্ডপের বয়স প্রায় একশত বছর হতে চলেচে। অনেক দূর থেকে লোকে এই চন্ডীমন্ডপ দেখতে আসে। খড়ের চাঁচ ও পাট, রলা ও সলা বাখারির কাচ, ছাঁচপড়নের বাঁশের কাজ, মটকায় দুই লড়ায়ে পায়রায় খড়ের তৈরী ছবি দেখে লোকে তারিফ করে। এমন কাজ এখন নাকি প্রায় লুপ্ত হতে বসেচে এদেশে।''[৩৮৬] ঐ অঞ্চলের মানুষদের খাদ্যতালিকায় নানা ধরনের জিনিস স্থান পেত। ভাত, মুড়ির চল বেশি ছিল, বিভিন্ন প্রকার গ্রাম্য তরি-তরকারি তো ছিলই, সঙ্গে ছিল ইছামতীর মাছ; খয়রা মাছের উল্লেখ উপন্যাসে বেশ কয়েকবার আছে। এদের খাদ্য তালিকায় নানাপ্রকার ফলও ছিল; ফলের মধ্যে কাঁঠালের উল্লেখ অনেকবার আছে। সন্ধ্যে বেলা দেওয়ান রাজারামের খাদ্যতালিকা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — ''তিলু একটা কাঁসার জামবাটিতে মুড়ি ও ছোলাভাজা সর্ষের তেল দিয়ে জবজবে করে মেখে নিয়ে এলো — সে জামবাটিতে

অন্তত আধ কাটা মুড়ি ধরে। বিলু নিয়ে এলো একঘটি জল ও একটা পাথরের বাটিতে আধ পোয়াটাক খেজুর গুড়।''[৩৮৭] ভবানী বাঁড়ুয্যে ও তিলুর সন্তান খোকার অন্নপ্রাশনের খাওয়া-দাওয়ার বর্ণনায় লেখা হয়েছে — ''ব্রাহ্মণভোজনের সময় নিমন্ত্রিতদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা হতে লাগলো। কে কত কলাইয়ের ডাল খেতে পারে। কে কত মাছ খেতে পারে। মিষ্টি শুধু নারকোল নাড়ু। খেতে বসে অনেকে বললেন এমন নারকোলের নাড়ু তারা অনেককাল খান নি। অন্য কোন মিষ্টির রেওয়াজ ছিল না দেশে। এক একজন সাত আট গণ্ডা নারকোলের নাড়ু, আরো অতগুলো অন্নপ্রাশনের জন্য ভাজা আনন্দনাড়ু উড়িয়ে দিলে অনায়াসে।''[৩৮৮] লুচি-চিনি সেই অঞ্চলে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট খাবার বলে গণ্য হত। এর সঙ্গে ঐ অঞ্চলের মানুষজনের পরিচয় খুব কম হত। নালু পাল তার বাড়ির দুর্গোৎসবে লুচি-চিনি খাইয়েছিল।

ঔপন্যাসিক যশোর অঞ্চলে প্রচলিত বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপ দিয়েই চরিত্রদের সংলাপগুলি রচনা করেছেন। এই ভাষা সম্পর্কে ভবানী বাঁড়ুয্যের প্রথম দিককার অভিজ্ঞতার বর্ণনায় ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ''তিলুর কথার সুরে যশোর জেলার গ্রাম্য টানগুলি ভবানী বাঁড়ুয্যের এত মিষ্টি লাগে! তিনি নিজে নদীয়া জেলার লোক, সেখানকার বাংলার উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গী সুমার্জিত। এদেশে এসে প্রথম শুনলেন এ ধরনের কথা।''[৩৮৯] এই উপন্যাসে যশোরের আঞ্চলিক ভাষার সাদৃশ্যে গ্রাম্য মানুষগুলির মুখে 'এ'-কারের স্থানে 'ই'-কারের বহুল প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন, 'মুগির ডালি,' 'ঘি দিলি ক্ষীরি তার হয়', 'শিবির মাটি', 'পুবির ঘর', 'বাড়িতি থাকবে', 'কৃপা হলি', 'বলতি বলতি', 'রাত্তিরি খাবেন', 'ওদের জন্যি, 'করতি পারে', 'শুনিচি', 'যেতি হবে', 'কথা শুনলি' প্রভৃতি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস 'ইছামতী'তে আঞ্চলিক উপন্যাসে এত সব বৈশিষ্ট্য থাকলেও উপন্যাসটি একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হয় নি। সত্যিকথা বলতে কি আঞ্চলিক উপন্যাসে সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে যে 'আঞ্চলিক রঙ' উঠে আসে তার পুরো ছবি এই উপন্যাসে নেই। এই উপন্যাসে মোল্লাহাটির নীলকুঠিকে কেন্দ্র করে যে কাহিনিটি পরিবেশিত হয়েছে, বাংলায় নীলচাষের রমরমার

সময়ে যে কোনো অঞ্চলেই সেরূপ কাহিনি গড়ে ওঠা সম্ভব। আর পাঁচপোতা গ্রামের কাহিনিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ভবানী বাঁড়ুয্যে এবং তার পরিবার; এরা উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি। উপন্যাসটির নায়করূপে চিত্রিত হয়েছে যে মানুষটি অর্থাৎ ভবানী বাঁড়ুয্যে আদতে বহিরাগত; ঐ অঞ্চলের সন্তান নন। এখানকার গ্রামসমাজটি সমকালের যে কোন বর্ধিষ্ণু গ্রাম সমাজেরই একটি প্রতিনিধি বলে মনে হয়। উপন্যাসে গ্রামাঞ্চলটির সর্বাঙ্গীণ চিত্র রচনার পাশাপাশি ভবানী বাঁড়ুয্যের ঈশ্বর অনুসন্ধানও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে বিভূতিভূষণের মানসিকতা সম্পর্কে অধ্যাপক-সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — ''তাঁর শেষ বড়ো উপন্যাস 'ইছামতী' (১৯৫০)-তেও বিমুগ্ধ প্রকৃতিদৃষ্টি, ঈশ্বরবিশ্বাস ও দরিদ্রজীবনপ্রীতি উপস্থিত।''[৩৯০] এই উপন্যাসে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবনেরও কিছু প্রক্ষেপ পড়েছে। তাই এই উপন্যাসের শ্রেণি নির্ণয় করতে গেলে অনেক কিছুই উঠে আসে। ইতিহাসের আশ্রয়ে সামাজিক উপন্যাস, অধ্যাত্মপ্রেমমূলক উপন্যাস, আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস প্রভৃতি শ্রেণি বিভাগগুলির কথা মাথায় আসে। আর এসব থেকে মনে হয় যে, 'ইছামতী' উপন্যাসটি আদৌ বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় আসে না।

তবে উপন্যাসটি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পড়লে এর মধ্যে আঞ্চলিকতার অনেক উপকরণকেই খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের আলোচনায় সেটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথাতেও তার ইঙ্গিত আছে — ''বিভূতিভূষণ ইতিহাস সচেতন শিল্পী নন, পরিবর্তমান কালের নানা তরঙ্গবিক্ষোভের শিল্পী নন, যুগবিক্ষোভ বা বাস্তবতার রূপকার নন। সুতরাং 'ইছামতী'তে তার অন্বেষণে লাভ নেই। প্রকৃতিপ্রেমিক, দরিদ্র সংসারপ্রেমিক, ঈশ্বরবিশ্বাসী বিভূতিভূষণের পরিচয়ই 'ইছামতী'তে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি সাধারণ গরীব মানুষের সুখদুঃখের ইতিহাস লিখতে চেয়েছিলেন। তা তিনি পেরেছেন।''[৩৯১] সত্যি সত্যিই 'ইছামতী' উপন্যাসে গরীব মানুষের সুখ-দুঃখের ইতিহাস প্রাধান্য পেয়েছে। তবে সেটা উঠে এসেছে মূলত যশোরে ইছামতী তীরস্থ মোল্লাহাটির নীলকুঠি এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলটির প্রেক্ষাপটেই। উপন্যাসটি বিজ্ঞাপনেও লেখা হয়েছে — ''ইচ্ছা ছিল এক শতাব্দীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন, মানুষের দৃষ্টি, তার জীবন-স্বপ্নের বিকৃতি, এর পূর্ণ চিত্র

রেখে যাবেন — হয়তো লিখবেন আরও দু'তিনটি উপন্যাস এই ইছামতীকে অবলম্বন করে কিন্তু বিধাতার বিচিত্র বিধানে তা সম্পূর্ণ হল না।''[৩৯২] হয়তো আরও দু'একটি খণ্ড লিখলে উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির প্রকৃতি এবং মানুষজনের সামগ্রিক চিত্র প্রকাশিত হয়ে এর আঞ্চলিক উপন্যাস হওয়ার পেছনে যে ঘাটতিগুলো আছে সেগুলিকে পূর্ণ করা সম্ভব হত। তাই বলা যায় যে, বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' হয়তো পুরোপুরি আঞ্চলিক উপন্যাস হয় নি; তবে আঞ্চলিক উপন্যাসের বেশ কিছু লক্ষণ পূরণ করে এটি একটি আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাস হয়ে উঠেছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। কল্লোল যুগ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দশম প্রকাশ : শ্রাবন ১৪১৬, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ১৬,
২। তদেব, পৃ ১৯
৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড) : সুকুমার সেন, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, পঞ্চম মুদ্রণ : জুন ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ ৩৪৬,
৪। কালের প্রতিমা : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পঞ্চম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ২২
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োবিংশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, পৃ ৫৫৩
৬। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য : গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, তৃতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৪১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ২২৫
৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড), পৃ ৩৪৮
৮। তদেব, পৃ ৩৪৮
৯। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা : সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ২১৩
১০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ ২০০৪-২০০৫, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ৬৬৮
১১। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, পৃ ২২৮
১২। কয়লাকুঠির দেশ : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইতেদেবট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ২
১৩। তদেব, পৃ ১৩
১৪। তদেব, পৃ ১৩
১৫। অলোক রায়ের 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থের দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় রচিত 'আঞ্চলিক উপন্যাস' অংশ, তৃতীয় সংস্করণ : আগস্ট ২০০২, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ ৪-৫
১৬। কালের প্রতিমা, পৃ ২৪৪
১৭। লেখকের কথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৭
১৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড), পৃ ৩৫৫
১৯। কালের প্রতিমা, পৃ ২২
২০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড), পৃ ৩২১
২১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৪৭৯-৪৮০
২২। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ২১৪
২৩। তদেব, পৃ ২১৪
২৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড) পৃ ৩৬১

২৫। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫১৬
২৬। তদেব, পৃ ৫১৬
২৭। পদ্মানদীর মাঝি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৪৩, চুয়াল্লিশতম মুদ্রণ মাঘ ১৪১৮, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ৭
২৮। তদেব, পৃ ১৩
২৯। তদেব, পৃ ১৬
৩০। তদেব, পৃ ২০
৩১। তদেব, পৃ ৩০
৩২। তদেব, পৃ ১৫
৩৩। তদেব, পৃ ৩৪
৩৪। তদেব, পৃ ১৪
৩৫। তদেব, পৃ ৪৩
৩৬। তদেব, পৃ ৪০
৩৭। তদেব, পৃ ২২
৩৮। তদেব, পৃ ৬১
৩৯। তদেব, পৃ ৪২
৪০। তদেব, পৃ ১১২-১১৩
৪১। তদেব, পৃ ১৪
৪২। তদেব, পৃ ৩৯
৪৩। তদেব, পৃ ১৮
৪৪। তদেব, পৃ ২৯
৪৫। তদেব, পৃ ৫৯
৪৬। তদেব, পৃ ১১১
৪৭। তদেব, পৃ ৬৯
৪৮। তদেব, পৃ ১৮
৪৯। তদেব, পৃ ২৪
৫০। তদেব, পৃ ৫৩
৫১। তদেব, পৃ ২৫
৫২। তদেব, পৃ ৮৩
৫৩। তদেব, পৃ ৩৫
৫৪। তদেব, পৃ ২৬
৫৫। কালের প্রতিমা, পৃ ৯২-৯৩
৫৬। সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, পৃ ৫
৫৭। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৭৬৪
৫৮। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ২১৩
৫৯। অশুকুমার সিকদারের 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : আদি উপন্যাস' প্রবন্ধ, চতুর্থ সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৪১৫, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ ২০৭
৬০। কালের প্রতিমা, পৃ ৯২
৬১। নিতাই বসুর 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা' (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮) গ্রন্থের নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা অংশ।
৬২। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য : গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, তৃতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৪১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ২৬৩
৬৩। তদেব, পৃ ২৬৩
৬৪। সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ১৬৮
৬৫। উপন্যাসের শৈলী : আশিসকুমার দে, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩, প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃ ৭৯
৬৬। কথাশিল্পী : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৪, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ ২০
৬৭। কালের প্রতিমা, পৃ ২৪৫
৬৮। বাংলা সাহিত্যসঙ্গী : শিশিরকুমার দাশ (সংকলন ও সম্পাদনা), প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১০, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ ১২২
৬৯। মানিক উপন্যাস : জীবনের জটিলতা : কানাই সেন, প্রথম প্রকাশ : ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫, পুঁথি প্রকাশনা, কলকাতা, পৃ ৫২
৭০। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'বাংলা সাহিত্যের নানারূপ' গ্রন্থের 'আঞ্চলিক উপন্যাস' অংশ, প্রথম প্রকাশ : ১লা তদেবাদ্র, ১৩৮৫, ষষ্ঠ মুদ্রণ : শ্রাবন, ১৪১০, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, পৃ ১৪১-১৪২

৭১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৪১
৭২। নতুনফসল : সরোজকুমার রায়চৌধুরী, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ২০০২, অঞ্জলী প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ ৩৭৬
৭৩। সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, পৃ ৫
৭৪। বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ২২৩
৭৫। নতুনফসল, পৃ ৯
৭৬। তদেব, পৃ ১২৫
৭৭। তদেব, পৃ ৭-৮
৭৮। সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, পৃ ৫
৭৯। নতুনফসল, পৃ ২৪
৮০। তদেব, পৃ ২৫
৮১। তদেব, পৃ ২৩-২৪
৮২। তদেব, পৃ ৬৫
৮৩। তদেব, পৃ ৩৭
৮৪। তদেব, পেছনের প্রচ্ছদ
৮৫। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য : বাসুদেব মোশেল (সম্পাদিত), গ্রন্থে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত ‘আঞ্চলিক উপন্যাস‘ প্রবন্ধ, প্রথম প্রকাশ : ২০০৮, বুকসওয়ে, কলকাতা, পৃ ৪২৮
৮৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (চতুর্থ পর্যায়) — ভুদেব চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৪, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ৩৭৪-৩৭৫
৮৭। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৪৩
৮৮। সাহিত্য বিতান : মোহিতলাল মজুমদার, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৬, পৃ ৪০৭
৮৯। প্রবন্ধ সঞ্চয়ন : ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত) গ্রন্থের সমরেশ মজুমদারের ‘উপন্যাসে আঞ্চলিকতা বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস’ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১৪১২, রত্নাবলী, কলকাতা, পৃ ১০৬৮
৯০। তদেব, পৃ ১০৬৮
৯১। আরণ্যক : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায়, দ্বাবিংশ মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পেছনের প্রচ্ছদের বিজ্ঞাপন অংশ
৯২। বিভূতি রচনাবলী (১ম খণ্ড) : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে’জ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৩৭৭, পৃ ৪১৭
৯৩। সংসদ বাংলা সাহিত্য সঙ্গী, পৃ ২৬
৯৪। কালের প্রতিমা, পৃ ৫৩
৯৫। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৬১৪
৯৬। আরণ্যক, পেছনের প্রচ্ছদের বিজ্ঞাপন অংশ
৯৭। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ১৭৭
৯৮। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৬৪
৯৯। তদেব, পৃ ২৬৫
১০০। উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি, পৃ১১৩-১১৪
১০১। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, পৃ ২৩৯
১০২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ, ৬১৪-৬১৫
১০৩। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৭০
১০৪। আরণ্যক, পৃ ১২০
১০৫। তদেব, পৃ ১৩
১০৬। তদেব, পৃ ২১
১০৭। তদেব, পৃ ১৫৫
১০৮। তদেব, পৃ ১৫৭
১০৯। তদেব, পৃ ১১
১১০। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য, পৃ ৪২৯
১১১। সাহিত্য প্রকরণ, পৃ ১৭৪
১১২। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ১০৭
১১৩। ধাত্রীদেবতা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ — আশ্বিন ১৩৪৬, অষ্টাদশ মুদ্রণ — পৌষ ১৪০৫, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ ৫
১১৪। তদেব, পৃ ৫
১১৫। তদেব, পৃ ২২৪
১১৬। তদেব, পৃ ১৮৯
১১৭। তদেব, পৃ ১৬৩
১১৮। তদেব, পৃ ৮২
১১৯। তদেব, ১১৯
১২০। তদেব, পৃ ৯০

১২১। তদেব, পৃ ৭৭
১২২। তদেব, পৃ ৬
১২৩। তদেব, পৃ ৭
১২৪। তদেব, পৃ ৭৬
১২৫। তদেব, পৃ ১৬৬
১২৬। তদেব, পৃ ১৬৭
১২৭। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৪৯
১২৮। তদেব, পৃ ৫৫১-৫৫২
১২৯। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ৫০
১৩০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৫২
১৩১। কালিন্দী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্দশ মুদ্রণ, পৌষ ১৪১২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ ১৭
১৩২। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৪২-২৪৩
১৩৩। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৫২
১৩৪। কালিন্দী, পৃ ৩
১৩৫। তদেব, পৃ ২৩৫
১৩৬। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৫৩
১৩৭। কালিন্দী, পৃ ১৮
১৩৮। তদেব, পৃ ৮৮
১৩৯। তদেব, পৃ ৬৯
১৪০। তদেব, পৃ ৬৯
১৪১। তদেব, পৃ ১২৫
১৪২। তদেব, পৃ ১২৫
১৪৩। তদেব, পৃ ৮২
১৪৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৫৩
১৪৫। কালিন্দী, পৃ ১৭
১৪৬। তদেব, পৃ ২১
১৪৭। তদেব, পৃ ৭২
১৪৮। তদেব, পৃ ৮৩
১৪৯। গণদেবতা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নবম মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'প্রথম সংস্করণের নিবেদন' অংশ।
১৫০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৫৫
১৫১। তদেব, পৃ ৫৫৮
১৫২। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ৬২
১৫৩। তদেব, পৃ ১২০
১৫৪। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৪৫
১৫৫। তদেব, পৃ ২৪৬
১৫৬। কালের প্রতিমা, পৃ ২১২
১৫৭। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ১৯৯
১৫৮। কালের প্রতিমা, পৃ ২৩২
১৫৯। তদেব, পৃ ১৬৪
১৬০। পঞ্চগ্রাম : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ষষ্ঠ মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, ভূমিকা অংশ
১৬১। কালের প্রতিমা, পৃ ৩৩
১৬২। তদেব, পৃ ১৬৩-১৬৪
১৬৩। তদেব, পৃ ১৬৩
১৬৪। গণদেবতা, পৃ ১৬
১৬৫। তদেব, পৃ ২০৪
১৬৬। কালের প্রতিমা, পৃ ২৫
১৬৭। তদেব, পৃ ১৬৩
১৬৮। তদেব, পৃ ১৬২
১৬৯। পঞ্চগ্রাম, পৃ ৪০-৪১
১৭০। তদেব, পৃ ২৪-২৫
১৭১। গণদেবতা, পৃ ৬৬
১৭২। তদেব, পৃ ১৩০

১৭৩। তদেব, পৃ ২০৩
১৭৪। তদেব, পৃ ৪২
১৭৫। তদেব, পৃ ১০৮
১৭৬। তদেব, পৃ ১২০
১৭৭। তদেব, পৃ ২৩২
১৭৮। তদেব, পৃ ১৩১
১৭৯। তদেব, পৃ ১৩২
১৮০। তদেব, পৃ ১৩২
১৮১। তদেব, পৃ ১৩৩
১৮২। পঞ্চগ্রাম, পৃ ১৩৪
১৮৩। তদেব, পৃ ১৩৪
১৮৪। তদেব, পৃ ১৫৬
১৮৫। তদেব, পৃ ১৬৩
১৮৬। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৫৮
১৮৭। তদেব, পৃ ৫৬১
১৮৮। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৪৮
১৮৯। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃষ্ঠা ৪১
১৯০। কবি : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিংশ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৭, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, উৎসর্গপত্র
১৯১। তদেব, পৃ ১৭১
১৯২। তদেব, পৃ ১
১৯৩। তদেব, পৃ ৮৩
১৯৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৪৯
১৯৫। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৫৪
১৯৬। কালের প্রতিমা, পৃ ৪২
১৯৭। কবি, পৃ ১৮
১৯৮। তদেব, পৃ ১৫৫
১৯৯। তদেব, পৃ ১১০
২০০। তদেব, পৃ ১১৭
২০১। তদেব, পৃ ১০৬
২০২। তদেব, পৃ ২৩
২০৩। তদেব, পৃ ৩২
২০৪। তদেব, পৃ ৩৫
২০৫। তদেব, পৃ ৩৬
২০৬। তদেব, পৃ ৫১
২০৭। তদেব, পৃ ৫৩
২০৮। তদেব, পৃ ৬৩
২০৯। তদেব, পৃ ৮৩
২১০। তদেব, পৃ ১০৮
২১১। তদেব, পৃ ১২৮
২১২। তদেব, পৃ ১৭১
২১৩। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৪৮–৫৪৯
২১৪। তদেব, পৃ ৫৪৯
২১৫। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৫৬
২১৬। কালের প্রতিমা, পৃ ২৬
২১৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), তৃতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৩৯৭, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, তদেবূমিকা অংশ, পৃ ১
২১৮। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৬২৪
২১৯। তদেব, পৃ ৬২০
২২০। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ৩৫
২২১। কালের প্রতিমা, পৃ ১৫৫
২২২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), চতুর্থ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৪০০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, 'উপনিবেশ' উপন্যাসের ভূমিকা, পৃ ১৯৭
২২৩। তদেব, উপনিবেশের ভূমিকা, পৃ ১৯৮
২২৪। তদেব, আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত ভূমিকা অংশ, পৃ খ

২২৫। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৬২০
২২৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পৃ ২০১
২২৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), তৃতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৩৯৭, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ভূমিকা অংশ, পৃ ২৫৪
২২৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পৃ ২০৫
২২৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ ৪৭
২৩০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পৃ ২৬৬
২৩১। তদেব, পৃ ২৪৬
২৩২। তদেব, পৃ ২০১
২৩৩। তদেব, পৃ ২০২
২৩৪। তদেব, পৃ ২৫৩
২৩৫। তদেব, পৃ ২৫৫
২৩৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ ১৮
২৩৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ ২৫২
২৩৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত ভূমিকা অংশ, পৃ খ
২৩৯। তদেব, পৃ ২২২
২৪০। তদেব, পৃ ২২৩
২৪১। তদেব, পৃ ২৩৭
২৪২। তদেব, পৃ ২৬৬-২৬৭
২৪৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ ৬৭
২৪৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পৃ ২৩৫
২৪৫। তদেব, পৃ ২৪৬
২৪৬। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), পৃ ২৩৫
২৪৭। তদেব, পৃ ২৫৫
২৪৮। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পৃ ২৪৯-২৫০
২৪৯। তদেব, পৃ ২৫৯
২৫০। তদেব, পৃ ২৫৯
২৫১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ ১৯
২৫২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পৃ ২৬০
২৫৩। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৬২৬
২৫৪। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ২৫২
২৫৫। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃ ৩০১
২৫৬। শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'বাংলা সাহিত্যের নানারূপ' গ্রন্থের 'আঞ্চলিক উপন্যাস' অংশ, প্রথম প্রকাশ : ১লা তদেবাদ্র, ১৩৮৫, ষষ্ঠ মুদ্রণ : শ্রাবন, ১৪১০, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা,
২৫৭। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৬৪
২৫৮। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৫২
২৫৯। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃষ্ঠা ২৪১
২৬০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৬৪
২৬১। সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, পৃ ৫
২৬২। 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা : চিরায়ত জীবন' প্রবন্ধ, উপন্যাসের বর্ণমালা — সুমিতা চক্রবর্তী, পৃ ৪৭
২৬৩। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ১৬৯
২৬৪। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, চৌত্রিশতম মুদ্রণ ২০১২, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবেদন অংশ
২৬৫। আমার সাহিত্যজীবন, পৃ ২৮
২৬৬। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃ ২৮৫
২৬৭। তদেব, পৃ ২৮৫
২৬৮। তদেব, পৃ ২৮৬
২৬৯। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৫৩
২৭০। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃ ৫
২৭১। তদেব, পৃ ৫
২৭২। তদেব, পৃ ৭
২৭৩। তদেব, পৃ ৮
২৭৪। তদেব, পৃ ৯
২৭৫। তদেব, পৃ ২৬

২৭৬। তদেব, পৃ ১০০
২৭৭। তদেব, পৃ ৬০–৬১
২৭৮। তদেব, পৃ ২৬২
২৭৯। তদেব, পৃ ৭
২৮০। তদেব, পৃ ৯৫
২৮১। তদেব, পৃ ৮২
২৮২। তদেব, পৃ ৬৪
২৮৩। তদেব, পৃ ৩২
২৮৪। তদেব, পৃ ৩৫
২৮৫। তদেব, পৃ ২০১–২০২
২৮৬। তদেব, পৃ ১৭০
২৮৭। তদেব, পৃ ৫২
২৮৮। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৬৫
২৮৯। তদেব, পৃ ৫৬৫–৫৬৬
২৯০। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃ ১৮
২৯১। তদেব, পৃ ১৭
২৯২। তদেব, পৃ ১৪
২৯৩। তদেব, পৃ ৬৯
২৯৪। তদেব, পৃ ২০২
২৯৫। তদেব, পৃ ২০৬
২৯৬। তদেব, পৃ ৪৫
২৯৭। তদেব, পৃ ১২৮–১২৯
২৯৮। তদেব, পৃ ৮২–৮৩
২৯৯। তদেব, পৃ ১৮৬–১৮৭
৩০০। তদেব, পৃ ১৫১
৩০১। তদেব, পৃ ৮
৩০২। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৫২
৩০৩। কালের প্রতিমা, পৃ ২৮
৩০৪। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পৃ ৮৮
৩০৫। তদেব, পৃ ৮৯
৩০৬। তদেব, পৃ ৯৩
৩০৭। তদেব, পৃ ১৪৪
৩০৮। তদেব, পৃ ১৪৫
৩০৯। তদেব, পৃ ১৪৭
৩১০। তদেব, পৃ ১৬৯
৩১১। তদেব, পৃ ২১১
৩১২। তদেব, পৃ ২১৭
৩১৩। তদেব, পৃ ২৪০
৩১৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৬৯
৩১৫। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৫২
৩১৬। কালের প্রতিমা, পৃ ২৭
৩১৭। তদেব, পৃ ২৪৬
৩১৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড) : সুকুমার সেন, প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ ৩৯৯
৩১৯। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৮১৪
৩২০। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ৩১১
৩২১। কালের প্রতিমা, পৃ ১৩২
৩২২। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ২৩৮
৩২৩। বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি : অলোক রায়, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ ১২৪
৩২৪। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃষ্ঠা ৯০
৩২৫। তদেব, পৃ ২১৭
৩২৬। সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, পৃ ৬
৩২৭। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ৩২১

৩২৮। ঢোঁড়াই চরিত মানস : সতীনাথ ভাদুড়ী, সপ্তম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১০, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ৩
৩২৯। তদেব, পৃ ৩
৩৩০। তদেব, পৃ ৪
৩৩১। তদেব, পৃ ৬৯
৩৩২। তদেব, পৃ ২০০
৩৩৩। তদেব, পৃ ২১২-২১৩
৩৩৪। কালের প্রতিমা, পৃ ১২৫
৩৩৫। ঢোঁড়াই চরিত মানস, পৃ ৩-৪
৩৩৬। তদেব, পৃ ৫
৩৩৭। তদেব, পৃ ৫
৩৩৮। তদেব, পৃ ৫-৬
৩৩৯। তদেব, পৃ ৬৬-৬৭
৩৪০। তদেব, পৃ ১৬৮-১৬৯
৩৪১। তদেব, পৃ ২১২
৩৪২। তদেব, পৃ ১৩৩-১৩৪
৩৪৩। তদেব, পৃ ১৪৮-১৪৯
৩৪৪। তদেব, পৃ ৬
৩৪৫। তদেব, পৃ ১৭
৩৪৬। তদেব, পৃ ১০০
৩৪৭। তদেব, পৃ ১৮-১৯
৩৪৮। তদেব, পৃ ৪২-৪৩
৩৪৯। তদেব, পৃ ৭
৩৫০। তদেব, পৃ ৮
৩৫১। তদেব, পৃ ৫
৩৫২। কালের প্রতিমা, পৃ ১৩৪
৩৫৩। ঢোঁড়াই চরিত মানস, পৃ ২৫-২৮
৩৫৪। তদেব, পৃ ২৮-২৯
৩৫৫। তদেব, পৃ ২৯
৩৫৬। তদেব, পৃ ১৬৯-১৭০
৩৫৭। তদেব, পৃ ১৮৭-১৮৯
৩৫৮। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ৩১০
৩৫৯। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস : অশ্রুকুমার সিকদার, চতুর্থ সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ ২৫৪
৩৬০। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ২২৭
৩৬১। তদেব, পৃ ২৩৯
৩৬২। কালের প্রতিমা, পৃ ১২৫
৩৬৩। তদেব, পৃ ১৩৩
৩৬৪। উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি পৃ ১৫৫
৩৬৫। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ৩০
৩৬৬। ইছামতী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চদশ মুদ্রণ, জৈষ্ঠ ১৪১৬, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পেছনের প্রচ্ছদের বিজ্ঞাপন অংশ।
৩৬৭। তদেব, পৃ ৩
৩৬৮। তদেব, পৃ ৪৬
৩৬৯। তদেব, পৃ ১১২
৩৭০। তদেব, পৃ ৮
৩৭১। তদেব, পৃ ১১৮
৩৭২। তদেব, পৃ ১১৮
৩৭৩। তদেব, পৃ ৬৯-৭০
৩৭৪। তদেব, পৃ ৪
৩৭৫। তদেব, পৃ ৬
৩৭৬। তদেব, পৃ ২৪
৩৭৭। তদেব, পৃ ২৬
৩৭৮। তদেব, পৃ ৩৭
৩৭৯। তদেব, পৃ ৯

৩৮০। তদেব, পৃ ৪৪
৩৮১। তদেব, পৃ ৪০
৩৮২। তদেব, পৃ ৭৫
৩৮৩। তদেব, পৃ ১০৩
৩৮৪। তদেব, পৃ ১০৪
৩৮৫। তদেব, পৃ ৯২
৩৮৬। তদেব, পৃ ৬৯
৩৮৭। তদেব, পৃ ৭
৩৮৮। তদেব, পৃ ৪৪
৩৮৯। তদেব, পৃ ৩২
৩৯০। তদেব, কালের প্রতিমা, পৃ ৭০
৩৯১। তদেব, পৃ ৭২
৩৯২। ইছামতী, পেছনের প্রচ্ছদের বিজ্ঞাপন অংশ।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতা

বিশ শতকের বিশের দশকে বাংলা গল্প-উপন্যাসের যে আঞ্চলিকতার সূত্রপাত ঘটে পরের দুই দশকে তা উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছায়। চল্লিশের দশকে স্বাধীনতার বৎসর অনেকের মতে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' প্রকাশিত হয়। এরপরেও বাংলা সাহিত্যের বহু ঔপন্যাসিক মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চলের আঞ্চলিক পটভূমিকায় উপন্যাস রচনায় আগ্রহী হন। ফলে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের পটভূমির যেমন বিস্তার ঘটে, তেমনি অনেক নতুন নতুন ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত অঞ্চল এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবনচর্যার বিবরণ বাংলা উপন্যাসের পাঠকের গোচরে আসে। এইসময় একদিকে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বিশ শতকের প্রথমার্ধের ঔপন্যাসিকরা অঞ্চল নির্ভর উপন্যাস রচনা করেছেন, অপরদিকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সমরেশ বসু, প্রফুল্ল রায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, রমাপদ চৌধুরী, মহাশ্বেতা দেবী, গুণময় মান্না, দেবেশ রায় প্রমুখ নতুন নতুন ঔপন্যাসিকও মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা কারণে বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চল এবং সেখানকার আঞ্চলিক পটভূমিকায় উপন্যাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অঞ্চল জীবনকে ভিত্তি করে যে সকল উপন্যাস রচিত হয়েছে সেগুলি হল — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫১ খ্রিঃ), 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৩ খ্রিঃ) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লালমাটি' (১৯৫১ খ্রিঃ), 'মহানন্দা' (১৯৫১ খিঃ), মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল' (১৯৫১ খ্রিঃ), 'বন কেটে বসত' (১৯৬১ খ্রিঃ), অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ), সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৫৭ খ্রিঃ) ও 'বাথান' (১৯৮৫ খ্রিঃ), প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী' (১৯৫৭ খ্রিঃ), 'সিন্ধুপারের পাখি' (১৯৫৯ খ্রিঃ) 'কেয়াপাতার নৌকো' (প্রথম পর্ব -১৯৬৯ খিঃ, দ্বিতীয় পর্ব ১৯৭০ খ্রিঃ), অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭ খ্রিঃ),

'দুখিয়ার কুঠি' (১৯৫৯ খ্রিঃ) 'মহিষ কুড়ার উপকথা' (১৯৭৮ খ্রিঃ), সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' (১৯৫৮ খ্রিঃ), অমরেন্দ্র নাথ ঘোষের 'চরকাশেম' (১৯৫৯ খ্রিঃ), শক্তিপদ রাজগুরুর 'তবু বিহঙ্গ' (১৯৬০ খ্রিঃ), রমাপদ চৌধুরীর 'বনপলাশীর পদাবলী' (১৯৬২ খ্রিঃ), মহাশ্বেতা দেবীর 'কবি বন্দ্যোঘটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৬ খ্রিঃ), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭ খ্রিঃ), 'অপারেশন বসাই টুডু' (১৯৭৮ খ্রিঃ), 'চোট্টি মুন্ডা এবং তাঁর তীর' (১৯৮০ খ্রিঃ), 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' (১৯৯০ খ্রিঃ), 'ব্যাধখন্ড' (১৯৯৭ খ্রিঃ), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'তৃণভূমি' (১৯৭০ খ্রিঃ), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (১৯৭১ খ্রিঃ), গুণময় মান্নার 'শালবনী' ও 'মুটে' (১৯৭৮ খ্রিঃ), অভিজিৎ সেনের 'রহু চন্ডালের হাড়' (১৯৮৫ খ্রিঃ), দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮ খ্রিঃ), তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহুলবনীর সেরেঞ' (১৯৯৫ খ্রিঃ), ভগীরথ মিশ্রের 'চারণভূমি' (১৯৯৪ খ্রিঃ) প্রভৃতি। এই অধ্যায়ে এই উপন্যাসগুলির আঞ্চলিকতার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে আঞ্চলিকতার স্বরূপ ও লক্ষণগুলি খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ডটি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত হলেও এর আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের প্রথম খন্ডটির সঙ্গেই করা হয়েছে। তাই এই অধ্যায়ে বাংলা উপন্যাসের আঞ্চলিকতা বিষয়ের আলোচনা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লালমাটি' উপন্যাস দিয়ে শুরু করা হল।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **'লালমাটি'** উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। তিনি এই উপন্যাসটির পটভূমি হিসেবে উত্তরবঙ্গের 'বরিন্দ' অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমির একটি বিশেষ অঞ্চলকে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাটির শেষে এই অঞ্চলটির প্রশস্তি করে তিনি বলেছেন —

''লালমাটি।

আমার মা। অনেক ইতিহাসের রক্ত-স্বাক্ষরের সীমন্তিনী তুমি — অনেক প্রাণ-সাধনার তুমি মহাভৈরবী। আজও তোমার সাধনা শেষ হয় নি, আজও গৈরিক মাটিতে তোমার ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস, আজও কালবৈশাখীর ঝড়ে দিকে দিকে উড়ে চলেছে তোমার ছিন্ন-ভিন্ন ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি।

কিন্তু আমরা আজ এসেছি! আমাদের হাতে নতুন ইতিহাসের লেখনী তলোয়ার হয়ে জ্বলছে; আমাদের বুকে আমরা বয়ে এনেছি রুকনপুরের নির্বাপিত দীপস্তম্ভের শেষ শিখা।

আমার জন্মভূমি — আমার লালমাটি। আমাদের রক্ত দামামার তালে তালে, তোমার রাঙা টিলার চূড়োয় চূড়োয় আজ নবযুগের স্পর্ধিত পদধ্বনি।''[১]

আর উপন্যাসটির শুরুতে 'কথামুখ' অংশে ঔপন্যাসিক এই অঞ্চলটির প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন — ''বাংলাদেশের প্রাচীনতম মৃত্তিকা। রাঢ়-বঙ্গ যখন অবগুণ্ঠিত জলায় আর বাদাবনে — সেদিন সভ্যতার আলোয় উদ্ভাসিত এই লালমাটি — বরেন্দ্রভূমি। একদিকে যখন কষাড় জঙ্গলের মাঝখানে জ্বলন্ত বাঘের চোখে আর হোগলার চড়ায় কুমীরের লেজ-ঝাপটানিতে প্রাগৈতিহাসিক সংগ্রাম, তখন এর রাজপথ দিয়ে গৌড়াবনীবাসবের চতুরঙ্গ গৌরবে রণযাত্রা।''[২] তিনি আরও জানিয়েছেন — ''সভ্যতার শ্মশান এই বরিন্দের মাঠ। একদা গৌরবান্বিত ছিল জনপদে আর লোকালয়ে; বিদ্যায় আর সংস্কৃতিতে; শিল্পে আর বাণিজ্যে। সেদিনের সেই উজ্জ্বল প্রজ্ঞার নিদর্শনের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রুকনপুরের অতিকায় শিলাগঠিত দীপস্তম্ভ। . . . আর ডাকে বান। বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ কিউসেক জল নামে বরিন্দের ঢালু মাঠের উপর। মহাসাগরের রূপ ধরে। . . . একদিন এই নদীগুলিই ছিল বরিন্দের বাণিজ্যপথ — তার জীবনসরণি। কিন্তু শুকিয়ে আসছে দিনের পর দিন। পলিমাটি পড়ে গর্ত যতই ভরাট হয়ে উঠছে — ততই বন্যার উচ্ছ্বসিত জলধারাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে। অভিশপ্ত বরিন্দের মাঠ যেন আত্মবিস্তার করতে না পেরে আত্মহত্যা করে চলেছে।''[৩] এই বরিন্দের গৌড়, আদিনা, একলাখি, রুকনপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ১৯৩০ সমকালীন কাহিনিই হল 'লালমাটি' উপন্যাসটি।

প্রাক্-স্বাধীনতার পটভূমিতে রচিত 'লালমাটি' উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বরেন্দ্রভূমির ঐ সমস্ত অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষজনের ছবি ফুটিয়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন। উপন্যাসে ঐ অঞ্চলের হিজলবনী, জয়গড় মহল, সোনাদিঘীর হাট, কামারহাটি, পাল নগর, মুস্তাফাপুর, কালাপুখরি, ফিরিঙ্গিপুর প্রভৃতি

গ্রামের উল্লেখ আছে। আর জনসাধারণের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পাশাপাশি ঐ সমস্ত অঞ্চলে বসবাসকারী সাঁওতাল, তুরী, আহির, ঘোষ, বেদে, হিন্দুস্তানী, রাজবংশী, পাঠান, বাদিয়ার মত হিন্দু-মুসলিম ধর্মের নানা সম্প্রদায়ের মানুষজনের উল্লেখ আছে। এখানে রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ভৈরব নারায়ণ, নগেন সরকার প্রমুখেরা হল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতিনিধি; আর আলিমুদ্দিন, ফতে শা, ইসমাইল, হাজী সাহেব, এন্তাজ আলি, জিব্রাইল, রাজিয়া প্রমুখেরা ঐ অঞ্চলের মুসলিমদের প্রতিনিধি। এদের মাঝে যমুনা আহির, কলোশশী, ধীরু সাঁওতাল, ঝুমরির মত অজস্র নিম্নবর্ণের মানুষের উল্লেখ আছে। এছাড়াও প্রাক-স্বাধীনতার পটভূমিকায় রচিত হওয়ায় দু'-একটি ইংরেজ চরিত্রও এই উপন্যাসটিতে আছে। এখানে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষজনের আচার-আচরণ, রীতি-প্রকৃতি, সংস্কার-বিশ্বাস, লোক-লৌকিকতা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস-খাদ্যতালিকা, ভাষাবৈশিষ্ট্য প্রভৃতিরও কম-বেশি পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে; যেগুলি উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করে। হয়তো এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এই ঔপন্যাসিকের আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত অপর দুই উপন্যাস 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' এবং 'মহানন্দা'র সঙ্গে এই উপন্যাসটির এক সরণীতে আলোচনাকালে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর আঞ্চলিকতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন — ''সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'মহানন্দা' ও 'লালমাটি' উপন্যাসত্রয়ে বঙ্গভূমির প্রাচীন ইতিহাস ও ভূতত্ত্ব, একদিকে উহার পৌরুষদৃপ্ত সংস্কৃতি ও জনশ্রুতির মধ্যে সংরক্ষিত বিরাট লালমাটির প্রান্তর — কাহিনীর বাহিরের পটভূমিকা অন্তর প্রেরণার বিস্মৃতপ্রায় মূল উৎসরূপে আবির্ভূত হইয়াছে।''[৪] উপন্যাসটিতে ১৯৩০ সমকালীন মুসলিম লীগ রাজনীতির বেশ কিছু ছবিও আছে। পাশাপাশি উপন্যাসটি ইতিহাসেরও বেশ কিছু দাবী মেটায়। তাই ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেও এর তাৎপর্য মেনে নিতে হয়। তবে সেইসঙ্গে 'লালমাটি' উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার লক্ষণগুলিকেও অস্বীকার করার উপায় নেই।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একটি উপন্যাস **'মহানন্দা'** প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি হিমালয়ের বুক থেকে জন্ম নেওয়া নদী

'মহানন্দা' নাম গ্রহণের পর তার দীর্ঘ গতিপথে যে জনপদ গড়ে উঠেছে, তার বিবরণ তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গেই বরেন্দ্রভূমির মালদহ জেলার প্রসঙ্গ এসেছে। ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''মহাপ্রভুর সেই পদচিহ্ন বহন করেছে এই জেলা, রামকেলি, গৌড়, সাদুল্লাপুরের ঘাট। রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামীর দেশ। এখানকার প্রতিটি জলবিন্দুতে, এখানকার মাটির প্রত্যেকটি পরমাণুতে হরিপ্রেমের অমৃত মিশে আছে।''[৫] 'মহানন্দা' উপন্যাসটির দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের প্রায় সমস্ত ঘটনা মহানন্দা তীরবর্তী যোধপুর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ঘটেছে। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঘটনাবলির বেশির ভাগ কলকাতায় ঘটেছে। উপন্যাসের কাহিনী অংশের অনেকটাই এর অন্যতম প্রধান চরিত্র নীতীশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। নীতীশ আদতে একটি রাজনৈতিক চরিত্র। সে ইংরেজ বিরোধী কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের মুক্তি ঘটাতে প্রয়াসী। অপরদিকে নীতীশের পিতা ধনী যতীশ ঘোষ মহানন্দা তীরবর্তী যোধপুর অঞ্চলটির স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী আপাতভাবে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হিসেবে উপস্থাপিত। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ''নামজপ আর নামকীর্তন এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে পুরুষানুক্রমে সংশ্লিষ্ট।''[৬] তবে যতীশের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব রীতি-নীতি পালনের বাড়াবাড়িটা শুরু হয়েছে তাঁর সতেরো বছর বয়সী একমাত্র পুত্র নীতীশের তেরো বছরের কিশোরী স্ত্রী মল্লিকাকে রেখে খুনের দায়ে দ্বীপান্তর হবার পর থেকে। অবশ্য যতীশের সবকিছুই যে ছিল ভণ্ডামি, তা নীতীশ জেল থেকে ফিরে আসার পরেই স্পষ্ট হয়। সে ধর্মের দোহাই দিয়ে মল্লিকাকে 'দেবদাসী' করে নিজের করতলগত করতে চায়। এই মল্লিকা তার ছেলে নীতীশের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছিল। শেষপর্যন্ত যতীশ যোধপুরের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে সুতাহাটির বামদেব ঘোষের মাঝবয়সী বিধবা বোনের সঙ্গে কণ্ঠীবদল করে বৃন্দাবনবাসী হয়। যাই হোক, 'মহানন্দা' উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক সচেতনভাবেই ইতিহাস ও রাজনীতির প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন। তবে এখানে মালদহের মহানন্দা তীরবর্তী যোধপুর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানুষজনের আচার-আচরণ, রীতি-প্রকৃতি, সংস্কার-বিশ্বাস, লোককথা-লোকাচার, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা-সংস্কৃতির ব্যবহার উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার লক্ষণকে পরিস্ফুট করে। এই উপন্যাসে মালদহের বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস থেকে শুরু করে সমকালে প্রচলিত এই ধর্মের বাস্তব রূপের

অনেকটাই প্রকাশ পেয়েছে। তাই 'মহানন্দা'র ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বকে স্বীকার করেও এর আঞ্চলিকতার লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এজন্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহানন্দা' উপন্যাসটিতে ব্যপকভাবে না হলেও আঞ্চলিকতার বেশ কিছু লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

মনোজ বসুর **'জলজঙ্গল'** উপন্যাসটি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সুন্দরবনের বাদাবন অঞ্চলের পটভূমিকায় এই উপন্যাসটি রচিত। ঔপন্যাসিক নিজেও ঐ অঞ্চলের মানুষ ছিলেন। তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়ে অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ বলেছেন — ''বাংলাদেশের গ্রামজীবন বিশেষ করে নদী নালাময় প্রাকৃতিক জগৎ ও সেইসঙ্গে যুক্ত সংগ্রামী মানুষের ছবি তাঁর কথাজগতের অন্যতম আকর্ষণ।''[৭] ঔপন্যাসিকের নিজের সম্পর্কে বক্তব্য হল — ''. . . গ্রাম আমার সুন্দরবন অঞ্চল থেকে দূরবর্তী নয় . . . কাঠ কাটতে, মধু ভাঙতে জীবিকার শতবিধ প্রয়োজনে লোকে বনে যায়, বাঘ-কুমির সাপের কবলে পড়ে — তার মধ্যে কতজনে আর ফেরে না। জনালয় থেকে বিচ্ছিন্ন, বনবিবি ও বাঘের সওয়ার গাজি-কালুর রাজ্য রহস্যময় সুন্দরবন ছোটবেলা থেকে আমায় আকর্ষণ করত। . . . সুন্দরবন নিয়ে দুটো উপন্যাস (জলজঙ্গল, বন কেটে বসত) ও কতকগুলো গল্প লিখেছি আমি। কোন কোন অংশ একেবারে বনের ভিতরে খালের উপর নৌকোয় বসে লেখা।''[৮] ঔপন্যাসিকের এই স্বীকারোক্তিতেই স্পষ্ট যে, তাঁর 'জলজঙ্গল' উপন্যাসের পটভূমি হল সুন্দরবন। নিম্নবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলটি সমতলের মানুষজনের কাছে 'বাদাবন' নামে পরিচিত। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে সেই বাদাবনেরই চিত্র আঁকতে প্রয়াসী হয়েছেন।

এর কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, বাদাবন অঞ্চলে বনসংস্কার ও প্রজাস্থাপ-নের স্বপ্ন নিয়ে কলকাতা থেকে এসে পৌছান মধুসূদন রায়। এজন্য তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তাঁর কর্মচারী তথা ম্যানেজার হল দুর্লভ। সেই সঙ্গে সমর্থা মেয়ে সুন্দরী এলোকেশীকে নিয়ে সে অঞ্চলে জাঁকিয়ে বসে আছে মতিলাল সাধু। সে অজানা উপায়ে সচ্ছল জীবনাযাপন করলেও তার মধ্যে মেয়েকে পাত্রস্থ করার কোনো প্রচেষ্টা চোখে পড়ে না। এই বাদাবন অঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবি। সকলে তাঁকে মেনে চলে। গোটা বাদাবন অঞ্চলে অলক্ষ্যে একরকম তাঁরই শাসন চলে।

উপন্যাসটির শুরুতেই দেখা যায় যে, সে অঞ্চলে জাঁকজমক করে বনবিবির পূজা হয়। এই উপলক্ষে কুস্তি-মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এইরকম এক মল্লযুদ্ধের আসরে কেতুচরণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। সে হল ঐ অঞ্চলের শক্তিমান মল্লযোদ্ধা। তবে তাঁর স্থায়ী কোনো ঠিকানা নেই। উপন্যাসে আয়োজিত মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতাটি সে-ই জিতে। এরপরেই এলোকেশী তার পিছু নেয় এবং নিজের আচার-আচরণ ও কথার মোহজালে আবিষ্ট করে কেতুচরণকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলে। কেতুচরণও এলোকেশীর প্রেমে হাবুডুবু খায়। এজন্য সে নিজের আবাসস্থল ত্যাগ করে এলোকেশীর পিতা মতিলালের আশ্রয় নেয়। অবশ্য সেখান থেকে তার বিতাড়িত হতে বেশিদিন সময় লাগে না। ইতিমধ্যে এলোকেশী কেতুচরণকে তাকে নিয়ে পালানোর প্রস্তাব দেয় এবং সেজন্য নৌকা জোগাড় করতে বলে। কেতু তার কথা মত কাজ করলেও দেখা যায় যে, এলোকেশী তাকে ছেড়ে দুর্লভের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। ইতিমধ্যে দুর্লভ মধুসূদনের কাজ ছেড়ে সে অঞ্চলের সরকারী ঘেরিদার অর্থাৎ খাজনা আদায় করার চাকরি নিয়ে ফেলেছে। এ ঘটনায় কেতুচরণ প্রচণ্ড অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হয়। এরপর প্রথমে সে তার মত সে অঞ্চলের আরও কয়েকজনকে জুটিয়ে নৌকায় করে যাত্রী বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করে। অবশ্য এর আড়ালে সরকারী ঘেরিদার ও তার অধীনস্ত কর্মচারীদের এড়িয়ে এরা বনাঞ্চলে নানা লুটতরাজের কাজও চালায়। তবে শেষ পর্যন্ত খুশাল নামক একজনের নেতৃত্বে তারা সকলে মিলে সায়র অর্থাৎ মাছ বেচা-কেনার কেন্দ্র বসায়, যেখানে বাদা অঞ্চলের সমস্ত মাছ একত্রিত করে বেচা-কেনা হয়ে মূল ভূখণ্ডের দিকে পাড়ি দেয়। এদিকে দুর্লভচন্দ্রের কাছে থেকে এলোকেশী সুখী হতে পারে না। সেখানে তার খাওয়া-পরা, অর্থ-সম্পদের অভাব না থাকলেও কোনো স্বাধীনতা ছিল না। লম্পট দুর্লভচন্দ্র তাকে কারণে-অকারণে মারধোর করে, শাস্তি দেয়, বন্দী করে রাখে। ফলে সে আবার কেতুচরণকে ফাঁদে ফেলে দুর্লভের কারাগার থেকে বেরিয়ে আসে। এবারে তার লক্ষ জমিদার মধুসূদন। কিন্তু বন কেটে বসতি করার লক্ষ্যে মশগুল বৃদ্ধ মধুসূদন তার কাছে থাকা সমস্ত গহনা এলোকেশীকে দিলেও তাকে গ্রহণ করতে পারে না। অগত্যা সেখানে আশ্রয় না পেয়ে এলোকেশী মধুসূদনের কলকাতার বন্ধু কৃষিবিজ্ঞানী সুকুমারের কাছে যায়। সুকুমার তাকে ভোগ করলেও আশ্রয় দেয় না।

ফলে সে আবার কেতুচরণের শরণাপন্ন হয়। এবারে কেতুচরণ আর ভুল করে না। সে শেষ পর্যন্ত এলোকেশীর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরে তাকে দুর্লভের হাতে তুলে দিয়ে দুর্লভের আগের পক্ষের শিশুসন্তান জোৎস্নাভূষণকে নিয়ে পাঁচু বাড়ুজ্জ্যে ও তার পতিতা বোন পদ্ম এবং পদ্মের প্রেমিক উমেশকে সঙ্গে নিয়ে বাদাবন ছেড়ে শান্তিনগরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়।

এই 'জলজঙ্গল' উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাস হওয়ার নানা লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। ঔপন্যাসিক নিজেও যে, বাদাবনের আঞ্চলিক রূপকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এই উপন্যাসটি রচনায় হাত দিয়েছেন, তা উপন্যাসটির শুরুতে বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার সার্থক রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়। তিনি 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিয়বরেষু' বলে সম্বোধন করে তাঁর উদ্দেশ্যে লিখেছেন — ''মানুষ ও মাটির প্রতি তোমার ভালবাসার সীমা নেই। বঙ্গোপসাগরের অদুরবর্তী জলজঙ্গল ও এই সব মানুষ দেখেছ কিনা জানিনে। এদের কথা নিশ্চয় তোমার ভালো লাগবে।''[৯] এই উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক সুন্দরবনের অদূরবর্তী 'জলজঙ্গল ও এই সব মানুষ'দের কথাই পরিবেশন করেছেন। উপন্যাসের মধ্যে বারবার বনের চিত্র, বনের প্রকৃতি, বনে বসবাসকারী মানুষজন, বনের রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, বনের লোককথা-লোকবিশ্বাস প্রভৃতি প্রসঙ্গ এসেছে। পাশাপাশি এসব কিছুর মিশ্রণে তিনি যেন মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক অন্য জগতে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে আমাদের একাত্ম করিয়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছেন বলেও মনে হয়।

উপন্যাসটির শুরুতেই আমরা দেখি ঔপন্যাসিক বন ও তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবির উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চলে প্রচলিত একটি গানের দু'টি চরণ তুলে ধরেছেন —

''মা গো মা — তোর বালক আইল বনে,
শত্তুর-দুশমন দমন করে রাখিস ছি-চরণে — ''[১০]

উপন্যাসে রায়গ্রাম, মৌভোগ, মশাল, বকুলতলা, লা-ভাঙার খাল, সাঁইতলা, শামুকতলা, বয়রা, খলসেমারি, পাতালবাড়ি প্রভৃতি স্থানের নাম আছে। বাদাবনে অনেকগুলো সাঁইতলা আছে — ''সাঁইতলা অনেকগুলো। শুধু সাঁইতলা বললে ধরা যায় না।''[১১] এই অঞ্চলগুলি পৃথক পৃথক নামের হলেও সবগুলির প্রকৃতি প্রায় এক

— ''জঙ্গলের মুখে আইট একটা। উঁচু জায়গা — কোটালের সময়েও জোয়ার-জলে ডোবে না। ঢেউয়ের আঘাতে আইটের এক প্রান্ত ধ্বসে পড়েছে — প্রতি বছরই গাঙের নিচে দশ-বিশ হাত তলিয়ে যায়।''[১২] বাদাবনের প্রায় সমস্ত এলাকা সম্পর্কে একথা সত্য। ঐ অঞ্চলের আর একটা জিনিস প্রায় সমস্ত লোকালয়ে দেখতে পাওয়া যায়। এটা হল বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবির থান — ''বনবিবি-তলা এটি। বাদার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবি। এই একটি কেবল নয় — বনের এখানে-সেখানে তাঁর অনেক আস্তানা।''[১৩] উপরে উল্লিখিত বাদাবনের স্থানগুলির মধ্যে মৌভোগে মধুসূদন রায় বন কেটে জনবসতি তৈরি করেছেন। সে অঞ্চলে এভাবে বন কেটে জনবসতি করার বিবরণে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''বাদা একবার কাটা হয়েছে। ছিটে-বন জন্মেছে। আগামী বছর আর-এক কাটা দিয়ে ধান ছড়ানো হবে। অল্পস্বল্প জন্মাবে! পুরো হাসিল হতে এখনো তিন-চার বছর। বেশিও লাগতে পারে — ঢেউয়ের মুখে মাটির বাঁধ কতটা টিকবে, সমস্ত নির্ভর করছে তার উপর।''[১৪]

এই বাদাবনে বিচিত্র ধরনের ও বিচিত্র প্রকৃতির মানুষজন বসবাস করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ মূল জনসমাজ থেকে গিয়ে হাজির হলেও অধিকাংশই সেখানকার স্থায়ী অধিবাসী। এই উপন্যাসে মধুসূদন রায়, মতিলাল সাধু, দুর্লভচন্দ্র, সুকুমার, পাঁচু বাড়ুজ্জ্যে ওরফে গোল পাঁচু, পদা, এলোকেশী, পদ্ম প্রমুখেরা আদতে মূল ভূখণ্ডের বাসিন্দা হলেও দীর্ঘদিন বাদাবনে বাস করায় তাদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সেসব স্থানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। মধুসূদনের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''যে-সে লোক নন মধুসূদন — রামনিরঞ্জন রায় নবাব সরফরাজ খাঁর দেওয়ান ছিলেন, সেই সুবিখ্যাত বংশের ছেলে। বিদ্যেও নাকি অঢেল — কিন্তু আলাপে আচরণে ধরতে পারবে না। ভাইরা কলকাতায় থাকেন। মাটিতে পা দেন না তাঁরা — গাড়িতে ঘোরেন, গাড়ি থেকে নেমে পালিশ-করা উঠোন-মেজের উপর দিয়ে দোতলা-তেতলায় উঠে যান। মধুসূদন তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে রায়-গ্রামের পৈতৃক বাড়ি এবং বনবিবি-তলার অনতিদূরবর্তী মৌভোগের কাছারিবাড়িতে পড়ে থাকেন অধিকাংশ সময়। জঙ্গল হাসিল করে চাষবাসের ব্যবস্থায় মেতে আছেন। এমন দরের লোক, তা বলে বাছবিচার নেই। চাষাভূষোর আসরে বসে

হল্লা করেন। মন্দ লোকে আরও নানা রকম রটনা করে। তাঁর জন্যে একখানা পিঁড়ি বা জলচৌকি — সকলের সঙ্গে এইটুকু মাত্র স্বাতন্ত্র্য।''[১৫] এই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় যে, মধুসূদন রায় আদতে কলকাতা থেকে এলেও আসলে বাদাবনেরই বাসিন্দা হয়ে গেছেন। অপরদিকে কেতুচরণ, দুকড়ি, উমেশ, খুশাল, গোল পাঁচু, মান্যধর, হরিপদ, জলধর, গুলি পাঁচু, ঋষিবর, টিকে সর্দারের মত অজস্র চরিত্র এই উপন্যাসে আছে। এরা সবাই সেই অঞ্চলেরই ভূমিপুত্র। এদের আচার-আচরণ, কার্যকলাপে বাদাবনের ছাপ স্পষ্টত অনুভূত হয়। উপন্যাসটির নায়ক হিসেবে আপাতভাবে বাদাবনের তেজী যুবক কেতুচরণকে মনে হলেও সে বাদাবনেরই ফসল। যদিও উপন্যাসের শেষে সে দুর্লভের শিশুসন্তানকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে; কিন্তু সমগ্র উপন্যাসেই তার উপর সেই অঞ্চলটির ব্যাপক প্রভাব আছে। তাকে কোনোভাবেই অঞ্চলটি থেকে আলাদা করা যায় না। উপন্যাসটির নায়িকা এলোকেশীর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। সে তার বাবা মতিলাল সাধুর সঙ্গে মূল জনসমাজ থেকে বাদাবনে এলেও পরবর্তী কালে সে ঐ অঞ্চলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। বাদাবন ছাড়া তার অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাই সামগ্রিকভাবে বিচার করলে উপন্যাসে গৃহীত বাদাবন অঞ্চলটিকেই নায়কের স্বীকৃতি দিতে হয়; যা একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান শর্ত।

এই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষগুলির জীবন-জীবিকাও স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এর মধ্যে মূল জনসমাজ থেকে হাজির হওয়া মনুষজন যেমন মধু রায়, দুর্লভচন্দ্র, মতিলাল সাধু বা পাঁচু বাড়ুজ্জ্যে ওরফে গোল পাঁচুর মত লোকেরা জমা-খরচ, আয়-সঞ্চয়ের বিষয়ে হিসেব-কিতেব করে চললেও বাদাবনের ভূমিপুত্ররা খুব একটা হিসেবের ধার ধারে না। এরা ভূত-ভবিষ্যতের কথাও তেমন ভাবে না। এদের কাছে বরং পয়সাকড়ি থাকলেই এরা অস্বস্তিতে ভোগে। তাই দেখা যায় কেতুচরণ তার কাছে থাকা সিকি ফড়ের আড্ডায় খুইয়ে দিয়েও নির্লিপ্ত থাকে — ''ফড়ের আড্ডায় নিঃশব্দে কেতু বসে পড়ল। একটা সিকি বের করে পুরোটাই রাখল রুইতনের উপর। সিকি গচ্চা গেল। তবু সে একটি কথা বলল না। পথের সম্বল সিকিটা। অনেকদিন ধরে গাঁটে আছে বিড়িটা-আসটা কিনবে বলে। কিন্তু প্রয়োজন হয় নি, এর তার কাছে চেয়ে-চিন্তে স্বচ্ছন্দে চলে গেছে। সিকি হেরে যেন আপদ চুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে সে

ডিঙিতে গিয়ে শুয়ে পড়ল।''[১৬] অবশ্য এরা নিজেদের ভূত-ভবিষ্যতের কথা তেমনভাবে ভাবে না বলে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকে এমনও নয়। তারা নানাধরনের কাজে লিপ্ত থাকে। এই অঞ্চলের মোড়লদের সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ''তা বলে নিষ্কর্মা নয় — তারা বসে খায় না। রাত্রিবেলা — বিশেষ করে কৃষ্ণ-পক্ষের রাত্রে কাজের চাপাচাপি। নৌকোর কাজে যেত জনকয়েক — কতক ঘরের কাজে, কতক বা ক্ষেতখামারের কাজে। খাল বা খাড়ির মধ্যে নৌকো বেধে আছে, মোড়লদের ডিঙি নিঃশব্দে লাগল গিয়ে তার পাশে। ঘুম ভেঙে উঠে মাঝিরা দেখবে কোমরের গাঁজিয়া কেটে টাকা পয়সা সমস্ত নিয়ে গেছে।''[১৭] এরা সকলে একত্রে জমিয়ে আড্ডা দিতেও ভালোবাসে। তাই দেখা যায় — ''উমেশ ছাড়াও গোল-পাঁচু, গুলি-পাঁচু, ঋষিবর, খুশাল — একসঙ্গে অনেকে জুটেছে। আছে মন্দ নয়, সন্ধ্যার পর জমজমাট আড্ডা। যদি জিজ্ঞাসা করো, এত লোকের খাওয়া-পরা চলে কিসে? গায়ে জোর আর মাথার ঘিলু থাকলে বাদা অঞ্চলে কিসের দুঃখ! কোন অভাব নেই ওদের।''[১৮] এরা অবশ্য নৌকায় সওয়ারী বওয়া থেকে শুরু করে বনকরের লোকজনদের লুকিয়ে-চুরিয়ে বনের গাছ কাটা, মোম মধু সংগ্রহ করা, বন্য পশু মারার মত কাজেও লিপ্ত থাকে। উপন্যাসটিতে খুশালের উদ্যোগে কেতুচরণদের কয়েকজন মিলে মাছের সায়র বসাতেও দেখা যায়। এই মাছের সায়রে ভোরবেলা ঐ এলাকার সমস্ত মাছ এনে হাজির করা হয়। তারপর পাইকারি বেচা-কেনা হয়ে সেই মাছ মূল জনসমাজের বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তবে এই সায়র থেকেও যে খুব বেশি আয়-উপার্জন হয় না, তা গোল-পাঁচুর কথা থেকেই স্পষ্ট — ''এ ঘোড়ার-ডিম সায়ের চালিয়ে কিছু হবে না। রায়বাবুর খাজনা আর তহরি-পরবি মিটিয়ে দিয়ে পেটের ভাতটা জোটানো যায় যদি বড় জোর। আর ক-দিন পরে মেলা অন্তে ডিঙিটা ঘাটে বসে থাকবে, সোয়ারি জুটবে না।''[১৯] এরা বরং বাদাবনের নদী-নালায় ডিঙি-নৌকা চালাতেই বেশি স্বচ্ছন্দ। তাই কেতুচরণ সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য — ''ডাঙার নয় — ডিঙির মানুষ কেতুচরণ। অত বড় জোয়ান দু-পা হাঁটতে হিমসিম হয়ে যায়, কিন্তু বৈঠা হাতে ডিঙিতে বসিয়ে দাও — সারাক্ষণ বেয়েও হাতে সাড় হবে না। গাঙ-খালের খুশিখেয়াল ও অন্ধিসন্ধি তার নখদর্পণে।''[২০] এসব অঞ্চলে পড়াশুনার চল

তেমন নেই। বরং ছেলেকে পড়াশুনা করালেই আফশোস করতে হয়। মোড়ল মান্যধর চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে এটা দেখা যায়। তার ছেলে ওমশা ওরফে উমেশ লেখাপড়া শিখে কাজকর্ম করে না বলে তার মনে হয় ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোটা তার দুর্বুদ্ধির কারণে হয়েছে — ''সাঁইতলার মান্যধর মোড়লের ছেলে উমেশ — কেতু তাদের বাড়িতে আছে। দুর্বুদ্ধি হয়েছিল মান্যধরের — উমেশকে শৈশবে পাঠশালায় পাঠায়। ফলে হতভাগাটা বাড়ির কাজকর্মে কোনদিন মন দিল না — গান গায়, ছড়া বাঁধে, আড্ডা দিয়ে বেড়ায় এখানে-ওখানে।''[২১] বনকরের লোকজন ও জলপুলিশকে হাত করে বাদাবন অঞ্চলে মোম-মধু সংগ্রহ, শিকারের মত কার্যাবলিও সংঘটিত হয়। এই অঞ্চলে পর্যাপ্ত মোম-মধু পাওয়া যায় — ''মোম-মধু সংগ্রহের মরশুম হচ্ছে চৈত্রমাসের মাঝামাঝি থেকে পুরোপুরি জৈষ্ঠ্য অবধি। নানারকম ফুল ফোটে জঙ্গলে, গাছে গাছে বিস্তর চাক হয়। মধুর প্রাচুর্যে চাকের রং ঘষা-কাচের মতো হয়ে ওঠে, টলমল করতে থাকে চাক। বাতাস এলে মধুর ভারে চাকের অংশ ভেঙেও পড়ে কখন কখন।''[২২] এভাবেই চলে বাদাবনের জীবন, যা মূল জনসমাজের মানুষদের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। তাই সেই অঞ্চলের রূপকথাকার দুকড়ির মুখে শোনা যায় — ''নগরবাসী কি বুঝতে পারে বাদার ব্যাপার? এ হল আলাদা এক জগৎ — তোমাদের বাঁধা ছকের জীবন থৈ পাবে না জঙ্গলে ঢুকতে।''[২৩]

বাদাবনে সাধারণ জনসমাজের নিয়ম-নীতি চলে না। এখানে এক রহস্যময় পরিবেশ গড়ে ওঠে। এর মধ্যেই জড়িয়ে থাকে বাদাবন অঞ্চলের সংস্কার-বিশ্বাস, লোক-লৌকিকতা। তাই ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''বাদাবনের নীতি নিয়ম তোমাদের মত জনসমাজের মত নয়। সেই সব নিয়ম জেনে নাও আগেভাগে, সাবধান হয়ে প্রতিপালন করো, সাবধানে বেড়াও, কথাবার্তা সামাল হয়ে বলো — কোনো ভয় নেই, মায়ের দয়া সব সময় তোমায় ঘিরে থাকবে। কাজকর্ম চুকিয়ে ঘরের মানিক ঘরে ফিরে যাবে, কেউ কোন রকম ক্ষতি করতে পারবে না।''[২৪] শুধু তাই নয়, এই অঞ্চল সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের আরও বক্তব্য — ''বাদাবন মানষেলার মত নয় — মানুষের বাঁধা হিসেব সব সময় খাটে না এখানে। পদ্ম বা আর কেউ মরে গেছে — অমনি যে সঙ্গে সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকে যাবে, এ-রীতি এখানকার নয়। জালের দড়ির মত নদী-

খালের শত পাকে-বাঁধা বনের মধ্যে অগণ্য জন্তু-জানোয়ার — ভয়ের আছে, আদর করে পোষ মানাবারও আছে। এসব ছাড়া আরও তো আছেন — মৃত্যুর অতীত হয়ে নির্জন বন-অঞ্চল জুড়ে রয়েছে যাঁরা।''[২৫] এই সমগ্র অঞ্চল জুড়ে চলে বন্যদেবী 'বনবিবি'র রাজত্ব। বাদাবন অঞ্চলের যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বনবিবির স্থান। বাদাবনের লোকজনের কাছে ইনি অত্যন্ত জাগ্রত। তাই খুব ধুমধাম করে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তাঁর পূজোর ব্যবস্থা করা হয় — ''বনবিবি-তলা এটি। বাদার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবি। এই একটি কেবল নয় — বনের এখানে-সেখানে তাঁর অনেক আস্তানা। জঙ্গলে ঢুকবার আগে বাওয়ালিয়া থানে এসে সিনি মানত করে, পূর্ব-প্রতিশ্রুত মানত শোধ দিয়ে যায়। কেউ জীবন্ত মুরগি ছেড়ে দিয়ে যায় দেবীর তুষ্টির জন্য, কেউ বা বকুলগাছের গোড়ায় নিরামিষ ছাঁচ-বাতাসা সাজিয়ে দেয়। প্রতি বছর চৈত্র-পূর্ণিমার দিন ঢাকঢোল বাজিয়ে সমারোহে দেবীর পূজা হয় এখানে। বছরের মধ্যে এই বিশেষ একটি দিন। দূর-দূরান্তর থেকে বিস্তর লোক জমায়েত হয়। আলো-আলোময় হয়ে যায় জঙ্গল-রাজ্য।''[২৬] এই বনবিবির কল্যাণে বাদাবনের মানুষজন সম্পূর্ণ বিপদসঙ্কুল পরিবেশে টিকে থাকে — বাঘ-ভালুক, সাপ-খোপের মত বন্য জীবজন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে বলেই ঐ অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস। সেখানকার প্রবীণ অধিবাসী দুকড়ির মুখে বনবিবির কার্যকলাপ সংক্রান্ত নানা লোককথা-লোকবিশ্বাসের গল্প শুনতে পাওয়া যায়। এগুলি সভ্যসমাজের মানুষের কাছে অলৌকিক, অবিশ্বাস্য মনে হলেও ঐ সব রহস্যময় অঞ্চলে সবকিছুই সম্ভব বলে মনে হয়। ঐ সব অঞ্চলের মানুষগুলি দুকড়ির গল্প আগ্রহভরে শোনে এবং বিশ্বাসও করে।

বাদাবনে বাঘ থেকে শুরু করে নানা হিংস্র জীবজন্তু বাস করে। এদের হাত থেকে আত্মরক্ষা পেতে সে অঞ্চলের মানুষদের কাছে গুণীনরাই ভরসা। তাই এই অঞ্চলে অনেক গুণীন যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি তাদেরকে কেন্দ্র করে প্রচুর লোককথাও জন্ম নিয়েছে। এই গুণীনদের কার্যাবলিকেও ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন — ''রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগার ভয়ানক — কিন্তু তার গ্রাস থেকে বেঁচে আসবার কায়দা গুণীনেরা জানে। বাঘবন্ধন পড়ে নৌকো চাপান দাও — বাঘের বাপের

সাধ্য নেই সে নৌকো স্পর্শ করবার। এরকম আছে খিলমন্ত্র — বাঘের দাঁতে দাঁতে খিল এঁটে যায় মন্ত্রের গুণে, হাঁ করে কামড়ানোর শক্তি থাকে না। খিল খুলে না দেওয়া পর্যন্ত খেতেই পারবে না কোনকিছু — না খেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে। কিন্তু অকারণে জীবের কষ্ট দেওয়া গুণীনদের বিধি নয়, গুরুর নিষেধ — মন্ত্র অসিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও আছে এতে। বিপত্তারণের জন্যই মন্ত্র, অন্যকে বিপদে ফেলবার জন্য নয়। তাই বিপদ অপগত হবার সঙ্গে সঙ্গে খিল খুলে দেয় গুণীনরা। শুধু মন্ত্রতন্ত্র নয়, গাছগাছড়াও জানা আছে নানারকম। বাঘের ঘায়ের বীভৎস মলমের কথা জানে সকলেই — তা ছাড়া একরকম শিকড় আছে বেটে লাগালে সপ্তাহের মধ্যে কামড়ের চিহ্ন পর্যন্ত বেমালুম মিলিয়ে যাবে।''[২৭] বন্যজীব জন্তুর পাশাপাশি বাদাবন অঞ্চল নানা প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের সাপেরও বাসভূমি — ''বিষধর সাপই বা কত! দুধরাজ-বঙ্করাজ, শঙ্খাবতী-শাখমুটি, কালনাগিনী-নগরবাসী, নাম শুনেছ এসবের? কাল-নাগিনীর গায়ে রাঙা রাঙা ফুল আঁকা। একবার এক বঙ্করাজের মুখোমুখি পড়েছিল কেতুচরণ। সাপ ক্রুদ্ধ হয়ে ফোঁস-ফোঁস করে আক্রমণ করতে ছোটে, সারাদেহ ভাঁজে ভাঁজে ভেঙে গিয়ে কি অপরূপ শোভা হয়েছিল সেই সময়! দশনাগ্রে সুনিশ্চিত মৃত্যু — কিন্তু মরেও সুখ আছে এমন সাপের ছোবলে। দেখ, ক্ষণে ক্ষণে কেমন রং বদলাচ্ছে উদয়কালের! যেন বহুরূপীর সাদা পোশাকে এই নারদ-মুনি হয়ে-এলেন, তারপর এই দেখ — টুকটুকে শাড়ি পরে রাজনন্দিনী।''[২৮] এই সমস্ত সাপেদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঐ অঞ্চলে ওঝাদেরও দেখতে পাওয়া যায়। এরাও নানারকম অবিশ্বাস্য কাণ্ড করে সাপে কাটা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলে বলে ঐ অঞ্চলের মানুষজনের বিশ্বাস — ''আবার ওঝারাও যেমনি! মরা মানুষে প্রাণ দিতে পারে। নীলবর্ণ হয়ে গেছে, গাঙে ভাসিয়ে দিতে যাচ্ছে — কাকপক্ষীর মুখে খবর পেয়ে জল-জাঙাল ভেঙে ছুটতে ছুটতে এসে ওরা বিষহরির দোহাই পাড়ে — রাখো মা প্রাণ নিও না। বিষ নামতে দেরী হলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে — কানে আঙুল দিতে হয় মন্ত্রের বচন শুনে। ঝাঁটার বাড়ি মারে — রোগির গায়ে যদিচ, কিন্তু রোগিকে নয় — সেই অলক্ষ্য আততায়ীকে, শয়তানি করে যে বিষ নামাতে দিচ্ছে না।''[২৯]

এই উপন্যাসে গৃহীত বাদাবন অঞ্চলটির জনসমাজের লোক-সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ — মানুষের এই তিনটি অতি আবশ্যকীয় ঘটনার মধ্যে জন্ম ও মৃত্য সংক্রান্ত বিবরণ নেই। বিবাহ সম্পর্কে অল্প বিবরণই আছে। এমনিতে ঐ অঞ্চলে মেয়েছেলের দেখা মেলাই ভার। তাই একটি ঘটনায় দেখা যায় — ''গোল পাঁচু একরকম উড়িয়ে দেবার ভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, কি দেখতে কি দেখেছিস। মেয়েলোক আসবে কোত্থেকে? বাদাবনে মেয়েছেলে? এই যা কেবল মেলার মধ্যে দেখা যাচ্ছে রায়বাবুর বন্দোবস্তে।''[৩০] হয়ত এজন্য বিয়ের সময় ছেলেদের সে অঞ্চলের নিরিখে অতি উচ্চহারে পণ দিতে হয়। তাই কেতুচরণ দ্বাদশ বর্ষীয়া টুনিকে বিয়ে করতে চাইলে টুনির বাবার চিন্তাভাবনা সম্পর্কে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ''মেয়ে দিতে আপত্তি নেই, তবে পণ লাগবে একশো-এক টাকা। ঐ রকম নাকি দর উঠেছে।''[৩১] বলা বাহুল্য, কেতুচরণ সে অঞ্চলের সবরকম কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেও পাঁচ বছরে এই একশ-এক টাকা উপার্জন করতে পারে নি।

বাদাবনে জনবসতি তৈরির উদ্দেশ্যে মধু রায় হাট বসানোর পরিকল্পনা করেন। এজন্য তিনি হাট বসানোর পূর্বে তার মুখবন্ধ স্বরূপ মেলা বসান। এই মেলা উপলক্ষে সেই অঞ্চলে খুব ধুম পড়ে যায়। নানা দিক থেকে লোকজন মেলায় এসে হাজির হয়। এই মেলার বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''মেলা বসেছে হাটের মুখবন্ধ স্বরূপ। পৌষ-সংক্রান্তি পর্যন্ত চলবে এই মেলা। খুব নাম ছড়িয়েছে, বিস্তর লোক যাতায়াত করছে, দোকানও বসেছে হরেক জিনিসের। লোকপরম্পরা শোনা যাচ্ছে, মেলার শেষ মুখে মানিক-যাত্রা ও জারিগান হবে। বায়োস্কোপ এসে এক রাত্রি চলন্ত ছবির খেলা দেখিয়ে যাবে, সে চেষ্টাতেও আছেন রায়বাবু। কিন্তু এতদূর বলে কোন কোম্পানি রাজি হচ্ছে না। এসব ছাড়াও আমোদ-স্ফূর্তির ব্যবস্থা আছে। ভবিষ্যতে আরও হবে। মেলা শেষ হয়ে গেলে পৌষ সংক্রান্তির পর সাপ্তাহিক হাট বসবে মেলারই জের হিসেবে। এ মোচ্ছব জুড়িয়ে যেতে দেওয়া হবে না।''[৩২] মেলার এই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় যে, বাইরের জগতের সঙ্গে বাদাবনের মানুষজনের যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ পরিমাণে ছিল। তারা নিজেদের অঞ্চলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই বাস করে।

এই উপন্যাসে বাদাবনের মানুষগুলিকে চিত্রিত করা হলেও তাদের ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস-খাদ্যতালিকার তেমন বিস্তারিত বিবরণ নেই। ধনী জমিদার মধু রায়, সরকারি ঘেরিদার দুর্লভচন্দ্রের মত লোকেদের বাসোপযোগী বাড়িঘর থাকলেও কেতুচরণ, খুশাল, ওমশা, গুলি পাঁচু, ঋষিবর প্রমুখদের বেশির ভাগ সময় ডিঙির উপর বা সায়রের ঘরে থাকতে দেখা যায়। তাদের থাকার ঘরগুলি বন্য ডালপালা-লতাপাতার তৈরি। বন্য এই মানুষগুলি যৎসামান্যই পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে। জলকাদার সময় এদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দু'টি জিনিস হল ছাতি ও লাঠি — ''জলকাদার এই সময়টা ছাতি লাঠি দুয়েরই প্রয়োজন হয় চলাচলের জন্য। গোলাপাতায়-ছাওয়া ছাতি — বন্ধ করা যায় না, কিন্তু জল মানায়। কাপুড়ে ছাতির চেয়ে অনেক ভাল। আর লম্বা লাঠি আগে কাদার মধ্যে দিয়ে আন্দাজ বুঝে তবে পা ফেলতে হয়। পদে পদে পা হড়কায়, তখন লাঠি ঠেকনো দিয়ে খাড়া থাকতে হয়। কথা চলিত আছে — বড়দলের মাটি, দুই ঠ্যাঙ আর লাঠি। অর্থাৎ শুধু দুই পায়ের ভরসায় পথ এগুনো নিরাপদ নয়।''[৩৩] এদের খাবার-দাবারের বিস্তারিত বিবরণ উপন্যাসে নেই। তবে ঐ অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ পাওয়া যায় জন্য এদের খাদ্যতালিকায় বেশির ভাগ সময় মাছ ভাত স্থান পায়। এছাড়াও বনের ফলমুল ও মধু প্রচুর পরিমাণে এরা খায়। এদের বিড়ি, গাঁজার মত নেশা করতেও দেখা যায়। সে অঞ্চলের সর্বত্র নোনাজল থাকায় পানীয় জলের জন্য যথেষ্ট আয়াস করতে হয়। মশাল স্টেশনের বনকরের অফিসে নৌকায় করে বহুদূর বাদাবনের বাইরে বেগুনবেড়ে থেকে জল আনতে দেখা যায়।

উপন্যাসটি মনোজ বসু মান্য চলিত বাংলা ভাষাতেই লিখেছেন। উপন্যাসের চরিত্রদের মুখেও সেই ভাষা বসিয়েছেন। তবে এই ভাষাতে ঐ অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য জুড়ে দিয়েছেন। যেমন বাঘের প্রসঙ্গ উঠলে তাকে বাঘ না বলে 'বড় হরিণ', 'দক্ষিণ রায়' প্রভৃতি নাম ব্যবহার করা হয়; বাঘের হাতে মানুষ মরলে বলা হয় 'ভাল হয়েছে' প্রভৃতি। ঐ অঞ্চলে মানুষকে ডাকের ভাষা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন — ''বাদাবনে কদাপি নাম ধরে ডাকাডাকি করো না। মানুষের গলা বুঝতে পারলে বাঘ থাকলে সেখানে চলে আসবে। দ্বিপদ খাদ্য অত্যন্ত দুর্লভ কিনা! এসে অলক্ষ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে সুলুক-সন্ধান খুঁজে। আবার বাঘই নয় — তাদের উপরে অনেক রকম

আছেন। তাঁরা আরও ভয়ানক। . . . দরকার পড়লে কু দিয়ে সঙ্কেত করো, কথা বলতে যেও না।''[৩৪] এজন্য ঐ সব অঞ্চলে 'কু — উ — উ — ' সঙ্কেতের মাধ্যমে কাউকে ডাকা হয়।

এইভাবে অনুসন্ধান চালালে দেখা যায় যে, 'জলজঙ্গল' উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক উপন্যাসের বেশ কিছু লক্ষণই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসটিতে পটভূমি, চরিত্র এবং তাদের আচার-আচরণ, কার্যকলাপ, জীবন-জীবিকা, বিশ্বাস-সংস্কার, লোকাচার-লোকবিশ্বাস-লোককথা থেকে শুরু করে প্রায় সবদিক থেকেই আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করা হয়েছে। নিম্নবঙ্গ সুন্দরবন অঞ্চলের বাদাবনের চিত্র হিসেবেও উপন্যাসটি অপূর্ব হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে এই উপন্যাসটিতে 'আঞ্চলিক রঙ্' একটা আলাদা জায়গাও করে নিয়েছে। তাই এই উপন্যাসটিকে একটি সফল আঞ্চলিক উপন্যাস বলেই মনে হয়। কিন্তু অধ্যাপক-সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির আঞ্চলিকতাকে পুরোপুরি স্বীকার করে নেন নি। তিনি এই উপন্যাসটির আলোচনায় বলেছেন — ''উপন্যাসটিতে নৌকা বাহিয়া সমুদ্রোপকূলে মাছ-ধরার ও আরণ্য জীবনের নানা চিত্তাকর্ষক বর্ণনা থাকিলেও ইহাতে প্রতিবেশ ও ঘটনার একাধিপত্য নাই — মানবহৃদয়ের লীলাই এই পটভূমিকার মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।''[৩৫] অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মতামতকে পুরোটা মেনে নিতে না পারলেও এটাও ঠিক যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মত মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল' উপন্যাসে 'আঞ্চলিক রঙ্' প্রকাশ পায় নি। তাই শেষপর্যন্ত 'জলজঙ্গল' উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে চরম সার্থক না হলেও এটি আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবেই স্বীকৃতি পাবে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'নাগিনী কন্যার কাহিনী'** উপন্যাসটিও ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটিতে তিনি রাঢ় অঞ্চলের অন্ত্যজ শ্রেণি বেদে সম্প্রদায়ের জীবনকথাকে পরিবেশন করেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশ হল সর্প অধ্যুষিত। তাই কি পূর্ববঙ্গ, কি উত্তরবঙ্গ, কি রাঢ়বঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গ — সর্বত্রই সাপের দেবী মনসার পূজা প্রচলিত হয়েছে, মনসার মহিমা বর্ণনার জন্য বিভিন্ন কবিদের দ্বারা বিভিন্ন নামে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচনা করা হয়েছে। এই সাপকে কেন্দ্র

করেই বাংলায় একটি বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা 'বেদে' নামে পরিচিত। এই বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় বেদেদের কাজ ছিল সর্প অধ্যুষিত বাংলায় সাপ ধরা, সেই সাপের খেলা দেখানো, সাপের বিষ সংগ্রহ করে তা চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সরবরাহ করা অর্থাৎ বেদেদের জীবনই ছিল সর্পকেন্দ্রিক। এদের সম্পর্কে ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন — ''অন্ত্যজ বর্ণের যাযাবর ডোম-শবর পুলিন্দ-নিষাদ-বেদে প্রভৃতিদের অন্যতম বৃত্তি ছিল সাপ-খেলানো, যাদুবিদ্যার নানা খেলা দেখানো ইত্যাদি। সাপের উপদ্রব খুবই ছিল; মনসা পূজাই তাহার অন্যতম সাক্ষ্য। রাজসভায় জাঙ্গলিক বা বিষবৈদ্য অন্যতম রাজপুরুষ ছিলেন; জাঙ্গুলী সাপেরই অন্য নাম। সাপের কামড়ে অনেককেই প্রাণ দিতে হইত; সেইজন্য ওঝা বা বিষ-বৈদ্যদের সমাজে একটা স্থান ছিল; ইহারাই ছিলেন সাপুড়ে।''[৩৬] এই বিষ-বেদে সম্প্রদায় সর্প অধ্যুষিত বাংলার সর্বত্র কমবেশি দেখা গেলেও পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরেই তাদের ঘাঁটি হিসেবে বিবেচিত হত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কালের কথা'য় জানিয়েছেন যে, তিনি ছোটবেলা থেকেই মার কাছে সাপের গল্প শুনেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন — ''সাপ ও সাপিনীর মিলনের সময় সাপিনীর গায়ে কাঁঠালীচাঁপার গন্ধের মত গন্ধ বের হয়। এই তথ্যও তিনি আমাকে বলেছিলেন।''[৩৭] তিনি বড় হয়ে এদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তাদের জীবন পরিক্রমা সম্পর্কে এদের মুখেই অনেক গল্প শুনেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন — ''বেদিয়ারা আসিত। দেশী বেদিয়া সাপুড়ে। এরা সাধারণত আসত বর্ষার সময়, মাঠে আল-কেউটে ধরতে। গ্রামে সাপ দেখিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করত, বাঁদরও নাচাত, আর চলত। ওরা যেত — মেদিনীপুর পর্যন্ত। তাদের মুখেই শুনেছিলাম — মেদিনীপুর অঞ্চলে কবিরাজ ছিলেন অনেক, তাঁরা কালো কেউটের বিষ কিনতেন এবং তা দিয়ে ওষুধ তৈরি করতেন। কালো কষ্টিপাথরের মত এদের গায়ের রঙ, তেমনি কি ছিল চুল — পুরুষদের দাড়ি-গোঁফের এমন প্রাচুর্য যে ভারতবর্ষের যে কোন শ্মশ্রুগুম্ফগরবীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। মেয়েদের চুলও ছিল তেমনি — রুক্ষ কালো ঘন এক রাশ চুল, বৈশাখের হাওয়ায় ফুলতে থাকত দ্রুত ধাবমান কালো মেঘের মত। তেমনি টিকলো নাক, আর তীক্ষ্ণ চোখ।''[৩৮] এই সাপুড়ে

বেদেদের জীবন পরিক্রমাকে পটভূমি করেই তারাশঙ্কর তাঁর 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসটি লিখেছেন। এই উপন্যাসে এদের মধ্যেকার বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের বাসভূমি ভাগীরথী তীরস্থ সাঁতালী পর্বতের ভূ-প্রাকৃতিক বিবরণ থেকে শুরু করে এই জীবনচর্যার অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও বিস্তারিত পরিচয় উঠে এসেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসটিতে যে, অন্ত্যজ বেদে সম্প্রদায়ের সামগ্রিক পরিচয় ফুটে উঠেছে সে সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট আলোচকেরাও অবহিত করেছেন। এই উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে অধ্যাপক-সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''নাগিনী কন্যার কাহিনী' (সেপ্টেম্বর, ১৯৫১) তারাশঙ্কর-প্রতিভার আর একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। বাঙলার সমাজবিন্যাসের অদ্ভুত জটিলতা ও হিন্দুধর্মের অন্তর্গত নিম্নশ্রেণীর বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের সংস্কার-বিশ্বাস, রীতি-আচার বিষয়ে তাঁহার যে কি আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসটিতে তাহার বিস্ময়কর প্রমাণ মিলে।''[৩৯] আবার 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' গ্রন্থে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে ড. শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন — ''সমাজের প্রান্তদেশ সংলগ্ন বেদে সমাজের ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা এবং জীবনাচরণের কাহিনীর পটভূমিকায় শিরবেদের শাসন ও বিষহরির সেবায় উৎসর্গীকৃতা নাগিনী কন্যার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এই কাহিনীর মূলবস্তু।''[৪০] অন্যান্য সমালোচকেরাও এই উপন্যাসটির এই দিকটির কথা উল্লেখ করেছেন। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরার আগে এর কাহিনি অংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা আবশ্যক।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসটি রাঢ় অঞ্চল বীরভূমের বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের জীবন পরিক্রমা অবলম্বনে রচিত। এই উপন্যাসের কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা দীর্ঘদিন ধরে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ভাগীরথী তীরস্থ সাঁতালী পর্বতে বংশ পরম্পরায় বাস করে এসেছে। এই উপন্যাসে ভদ্রসমাজের প্রতিনিধি ধূর্জটি কবিরাজের শিস্য 'ছোট ধন্বন্তরী' শিবরাম কবিরাজের কথকতায় সমগ্র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

এখানে দু'টি পর্ব আছে। উপন্যাসের দু'টি পর্বেই মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের জীবনধারা, উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির সঙ্গে নিবিড় যোগ, নানা বিশ্বাস-সংস্কার, জীবন দ্বন্দ্ব, লৌকিক রীতি-নীতি, রূপকথা, আঞ্চলিক ভাষার মতো বিষয়গুলির জীবন্ত চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের সমাজে একজন সমাজপতি থাকেন যাকে বলা হয় 'শিরবেদে'। আর একজন হয় 'নাগিনী কন্যা'। বিষ-বেদেদের বিশ্বাস — মা মনসার নির্দেশেই তাদের সমাজে একজন করে নাগিনী কন্যার আবির্ভাব হয়। এনিয়ে এদের সমাজে 'মনসামঙ্গল' কাব্যের লক্ষীন্দরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নানা লৌকিক গল্পও প্রচলিত আছে। নাগিনী কন্যা এবং শিরবেদে উভয়েই বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের হলেও এই দু'জনের বিরোধ চিরন্তন। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসের এই শিরবেদে চালিত বিষ-বেদেদের সমাজব্যবস্থা এবং সেখানে নাগিনী কন্যার ভূমিকাকে দেখানো হয়েছে। এই উপন্যাসের দু'টি পর্বে আমরা দু'জন নাগিনী কন্যাকে পাই — শবলা ও পিঙলা। অনুরূপভাবে দু'জন শিরবেদে আছে — মহাদেব ও গঙ্গারাম। বিষ-বেদে সমাজে পাঁচবছর বয়স থেকেই কোন বালিকার শরীরে নানা স্বতন্ত্র লক্ষণ পরিস্ফুট হতে শুরু করে, যা দেখে সহজেই ধরে নেওয়া যায় সে পরবর্তী নাগিনী কন্যা হতে চলেছে। তবে একবার নাগিনী কন্যা হয়ে গেলে সেই মেয়েটিকে কঠোর নিয়ম-কানুনের মধ্যে থাকতে হয়, যার মধ্যে একটি হল অন্য কোনো পুরুষের প্রতি আকর্ষিত হওয়া যাবে না। নাগিনী কন্যারা এসকল নিয়ম-কানুন ঠিকমতো মেনে চলছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব শিরবেদেদের। এনিয়েই বিষ-বেদে সমাজে নাগিনী কন্যার সঙ্গে শিরবেদেদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই উপন্যাসেও প্রথম নাগিনী কন্যা শবলার সঙ্গে শিরবেদে মহাদেবের বিরোধ বেধেছে। শবলা এক জোয়ান পুরুষের প্রতি আকর্ষিত হলে শিরবেদে মহাদেব তাকে সুকৌশলে সাপ দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছে। শবলা এটা বুঝতে পেরে মহাদেবকে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে নিজের প্রতি আকর্ষিত করে সাপ দিয়ে হত্যা করেছে এবং নিজেও নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। এরপর দীর্ঘদিন তার কোনো খবর পাওয়া যায় নি। তবে উপন্যাসের শেষে সে আবার

আবির্ভূত হয়েছে। অবশ্য সে ততদিনে একজন ইসলামীবেদেকে বিয়ে করে সংসার পেতেছে।

শিরবেদে মহাদেবের মৃত্যু এবং নাগিনী কন্যা শবলার সাঁতালী পর্বত ত্যাগ করার ফলে বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের মহাদেবের ভাইপো গঙ্গারাম নতুন শিরবেদে এবং পিঙলা নতুন নাগিনী কন্যা হয়। শিরবেদে গঙ্গারাম জন্মসূত্রে বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের হলেও দীর্ঘদিন অঞ্চলটির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল না। সে তুক্‌তাক, জাদুবিদ্যা, মায়াজাল, ভোজবাজী জানা লম্পট প্রকৃতির মানুষ। নতুন নাগিনী কন্যা পিঙলার সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। সে পিঙলাকে নিজের আয়ত্তে এনে ভোগ করতে চায়। এদিকে পিঙলাকে ভালোবাসে সভ্যজগতের ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিনিধি নাগেশ্বর ঠাকুর ওরফে নাগুঠাকুর। এই নিয়ে শিরবেদে গঙ্গারামের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। নাগুঠাকুর জানায় যে, সে বিষহরি, মা কামাক্ষ্যার আদেশে পিঙলাকে উদ্ধার করতে এসেছে। কিন্তু শিরবেদে গঙ্গারামসহ পুরো বেদেসমাজ সে কথা মানে না এবং তার প্রমাণ চায়। ফলে তাদের সঙ্গে নাগুঠাকুরের বিরোধ বাধে। এই বিরোধে নাগুঠাকুর কিছুটা পিছু হটে এবং উপযুক্ত 'ছাড়পত্তর' নিয়ে এসে পিঙলাকে বিয়ে করার দাবী জানিয়ে সাঁতালী ত্যাগ করে। এদিকে সংস্কারগ্রস্ত পিঙলা নাগুঠাকুরের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে দুর্বল হয়ে পড়ে। এসময় গঙ্গারাম তাকে ছলনা করলে সে গঙ্গারামের ছলনা বুঝতে পারে না। ফলে সংস্কারগ্রস্থ পিঙলা আর নাগুঠাকুরের জন্য অপেক্ষা না করে নিজে নিজে সাপের কামড় খেয়ে আত্মাহুতি দেয়। এর চারদিন পরে নাগুঠাকুর উপযুক্ত প্রমাণ নিয়ে ফিরে আসে। পিঙলার মৃত্যুর খবর পেয়ে সে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার হাতে গঙ্গারামের মৃত্যু হয়। আর নাগুঠাকুরের দলবল মদ খেয়ে রাতের বেলা সাঁতালীর বিষ-বেদে পাড়ায় আগুন ধরিয়ে দেয়, এতে সেখানকার সবকিছু পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ থেকেই নাগিনী কন্যার মুক্তি ঘটে। ফলে সেখানে আর নতুন নাগিনী কন্যা জন্মায় না। শবলা যেমন ইসলামীবেদেকে বিয়ে করে অন্যত্র চলে গেছে, সাঁতালীর বিষ-বেদেরাও চিরকালের মতো সাঁতালী ত্যাগ করে।

উপন্যাসটির এই কাহিনি অংশে নানা দিক থেকেই আঞ্চলিকতার লক্ষণগুলি প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনাকালে সমালোচকেরাও এর আঞ্চলিকতা ধর্মের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে এখানে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যের

উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন — ''বেদেদের বাসস্থান সাঁতালী গ্রাম সুদূর মধ্যযুগের স্মৃতিরোমন্থনে আবিষ্ট, সাপের বিষনিঃশ্বাসে উগ্র, নানা অলৌকিক সংস্কারচর্চায় কল্পনা-রোমাঞ্চিত, এক আশ্চর্য ধর্মনিষ্ঠা ও সমাজশাসন-স্বীকৃতিতে দৃঢ়বদ্ধ, জীবনের অমোঘ দুঃখময়তা ও নিয়তিবাদের অনিবার্যতায় মহিমান্বিত। এই বেদে-জগতের বাতাবরণ মা-বিষহরির অদৃশ্য উপস্থিতির আভাসে-ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ; হিংস্র বন্যজন্তুর চাপা গর্জন ও রাত্রির নিঃশব্দ অন্ধকারকে রহস্যময় করিয়া রাখে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে এই বাতাবরণটি অপূর্ব বর্ণনাকৌশলে ও ব্যঞ্জনাধর্মিতায় অপরূপ সঙ্কেতভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।''[৪১] অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তিটিতেই 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসের আঞ্চলিকতার লক্ষণগুলির অনেকটাই আভাস পাওয়া যায়। বাস্তবেও তাই। একটু অনুসন্ধান করলেই উপন্যাসটির প্রায় সর্বত্রই আঞ্চলিকতার লক্ষণগুলি খুঁজে পাওয়া যায়।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসটি যে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে ভিন্ন কোনো অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত, তা উপন্যাসটির শুরু থেকেই ঔপন্যাসিক স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি উপন্যাসটি ধূর্জটি কবিরাজের শিস্য শিবরাম কবিরাজের কথকতায় রচনা করেছেন। তার জবানীতেই এর পটভূমির বিবরণ দিতে গিয়ে প্রথমেই লিখেছেন — ''মা-ভাগীরথীর কূলে কূলে চরভূমিতে ঝাউবন আর ঘাসবন, তারই মধ্যে বড় বড় দেবদারু গাছ। উলুঘাস, কাশবন আর সিদ্ধিগাছে চাপ বেধে আছে। মানুষের মাথার চেয়েও উঁচু। এরই মধ্যে গঙ্গা স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হিজল বিল এঁকেবেঁকে নানান ধরনের আকার নিয়ে চলে গেছে। ক্রোশের পর ক্রোশ লম্বা হিজল বিল। বর্ষার সময় হিজল বিল বিস্তীর্ণ বিপুল গভীর, শীতে জল ক'মে আসে, গঙ্গার টানে জল নেমে যায়, সূর্যের উত্তাপে শুকিয়ে আসে, তখন হিজল বিল টুকরো টুকরো। হিজল বিল থেকে নালার সতনরী গিয়ে মিশেছে গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে; আশ্বিনের পর থেকে টুকরো টুকরো বিলগুলিকে দেখে মনে হয়, ওই হারের সঙ্গে গাথা কালো মানিকের ধুকধুকি। তখন হিজল বিলের জলের রঙ কাজল কালো, নীল আকাশের জলের বুকে স্থির হয়ে আসে, যেন ঘুমোয়।''[৪২] শিবরাম কবিরাজের এই বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট হয় যে, উপন্যাসের এই জগৎ বাঙালির চির পরিচিত জগৎ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক জগৎ। এরপর হিজল বিলের বর্ণনায়

বলেছেন — ''বিলের বুকে হাঁসের মেলা বসেছে, কার্তিক মাস পড়তে না পড়তে। হাজারে-হাজারে — ঝাঁকে-ঝাঁকে নানান আকারের বহু বিচিত্র বর্ণের হাঁস এসে বাসা নিয়েছে। জলের বুকে ভাসছে, ডুবছে, উঠছে, বিলের চারি পাশের শালুক-পানাড়ি-পদ্মবনের মধ্যে ঠুকরে ঠুকরে টাটি ভেঙে খাচ্ছে, ডুব দিয়ে শামুকগুগলি তুলছে, কলরব করছে, মধ্যে মধ্যে পাক দিয়ে উড়ছে, ঘুরছে, আবার ঝপ-ঝপ ক'রে জলের বুকে ঝাঁপিয়ে ভেসে পড়ছে। বহু জাতের হাঁসের বিচিত্র ডাক একসঙ্গে মেশানো এক কলরব — কল্-কল্, কল্-কল্, ক্যাক-ক্যা-ক, ক্যাও-ক্যাও ক্যা-ও-ক্যা-ও। তার সঙ্গে ওই ভেরানীদের মতো কর্-কর্-কর্ — কর্ ধ্বনি।''[৪৩] এই বর্ণনার পাশাপাশি শিবরাম আরও বলেছে — ''গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালটি জড়িয়ে ফণা তুলে ফুঁসছে বিশালফণা এক দুধে-গোখরো। শকুনি-গৃধিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্য সে অহরহ প্রস্তুত হয়ে আছে। তারপর তাকাও ডালে ডালে। দেখবে, পাকে পাকে জড়িয়ে কি যেন সব নড়ছে, দুলছে, কখনও বা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সাপ — সব সাপ। বন্যায় ডুবছে হিজলের ঘাসবন, সাপেরা উঠেছে গাছের ডালে ডালে।''[৪৪] এই হিজল বিলের পাশে সাঁতালী গ্রাম হল উপন্যাসের মূল পটভূমি। ঔপন্যাসিক শিবরাম কবিরাজের বিবরণে এই সাঁতালী গ্রাম গড়ে ওঠা থেকে শুরু করে তার অভ্যন্তরীণ নানা বিষয়ের বিবরণও এই উপন্যাসে দিয়েছেন, যা থেকে খুব সহজেই 'ছায়া সুনিবিড়', 'শান্তির নীড়' 'শস্যশ্যামলা' বাংলার সাধারণ গ্রামগুলি থেকে এই সাঁতালী গ্রামকে পৃথক করা যায়।

এই উপন্যাসে সাঁতালী গ্রামের প্রথম পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শিবরাম কবিরাজের মাধ্যমে বলেছেন — ''সাঁতালীর বিষ-বেদে। সাঁতালী ওদের গ্রামের নাম। ওই হিজল বিলের ধারে ভাগীরথীর চরভূমির ঘাসবন ঝাউবন দেবদারু গাছের সারির আড়ালে, ওই হাঙরমুখী নালার ঘাট থেকে চলে গেছে একফালি সরু পথ, দুদিকে ঘাসবন, মাঝখানে পায়ে পায়ে বনপথ একেবেঁকে চলে গিয়েছে ওই বিষ-বেদেদের সাঁতালী গ্রামের মাঝখানে, বিষহরি মায়ের 'থান' অর্থাৎ স্থান পর্যন্ত।''[৪৫] এরপর তিনি গ্রামটির অভ্যন্তরের বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন। শিবরামের বর্ণনায় তা হল — ''ভাগিরথীর কূলে হিজল বিলের পাশে মা-

মনসার আটনের পাট অঙ্গনে সাঁতালী গাঁয়ের চারিপাশেই কালনাগিনীর বাসভূমি। তাই তো বিষ-বেদেরা এই ঘাস-বনের মধ্যে বন্যার জলে পাঁকল মাটির উপরই বাস করে পরমানন্দে। বন্যায় কাদা হয়। ঘাস পচে, ভ্যাপসা গন্ধ হয়, মশায় মাছিতে ভনভন করে চারিদিক, ঘাসবনের মধ্যে বাঘ গর্জায়, হিজল বিলের অসংখ্য নালায় কুমীর ঘুরে বেড়ায়, হাঙর আসে, কামঠ আসে, তারই মধ্যে ওরা বাস ক'রে চলেছে। এখান ছেড়ে বিষ-বেদেরা স্বর্গেও যেতে চায় না। . . . মা-বিষহরির সনদ দেওয়া জমি — এ জমির খাজনা নাই। লোকে বলে ওমুক রাজার রাজত্বি — ও গাঁয়ের ওই জমিদারের এলাকা, কিন্তু বিষ-বেদেদের খাজনা নিতে আজও কোনো তসিলদারের নৌকা হাঙরমুখীর নালা বেয়ে সাঁতালী গাঁয়ের ঘাটে এসে পৌঁছে নাই।''[৪৬] আর হিজল বিলতীরস্থ সাঁতালীর চারিপাশের পরিচয় প্রসঙ্গে শিবরামের বক্তব্য — ''হিজল বিলের বুক থেকে নালা-খালার অন্ত নাই। এইখানে মুখে হাঙরের বাস — এর নাম হাঙরমুখী, ওর পাশে ওইটে হল কুমীর খানা, তার ওদিকে হাঁসখালি। এ বিলের নালা-খালার অন্ত নাই; কর্কটির খাল, চিতির নালা, কাঁদুনে গড়ানি। হিজলের যে দিকটা লোকে চেনে, এটা সেদিক নয়, সেদিকে আছে আরও কত নালা-খালা। আমরা এইখানেই ঢুকলাম নৌকা নিয়ে। তিনখানি নৌকো ঘাটে বাঁধা রইল। ঘাসবনের ভিতর মাচান বেঁধে তুললাম। তিনখানি ঘরে নতুন সাঁতালী গাঁয়ের পত্তন হয়েছিল।''[৪৭]

এসব দৃষ্টান্তের পর আর বলার অপেক্ষা থাকে না যে, 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'র পটভূমি মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত থেকেও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন কোন একটি বিশিষ্ট অঞ্চল। তবে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে শুধু সেই বিশিষ্ট অঞ্চলটিকেই পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেন নি, সেখানে বসবাসকারী জনসমাজের জীবনচর্যার ছবিকেও তুলে ধরেছেন।

এই সাঁতালী গাঁয়ে বাস করে বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের মানুষজন। বিষ-বেদেরা মূল জনসমাজের বেদে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হলেও তাদের সঙ্গে এদের বেশ কিছু পার্থক্য আছে। তাই এই উপন্যাসে বিষ-বেদেদের পাশাপাশি মেটেল বেদে, ইসলামীবেদে প্রভৃতি বেদে সম্প্রদায়ের উল্লেখ করে ঔপন্যাসিক তাদের সঙ্গে বিষ-বেদেদের পার্থক্যের কথা জানাতে ভোলেন নি। মেটেল বেদে সম্পর্কে তিনি

জানিয়েছেন — ''মেটেল বেদেরা বিষহরির সন্তান নয়। ওরা সাধারণ বেদে। ওরা জলকে এড়িয়ে চলে। মাটিতে কারবার। হাঁটা-পথে ওরা ঘুরে বেড়ায়। ওরা সাপ বিক্রি করে। ওরা চাষ করে, লাঙল ধরে। সাঁতালীর বিষ-বেদেদের সঙ্গে ওদের অনেক তফাত।''[৪৮] আর বিষ-বেদে সমাজ ত্যাগ করে গিয়ে এক ইসলামীবেদের সঙ্গে ঘর বাধা 'নাগিনী কন্যা' শবলা ইসলামীবেদেদের সম্পর্কে শিবরাম কবিরাজকে বলেছে — ''সাঁতালীর বেদেকুলের যারা সাঁতালী থেক্যা গাঙুড়ের জলে পা ভাসায়ে আসিবার পথে সঙ্গ ছাড়িছিল, থেক্যা গেছিল পদ্মাবতীর চরে — তারাই তো হইছে ইসলামী বেদে।''[৪৯] যাই হোক, এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্ররা যথা নাগিনী কন্যা শবলা, শবলার প্রেমিক, শিরবেদে মহাদেব, মহাদেবের ভাইপো পরবর্তী শিরবেদে গঙ্গারাম, দ্বিতীয়া নাগিনী কন্যা পিঙলা, শবলার কাকা ভাদু বেদে প্রমুখেরা সবাই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে। ধূর্জটি কবিরাজ ও তার শিস্য শিবরাম কবিরাজ, নাগু ঠাকুর প্রমুখেরা উপন্যাসে বাইরের চরিত্র হিসবেই থেকে গেছে। ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক চরিত্রগুলির শারীরিক অবয়ব থেকে শুরু করে তাদের প্রকৃতির বিবরণও এই উপন্যাসে দিয়েছেন, যা থেকে খুব সহজেই এদের মূল জনসমাজের মানুষজনের চেয়ে আলাদা করা যায়। তাই নাগিনী কন্যা শবলার প্রথম আবির্ভাবের বিবরণে শিবরাম কবিরাজ বলেছে — ''এ মেয়ে সাপুড়েদের মেয়ে, বেদিনী। কিন্তু এ বেদিনী আগের-দেখা সব বেদেনী থেকে আলাদা। সাল-বেদে, মাঝি-বেদে — এরা তাঁর দেশের মানুষ। এ বেদিনীর জাত আলাদা। চেহারাতে আলাদা, কথায় আলাদা, সাজে পোশাকে আলাদা — এমন বেদের মেয়ে নতুন দেখলেন শিবরাম তাঁর জীবনে। বেদেরা কালোই হয়, কিন্তু এমন মসৃণ উজ্জ্বল কালো রঙ কখনও দেখেন নাই শিবরাম। তেমনি কি ধারালো গড়ন। মেয়েটির বয়স অল্প, কিন্তু বেশি বয়স হ'লেও একে দূর থেকে মনে হয় কিশোরী মেয়ে। ছিপছিপে পাতলা গড়ন, দীর্ঘাঙ্গী, মাথায় একরাশি চুল — রুক্ষু কালো করকরে কোঁকড়া চুল, খুলে দিলে পিঠের আধখানা ঢেকে চামরের মতো ফাঁপা হয়ে বাতাসে দোলে, কোঁকড়া চুল টেনে সোজা করলে এসে পড়ে জানুর উপর। কালো রঙের মধ্যে চিক্‌চিক্ করছে তিন অঙ্গে চার ফালি তুলির রেখায় টানা সাদা রেখা। কালো চুলের ঠিক মাঝখানে পৈতের সুতোর

মতো লম্বা সিঁথিটি, ধারালো নাকটির দুপাশে নরুণ দিয়ে চেরা সরু অথচ লম্বা টানা পদ্মের একেবারে ভিতরের পাপড়ির মতো দুটি চোখের সাদা ক্ষেত, আর ঠোঁটের ফাঁকে ছোট দাঁতের সারি। . . . নৌকাখানা আর একটু এগিয়ে যেতেই নাকে একটা তীব্র গন্ধ ঢুকল এসে শিবরামের। মেয়েটি যখন ঘাসবন ঠেলে সাপটার পিছনে বেরিয়ে এসে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, তখন ঠিক মুহূর্তের জন্য এই গন্ধ নাকে এসে পৌঁছেছিল। শিবরাম বুঝলেন, এ গন্ধ ওর গায়ের গন্ধ। শরীরটা যেন পাক দিয়ে উঠল। যারা বন্য, যারা পোড়া মাংস খায়, তেল মাখে না, তাদের গায়ে একটু গন্ধ থাকে। মাল মাঝি বেদেদের গায়েও গন্ধ আছে, কিন্তু তাতে এই তীব্রতা নেই। এ যেন ঝাঁজ!''[৫০] দ্বিতীয় নাগিনী কন্যা পিঙলাও শারীরিক গঠন এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে গড়পড়তা নারীর চেয়ে আলাদা। তার সম্পর্কে শিবরাম জানিয়েছেন — ''কালো মেয়ে পিঙলার চোখ দুটো পিঙ্গলাভ; সে চোখের দৃষ্টি আশ্চর্য রকমের স্থির। মানুষের দিকে সে নিষ্পলক হয়ে তাকিয়ে থাকে, পলক ফেলে না; মনে হয় একেবারে ভিতরের ভিতরে থাকে যে আঙ্গুল-প্রমাণ আত্মা, সে-ই যেন চোখ দুটার দুয়ার খুলে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তার তো ভয় নাই, ডরও নাই। তা ছাড়া, পিঙলার ওই চোখ দুটা অন্ধকারের মধ্যে বনবিড়ালের চোখের মতো জ্বলে। যে অন্ধকারে অন্য মানুষের দৃষ্টি চলে না, পিঙলা সেই অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পায়। পিঙলার চোখের দিকে চাইলেও ভয় পায় সকলে।''[৫১]

বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের শিরবেদেদেরও সাধারণ মানুষের চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে খুব সহজেই আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। ঔপন্যাসিক চমৎকারভাবে শিরবেদে মহাদেবের আবির্ভাবের বিবরণ দিয়েছেন — ''তাঁর কথা শেষ হতে না হতে ঘাসবন থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সেই মহাদেব। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত গামছার মত একফালি মোটা একটা কাপড়ের আবরণ শুধু, নইলে নগ্নদেহ এক বন্য বর্বর। গলায় হাতে তাবিজ জড়িবুটি এক কালো সুতোয় বাঁধা, আর গলায় দুলছে একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা। তারও গায়ে ওই উৎকট তীব্র গন্ধ। বৃদ্ধ তবু লোকটা খাড়া সোজা। দেহখানা যেন শ্যাওলা-ধরা অতি প্রাচীন একটা পাথরের দেওয়াল, কালচে সবুজ শ্যাওলায় ছেয়ে গিয়েছে, কতকালের শ্যাওলার স্তরের উপরে শ্যাওলার স্তর। কিন্তু এখনও শক্ত অটুট রয়েছে।''[৫২]

তবে ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’ উপন্যাসে বেদে সম্প্রদায় এবং কিছু মূল জনগোষ্ঠীর মানুষজন থাকলেও এরা সবাই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, যদি উপন্যাসটি থেকে হিজল বন ও সাঁতালী গ্রামের আদি-মধ্যযুগীয় আলো-আঁধারিপূর্ণ রোমাঞ্চকর প্রকৃতিকে সরিয়ে নেওয়া যায়। সমগ্র উপন্যাসেই এই অঞ্চলটি তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যসহ সামগ্রিক প্রভাব বিস্তার করেছে। অঞ্চলটির বাইরে এই মানুষগুলির অস্তিত্ব কেমন তা একটি দৃষ্টান্ত দিলেই স্পষ্ট হয়। ঔপন্যাসিক ওদের জবানীতেই থানা-পুলিশ সম্পর্কে বলিয়েছেন — ‘থানা-পুলিশ যমের বাড়া, উরা বাবা সাক্ষাৎ বাঘ। দেখলি পরেই পরানটা খাঁচাছাড়া হয়্যা যায় গ।’’[৫৩] তাই উপন্যাসের শেষে নাগুঠাকুরের চেলা-চামুণ্ডাদের হাতে সাঁতালী গাঁ পুড়ে গেলে এদের অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়েছে। শেষপর্যন্ত বিষ-বেদেরাও ঘরছাড়া হয়ে যাযাবরে পরিণত হয়েছে। তাই বলা যায় যে, উপন্যাসটি থেকে কোনভাবেই হিজল বিল ও সাঁতালীকে সরিয়ে নেওয়া যায় না; সরিয়ে নিলে উপন্যাসটি তার আনেক কিছুই হারিয়ে ফেলে। এজন্যই এই রাঢ়ের এই অঞ্চলটি উপন্যাসে তার অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

উপন্যাসে আঞ্চলিক প্রকৃতি-পরিবেশের নিরিখে চিত্রিত মানুষজনের জীবন পরিক্রমার বিস্তারিত বিবরণও রয়েছে। সাঁতালী গাঁয়ের মানুষজনের সাপ নিয়েই সমস্ত কারবার। এরা সাপকে তাদের জীবনের অঙ্গ হিসেবেই ভাবে। তাই সাপের প্রকৃতি, মনোভাব সবকিছুই যেন এরা বুঝতে পারে। এরা যেন সাপের সঙ্গে কথাও বলে। তাই হিজল বিলের পার্শ্ববর্তী বনে একটি কালো সাপকে ধরে এক বেদে কন্যার অভিব্যক্তি এরূপ — ‘‘খিলখিল হাসির সঙ্গে মেয়েটি কোন কৌতুকে হেসে যেন ভেঙে পড়ছে। হাসির শেষে তার কথা শোনা গেল — ইরে বাবারে, ইরে বানাস্! মুই কুথাকে যাব রে! গোসা করিছে গো, মোর কালনাগিনীর গোসা হলছে গো! ইরে বাবা রে, ফুঁসানি দেখ গো!’’[৫৪] সাপকে নিয়ে কারবার করা সাঁতালী গাঁয়ের বিষ-বেদেদের কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই জীবনপথে এগোতে হয়। গঙ্গার বন্যার জল হিজল বিলে ঢুকে পড়লে তাদের দুর্দশার সীমা থাকে না। বন্যার জল নেমে গেলে এদের জীবন আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফেরে। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ‘‘গঙ্গায় বন্যা আসে। ঘাসবন ডুবে যায়, হিজল বিল আর গঙ্গায় এক হয়ে যায়, সাঁতালী গাঁ জলে ডোবে, মাচাগুলি

জেগে থাকে, — বড়ো বন্য হ'লে তাও ডোবে। তখন গেলে দেখতে পাবে ঝাউগাছের ভেলার উপর, ছোটো ছোটো নৌকার উপর বিষ-বেদেরা সেই অথৈ বন্যার মধ্যে ভাসছে। বন্যার জল নেমে যায়, মাটি জাগে, ভিজে প'লির আস্তরণ পড়ে যায়, বিষ-বেদেরা নৌকা এবং ভেলার উপর থেকে নেমে আসে মাচার উপর পলি কাদা পরিষ্কার করে। দেওয়ালের খ'সে-পড়া কাদার আস্তরণ আবার লাগায়, ছোট ছেলেমেয়েরা কাদা ঘেঁটে মাছ ধরে, কাঁকড়া ধরে। বড়োরা দেবদারু গাছে আঁকশি লাগিয়ে শুকনো কাঠ ভেঙে আনে, বিলে ফাঁদ পেতে হাঁস ধরে, গুল্‌তি ছুড়েও মেরে আনে, আবার সাঁতালীর ঘরে ঘরে উনানের ধোঁয়া ওঠে, ওদের ঘরকন্না আবার শুরু হয়ে যায়।''[৫৫]

এইসময় থেকেই বিষ-বেদেদের সাপ ধরার কাজ শুরু হয় — ''হিজল বিলের চারি পাশে ঝাউ-দেবদারুর উঁচু ডালে, মাথায় — বন্যায় ভেসে এসে নানান ধরনের সাপেরা আশ্রয় নেয়, ওরা সেই সাপ দেখে দেখে প্রায় বেছে বেছে ধরে ঝাঁপি বোঝাই করে। ওদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে এমন সাপ সৃষ্টিতে নাই।''[৫৬] বর্ষার জল নেমে যাওয়ার পর জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে এলে ভাদ্রের শেষে নাগপঞ্চমীতে মা-বিষহরির পূজা করে বিষ-বেদেরা দেশ-বিদেশে তাদের সফর শুরু করে — নানাধরনের বৃত্তির মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — ''ভাদ্রের শেষে নাগপঞ্চমীতে মা-বিষহরির পূজো শেষ ক'রে ওদের সফর শুরু হয়। . . . বিষ-বেদেরাও বের হয় — তাদের কুল-ব্যবসায়ে। হাঙরমুখী, কুমীরখালা, হাঁসখালি বেয়ে সারি সারি বিষ-বেদেদের নৌকা এসে পড়ে মা-গঙ্গার জলে। নৌকাতে সাপের ঝাঁপি, রান্নার হাঁড়ি, খেলা-দেখাবার বাঁদর-ছাগল আর মানুষ। শুধু বিষ-বেদেরাই নয় -- অন্য অন্য যারা জাতবেদে তারাও বের হয় কতক নৌকায়, কতক হাঁটাপথে — ভার কাঁধে। এই সফর ওদের কুলপ্রথা, জাতিধর্ম। . . . সাপ-সাপিনী মাঠে মাঠে বা নদী-নালার কূলের গর্তে গর্তে সন্ধান ক'রে ধরতে বের হয়। দেশ-দেশান্তর ঘোরে, বাঁধা কবিরাজ মশায়দের ঘর আছে, সেইখানে গিয়ে তাঁদের চোখের সামনে কালনাগিনীর বিষ গেলে বিক্রি করে; গ্রামে গ্রামে গৃহস্থদের ঘরে খেলা দেখায় — সাপের নাচন, ছাগল-বাঁদরের খেলা। দেখিয়ে দেখিয়ে চলে এক গ্রাম থেকে আর এক

গ্রাম, এক জেলা থেকে আর এক জেলা — মাসের পর মাস কেটে যায়, তারপর একদিন আবার ঘরের দিকে ফেরে।''[৫৭]

সাপের মুখ থেকে বিষ সংগ্রহ করে বিক্রি করাও এদের পয়সা উপার্জনের একটা দিক। এই উপন্যাসে সেই বিষ সংগ্রহের পরিচয়ও আছে। শিবরাম কবিরাজ এই বিষ সংগ্রহের বিবরণে বলেছে — ''তালের পাতা আর ঝিনুকের খোলা। যে ঝিনুক পুকুরে মেলে সেই ঝিনুক। তালের পাতা ধনুকের ছিলার মতো টান করে বেঁধে ধরে একজন, আর একজন সাপের চোয়াল টিপে হাঁ করিয়ে ধরে। ঝিনুকটা দেয় মুখের মধ্যে পুরে, বিষদাঁত দুটি বিঁধে যায় ওই তালপাতার বাঁধনে। তালপাতার ধারলো করকরে প্রান্তভাগের চাপ পড়ে বিষের থলিতে, ওদিকে বিষদাঁত বিঁধে থাকার স্বাভাবিক ক্রিয়ায় দাঁতের নালী বেয়ে বিষ টপ টপ ক'রে পড়ে ওই ঝিনুকের খোলায়। এমনই কৌশল ওদের যে বিষের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত ঝ'রে পড়বে। তারপর সাপটা যায় ঝাঁপিতে, ঝিনুকের বিষ যায় সরষের তেলে ভরা কবিরাজের পাত্রে। জলের উপর তেলের মতো, তেলের উপর বিষ ছড়িয়ে প'ড়ে ভাসে। না হ'লে বাতাসের সংস্পর্শে জ'মে যায় বাবা।''[৫৮] অবশ্য এই বিষ-বেদেদের সমাজে উচ্চস্থান পাওয়ার কথা ছিল। তবে তারা হেলায় তা প্রত্যাখ্যান করে ভবঘুরে যাযাবরের জীবন বেছে নিয়েছে। শিবরামের বিবরণ অনুযায়ী — ''ধন্বন্তরির শিস্য বিষবৈদ্যেরা সমাজে আসন পেত, আদর পেত, সম্মান পেত — অচ্ছুৎ ছিল না, বিষঘ্ন লতা পৈতের মতো পরতে পেত গলায়। তবু তারা ছিল বিবাগী বাউল; বিষ-চিকিৎসায় মূল্য নাই — অমূল্য এ বিদ্যা, ধনলোভীর এ বিদ্যা নিষ্ফল, তারা দক্ষিণা নিত না, মূল্য নিত না — নিত যৎসামান্য দান।''[৫৯]

বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের জীবন-পরিক্রমায় নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিরবেদেরা তাদের উপর কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করে। এ সম্পর্কে শিবরাম জানিয়েছে — ''সন্ধ্যায় শিবারবের পর যে বেদের মেয়ে গাঁয়ের বা আস্তানার বাইরে রইল, তার ঘরে প্রবেশাধিকার রইল না। অন্তত সে রাত্রির মত রইল না। পরের দিন সকালে তাকে সাক্ষীসাবুদ নিয়ে শিরবেদের সম্মুখে এসে দাঁড়াতে হবে, প্রমাণ করতে হবে — সে সন্ধ্যের সময় পর্যন্ত কোনোমতেই ঘর পর্যন্ত পথ অতিক্রম করতে পারে নাই এবং সন্ধ্যের সময়েই সে আশ্রয় নিয়েছিল কোনো সৎগৃহস্থের ঘরে, কোনো

অপরাধে সে অপরাধিনী নয়। তবে সে পায় ঘরে ঢুকতে। প্রমাণে এতটুকু খুঁত বের হ'লে দিতে হয় জরিমানা। এর উপর খেতে হয় বেদের প্রহার।''[৬০] তবে এত করেও নারীদের আটকে রাখা যায় না। শিবরামের বিবরণ অনুযায়ী — ''বেদের কন্যের লাজ নাই, শরম নাই, বেদের কন্যের ধরম নাই, বেদের কন্যের ঘরের মায়া নাই; বেদের কন্যে বেদিনী অবিশ্বাসিনী। রীতিচরিত তার লাগের কন্যে লাগিনীর মতন। রাত লাগলি, আঁধার নামলি চোখে নেশা লাগে, বুকের ভিতরটা তোলপাড় ক'রে লাগিনীর মতন সনসনিয়ে চলে, ফণা তুলে লাচে। সে লাচন যে দেখে সে সংসার ভুলে যায়।''[৬১] তাই মাঝে মাঝেই রাত্রির আঁধারে এদের চোখে-মনে 'নিশির নেশা' ধরে। আর একবার 'নিশির নেশা' ধরলে রক্ষা থাকে না। এটাই নাগিনী কন্যার মৃত্যুযোগ। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ''রাত্রির আঁধার তার চোখে-মনে নিশির নেশা ধরিয়ে দেয়। 'নিশির নেশা' নিশির ডাকের চেয়েও ভয়ঙ্কর। নিশির ডাক মানুষ জীবনে শোনে কাল-কস্মিনে। 'নিশির নেশা' রোজ নিত্য-নিয়মিত ডাকে মানুষকে। . . . নাগিনীও পাগল হয়ে যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে যায়। ভুলে যায় মা-বিষহরির নির্দেশ, ভুলে যায় বেহুলার অভিশাপের কাহিনী, ভুলে যায় তার নিজের শপথের কথা। বেদেদের শিরবেদের শাসন ভুলে যায়, মানসম্মান পাপ-পুণ্য সব ভুলে যায়; ভুলে গিয়ে সে ঘর ছেড়ে নামে পথে। তারপর ওই ঘন ঘাসবনের ভিতর দিয়ে চলে — সনসন ক'রে কালনাগিনীর মতোই চলে। সমস্ত রাত্রি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘোরে; . . . রাত্রির পর রাত্রি ঘোরে নাগিনী কন্যা। একদিন বেরিয়ে এলে আর নিস্তার নাই। রোজ রাত্রে নিশির নেশা ধরবে, যেন চুলের মুঠো ধ'রে টেনে নিয়ে যাবে। এক নাগিনী কন্যেকে ধরেছিল এই নেশা — তার প্রাণ গিয়েছিল বাঘের মুখে। এক নাগিনী কন্যের দেহ পাওয়া গিয়েছিল বিলের জলে। . . . দুই তিনজন পাগল হয়ে গিয়েছিল। . . . জন চারেকের হয়েছে চরম সর্বনাশ। সর্বনাশীরা ফিরেছে — ধর্ম বিসর্জন দিয়ে। কিছুদিন পরেই দেখা দিয়েছে মাতৃত্বের লক্ষণ। তখন সন্তান নষ্ট করতে গিয়ে নিজে মরেছে। কেউ পালাতে চেয়েছে। কেউ পালিয়েছে। কিন্তু পালিয়েও তো রক্ষা পায় নি তারা। রক্ষা পায় না। হয় মরেছে, বেদে-সমাজের মন্ত্রপূত বাণের আঘাতে — নয়তো নাগিনী ধর্মের অমোঘ নির্দেশে প্রসবের পরেই নখ দিয়ে টুঁটি টিপে সন্তানকে হত্যা

করেছে। ডিম ফুটে সন্তান হবামাত্র নাগিনী সন্তান খায় — নাগিনী কন্যাকেও সেই ধর্ম পালন করতেই হবে। নিষ্কৃতি কোথায়? নিষ্কৃতি কোথায়? ধর্ম ঘাড়ে ধ'রে করাবে যে! নিশির নেশা — নাগিনী কন্যের মৃত্যুযোগ।''[৬২]

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে ইসলামীবেদে সম্প্রদায়ের উল্লেখ থাকলেও তাদের ধর্মাচরণের কোনো ছবি নেই। এই উপন্যাসে পটভূমি হিসেবে গৃহীত সাঁতালীর বেদে সম্প্রদায়ের লোকজনেরা হিন্দুধর্মমতে বিশ্বাসী। এদের সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''বেদে অধিবাসীদের লৌকিক জগৎ যেমন হিন্দুসমাজছাড়া হইয়াও উহার প্রান্তদেশ-সংলগ্ন, সেইরূপ উহাদের ধর্মসংস্কারের জগৎ আর্যধর্ম হইতে পৃথক, অথচ আর্যধর্মানুসারী নিজস্ব পুরাণকল্পনা ও উদ্ভট কিংবদন্তীসমবায়ে রচিত হইয়াছে।''[৬৩] তাই এদের দেবতা পরিকল্পনায় আর্য-অনার্য দুই সংস্কৃতিরই মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। একদিকে এরা যেমন পৌরাণিক শিবের আরাধনা করে, তেমনি এদের ধর্মাচরণে অনিবার্যভাবে চলে আসে অনার্যের লৌকিক দেবী মা মনসা অর্থাৎ বিষহরি। আরাধ্য এই দুই দেব-দেবী নিয়ে নানা অলৌকিক গল্পও তদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর শিবরাম কবিরাজের জবানীতে বলেছেন — ''বেদেকুলের মা বলতে বিষহরি, বেদেদের অন্য মা নাই। কালী না, দুর্গা না — কেউ না। বেদেদের বাপ বলতে শিব। শিবের মানস থেকে মা-বিষহরির জনম গ! পদ্মবনের মধ্যে শিবের মনের থেকে জন্ম নিয়া পদ্মপাতের মধ্যে ধীরে ধীরে মা বড়ো হয়্যা উঠলেন। মায়ের আমার পদ্মবনে বাস — অঙ্গের বরণ পদ্মফুলের মতো। শিবঠাকুরের মধুপান কর্যা নেশা হয় না, তাই শিবের কন্যে পদ্মবনে পদ্মমধু পান করলেন, সেই কন্যের কণ্ঠে — অমৃতের থেক্যা মধু হইল; তখন সেই মধু খাইলেন শিব। সেই মধুতে তাঁর কণ্ঠ হ'ল নীল বরণ, মধুর পিপাসা মিট্যা গেল চিরদিনের তরে; চক্ষু দুটি আনন্দে হল ঢলুঢলু! শিবের কন্যে পদ্মাবতী — পদ্মের মতো দেহের বরণ, তেমনি তার অঙ্গের সৌরভ, মা হলেন চিরযুবতী।''[৬৪] এইভাবে পৌরাণিক শিব ও লৌকিক মা বিষহরির আরাধনা করেই সাঁতালীর বিষ-বেদেরা নিজেদের ধর্মীয় জীবন অতিবাহিত করে।

এই উপন্যাসে হিজল বিল পার্শ্বস্থ সাঁতালী গাঁয়ের আদি-মধ্যযুগীয় আলো-আঁধারিযুক্ত পরিবেশে নানা বিশ্বাস-সংস্কার, লৌকিকতা, লোকাচার, লোককথা,

উপাখ্যান, প্রবাদের পরিচয় ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। বিষ-বেদেদের জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে মা বিষহরি। মা বিষহরির পূজাই তাদের জীবনের সবথেকে বড় উৎসব। এই মা বিষহরির পূজার বিবরণ এরূপ — ''আজ ভাদ্রের শেষ নাগপঞ্চমী। বিষহরির আরাধনা করছে বিষ-বেদেরা। আজ ওদের শ্রেষ্ঠ উৎসব। উৎসব হচ্ছে বিষহরির আঙনেতে। পূজা হয়ে গিয়েছে দিনে, এখন হচ্ছে গান। গোটা পাড়া গানের আসরে এসে বসেছে, সবাই গাইছে গান। মেয়ে পুরুষ সবাই।''[৬৫] এই মা বিষহরি তাদের জীবনে এতটাই জড়িয়ে আছে যে, তাঁকে কেন্দ্র করে বিষ-বেদেরা নানা লৌকিক-অলৌকিক গল্প তৈরি করে এবং সেগুলি বিশ্বাসও করে। মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগরের আখ্যান থেকেই এদের জীবনে নাগিনী কন্যার ধারণার জন্ম। এই সম্পর্কে শিবরাম কবিরাজের কথা — ''হিজল বিলে মা-মনসার আটন। পদ্মাবতী হিজল বনে পদ্ম-শালুকের বনে বাসা বেঁধে আছেন। চাঁদো বেনের সাত ডিঙা মধুকর সমুদ্রের বুকে ঝড়ে ডুবিয়ে এইখানে এনে লুকিয়ে রেখেছিলেন। বৃন্দাবনের কালীদহের কালীনাগ কালো ঠাকুরের দণ্ড মাথায় ক'রে কালীদহ ছেড়ে এসে এখানেই বাসা বেঁধেছে। কালীনাগ বলেছিল — তুমি তো আমাকে দণ্ড দিয়ে এখান থেকে নির্বাসন দিলে; কিন্তু আমি যাব কোথায় বলো? ঠাকুর বলেছিলেন — ভাগীরথীর তীরে হিজল বিল, সেখানে মানুষের বাস নাই, সেখানে যাও।''[৬৬]

সাঁতালীর বিষ-বেদেদের সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন থাকলেও পাঁচবছরের কোনো কন্যের স্বামী সর্পদংশনে মারা গেলে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত তার বিয়ে দেওয়া হত না। ইতিমধ্যে তার অঙ্গে বিশেষ কিছু লক্ষণ ফুটে উঠলে তাকে নাগিনী কন্যা বলে ঘোষণা করা হত। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ''বেদের ঘরে মেয়ের বিয়ের কাল হয় অন্নপ্রাশনের পরই। ছ-মাস থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যায়।''[৬৭] যেহেতু বেদেদের সাপ নিয়েই কারবার, তাই অসতর্ক মুহূর্তে এদের অনেকেই সর্পদংশনে মারা যায়। মারা যাওয়া অনেক বেদের স্ত্রীর বয়স পাঁচ বছর বা তার কম হয়। এরূপ স্ত্রীদের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ পরবর্তী কালে নাগিনী কন্যা হয় — ''বেদের মিত্যু সাপের মুখের মধ্যে দিয়ে আসবে, তাতে আর আশ্চর্যি কি! তাই যারা মরে সাপের দংশনে, তাদের বউয়েরা সবাই কিন্তু নাগিনী কন্যে হয় না। যে হয় ধীরে

ধীরে তার অঙ্গে লক্ষণ ফুটে ওঠে। বেদের জাতে বিধবার বিয়ে হয়, আবার ছাড়-বিচারও আছে। কিন্তু এই সব কন্যের সাঙা ষোল বছরের আগে হয় না। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত চোখ থাকে এই কন্যেদের ওপর।''[৬৮] একবার বেদে সম্প্রদায়ের কোনো মেয়ে নাগিনী কন্যে হয়ে গেলে তাকে অনেক কঠোর নিয়ম-কানুনের মধ্যে থাকতে হয়। এদের বিশ্বাস নাগিনী কন্যাদের ভ্রষ্ট হলে চলে না; তবুও কেউ ভ্রষ্ট হয়ে পালিয়ে বাঁচে তবে তার উপর মা-বিষহরির অভিশাপ নেমে আসে। শিবরাম কবিরাজ জানিয়েছে — ''প্রবাদ আছে, — নাগিনী কন্যা যদি ভ্রষ্ট হয়ে পালিয়ে গিয়ে বাঁচে, সে যদি ঘর-সংসার বাঁধে, সে-যদি তার জাতি-ধর্ম সব ত্যাগ করে, তবে মা-বিষহরির অভিশাপ গিয়ে পড়ে তার মাতৃত্বের উপর। সন্তান কোলে এলেই তার নাগিনী স্বভাব জেগে ওঠে। নাগিনী যেমন নিজের সন্তান ভক্ষণ করে, নাগিনী কন্যা তেমনই সন্তান হত্যা করে।''[৬৯] এই বিশ্বাস বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের সকলের মনেই দৃঢ়। একারণেই নাগিনী কন্যা শবলা পালিয়ে গিয়ে একজন ইসলামীবেদেকে বিয়ে করে সংসার পাতলেও সন্তান ধারণ করতে পারে নি।

সাঁতালী গ্রামের বেদেদের বিশ্বাস — তাদের এখানে যেমন সাপের আখড়া, তেমনি পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র সাঁতালী পাহাড়েই সাপের বিষ থেকে রক্ষে পাওয়ার ওষুধ পাওয়া যায়। তাই 'ছোট ধন্বন্তরী' শিবরাম কবিরাজ নাগিনী কন্যা শবলার কাছে ওষুধের গাছ চিনে নিতে চাইলে সে তাকে একটি বিশেষ গাছ চিনিয়ে দিয়ে গাছটি সম্পর্কে একটি রূপকথা শুনিয়েছে — ''যদি বিশ্বাস কর ধরম ভাই, তবে বুলি শোন। এ যে কি গাছ তার নাম আমরাও জানি না। বেদেরা বলে — সেই যখন সাঁতালী পাহাড় থেকে বেদেরা ভাসল নৌকাতে, তখুন ঐ কালনাগিনী কন্যে যে আভরণ অঙ্গে পর্যা নেচেছিল, তাথেই একটুকরো মূল ছিল লেগে। সাঁতালী ছাড়ল বেদেরা, সঙ্গে সঙ্গে ধন্বন্তরির বিদ্যা চাঁদো বেনের শাপে হলো বিস্মরণ। নতুন বিদ্যা দিলেন মা-বিষহরি। এখুন ধন্বন্তরির বিদ্যার ওই মূলটুকুই কন্যের আভরণের সঙ্গে লেগে এল, তাই পুঁতলে শির বেদে নতুন সাঁতালী গাঁয়ে হিজল বিলের কুলে। গাছ আছে, শিকড় নিয়া ওষধ করি; কিন্তু নাম তো জানি না ধরম ভাই। আর ই গাছ সাঁতালী ছাড়া তো আর কুথাও নাই পিথিমীতে। তাহলে তুমাকে নাম বলব, কি গাছ চিনায়ে দিব কি কর্যা কও? এইটি তুমি রাখ, লাগ যদি ডংশন করে আর সি ডংশনের পিছাতে যদি

দেব রোষ না থাকে ধন্বন্তরি — তবে ইয়ার এক রতি জল বেঁট্যা গোল মরিচের সাথে খাওয়াইয়া দিবা, পরাণডা যদি তিল-পরিমাণও থাকে, তবে সে পরাণকে ফিরতে হবে, এক পহরের মধ্যে মড়ার মত মনিষ্যি চোখ মেলে চাইবে।''[৭০]

এই সাঁতালী গ্রামের বেদেদের কাছ থেকেই সর্পবিষ নিয়ে ধূর্জটি কবিরাজ এক বিশেষ ধরনের ওষুধ 'সূচিকাভরণ' তৈরি করেন। ফলে তিনিও ঐ অঞ্চলের জীবন্ত প্রবাদ হয়ে ওঠেন। তাঁরই শিস্য শিবরাম কবিরাজ। শিবরাম বলেছে — ''ধূর্জটি কবিরাজকে লোকে বলত — সাক্ষাৎ ধূর্জটি অর্থাৎ শিবের মতো আয়ুর্বেদ-পারঙ্গম। ধূর্জটির 'সূতিকাভরণ' মৃতের দেহে উত্তাপ সঞ্চার করত। লোকে বলে — মৃত্যু যখন এসে হাত বাড়িয়েছে, তখনও যদি ধূর্জটি কবিরাজের সূচিকাভরণ প্রয়োগ করা হ'ত, তবে মৃত্যু পিছিয়ে যেত কয়েক পা, উদ্যত হাত গুটিয়ে নিত কিছুক্ষণের জন্য বা কয়েক দিনের জন্য। নিয়তিকে লঙ্ঘন করা যায় না, কবিরাজ কখনও সে চেষ্টা করতেন না, তবে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর সূচিকাভরণ ক'রে মৃত্যুকে বলতেন — তিষ্ঠ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।''[৭১]

সাঁতালী গাঁয়ের বিষ-বেদেদের মধ্যে তাদের জন্মকথা থেকে শুরু করে নানা বিষয় অবলম্বনে প্রচুর গল্প-উপাখ্যানের প্রচলন আছে। এই উপাখ্যানগুলির মধ্যে বেশির ভাগই মনসামঙ্গল কেন্দ্রিক। তবে কিছু কিছু সেই অঞ্চলটির একান্ত নিজস্ব উপাখ্যানও আছে। উপন্যাসের এক জায়গায় শিবরাম কবিরাজ শিরবেদে মহাদেবের মুখে শোনা এরূপ একটি উপাখ্যানের ভূমিকায় বলেছে — ''সাঁতালী গাঁয়ের শিরবেদে সেকালের উপাখ্যান বলতে বলতে ন'ড়ে চ'ড়ে ওঠে বুকের ভিতরের আবেগে; চোখ ওদের ছোট ছোট — নরুণ-দিয়ে-চেরা লম্বা সরু চোখও বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।''[৭২] এরপরেই শিরবেদে মা-বিষহরি ও চাঁদ সদাগরের দ্বন্দ্বের কথা বলে কীভাবে বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের জীবনে নাগিনী কন্যের আবির্ভাব ও প্রচলন ঘটেছে সে সম্পর্কিত এক উপাখ্যানের অবতারণা করেছে। আর একস্থানে নাগিনী কন্যা শবলা — ''মত্তে থাকে বণিক বুড়া, যত ধনী তত কৃপণ। বাড়িতে আছে গিন্নী, বেটা আর বেটার বউ। আর আছে সিন্দুকে ধন, খামারে ধান, ক্ষেতে ফসল, পুকুরে মাছ, গোহালে গাই। শ্যামলী ধবলী বুধি মঙ্গলার পাল।''[৭৩] — বলে শিবরামের সামনে গল্প জুড়ে দিয়েছে।

তথাকথিত সভ্যসমাজের কাছে এইসব উপাখ্যান অলৌকিক বলে মনে হলেও উপন্যাসের পটভূমির প্রেক্ষিতে তা বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে এরূপ অনেক লৌকিক-অলৌকিকতার দোলাচলে-পূর্ণ স্থানীয় বেদেদের বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ে গড়ে ওঠা লোককথার পরিচয় আছে।

'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহীত অঞ্চলটির প্রেক্ষিতে বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের খাদ্যাভ্যাস-খাদ্যতালিকা, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচয়ও সময়-সুযোগ মতো দিয়েছেন। এখানে বেদেদের খাদ্যাভ্যাসের বিস্তারিত পরিচয় না থাকলে নিম্ন-বৃত্তিজীবী এই মানুষগুলির খাদ্যতালিকা যে সাধারণ মানের ছিল তা ঔপন্যাসিক নানা সূত্রে জানিয়েছেন। বেদেদের খাদ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে — ''এবার শিকার হয়েছে প্রচুর। খরগোশ, সজারু, তিতির অনেক পাওয়া গিয়েছে। তার উপর হাঁস বলি হবে। হিজল বিলের ধারে সাঁতালী গ্রাম, সেখানে মাংস দুর্লভ নয়। ফাঁদ পাতলেই সরালি হাঁস, জলমুরগী পাওয়া যায়; কাদাখোঁচা, হাঁড়িচাঁচা, শামকল দল বেঁধে বিলের ধারে ধারে লম্বা পা ফেলে ঘুরছে। বাঁটুল মেরে তীর ছুঁড়ে তাও মারা যায় অনায়াসে। . . . কার্তিক মাসে হিজল বিলের পশ্চিমের মাঠ রবি-ফসলে সবুজ হয়ে ওঠে। গম, যব, ছোলা, মুসুরি, আলু, পেঁয়াজ, রসুন — হরেক রকম ফসল। ফসল পাকলে বেদেরা সেই ফসল কুড়িয়ে সংগ্রহ করে, চুরি ক'রে সংগ্রহ করে। পেঁয়াজ, রসুন, মসুরি, তারা সযত্নে রেখে দেয় এই দিনটির জন্য। পেঁয়াজ রসুন লঙ্কা মরিচ দিয়ে পরিপাটি ক'রে রান্না করবে মাংস; আজ খাবে পেট ভ'রে; কাল-পরশুর জন্য বাসি ক'রে রেখে দেবে। বাসি মাংস রাঁধবে মসুরি কলাই মিশিয়ে। এমন অপরূপ খাদ্য কি হয়!''[৭৪] এদের বাসস্থানগুলির পরিচয় এরূপ — ''গ্রামের মাঝখানে ওই দেবস্থানটিকে ঘিরে চারি পাশে বিচিত্র বসতি। দেবস্থানের চারিদিকে দেবদারুডালের খুঁটো পুঁতে মাচা বেঁধে তারই উপর ঘর। মাচাটির চারি পাশে ঝাউডালের বেড়া বেঁধে গায়ে পাতলা মাটির প্রলেপ দিয়ে তৈরি করা দেওয়াল, তার উপর ওই ঘাসবনের ঘাসে ছাওয়া চাল, ওই ওদের ঘর। প্রতি বৎসরই ঝড়ে উড়ে যায়, বর্ষায় গ'লে প'ড়ে শুধু নিচের শক্ত মাচাটি টিকে থাকে।''[৭৫] উপন্যাসের অনেক জায়গাতেই দুই নাগিনী কন্যা শবলা ও পিঙলা, দুই-বিষ-বেদে মহাদেব ও গঙ্গারাম,

ভাদু বেদে এবং অন্যান্যদের পোশাক-পরিচ্ছদের উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে ঐ সম্প্রদায়ের পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কেও একটা ধারণা করা যায়। উপন্যাসের নাগিনী কন্যা শবলার আবির্ভাবের সময় তার পোশাক-আশাক ছিল — ''পরনে লাল-রঙে ছাপানো তাঁতে বোনা খাটো মোটা রাঙা শাড়ি, গলায় পদ্মবীজের মালা, তার সঙ্গে লাল সুতো দিয়ে ঝুলছে মাদুলি পাথর আরও অনেক কিছু; হাতের মণিবন্ধ খালি, উপর-হাতে লাল সুতোর তাগা টান ক'রে বাঁধা; নরম হাতের বাইরে যেন কেটে ব'সে গেছে। তাতে মাদুলি পাথর জড়িবুটি। গাছ-কোমর বাঁধা পরনের ভিজে কাপড় হিলহিলে দেহখানার সঙ্গে সেঁটে লেগে রয়েছে; মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে যেন বাতাসে প্রতিমার মতো দুলছে।''[৭৬] এই বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বেদে সম্প্রদায়ের নারীদের এটাই হল সাধারণ পোশাক।

উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির প্রেক্ষিতে বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষারূপেরও পরিচয় আছে। উপন্যাসটি সভ্যসমাজের প্রতিনিধি ধূর্জটি কবিরাজের শিস্য শিবরাম কবিরাজের কথকতায় বর্ণিত। সে বিশুদ্ধ রাঢ়ীতেই নিজের কথা বলেছে। তবে উপন্যাসটির পটভূমি রাঢ় অঞ্চল বীরভূম হওয়ায় এর অন্ত্যজ চরিত্র বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের মানুষদের মুখে রাঢ়ী উপভাষার সংলাপ উচ্চারিত হলেও তা বিশুদ্ধ রাঢ়ী উপভাষা নয়; এরই আঞ্চলিক রূপ। এই আঞ্চলিক ভাষার সংলাপের কিছু দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক —

নাগিনী কন্যা শবলার সংলাপ :

১। ''ই বাবা! ই বাবা গো! ধন্বন্তরি বাবা! আপুনি হেথা কোত্থেকে গো! ইরে বাবা!'' (পৃ ১২)

২। ''লজর তুর খাটো হল্ছে বুড়া। মানুষ চিনতে দেরি লাগছে। উটি সেই বাবার সাথে আমাদের গাঁয়ে গেল্ছিল, বাবার সাকরেদ বটে, কচি-ধন্বন্তরি।'' (পৃ ৩৩)

৩। ''বাবা হিসাব ক'রে দেবেন এক কলমে, মুখে মুখে হিসাব করতে তুদের সারাদিন কেটে যাবে। কি গ, বল্ না কেনে তুরা? মুখে যে সব মাটি লেপে দিলি! আঁ?'' (পৃ ৩৯)

৪। ''কি নিব? বেদে বুড়া তুমাকে বাক্ দিছে, আমি সেই বাক্ রাখতে এসেছি। টাকা তো মুই চাই নাই কবরাজ। লাও, ব'স। লাগ চিনায়ে দিই তুমাকে।'' (পৃ ৬০)

শিরবেদে মহাদেবের সংলাপ :

১। ''মা-বিষহরির হুকুম নাই। তার সনদে মোরা ঘর বাঁধলাম হেথাকে এসে। চম্পাই নগরের ধারে সাঁতালী পাহাড়ে ছিষ্টির আদিকাল থেকে বাস ছিল — শতেক পুরুষের বাস — জাতে ছিলাম বিষবৈদ্য — সে বাস গেল্‌ছে, মা লক্ষ্মী ছেড়ে গেল্‌ছেন — তার বদলে পেয়েছি মা-বিষহরির সনদে কালনাগিনী-কন্যে, মা-গঙ্গার পলি-পড়া জমির ওপর এই নতুন সাঁতালী গাঁয়ে জমি, এ ছেড়ে কোথাকে যাব?'' (পৃ ১৬)

২। ''এই দেখেন বাবা! গড়নটা দেখেন আর বরণটা দেখেন। চিকচিকে কালো। এই দেখেন চক্কটি দেখেন। লেজটি দেখেন।'' (পৃ ৩৮)

৩। ''পাপীর পরাণ তু লিবি, তু লাগকুলের রাজপুত্তুর, বিচারের ভার তোরে দিলাম।'' (পৃ ৮১)

গঙ্গারামের সংলাপ :

১। ''এ সব তো বাবার কাছে লতুন কথা লয়। ই সব তো আপুনিই জানেন। কন্যেটার এ মতি অ্যানেক দিন থেক্যাই হয়েছিল বাবা — অ্যানেক দিন থেক্যা। ওই কন্যেগুলানেরই ওই ধারা।'' (পৃ ৭৩)

২। ''কাঁউর-কামিক্ষে থেকে কত দ্যাশে দ্যাশে ঘুরলম, জেহেলেও ছিলম বছর চারেক। তা'পরেতে এলম, বলি, দেখ্যা আসি, সাঁতালীর খবরটা নিয়্যা আসি।'' (পৃ ৮৯)

৩। '' — কচু। উ শালার কুনো জাত নাই। শালা বেদের কন্যে নিয়া গর বাঁধিবে, উর আর জাত কিসের?'' (পৃ ১২৬)

ভাদুর সংলাপ :

১। ''ভাজ বউ গ, তুমি দেখ একবার। কন্যেটারে ডাক।'' (পৃ ৭৯)

২। '' — আঃ মুখ খস্যা যাবে তুর। সারা বেদেপাড়া দেখেছি — কন্যের 'পরে আজ জনুনীর বর হল্‌ছিল। উ সব বুলিস না তু। তু দেখলি না — তুর ভাগ্যি।'' (পৃ ৮০)

৩। ''হোথাকে বিষ লহমার ক যোজন ছুটছে কন্যে — নরের রক্তে নাগের বিষ পাথর হয়্যা উঠছে। সে পাথরে পরাণ-পুতুল ডুব্যা গেলে আর সিবের সাধ্যি হবে নাই। চল্‌ — চল্‌। দেরী করলে অধরম হবে।'' (পৃ ১০০)

পিঙলার সংলাপ :

১। '' — জানি তিলশুনা তো খেটেই যেছি, অমনিতে, যাবার সময় তুকে দিয়া যাব গজমতির হার। চৈতলক্ষ্মীর কথা যখন জানিস, তখন মা-লক্ষ্মী যাবার কালে বেরাহ্মণীকে গজমতির হার দিয়া গেছিল — সে কথাও তো জানিস।'' (পৃ ১০৩)

২। ''মুই ধরব সাপ। আনেনে আলো, আনেন হাঁড়ি। থাক্ গ, তোরা হোথাই দাঁড়িয়ে থাক্, মুই ধরব সাপ — সাঁতালীর বেদের গায়ে হাত দিবেন না। অপমান করবেন না।'' (পৃ ১০৬)

৩। ''খবরদার! ঠাকুর যা বলিছে সে আপন কথা বলিছে! মুই যাই নাই। যতক্ষণ মায়ের আদেশ না মিলবে মুই যাব না। বেরাহ্মণকে পথ দে।'' (পৃ ১৩০)

৪। ''ধন্বন্তরী ভাই, তুমার কাছে মুই কিছু গোপন করব না, পরানের কথাগুলান বুকের ভিতরে গুমুর্‌্যা গুমুর্‌্যা কেঁদ্যা সারা হ'লো। দুঃখের ভাগী আপনজনার কাছে না-বল্যা শান্তি নাই। তুমারে সকল কথাই কই, শুন। হও তুমি মরদ মানুষ, তবু তুমি আমার ধরম-ভাই। মনে লাগে, যেন কত জনমের আপন থেক্যাও আপনজনা। বলি শুন ভাই। . . .'' (পৃ ১৩১)

এই রকম অজস্র আঞ্চলিক উপভাষার সংলাপ এই উপন্যাসের চরিত্রদের মুখে তারাশঙ্কর ব্যবহার করেছেন। এই সংলাপগুলির দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই স্পষ্ট হয় যে, এগুলি রাঢ়ী উপভাষা থেকে উদ্ভূত হলেও নানা দিক থেকেই স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করেছে।

এছাড়াও সাঁতালীর বিষ-বেদে সম্প্রদায়ের জীবনের সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু গানও ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর এই উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নীচে এই গানগুলির কয়েকটি উদ্ধৃত করা হল —

১। ''জয় বিষহরি গ! জয় বিষহরি!
চাঁদো বনে দণ্ড দিল
তোমার কৃপায় তরি গ!
অ — গ! . . . ''(পৃ ১৬)

২। ''তুরা খাস গো সুধার মধু মোরা খাইব বিষ গ!

অ — গ!

তুদের ঘরের কালসপ্য মোদের গলা দিস গ!

অ — গ!'' (পৃ ১৭)

৩। ''জলে ভেসে যায় সোনার কমলা।

হায় গ! হায় গ!

কঠিন নাগিনী তোর দয়া হ'লো না!

হায় গ! হায় গ!'' (পৃ ২৫)

৪। ''লাচো লাচো আমার কালনাগিনী কন্যে গ!

অ-গ!

দুস্কু আমার সোনা হইল তু মানিকের জন্যে গ!

অ-গ!'' (পৃ ২৮)

৫। ''যেমন বাবুর চাঁদো মুখো

তেমনি বিদায় পাব গ।

বেনারসীর শাড়ি পর্যা

লেচে লেচে যাব গ!. . .'' (পৃ ৪৩)

৬। ''উর্‌র্‌ — হায় হায়, লাজে মরি,

আমার মরণ ক্যানে হয় না হরি!

আমার পতির মরণ সাপের বিষে

আমার মরণ কিসে গ!. . .'' (পৃ ৪৪)

৭। ''বঁধু তুমি, আইল্যা যোগীর ব্যাশে।

হায় — অবশ্যাষে!

মরণ আমার হায় গ — মরণ

লয়ন-জলে ধোয়াই চরণ

সযতনে মুছায়ে দি আমার কালো ক্যাশে!. . .''(পৃ ৯৩)

৮। ''নাগিনী তুই ফুঁসিস না

ও কালামুখী নাগিনী লো — এমন কর্য্যা ফুঁসিস না।. . .''(পৃ ৯৭)

উপন্যাসটিতে এইরকম অনেক গানই আছে। এর মধ্যে কিছু গান মনসামঙ্গল থেকে নেওয়া হলেও বেশির ভাগ গান তারাশঙ্কর উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটি এবং সেখানকার বেদে সম্প্রদায়ের জীবন পরিক্রমার প্রতি দৃষ্টি রেখেই রচনা করেছেন। তাই আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে লেখা এই গানগুলিও উপন্যাসে সফল সংযোজন বলে বিবেচিত হয়।

এইভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসে আঞ্চলিকতার অনেক লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে উপন্যাসটিকে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলতেও দ্বিধা থাকে না। বাংলা উপন্যাসের বিশিষ্ট সমালোচকরাও এর আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য প্রায় মেনেই নিয়েছেন। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি এই উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস না বললেও প্রকারান্তরে এর আঞ্চলিকতা ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েছেন। উপন্যাসটির আলোচনায় তিনি বলেছেন — ''উপন্যাসটি প্রকৃতি-পরিবেশ, সমাজ পটভূমিকা, অলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাসের সর্বব্যাপিত্ব, ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র পরিকল্পনা — এই পাঁচটি উপাদানের সার্থক সমবায়ে একটি অপূর্ব অবয়ব-ঘনত্ব ও গীতিকবিতাসুলভ নিবিড় সুরসঙ্গতি অর্জন করিয়াছে। হিজল বিলের ঘন কাশবন ও শরের ঝোপ, উহার তীরস্থ আরণ্য জটিলতা, হিংস্র পশু ও সর্পসঙ্কুলতা, উহার পশু-পক্ষীর অভ্যস্ত সংস্কার ও সঙ্কেতময় গতিবিধি যে রহস্যবিভীষিকাময় পটভূমিকা উন্মোচন করে সমস্ত কাহিনীটি তাহার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা।''[৭৭] সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'র আঞ্চলিকতার ধর্মকে প্রায় স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে তিনি 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র চেয়ে এর আঞ্চলিকতাকে এক করে দেখাতে না চেয়ে বলেছেন — '' . . .

‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ ও ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’ আঞ্চলিক হয়েও দুই ভিন্ন জাতের উপন্যাস।’’[৭৮] এযুগের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক গুণময় মান্না ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’র আঞ্চলিকতাকে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন — ‘‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’ সম্বন্ধে প্রথম দৃষ্টিপাতেই দুটি জিনিস চোখে পড়ে। প্রথমত, লেখক ভাগীরথী তীরবর্তী সর্প-অধ্যুষিত হিজল বিলকে তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং দ্বিতীয়ত, উপন্যাসের যা প্রধান দৃশ্যপট তার কুশীলব হিসেবে বেছে নিয়েছেন ওই হিজল বিলের অধিবাসী বেদে সমাজের নরনারীকে। . . . এই সব ভৌগোলিক প্রাকৃতিক অঞ্চল এবং তার বিচিত্র নরনারীরা শহর থেকে দূরের তো বটেই, গড়পড়তা লোক-মানসেরও বাইরে। প্রচলিত পরিভাষায় যাকে বলে আঞ্চলিকতা, এই উপন্যাসে তারই নিদর্শন পাওয়া যায়।’’[৭৯] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত বিশিষ্ট গবেষক গৌরমোহন রায়ের কথাতেই আঞ্চলিকতার দিকটি স্পষ্ট হয়। তিনি বলেছেন — ‘‘বিশেষ অঞ্চলের বেদেদের জীবনই যে এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু সেকথা কথাকার যেমন প্রতিমূহূর্তে মনে রাখেন তেমনই পাঠকের পক্ষে সে কথা বিস্মৃত হওয়া সুকঠিন। অন্ত্যেবাসী বেদে সমাজের জাত স্বভাব বর্ণনায়, চরিত্রের সঙ্গে তার সংযোজনে এবং অনাবিল বলিষ্ঠ প্রকাশের দৃঢ়তায় ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’র অধিকাংশ পৃষ্ঠাই অত্যুজ্জ্বল।’’[৮০]

সুতরাং একথা মেনে নিতে দ্বিধা নেই যে, বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’কে সার্থক উপন্যাস বলাই যায়। এই উপন্যাসটি তার আঞ্চলিকতার ধর্মসহ বাংলা সাহিত্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মেনে নিতেই হয়। ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’ উপন্যাসটির মত সর্প অধ্যুষিত কোনো অঞ্চল এবং এরূপ বেদে সমাজের বিস্তারিত বিবরণ কেন্দ্রিক উপন্যাসও খুব একটা দেখা যায় না।

এবারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **‘আরোগ্য নিকেতন’** উপন্যাসটির আঞ্চলিকতা আমাদের আলোচনায় আসবে। এই উপন্যাসটি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের প্রেক্ষিতে রাঢ়বঙ্গের চিকিৎসা-ব্যবস্থার সামগ্রিকরূপকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বাংলার সমাজ-অর্থনীতি তথা

রাজনীতিতে বিশ শতকের চল্লিশ–পঞ্চাশের দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। ভারতবর্ষে ইংরেজদের আগমনের পর ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে রেলপথ নির্মাণের মধ্য দিয়ে যে যন্ত্র সভ্যতার যুগের সূচনা হয়, এক শতকের মধ্যেই সেই যন্ত্রসভ্যতার প্রভাব সর্বত্র পড়তে শুরু করে। এই সময়কালের মধ্যে একদিকে যেমন বাংলার গ্রামীণ জীবনে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা কৃষি ভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিদায় নিতে শুরু করে, তেমনি সাড়ম্বরে পুঁজি নিয়ন্ত্রিত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এসে তার জায়গা দখল করতে শুরু করে। পূর্বে বাঙালির গ্রামীণ জীবনে সামন্তপ্রভু জমিদার ও তার লোকজনই শেষ কথা ছিল; সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কৃষিকাজকে ভিত্তি করেই এগোত। সমাজে বিভিন্ন বৃত্তির মানুষেরাও তাদের শ্রমের বিনিময়ে কৃষিজ ফসলকেই পারিশ্রমিক হিসবে গ্রহণ করত। তখন জমিদার ও তার কর্মচারীদের শোষণ থাকলেও সকলের জীবন কৃষিজ ফসলের উপর নির্ভরশীল থাকায় মানুষে মানুষে পারস্পরিক সহমর্মিতাও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। কিন্তু পরিবর্তনের পর সামন্তপ্রভুরা আড়ালে চলে যায় এবং তাদের জায়গা দখল করতে শুরু করে আধুনিক পুঁজিপতি কলকারখানার মালিকেরা। আর সাধারণ মানুষ কৃষক থেকে শ্রমিকে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। তাদের হাতে প্রচুর কাঁচা টাকা চলে আসে, যার অনিবার্য পরিণামে নিজেদের মধ্যে সহমর্মিতাও উধাও হতে থাকে। সবকিছুর মূল্যায়ন অর্থের মাধ্যমেই নির্ণয় করার প্রবণতা শুরু হয়। এই সময়কালের মধ্যেই বাংলা তথা ভারতবর্ষে সর্বক্ষেত্রে প্রচুর নতুন নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রচলিত হয়। এর ঢেউ এদেশের চিকিৎসাব্যবস্থাতেও এসে লাগে।

চরক–সুশ্রুতের দেশ ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকেই একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ চিকিৎসাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গাছ–গাছড়া নির্ভর এই চিকিৎসাব্যবস্থায় নাড়ীদেখা, জলপড়া, নানা ধরনের মুষ্টিযোগ, বিভিন্ন টোটকার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্ব পেত। গ্রাম সমাজে চিকিৎসক হিসেবে কবিরাজ, হাকিম, বৈদ্য প্রমুখদের অত্যন্ত সমাদর ছিল। এদের হাতযশই মানুষের রোগ নির্ণয়ের সর্বোত্তম পদ্ধতি ছিল। কিন্তু আঠারো–উনিশ শতক থেকেই ইউরোপের চিকিৎসাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসে। বিভিন্ন রোগের জন্য যেমন নানা নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কৃত হতে শুরু করে, তেমনি রোগ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি নির্মিত হতে শুরু করে। ইংরেজদের হাত ধরে এইসব

যন্ত্রপাতি বাংলা তথা ভারতবর্ষেও প্রবেশ করে। ফলে বিশ শতকের শুরু থেকেই বাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। এখানেও হাকিম, কবিরাজ, বৈদ্যদের স্থান নিতে শুরু করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ডাক্তারেরা। আর নাড়ীদেখা, জলপড়া, নানা ধরনের মুষ্টিযোগ, বিভিন্ন টোটকার পরিবর্তে এক্স রে, রক্ত পরীক্ষা, মল-মূত্র-কফ পরীক্ষার মত জিনিসগুলোর ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়। এতে পুরাতন চিকিৎসা ব্যবস্থা পিছু হটতে শুরু করে এবং মানুষজন নতুন চিকিৎসা-ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। বাংলায় বিশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকেই এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে এই সময়কালটিকে গ্রহণ করেছেন। এই উপন্যাসে তিনি পুরাতন চিকিৎসা-ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার দ্বন্দ্বকে দেখিয়েছেন। তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসের পাঠকমাত্রেরই এটা জানা যে, তাঁর রচনায় প্রথম থেকেই এই নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে এবং বীরভূমের লাভপুরের এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান তারাশঙ্কর নবীনকালকে অস্বীকার করতে না পেরে তাকে বারবার জয়ী করলেও বরাবরই প্রবীণের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল এবং তার প্রতি তিনি একটা আলাদা আকর্ষণ অনুভব করেছেন। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে প্রাচীন চিকিৎসা-ব্যবস্থার প্রতিনিধি হলেন হাতেকলমে শেখা বৃদ্ধ কবিরাজ জীবনমশাই, তিনিই উপন্যাসের নায়ক। আর নতুন চিকিৎসা-ব্যবস্থার প্রতিনিধি ইংরেজি ডাক্তারি শাস্ত্র পাশ করা প্রদ্যুৎ ডাক্তার। উপন্যাসটিতে জীবনমশাই-এর মাধ্যমে তারাশঙ্কর তাঁর মৃত্যুচেতনারও প্রকাশ ঘটিয়েছেন। উপন্যাসটির শ্রেণি নির্ণয় করতে বসলে একে তারাশঙ্করের মৃত্যুচেতনা বিষয়ক উপন্যাস, চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক উপন্যাস, দার্শনিক চেতনাবিষয়ক উপন্যাস, সামজিক উপন্যাস, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের মত বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ফেলা গেলেও কখনোই আঞ্চলিক উপন্যাসের শ্রেণিতে ফেলা যায় না। তবে 'আরোগ্য নিকেতন' তারাশঙ্করের আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস — এই শ্রেণি বিভাজনের ভেতর থেকেই এর আঞ্চলিকতার লক্ষণের প্রসঙ্গ উঠে আসে। আসলে এই উপন্যাসে তারাশঙ্কর দুইকালের চিকিৎসা-ব্যবস্থার যে দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন, তা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা

ময়ূরাক্ষী তীরস্থ রাঢ়বঙ্গের চিকিৎসা-ব্যবস্থার মাধ্যমেই উপস্থাপন করেছেন। তাই উপন্যাসটিতে রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের প্রকৃতি, জনজীবন ও তাদের জীবনচর্যা বিশেষ স্থান পেয়েছে। ফলে উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতার একটা পটভূমিও নির্মিত হয়েছে।

'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের বিখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটি 'একখানি উৎকৃষ্ট' উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করে বলেছেন — ''আরোগ্য নিকেতন' (চৈত্র, ১৩৫৯) তারাশঙ্করের আর একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ইহার উপজীব্য জীবনলীলা নহে, জীবন মৃত্যুর সংগ্রাম-ছন্দে রূপায়িত জীবনদর্শন; ইহার অনুভূতি উপরিভাগের বিচিত্র জীবন-চাঞ্চল্যে সীমাবদ্ধ নহে, জীবনের চরম পরিণতি ও আপাত-বৈরী মৃত্যুর গহনরহস্যময়, গুহ্যনিহিত স্বরূপ-আবিষ্কারে নিয়োজিত।''[৮১] উপন্যাসটি সম্পর্কে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মত হল — ''আরোগ্য-নিকেতন উপন্যাসের বিষয়বস্তু সাময়িক নয়, চিরন্তন। ভারতবাসীর মনে যে মৃত্যু জিজ্ঞাসা আছে — মৃত্যুর দর্শনে যে চিরন্তন জিজ্ঞাসা আর মৃত্যুর রহস্যময়তা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-বিস্ময় মিশ্রিত অনুভূতি আছে, তাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস।''[৮২] এই দুই বিদগ্ধ সমালোচকের বক্তব্য থেকে উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার কোন নামগন্ধ পাওয়া যায় না। কিন্তু অধ্যাপক ক্ষেত্রগুপ্তের একটি মন্তব্য থেকে উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার লক্ষণাক্রান্ত হওয়ার আভাস মেলে। তিনি উপন্যাসটির আলোচনাকালে এর চিকিৎসাগত দিকটিকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে সেইসঙ্গে আরও বলেছেন — ''প্রতিটি চরিত্র এবং ঘটনা রোগভোগ ও চিকিৎসা নিয়ে, পুরনো দিনে বাংলার গ্রাম অঞ্চলে কি ধরনের চিকিৎসা প্রচলিত ছিল তার ক্রমিক পরিবর্তন নিয়ে, দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে স্বাধীনতা-পরবর্তী হেলথ সেন্টার, হাসপাতাল, টেস্ট ক্লিনিক গড়ে ওঠাকে কেন্দ্র করে। নতুন নতুন ওষুধের আবিষ্কার নিয়ে। তবে এই একটা বিশেষ দিক থেকে ধরা পড়লেও সমাজ-জীবন প্রায় পুরো কালের আধারে ধরা পড়েছে।''[৮৩] বলা বাহুল্য, 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের এই সমাজ জীবন রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের সমাজ জীবন। আর এখান থেকেই উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার লক্ষণের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। তবে আঞ্চলিকতার এই লক্ষণগুলি

অনুসন্ধানের পূর্বে উপন্যাসটির কাহিনি অংশ সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেওয়া দরকার।

'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটিতে 'উনিশ শ পঞ্চাশ সাল -- বাংলার তের শো ছাপ্পান্ন সালের এক শ্রাবণ অপরাহ্ন থেকে উনিশ শো একান্ন সালের সেপ্টেম্বর মাস'-এর মধ্যবর্তী এক বছরের কিছু বেশি সময়কালের নিরিখে নবগ্রাম সংলগ্ন দেবীপুর নামক রাঢ়বঙ্গের একটি গ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে বয়ঃবৃদ্ধ গ্রাম্য কবিরাজ জীবনকৃষ্ণ দত্ত ওরফে জীবনমশায়ের জীবনকথা পরিবেশিত হয়েছে। তবে ঔপন্যাসিক এখানে মাঝেমাঝেই ফ্লাশব্যাকে ফিরে গিয়ে জীবনমশায়ের কৈশোর, যৌবনসহ উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটিতে প্রায় পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ চিকিৎসক জীবনের প্রচুর ঘটনা তুলে এনেছেন। সেই জীবনমশায়ের পিতা জগবন্ধু দত্ত ও পিতামহ দীনবন্ধু দত্তের কথাও এসেছে। অবশ্য এসকল ঘটনা জীবনমশায়ের স্মৃতিচারণার ভিত্তিতে উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নি। তবে আপাত বিচ্ছিন্ন জীবনমশায়ের স্মৃতিজাত ঘটনাগুলিকে জোড়া দিলে একটি সামগ্রিক কাহিনিও আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এ থেকে জানা যায় যে, বংশানুক্রমে জীবনমশায় যে চিকিৎসা পদ্ধতি ধারণ করে চলছিলেন, এর সূত্রপাত করেন তার পিতামহ দীনবন্ধু দত্ত। তিনি নবগ্রামের জমিদার রায়চৌধুরীদের আশ্রমে একটি পাঠশালা খুলে জীবন শুরু করলেও অচিরেই সেই অঞ্চলের কবিরাজ শিরোমণি কৃষ্ণদাস সেনের শিস্যত্ব লাভ করেন। একবার রায়চৌধুরী বাড়ির এক সদস্যের সান্নিপাতিক জ্বরবিকার হলে দীনবন্ধু দত্তের অক্লান্ত সেবা ও নিষ্ঠা দেখে কবিরাজ শিরোমণি কৃষ্ণদাস সেন তাকে নিজের সমস্ত চিকিৎসা বিদ্যা শিখিয়ে দেন। শিক্ষা সমাপনান্তে দীনবন্ধু দত্ত নবগ্রামের জমিদার বাড়ি ছেড়ে দেবীপুরে বাস শুরু করেন এবং লোকজনের ভালোবাসায় দীনবন্ধু দত্ত থেকে দীনবন্ধু মশায় হয়ে উঠে সে অঞ্চলের একজন সবচেয়ে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী চিকিৎসক হয়ে ওঠেন। দীনবন্ধুমশায় মৃত্যুর আগে তাঁর ছেলে জগবন্ধুকে অর্জিত সমস্ত কবিরাজিবিদ্যা শিখিয়ে জগৎ মশায় বানিয়ে যান। জগৎমশায় সে অঞ্চলে পিতার সুনাম বজায় রেখে মশায়দের প্রভাব প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়ে তোলেন। এই জগৎমশায়ের ছেলে হল জীবনকৃষ্ণ দত্ত ওরফে জীবনমশায়। তবে জীবনকৃষ্ণের জীবনমশায় হয়ে ওঠাটা অতটা সহজ হয় নি।

শারীরিক দিক থেকে দীর্ঘদেহী জীবন দত্ত শৈশব থেকেই কিছুটা দুরন্ত ও বন্যপ্রকৃতির ছিল। সে যখন বেড়ে উঠছিল তখন বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই পুরাতন বিদায় নিতে শুরু করেছিল এবং নতুন এসে তার জায়গা দখল করছিল। এর ঢেউ এদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও এসে লাগতে শুরু করে। চরক-সুশ্রুতের এই দেশে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা গাছ-গাছড়া, মুষ্টিযোগ, বিভিন্ন ধরনের টোটকা, তন্ত্র-মন্ত্র নির্ভর এদেশের আয়ুর্বেদ তথা কবিরাজি চিকিৎসা পদ্ধতির জায়গা দখল করতে শুরু করে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান নির্ভর আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ডাক্তারেরা কবিরাজদের স্থান নিতে শুরু করে। রোগনির্ণয়ের ক্ষেত্রে হাতদেখা, নাড়ীদেখার পরিবর্তে নানা নতুন নতুন যন্ত্রের সাহায্যে এক্স-রে, রক্ত-মল-মূত্র-কফ পরীক্ষার মত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়। অনেকস্থানে হাসপাতাল নির্মিত হয় এবং সেখানে ডাক্তারের যোগান দেওয়ার জন্য বেশ কিছু মেডিক্যাল কলেজ নির্মিত হয়। এই মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা ডিগ্রিধারী ডাক্তারদের দৃষ্টিতে পুরাতন কবিরাজরা হয়ে ওঠে 'হাতুড়ে' ডাক্তার। ফলে যুগের প্রভাবে জীবন দত্ত কৌলিক কবিরাজি শিক্ষার পরিবর্তে ডাক্তারি পড়ার দিকে ঝোঁকে। তার বাবা জগৎমশায়ও পুত্রের ইচ্ছায় বাধ সাধেন নি। তাই কৌলিক আয়ুর্বেদ শেখানোর জন্য সংস্কৃত না পড়িয়ে তিনি ইংরেজি শিক্ষার জন্য ছেলেকে নবগ্রাম মাইনর স্কুল পাশ করার পর কাঁদী রাজ হাইস্কুলে ভর্তি করে দেন; ইচ্ছা সেখান থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে বর্ধমান মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হবে। কিন্তু এই কাঁদীতে এসেই জীবন স্কুলের মাস্টারমশাই নবকৃষ্ণ সিংহের দ্বাদশবর্ষীয়া মেয়ে মঞ্জরীর প্রেমে পড়ে এবং তা নিয়ে স্থানীয় জমিদারের ছেলে ভূপী বোসের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। এতে জীবনের হাইস্কুলের পাঠ চুকে যায় এবং বাবা তাকে কবিরাজি শিক্ষা দেওয়ার মনস্থ করেন। এদিকে ঘটনাক্রমে মঞ্জরীর সঙ্গে জীবনের বিয়ে ঠিক হলেও মঞ্জরী, তার মা ও দাদার ছলনায় তা ভেস্তে যায়। এতে চরম অপমানিত জগৎমশায় নির্ধারিত তারিখেই জীবনের বিয়ে দিলেও নতুন বৌ-এর কাছে জীবন প্রত্যাশিত ভালোবাসা পায় না। ফলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত জীবন গভীর মনোযোগ দিয়ে আয়ুর্বেদ শিক্ষায় মন দেয় এবং পাঁচবছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে জীবন দত্ত থেকে জীবনমশায় হয়ে ওঠে। জীবন অবশ্য কবিরাজি শিখেই ক্ষান্ত হয় নি, সে অঞ্চলের

বিখ্যাত এ্যালোপ্যাথ রঙলাল ডাক্তারের কাছে ডাক্তারিও শিখে নেয়। তবে সার্জারিতে ধৈর্য ও সংযম দেখাতে না পারায় তার পক্ষে ডাক্তারি বিদ্যা পুরোটা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় নি। তবে জীবনমশায় একসঙ্গে কবিরাজি ও ডাক্তারি অর্থাৎ আয়ুর্বেদ ও এ্যালোপ্যাথি দু'টোই শুরু করেন। তবে প্রথাগত ডিগ্রি না থাকায় পাশ করা ডাক্তারদের কাছে জীবনমশায় 'হাতুড়ে'ই থেকে যান।

চিকিৎসা শুরু করার পর জীবনমশায় অল্পদিনেই সে অঞ্চলের বিখ্যাত চিকিৎসক হয়ে ওঠেন। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের বেশির ভাগ স্থান জুড়েই এই চিকিৎসক জীবনমশায়ের স্মৃতিচারণায় সে অঞ্চলে চিকিৎসা করার অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে। এই স্মৃতিচারণায় লালমাটির দেশ রাঢ়বঙ্গের ভূ-প্রকৃতির কথা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি স্থান পেয়েছে সে অঞ্চলের বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত, বিভিন্ন বৃত্তির। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচিত্র সব নারী-পুরুষের জীবনচর্যার প্রসঙ্গ, যাদের সঙ্গে জীবনমশায় তার দীর্ঘ চিকিৎসক জীবনে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। এরমধ্যে একদিকে যেমন আছে মৃত্যুভয়ে ভীত জীবনমশায়ের আপন পুত্র বনবিহারী, মতির মা, মঞ্জরি বা দাঁতু ঘোষালের মত মানুষজন, তেমনি মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণ করা রাণা পাঠক, মহাপীঠের সন্ন্যাসী, ভুবন রায়, গণেশ পাঠক প্রমুখদের কাহিনিও আছে। আরও আছে অকাল মৃত্যুর সম্মুখে দণ্ডায়মান লজ্জাকুণ্ঠিত, আত্মগ্লানিতে মূহ্যমান বিপিনের কাহিনি। এরা ছাড়াও দুর্গাদাস কুন্ডু, চক্রধারী, চারু ডাক্তার, হরেন ডাক্তার, শশি কম্পাউন্ডার, ভূপী বোস, রতনবাবু, বিনয়, অহি সরকার, অতসীর ছেলে হরিশ, প্রহ্লাদ বাগ্দী, গৌরহরি, সেতাব, নেপাল, সুরেন, কিশোর, মণি চাটুজ্জে, রাম মিত্তির, ব্রজলালবাবু, জীবনমশায়ের মা, মঞ্জরী, আতর বউ, গিরিশবাবুর মা, অবিনাশ বাউরির স্ত্রী, শশাঙ্কের বউ, সীতা, নীহার, মঞ্জু, মঞ্জুর মা, মকবুল, পরাণ শেখ, রামপুরের মিয়াসাহেব থেকে শুরু করে সে অঞ্চলের অজস্র মানুষজনের সঙ্গে চিকিৎসার সূত্রে বা অন্যভাবে জীবনমশায়ের দীর্ঘজীবনের নানা সময়ে যোগাযোগের কাহিনি। উপন্যাসটি অবশ্য জীবনমশায়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সে সময় নবগ্রামে হাসপাতাল তৈরি হলে সেখানে বেশ কিছু পাশ করা ডাক্তার এলেও কেউ-ই জীবনমশায়কে সহজে হটাতে পারে নি। জীবনমশায়ের বার্ধক্যে প্রদ্যোত বোস নামক এক তরুণ যুবক সেই হাসপাতালে ডাক্তার হয়ে আসে। আধুনিক চিকিৎসা প্রণালীর

প্রতিনিধি এই প্রদ্যুত ডাক্তারের সঙ্গে প্রবীণ কবিরাজ জীবনমশায়ের দ্বন্দ্বই এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। তবে উপন্যাসের আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গে সেটা আলোচ্য নয়। জীবনমশায়ের স্মৃতিচারণায় ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সে অঞ্চলের প্রায় অর্ধশতাব্দীকালের চিকিৎসা-ব্যবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে রাঢ় অঞ্চলের যে ছবি এই উপন্যাসে তুলে এনেছেন, তাতেই 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতার নানা লক্ষণ ধরা পড়েছে।

'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে জীবনমশায়ের দীর্ঘজীবনের রূপরেখা অঙ্কণ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক যে সকল অংশে আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গ এনেছেন, তার মধ্যে প্রথমেই জীবনমশায়ের কবরেজখানা তথা ডাক্তারখানা নবগ্রামের অদূরে দেবীপুর গ্রামের আরোগ্য নিকেতনের দিগ্‌নির্দেশের স্থানটির উল্লেখ করতে হয়। এই অংশে তারাশঙ্কর সমকালীন রাঢ়বঙ্গ বীরভূমের পল্লীঅঞ্চলের বাস্তব ছবি এঁকেছেন। তিনি লিখেছেন — ''যাবেন, মহানগরী থেকে শতাধিক মাইল। চলে যাবেন বড়ো লাইনের ট্রেনে।...জংশনে নেমে পাবেন একটি অপরিসর শাখা-রেলপথ। মাইল দশেক গিয়ে পাবেন একটি সমৃদ্ধ গ্রামের স্টেশন। চারিদিকে দেখতে পাবেন কালান্তরের সুস্পষ্ট পরিচয়। . . . পাকা লাল কাঁকরে তৈরি সড়ক ধরে যাবেন। দেখবেন প্রাচীনকালের জমিদারের বড়ো বড়ো নোনাধরা পাকা বাড়ি। ভাঙা বাগান। ধসে পড়া পাঁচিল। শ্যাওলা-পড়া মন্দির। পুকুরের ভাঙা ঘাট। পুরানো মন্দির। চারিদিকেই দেখবেন ধূলি-ধুসরতা; আবর্জনার স্তুপ! পতিত জায়গায় আগাছার জঙ্গল। এরই মধ্যে এক জায়গায় পাবেন এক পুরানো বৃদ্ধ বট; শাখা-প্রশাখা জীর্ণ; গোড়াটা বাঁধানো, তাতেও দেখবেন অনেক ফাটল। এইটি গ্রামের ষষ্ঠীতলা। . . . এখান থেকেই আবার উত্তরমুখী একটি শাখাপথ পাবেন। রাস্তাটি খুব পরিসর নয়; — একখানি গাড়ি যায়, দুপাশে দুসারি লোক বেশ স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। একটু, বোধহয় সিকি মাইল, চলবেন ছায়াছন্নতার মধ্য দিয়ে; দুপাশে চার-পাঁচটি পুষ্করিণীর পাড়ের উপর আম, জাম, শিরীষ, তেঁতুলের গাছগুলি দুপাশ থেকে পল্লব বিস্তার করে পথটিতে ছায়া ফেলেছে। একটি পুকুরে একটি ছোট বাঁধা ঘাটও পাবেন। . . . চলে যাবেন এগিয়ে, এই সব নতুন কালের ঝকঝকে ইমারতগুলিকে বাঁয়ে রেখে চলে যাবেন। আরও মাইলখানেক পথ যেতে হবে। দুধারে শস্যক্ষেত্র; মাঝখানে লাল কাঁকর-দেওয়া ওই একখানি গোরুর গাড়ি

যাওয়ার মতো আঁকাবাঁকা পথটি। মাইলখানেক পর গ্রাম দেবীপুর; এই গ্রামেই আছে পুরাতন আরোগ্য নিকেতন।''[৮৪]

উপন্যাসটিতে যে সময়কাল ধরা হয়েছে তখন এদেশে সবে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান নির্ভর চিকিৎসাব্যবস্থা চালু হচ্ছিল। উপন্যাসে গৃহীত রাঢ়বঙ্গে এই অঞ্চলটিতেও তার ঢেউ এসে লাগলে সেই আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা তখনও পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়েনি। তখনও সেখানে প্রাচীন আয়ুর্বেদিক মতে কবিরাজি চিকিৎসার কদর ছিল। এই অঞ্চলটিতে সেই কবিরাজি চিকিৎসা বহুকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও উপন্যাসটিতে জীবনমশায়ের ঠাকুরদা দীনবন্ধু মশায়ের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে — ''মশায় উপাধি পেয়েছিলেন এই দীনবন্ধু মশায়ই। পরনে থান-ধুতি, পায়ে চটি, খালি গা, দীনবন্ধু মশায় গ্রামান্তরে রোগী দেখে বেড়াতেন। এ অঞ্চলে প্রতিটি বালকই তাঁকে চিনত। তিনি ডেকে তাদের চিকিৎসা করতেন, মধু খাওয়াতেন। টিনবন্দী মধু থাকত। আর আশ্চর্য ছিল তাঁর সাধুপ্রীতি। সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করে, তাঁদের পরিচর্যা করে বহু বিচিত্র মুষ্টিযোগ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। . . . শুধু কী সন্ন্যাসী — কত বেদে, ওস্তাদ, গুণীন — এদের কাছেও তাদের বিদ্যা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।''[৮৫] পিতা জগবন্ধু দত্ত ওরফে জগৎমশায়ের মধ্য দিয়ে জীবনমশায় এই দীনবন্ধু মশায়েরই উত্তরাধিকার বহন করে নিয়ে চলেন। তবে তিনি কবিরাজির পাশাপাশি ডাক্তারিও শিখেছিলেন — ''জীবনমশায় নাড়ীর মধ্যে, কালের পদধ্বনি অনুভব করতে পারেন। এটি তাঁর পিতৃ-পিতামহের বংশগত সম্পদ। তাঁরা ছিলেন কবিরাজ। তিনি প্রথম ডাক্তার হয়েছেন। কবিরাজি অবশ্যই জানেন। প্রয়োজনে দুই মতেই চিকিৎসা করে থাকেন। তবে এই নাড়ী দেখাই তাঁর বিশেষত্ব। নাড়ীর স্পন্দনের মধ্যে রোগাক্রান্ত জীবনে পদক্ষেপ থেকে রোগীর রোগের স্বরূপ এবং কালের দ্বারা আক্রান্ত জীবনের পদক্ষেপ থেকে কাল কতদূরে তাও তিনি বুঝতে পারেন।''[৮৬] জীবনমশায়ের আমলে মেডিক্যাল কলেজে পাশ করা ডাক্তারেরা ধীরে ধীরে সেই অঞ্চলে ভীড় জমাতে শুরু করলেও ডাক্তারি বিদ্যায় তার গুরু রঙলাল ডাক্তার প্রথম ঐ অঞ্চলে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা চালু করেন। ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''দেশে সত্যই তখন ডাক্তারি অর্থাৎ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

রাজকীয় সমরোহে রথে চড়ে আবির্ভূত হয়েছে। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, বর্ধমান মেডিক্যাল স্কুল, জেলার সদরে সদরে হাসপাতাল, চ্যারিটেবল্ ডিসপেনসারী, ইংরেজ সাহেব ডাক্তার, দেশী নামজাদা ডাক্তারদের পোশাকগলাবন্ধ কোট, প্যান্টালুন, গোল টুপি, গার্ডচেন, বার্নিশ করা কাঠের কলবাক্স; ঝকঝকে লেবেল-আঁটা সুন্দর শিশিতে ঝাঁঝালো রঙীন ওষুধ, ওষুধ তৈরির সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া, সব মিলিয়ে সে যেন একটা অভিযান। এ অঞ্চলে তখনও কবিরাজির রাজ্য চলছে। . . . রঙলাল ডাক্তার থাকেন এখান থেকে মাইল চারেক দূরে। এ অঞ্চলে তিনিই অ্যালোপ্যাথি নিয়ে এসেছেন।''[৮৭] উপন্যাসে গৃহীত সময়কালটিতে ডাক্তারি চিকিৎসা সেই অঞ্চলে সাড়ম্বরে আত্মপ্রকাশ করলেও তা একদিনে সম্ভব হয় নি; দীর্ঘদিন জীবনমশায় তথা প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সঙ্গে সংগ্রাম করেই তাকে জায়গা করে নিতে হয়েছে। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে সেই অঞ্চলের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সঙ্গে পাশ্চাত্যের যন্ত্রনির্ভর আধুনিক চিকিৎসার দ্বন্দ্বকেও দেখিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, সেই অঞ্চলে আধুনিক পদ্ধতিতে দুর্গাদাস কুণ্ডু নামে একজন ডাক্তার চিকিৎসা শুরু করলেও টিকতে পারেন নি। ঔপন্যাসিকের ভাষায় — ''দুর্গাদাস কুন্ডু সর্বপ্রথম এসেছিল — চলেও গিয়েছিল সর্বপ্রথম। বলে গিয়েছিল — জানতাম না এটা গরুভেড়ার দেশ। ঘাসপাতা জড়িবুটিতে এদের অসুখ সারে। অ্যালোপাথি বিলিতী ওষুধ খাটে না।''[৮৮]

তবে জীবনমশায়ের বার্ধক্যে প্রদ্যুত ডাক্তার যখন সে অঞ্চলে আসে তখন সেখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। রোগ সারাবার জন্য সাধারণ মানুষও আয়ুর্বেদ-কবিরাজি ছেড়ে অ্যালোপাথ-ডাক্তারির দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। সে অঞ্চলে হাসপাতাল নির্মাণ হতে দেখা যায় — ''এর পরই পাবেন একদফা বাড়ির সারি; গুটিকয়েক ছোট ইমারতকে ঘিরে বড়ো বড়ো ইমারত তৈরি চলেছে। চারিদিকে ভারা বাঁধা, রাজমজুর খাটছে, মজুরনীরা গান গাইছে আর ছাদ পিটছে। হ্যাট-কোট-প্যান্ট-পরা-ইঞ্জিনীয়ার ঘুরছে সাইকেল হাতে নিয়ে। ওই ছোট বাড়িগুলি এখানকার হাসপাতাল। ছোট হাসপাতালটি, ডাক্তার-কম্পাউন্ডারের ছোটোখাটো দুটি কোয়ার্টার; আরও ছোট কয়েকটি কাঁচা বাড়ির বাসা, এখানে থাকে নার্সেরা। একটু দূরে একটি

ছোট ঘর দেখবেন — সেটি মোতিয়া ডোমের বাড়ি। আর ওই অর্ধসমাপ্ত বড়ো ইমারতটি — ওটিও হাসপাতালের ইমারত, এ অঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে।''[৮৯] এই হাসপাতালের ডাক্তার প্রদ্যুত বোস আধুনিক বিজ্ঞানের বলে বলিয়ান। তাই জীবনমশায় প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী বৃদ্ধ বয়সে হাড় ভাঙ্গার কারণে মতির মাকে জ্ঞানগঙ্গায় নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ মৃত্যুর নিদান দিলেও প্রদ্যুত তা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে — '' — একটু পাকিয়ে গেছে, এক্স-রে না করলে ঠিক ব্যবস্থা তো হবে না। ভিতরে কোথাও হাড়ের আঘাত গুরুতর হয়েছে, ফেটে থাকতে পারে, যদি ফ্রাকচার হয়ে হাড়ের কুচুকুচি থাকে তো অপারেশন করতে হবে। ব্যবস্থা হলেই সেরে যাবে। মারাত্মক কিছু নয়।''[৯০] শুধু তাই নয়, চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সে জীবনমশায়কে পর্যন্ত জ্ঞান দিয়ে বলেছে — ''পেনেসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন — এক্স-রে — এসবের যুগে ওভাবে নিদান হাঁকবেন না। এগুলো ঠিক নয়। জড়ি বুটি সর্দি পিত্তি এসবের কাল থেকে অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি আমরা। তা ছাড়া এসব হল ইনহিউম্যান — অমানুষিক। . . . আসবেন একদিন, আমাদের ব্যবস্থা দেখলেই বুঝতে পারবেন সব। নতুন নতুন কেসের সব অদ্ভুত ট্রিটমেন্টের হিস্ট্রি পড়ে শোনাব — মেডিক্যাল জার্নাল থেকে। হাতুড়ে চিকিৎসা ছাড়া এককালে যখন চিকিৎসা ছিল না — তখন যা করেছেন — করেছেন। কিন্তু একালে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা যখন হয়েছে, লোকে পাচ্ছে — তখন ওই হাতুড়ে চিকিৎসা ফলানো মারাত্মক অপরাধ। অন্য দেশ হলে শাস্তি হত আপনার।''[৯১] এসব শোনার পর জীবনমশায় বুঝতে শুরু করে তাদের অর্থাৎ রাঢ়বঙ্গের আয়ুর্বেদিক কবিরাজদের দিন শেষ হতে চলেছে। তবে তখনও রাঢ়বঙ্গে আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার সমস্ত সুবিধা যে পৌঁছায় নি, প্রদ্যুতের এক সময়ের আত্মগত ভাবনা থেকেই তা জানা যায়। সে বলেছে — ''একটা ক্লিনিক যদি এখানে থাকে! এক্স রে — ইলেকট্রিসিটি না হলে উপায় নাই। ময়ূরাক্ষী স্কীম হতে আরও কয়েক বছর লাগবে। তার আগে সে আর হবে না। কিন্তু একটা ক্লিনিক। কত লোক যে বাঁচে! আজ কি এই মেয়েটাই বাঁচত? হাসপাতাল যন্ত্রপাতি — এসব না থাকলে এ মেয়েটাও আজ মরত।''[৯২]

তবে শুধু হাসপাতাল নির্মাণ বা দুই কালের দুই চিকিৎসা-ব্যবস্থার দ্বন্দ্বের মধ্যে 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে আঞ্চলিকতার দিকগুলি আছে এমন নয়; উপন্যাসে গৃহীত রাঢ়বঙ্গের ঐ অঞ্চলটির মানুষজন ও তাদের জীবনচর্যার মধ্যেও একটা স্থানিকতার ব্যাপার আছে। এই উপন্যাসে জীবনমশায়, জগৎমশায়, দীনবন্ধুমশায় থেকে শুরু করে নবগ্রামের জমিদার রায়চৌধুরীরা, আয়ুর্বেদ শিরোমণি কৃষ্ণদাস সেন, রঙলাল ডাক্তার, জীবনমশায়ের পুত্র বনবিহারী, রাণা পাঠক, মহাপীঠের সন্ন্যাসী, ভুবন রায়, গনেশ পাঠক, দাঁতু ঘোষাল, মতি, বিপিন, চক্রধারী, চারু ডাক্তার, হরেন ডাক্তার, শশি কম্পাউন্ডার, ভূপী বোস, বঙ্কিম, নবকৃষ্ণ সিংহ, রতনবাবু, বিনয়, অহি সরকার, অতসীর ছেলে, হরিশ, প্রহ্লাদ বাগ্দী, গৌরহরি, সেতাব, নেপাল, সুরেন, কিশোর, মণি চাটুজ্জে, রাম মিত্তির, ব্রজলালবাবু, জীবনমশায়ের মা, মঞ্জরী, মঞ্জরীর মা, আতর বউ, গিরিশবাবুর মা, মতির মা, অবিনাশ বাউরি স্ত্রী, শশাঙ্কের বউ, সীতা, নীহার, মঞ্জু, মঞ্জুর মা, মকবুল, পরাণ শেখ, রামপুরের মিয়াসাহেব থেকে শুরু করে সে অঞ্চলের অজস্র মানুষের উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে কিছু কিছু প্রকৃতির মানুষকে মূল ভূ-খণ্ডের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেলেও শুধুমাত্র প্রকৃতিগত কারণে অনেককেই একমাত্র ঐ অঞ্চলটিতেই খুঁজে পাওয়া যায়। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু হলেও সে অঞ্চলের মানুষগুলির মধ্যে যে অধুনিকতার ছোঁয়া পুরোটা লাগেনি, তা প্রদ্যোত ডাক্তারের স্ত্রী সম্পর্কে তাদের একটি দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই ঔপন্যাসিক স্পষ্ট করেছেন -- ''এখানকার লোকগুলি সহজ নয়। মঞ্জু আধুনিকা, সে বাইসিক্ল চড়ে একা যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়, এর জন্য কুৎসা রটিয়ে ক্ষান্ত হয় নি — ওপরে দরখাস্তও করেছিল।''[৯৩]

'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটি কখনই একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস নয়; একে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে রচনা করার উদ্দেশ্যও ঔপন্যাসিকের ছিল না। তারাশঙ্কর এই উপন্যাসটিকে বাংলার চিকিৎসা-ব্যবস্থার নিরিখে নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্বকে দেখানোর উদ্দেশ্যেই রচনা করেছেন। তাই আঞ্চলিক সীমা সংগতির প্রসঙ্গ থাকলেও সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের মত একটি মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত থেকেও নানা কারণে বিচ্ছিন্ন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের একান্ত নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোককথা, খাদ্যাভ্যাস-খাদ্যতালিকা,

পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসভূমি, নিজস্ব উপভাষার মতো বিষয়গুলিকেই একমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। মনে হতে পারে যে, এই উপন্যাসে দুই কালের দুই চিকিৎসা-ব্যবস্থার নিরিখে যে দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে, তা বাংলা তথা ভারতবর্ষের যে কোনো স্থানের প্রেক্ষিতেই দেখানো যেতে পারে। কিন্তু বীরভূমের লাভপুরের সন্তান তারাশঙ্কর এই উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে তাঁর নিজের অঞ্চলটিকেই বেছে নিয়ে সেখানকার রূপচিত্রণে অগ্রণী হয়েছেন। উপন্যাসে পটভূমি ও চরিত্ররা তো সেই অঞ্চলেরই; তার পাশাপাশি অতি অল্প হলেও প্রয়োজনমতো নবগ্রাম, কাঁদী, বর্ধমান, কাটোয়ার মতো ঐ অঞ্চলের জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত নানা স্থানের নাম, সেখানকার নানা উৎসব অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-সংস্কার, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসভূমির দৃষ্টান্তও তিনি দিয়েছেন। এ সবের সঙ্গে ঔপন্যাসিক মান্য চলিত ভাষায় উপন্যাসটি রচনা করে ভদ্র চরিত্রদের মুখে সে ভাষার সংলাপ দিলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় চরিত্রদের মুখে রাঢ়ী উপভাষার আঞ্চলিক কথ্যরূপেরও প্রয়োগ করেছেন। ফলে 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের সরণীতে না ফেলা গেলেও উপন্যাসটির মধ্যে আঞ্চলিকতার বেশ কিছু লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। উপন্যাসটির মধ্যে আঞ্চলিক পটভূমি রয়েছে।

এরপর বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার আলোচনায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের **'তিতাস একটি নদীর নাম'** উপন্যাসটি গ্রহণ করতে হয়। 'পুথিঘর' প্রকাশিত অদ্বৈত মল্লবর্মণের এই উপন্যাসটির ভূমিকাংশ থেকে জানা যায় যে, এই উপন্যাসটি প্রথমে 'মাসিক মোহম্মদী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির কয়েকটি স্তবক প্রকাশিত হওয়ার পর তা রসিক পাঠককে ব্যাপকভাবে আকর্ষিত করে। কিন্তু এসময় অদ্বৈতের স্বল্পায়ু লেখকজীবনে একটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে — 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। এতে ঔপন্যাসিক তীব্র মানসিক আঘাত পান ও তাঁর মন ভেঙে যায়। তবে আশার কথা তিনি তিতাসের কাহিনি রচনা একেবারে বন্ধ করে দেন নি — শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবান্ধব এবং সহৃদয় পাঠকদের অনুরোধ-আবদারে এর কাহিনি তিনি আবার লিখতে শুরু করেন। তবে তিনি উপন্যাসটির কাহিনি সম্পূর্ণ করলেও অকালমৃত্যুর কারণে গ্রন্থাকারে এর প্রকাশ দেখে যেতে পারে নি। যাই হোক, পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাবার পরেও ভগ্নহৃদয়ে তিনি উপন্যাসটি সমাপ্ত

করেছিলেন বলেই বাংলা সাহিত্যের পাঠক এরূপ একটি অসাধারণ উপন্যাসের সাক্ষাৎ পেয়েছে।

'তিতাস একটি নদীর নাম'–এর আলোচনায় বাংলা উপন্যাসের প্রায় সমস্ত প্রথম শ্রেণির সমালোচক উচ্চকিত প্রশংসা করেছেন। এরমধ্যে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'তে উপন্যাসটির পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন — ''অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬) জীবনবৃত্তিনির্ভর উপন্যাসের চমৎকার দৃষ্টান্ত। ইহাতে লেখক কুমিল্লা জেলার তিতাস নামে একটি অখ্যাত নদীর তীরে বাস-করা জেলে-সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পূজা-পার্বণ-উৎসব ও রীতি-সংস্কৃতির একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়েছেন।''[৯৪] এখানে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটিকে 'জীবনবৃত্তি নির্ভর' বলে মন্তব্য করে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জীবনচর্যার উপস্থিতিকে লক্ষ করেছেন। অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশও সেদিকে খেয়াল রেখে তাঁর 'বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' গ্রন্থে উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন — ''কুমিল্লা জেলার তিতাস নামক একটি নদীতীরের ধীবর-সমাজের রীতি-নীতি, ধর্ম-সংস্কার-উৎসব ও জীবনযাপনের অনবদ্য কাহিনী। সমাজের ও অর্থনীতির পরিবর্তনের ফলে কীভাবে এই সমাজের বুকে লাগল বিপর্যয়ের ঢেউ, আর প্রকৃতির খেয়ালে একদিন তিতাসে ধারা শুকিয়ে এল, সেইসঙ্গে শীর্ণ হয়ে এল ধীবর সম্প্রদায়ের জীবন। সমাজ ও সংস্কৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তনের মহাকাব্যিক বিস্তার এই কাহিনীতে।''[৯৫] সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছেন যে, উপন্যাসটির প্রকাশ ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ দেখে যেতে না পারলেও এই উপন্যাসটির জন্যেই তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছেন — ''প্রকাশিত বই — তিতাস একটি নদীর নাম অদ্বৈত দেখে যেতে পারেন নি। এই একটি উপন্যাসের জন্যই বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে একটি স্থায়ী আসন অধিকার ক'রে আছেন মাটি-থেকে-উঠে-আসা ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ।''[৯৬] সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত তারাশঙ্করের পরবর্তীকালের নবীন লেখকদের হাতে আঞ্চলিক ও অন্ত্যজ জীবন নিয়ে যে কয়েকটি উপন্যাস লেখা হয়েছে, তার মধ্যে আলোচনার যোগ্য হিসেবে তিনটি উপন্যাসের নাম করতে গিয়ে এই উপন্যাসটির উল্লেখ করেছেন — ''আঞ্চলিক জীবন এবং প্রায়ই অন্ত্যজ জীবন

অথবা পরিচিত শ্রমজীবী জীবনকে অবলম্বন করে নবীন লেখকদের হাতে যে ক'টি উপন্যাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে আলোচনার যোগ্য বা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস তিনটি — সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'। তিনটি উপন্যাসেই লেখকদের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যক্তিগত সাহস অভিজ্ঞতার প্রসারিত রূপের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনজনেই ধৃত বিষয়কে এমনভাবে নিঃশেষে ব্যবহার করেছেন যে পাঠান্তে পাঠকের মনে এই ফলশ্রুতির উদয় হয় — এর বেশি কিছু এ-জীবন সম্বন্ধে আমরা আর জানতে পারতাম না।''[৯৭] এই সমস্ত প্রথম শ্রেণির বাংলা কথাসাহিত্যের সমালোচকদের বক্তব্য থেকে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি সম্পর্কে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয় যে, উপন্যাসটি আঞ্চলিকতার রঙে রাঙানো। বাস্তবেও এখানে আঞ্চলিকতার নানা ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এর আঞ্চলিকতার লক্ষণগুলি অনুসন্ধানে যাওয়ার পূর্বে এর কাহিনি অংশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নিতে হয়।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির কাহিনিকে মোট চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই চারটি ভাগের প্রতিটি ভাগে আবার দু'টি করে ঘটনাবৃত্ত আছে। এরমধ্যে প্রথম ভাগের ঘটনাবৃত্ত দু'টি হল — 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং 'প্রবাস খণ্ড'; দ্বিতীয় ভাগের ঘটনাবৃত্ত দু'টি হল — 'নয়া বসত' এবং 'জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ'; তৃতীয় ভাগের ঘটনাবৃত্ত দু'টি হল — 'রামধনু' এবং 'রাঙা নাও'; আর চতুর্থ ভাগের ঘটনাবৃত্ত দু'টি হল — 'দুরঙা প্রজাপতি' এবং 'ভাসমান'।

উপন্যাসের প্রথম ভাগের কাহিনি অংশের শুরুতেই ঔপন্যাসিক কুমিল্লা জেলার তিতাস নামক এক অখ্যাত নদীর সমৃদ্ধ রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি ঐ নদীটির তীরে বসবাসকারী ধীবর মালো সম্প্রদায়ের নিশ্চিন্ত জীবিকা প্রাচুর্যে ভরা আনন্দমুখর জীবনযাপনের কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মেঘনা নদীর তুলনায় তিতাসের ক্ষুদ্রতার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি বিজয় নামক আর একটি প্রতিবেশি জলহীন নদীর সঙ্গেও তিতাস তীরবর্তী মানুষজনের সমৃদ্ধ জীবনের তুলনাও করেছেন। অবশ্য উপন্যাসের এই অংশে জেলেদের জীবন পরিক্রমার পাশাপাশি তিতাস তীরবর্তী কৃষিজীবীদেরও জীবনযাত্রার পরিচয় ঔপন্যাসিক দিয়েছেন। তবে তিনি তিতাস তীরস্থ এই জেলে ও কৃষিজীবীদের মধ্যে কোনো বিরোধ

না দেখিয়ে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের কথাই পরিবেশন করেছেন। এরপর উপন্যাসের কাহিনি এগিয়ে গেলে আমাদের কিশোর ও সুবল নামক দুই মালো তরুণের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। মালোদের চৌয়ারি-ভাসানোর উৎসবকে কেন্দ্র করে সাত বছরের মালো মেয়ে বাসন্তীর প্রতি দু'জনকেই অনুরুক্ত হতে দেখা যায়। ঘটনাক্রমে কিশোর ও সুবল -- দু'জনেই দূর প্রবাসে নৌ-যাত্রায় মৎস্যাভিযানে বের হয়। ঔপন্যাসিক তাদের এই প্রবাসযাত্রার মনোজ্ঞ বিবরণ উপন্যাসটির এই অংশে তুলে ধরেছেন। তারা তিতাস থেকে নৌ-যাত্রা শুরু করে বড় নদীতে প্রবেশ করে আরও এগিয়ে যায়। এই যাত্রাপথে কিশোর ও সুবলের দু'জনকেই জনাকীর্ণ বন্দরের কর্মব্যস্ততা, নদীর দুই পারের অকৃপণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্বজাতীয়দের আগ্রহপূর্ণ আতিথেয়তা, ধর্মসাধনযুক্ত গান প্রভৃতি বিষয় দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। অবশেষে তারা শুকদেবপুর নামক একটি গ্রামে এক বড় জেলে-মহাজনের কাছে আশ্রয় পায়। সেখানে থেকেই তারা নদীতে প্রচুর মাছ ধরে এবং সেই মাছ বিক্রি করে অনেক টাকা উপার্জন করে।

উপন্যাসের এই পর্যায়ে ঔপন্যাসিক কিশোর-সুবলের আশ্রয় পাওয়া শুকদেবপুর গ্রামটির অন্তরে বাহিরে ফাগ-রাঙানো দোল-উৎসবের আনন্দে আলোড়িত জীবনের পরিচয়ও দিয়েছেন। তবে এর পাশাপাশি তিনি পাশের গ্রামের জেলেদের সঙ্গে শুকদেবপুরের জেলেদের দারুণ দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনার বিবরণও দিয়েছেন। যাই হোক, দোল-উৎসবের রঙিন পরিবেশেই কিশোরের সেখানকার এক মালো কিশোরীর প্রতি অনুরাগ জন্মায়, যার ফলশ্রুতিতে সে ঐ মালো কিশোরীকে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করে বসে। শুকদেবপুরের মালো সমাজ তাদের এই গান্ধর্ব বিয়েকে স্বীকৃতিও দেয়। এরপর প্রবাস জীবনে উপার্জিত অর্থ এবং কিশোরের নববিবাহিতা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কিশোর ও সুবল বাড়ি ফেরার জন্য নিজ গ্রামের উদ্দেশ্যে নদীপথে রওনা দেয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের আর ভালোভাবে বাড়ি ফেরা হয় না -- গ্রামে ফেরার ঠিক পূর্বে তাদের নৌকায় ডাকাত পড়ে। ডাকাতেরা তাদের প্রবাস জীবনে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ এবং কিশোরের নববিবহিতা বউকে অপহরণ করে। ঘটনার এই আকস্মিকতা রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্নে মশগুল কিশোরের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না, এর ফলস্বরূপ এই মানসিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে কিশোর উন্মাদ হয়ে যায়। কিশোরের এই

উন্মাদ হয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের কাহিনি অংশের প্রথম ভাগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

উপন্যাসটির কাহিনি অংশের দ্বিতীয় ভাগের শুরু হয়েছে প্রথম ভাগটির ঘটনাক্রমের চার বৎসর পর। এই চার বছরে মালোদের গ্রামটিতে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এরমধ্যে কিশোরের পাগলামি অনেক বৃদ্ধি পায়। কিশোর তার পাগলামি দ্বারা বাবা-মার সংসারকে ছন্নছাড়া করে দিয়ে তাদের জীবনের সুখশান্তি কেড়ে নেয়। এদিকে দেখা যায় যে, কিশোরের অপহৃতা স্ত্রী প্রথমে পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক জেলে পরিবারে আশ্রয় নিলেও পরে বালক পুত্র অনন্তকে সঙ্গে নিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিতারূপে তার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছে। জানা যায় যে, কিশোরের মাছ ধরার সঙ্গী সুবলও আর বেঁচে নেই। সে বাসন্তীকে বিয়ে করার পর এক নৌকা দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। কিশোরের বউ তার অপরিচিত শ্বশুরবাড়ির গ্রামটিতে এলে বাসন্তীই তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ হয়। এই দুই দুর্ভাগিনী নারী নিজেদের আপন নাম-পরিচয় হারিয়ে ফেলে, যথাক্রমে 'অনন্তের মা' এবং 'সুব্‌লার বউ' এই দুই নতুন নামে গ্রামসমাজে পরিচিত হয়ে ওঠে। উপন্যাসের এই দ্বিতীয় ভাগের কাহিনি অংশের সঙ্গে প্রথম ভাগের কাহিনি অংশের মধ্যেকার স্থানগত ঐক্য ছাড়া অন্য কোনো বিশেষ যোগ দেখতে পাওয়া যায় না। উপন্যাসের এই অংশে ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ অনন্তর মার আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, সুব্‌লার বউ-এর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা, অনন্তের শৈশব জীবনের বিকাশ এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার কল্পনা মিশ্রিত আবেগ-অনুভূতির প্রকাশকে দেখিয়েছেন। এখানে অনন্তের মা-র কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে জীবিকার্জন করে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই-এর পরিচয় দিয়ে ঔপন্যাসিক মালো সম্প্রদায়ের গ্রাম সমাজের বিশিষ্ট জীবনচর্যার সুন্দর ছবি যেমন এঁকেছেন, তেমনি মালো জাতির আচরণের বিচারের জন্য আহূত মাতব্বরের মজলিশ ও সেখানে আলোচিত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে মালো সমাজের শাসনপ্রণালীর উপর আলোকপাত করেছেন।

সন্তান-জন্ম ও বিবাহের উৎসব, কালীপূজার বারোয়ারী আয়োজন, উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে পিঠে-পার্বণের আতিথেয়তা প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মালোদের লোকাচার-লোক-সংস্কৃতির ছবিও এঁকেছেন। উপন্যাসের এই অংশে পাগল

স্বামী কিশোরকে ঠিক চিনতে না পারলেও অনন্তের মা তার প্রতি একটা অজানা আকর্ষণ অনুভব করে এবং লোকলজ্জাকে উপেক্ষা করে স্নেহময় সেবা-পরিচর্যার দ্বারা তাকে প্রকৃতস্থ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এদিকে সুবলার বউ বাসন্তীর অনন্তের মা-র প্রতি গভীর সখ্যতা ও সহানুভূতির জন্ম হয়। এমনকী এই সহানুভূতির আতিশয্যের কারণে বাপ-মায়ের সঙ্গে তার মনোমালিন্য পর্যন্ত হয়। এইসময় দোল-উৎসবের দিন অনন্তের মা তার পাগল স্বামী কিশোরকে কুমকুমে রাঙিয়ে প্রথম প্রেমের স্মৃতি উৎঘাটনের চেষ্টা করলে কিশোরের স্মৃতিপথে অতীতের এক দোলের দিনের দাঙ্গায় তার স্ত্রীর মূর্চ্ছা যাওয়ার কথা উদিত হয়। এই স্মৃতিবিকারের কারণেই সে তার স্ত্রীকে অতিরিক্ত আদর করতে গিয়ে গুরুতর জখম করে ফেলে এবং নিজেও প্রতিবেশিদের হাতে দারুণ মার খায়। কিশোর-কিশোরের বউ কেউ-ই এই আঘাত সহ্য করতে পারে না — পরিণামে দু'জনেই মারা যায়। তাদের দু'জনেরই প্রায় একসঙ্গে মারা যাওয়ার মধ্যে দিয়ে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের কাহিনি অংশের দ্বিতীয় ভাগটির সমাপ্তি ঘটেছে।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির কাহিনি অংশের তৃতীয় ভাগে ঔপন্যাসিক অনন্তের বেড়ে ওঠাকে চিত্রিত করে ধীরে ধীরে তাকে মালো সমাজের নায়কত্বের পথে উত্তীর্ণ করার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। অনন্তের এই বেড়ে ওঠার সঙ্গে ঔপন্যাসিক অদ্বৈতের বেড়ে ওঠার সাদৃশ্য থাকায় অনেকের মতে তিনি অনন্তের মধ্যে দিয়ে নিজেকেই প্রকাশ করেছেন। যাই হোক, উপন্যাসের এই অংশে অনন্তের বেড়ে ওঠার পাশাপাশি কতকগুলি কৃষক চরিত্রেরও অবতারণা করা হয়েছে। উপন্যাসের তৃতীয় ভাগের কাহিনি অংশ অনন্ত, বিরামপুরের চাষি কাদির ও তার পরিবারের লোকজন, জেলে বনমালী, বনমালীর বোন উদয়তারা এবং সুবলার বউ বাসন্তীর মাধ্যমে এগিয়ে গেছে। উপন্যাসের এই ভাগে দেখা যায় যে, অনন্তের মাতৃশ্রাদ্ধ সুবলার বউ-এর প্রচেষ্টায় যথেষ্ট যত্ন সহকারে সমাধা হয়। এরপর নিজের বাপ-মায়ের প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও সুবলার বউ বাসন্তী নিজের একার দায়িত্বে মাসীরূপে অবতীর্ণ হয়ে অনন্তকে আশ্রয় দেয়। তবে সে অনন্তকে নিজের কাছে ধরে রাখতে পারে না — একদিন পারিবারিক কোন্দলে তিতিবিরক্ত হয়ে বাসন্তী প্রবল ভর্ৎসনা করে অনন্তকে তাড়িয়ে দেয়। বাসন্তী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে অনন্ত এরপর সে গ্রামের বধূ উদয়তারার

কাছে আশ্রয় পায়। উদয়তারা তাকে তার পিত্রালয়ে নিয়ে যায় এবং দাদা বনমালীর আশ্রয়ে রাখে। এই ঘটনাপর্বে ঔপন্যাসিক উদয়তারার পিত্রালয়ের গ্রামটির এক আনন্দময় পরিবেশ ও জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন। এই গ্রামের এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব প্রভাতী গান গাইতে গাইতে বৈষ্ণবোচিত বাৎসল্যরসে বিভোর হয়ে অনন্তকে বুকে চেপে ধরে এবং তার মধ্যে যশোদাদুলাল ও শচীনন্দনের সাদৃশ্য খুঁজে পায়। উদয়তারার বাপের বাড়ির গ্রামে সমগ্র শ্রাবণ মাস ধরে মনসার গান ও পদ্মাপুরাণ পাঠ হয়। এই উপন্যাসে সে উপলক্ষে বেহুলার চির এয়োতির স্মারক চিহ্নরূপে মেয়েতে মেয়েতে অভিনব বিবাহ অনুষ্ঠান ও তার আনুষঙ্গিক হাসি-খুশি, ঠাট্টা-পরিহাসের ছবি আছে।

এসবের সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিক সেই গ্রামে অনন্তের সঙ্গে অভিন্ন নামধারিণী অনন্তবালার প্রণয়াভাস ও সরস পরিচয়, মুসলিম কৃষক কাদিরের ছেলে ছাদিরের অদ্ভুত খেয়ালে নৌকা-বাইচ প্রতিযোগিতায় নামা, তার ছেলে রমুর শৈশব সাধ-আহ্লাদ, বাইচ নৌকার আরোহীদের বাউল-ভাটিয়ালি-সারী গানে উৎসারিত হৃদয়োচ্ছ্বাস — এই সমস্ত মিলে পল্লীজীবনের স্বতস্ফূর্ততার এক অপরূপ ছবি এঁকেছেন। উপন্যাসের ঘটনাক্রমে এসবের মধ্যে নৌকা-বাইচ খেলা উপলক্ষে অনন্ত ও তার মাসী অর্থাৎ সুব্‌লার বউ বাসন্তীর দেখা হলে অনন্তের প্রতি বাসন্তীর প্রতিহত স্নেহ হিংস্র আক্রমণে রূপান্তরিত হয়। ফলে সে অনন্তকে বেদম মারে এবং পরিণামে অনন্তের বর্তমান আশ্রয়দাতা উদয়তারা ও তার দলবলের কাছে নিজেও প্রবল মার খায়। সুব্‌লার বউ বাসন্তীর এই মার খাওয়ার মধ্য দিয়েই উপন্যাসটির কাহিনি অংশের তৃতীয় ভাগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির শেষ ভাগ অর্থাৎ চতুর্থ ভাগে অনন্ত গ্রামের শিক্ষা শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য শহরে এসে হাজির হয়েছে। অনন্ত শৈশব-কৈশোর থেকেই অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ হিসেবে উপন্যাসে উপস্থাপিত। তবে শহরের নতুন পরিবেশে এবং দেশসেবার নবজাগ্রত উৎসাহে অনন্তর কল্পনাপ্রবণতা ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এদিকে গ্রামে তার জন্য অনন্তবালা প্রতীক্ষা করলেও সমাজকল্যাণে ব্রত নেওয়া অনন্ত আর তার বাল্যজীবনে ফিরে যায়নি; সে সমাজসেবার আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়ে মালো সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হয়েছে।

ঔপন্যাসিক উপন্যাসটির এই ভাগে বহুদিন ধরে চলে আসা মালো-সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় যেমন দিয়েছেন, তেমনি আধুনিক চটুল ও বর্ণসংকর রুচি-আমোদের প্রভাবে কীভাবে তার বিপর্যয় ঘনিয়ে এসে বিলুপ্তির পর্যায়ে পৌঁছে যায় তার ছবিও এঁকেছেন। প্রাচীন মালো-সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি এরমধ্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব, সুরের উন্নত রুচি ও অন্তরের গভীরে ক্রিয়াশীল বিশুদ্ধ আবেগের সমন্বিতরূপের এক অসামান্য পরিচয় তুলে ধরেছেন। কিন্তু এত উঁচুস্তরের সংস্কৃতিকে মালোরা আর ধরে রাখতে পারে নি, সুলভ চটকদার আধুনিকতার মোহে মালোদের এই সংস্কৃতি অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায়। ঔপন্যাসিক তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতির এই অবলুপ্তির ছবি আঁকতে বসে নিজের দীর্ঘশ্বাসও গোপন করেন নি। তিনি আশ্চর্য পারদর্শিতার সঙ্গে মালোদের সমাজে নবাগত সুলভ চটকদার আধুনিক সংস্কৃতির সুদূরপ্রসারী ফলাফলকেও দেখিয়েছেন। উপন্যাসের শেষদিকে দেখিয়েছেন যে, মালোদের নিজস্ব সংস্কৃতি হারানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমাজ-সংহতি, সহযোগিতামূলক মনোবৃত্তি, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, জীবনের মর্যাদাবোধ ও বাচবার ইচ্ছার মতো সমস্ত বিষয়ই একে একে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছে। এইভাবে মালো-সংস্কৃতি যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, ঠিক সেইসময় তিতাস নদীতে চর পড়লে তাদের পক্ষে অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশেরও পরিবর্তন ঘটেছে। এতে মালোদের অর্থনৈতিক সর্বনাশ আরও নিদারুণ ও প্রতিকারহীনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে একসময় মালোপাড়াও বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত একসময় মালোপাড়ার অবলুপ্তিই ঘটে। মালোপাড়ার এই অবলুপ্তির মধ্য দিয়েই উপন্যাসটি শেষ হয়েছে।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের এই কাহিনি অংশটির সর্বত্র বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লার তিতাস নদী তীরবর্তী একটি বিশেষ অঞ্চল এবং সেখানে বসবাসকারী মালো নামক একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জীবনচর্যার ছবি উঠে এসেছে। এভাবে এখানে আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রাথমিক শর্ত পূরণ হওয়ায় স্বভাবতই উপন্যাসটির আঞ্চলিকতা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। আমাদের অনুসন্ধান বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের আঞ্চলিকতা। তবে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার অনুসন্ধান শুরুর পূর্বে উপন্যাসটি

সম্পর্কে অধ্যাপক–সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি জানা প্রয়োজন। তিনি উপন্যাসটির পরিচয় দেওয়ার পর এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেছেন — ''প্রথম খণ্ডে কিশোর ও সুবল, দ্বিতীয় খণ্ডে উহাদের পত্নীদ্বয়, তৃতীয় খণ্ডে অনন্ত ও উদয়তারা ও চতুর্থ খণ্ডে মালো সমাজের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কাহিনী পর্যায়ক্রমে উপন্যাসের ভাবকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের ফাঁকে ফাঁকে নানা গৌণ চরিত্র, বহুবিধ সরস সমাজচিত্র, নদীযাত্রা ও নদীতীরস্থিত গ্রামগুলির বর্ণনা সমস্ত উপন্যাসটিকে প্রাণসমৃদ্ধ ও গতিবেগচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। এখানে কোন চরিত্রই কেন্দ্রীয় তাৎপর্য বিশিষ্ট নহে; অনন্ত কিছু সময়ের জন্য উপন্যাসের মর্মবাণীদ্যোতক চরিত্ররূপে প্রতিভাত হইয়াছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মিলিত ও সমষ্টিগত জীবনাবেগই উপন্যাসের আসল রসকেন্দ্র। মৎস্যজীবীদের নদীতে মাছ–ধরার বর্ণনা ইহার একটি প্রধান অধ্যায়; কিন্তু নদীপ্রবাহের সহিত উহাদের জীবনধারার সম্পর্ক নিবিড় হইলেও উহা নিছক প্রয়োজনাত্মক। উহাদের জীবনদর্শন নদীর অনন্তগতিশীল ও বিচিত্ররহস্যময় সত্তার নিগূঢ়প্রভাবচিহ্নিত নহে। লেখকের প্রকৃত আকর্ষণ নদীতীরের গ্রামসমাজের ধর্মকেন্দ্রিক ও উৎসবছন্দগ্রথিত জীবনযাত্রায়, সরলবিশ্বাসী মালো ও কৃষকদের স্নিগ্ধ–শান্ত জীবনস্পৃহায়, ধর্মবিশ্বাসউদ্ভূত, বদ্ধমূল সংস্কৃতিচর্চায়। কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, এই সমষ্টিজীবনের চিত্রাঙ্কনে তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।''[৯৮] অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তির সর্বত্রই উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার লক্ষণের আভাস আছে।

মালোসন্তান অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতা থেকেই 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি রচনা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর যখন এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়, তখন উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতেই এর আভাস দেওয়া হয়েছে — ''আজ এই গ্রন্থ প্রকাশের দিনে আমরা আমাদের প্রিয়বন্ধু অদ্বৈত মল্লবর্মণকে বেদনার্ত চিত্তে স্মরণ করি। কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালে যাইবার পূর্বে তিনি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জীবৎকালে ইহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি নাই — লেখকের মৃত্যুর পরও কয়েকটি বৎসর কাটিয়া গেল। . . . আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করিবার চিত্র কমই আছে। পরিচয়ের অভাবে লেখক অনেক স্থানেই মিথ্যা রোমান্টিক, আবার অনেক

স্থানে সত্যের ছল হেতু তাঁহার দৃষ্টি বক্র। অদ্বৈত মল্লবর্মণের লেখা এই মিথ্যা রোমান্টিকতা বা সত্যের ছলনা হইতে মুক্ত। তাঁহার মানুষ, প্রকৃতি, আনন্দ, বিষাদ সমস্তই সহজ জীবন-রসিকতার ও নিগূঢ় অনুভবের পরিচয় বহন করে।''[৯৯] এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে, আসলে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে তাঁর নিজস্ব সমাজেরই রূপচিত্রণ করতে আগ্রহী ছিলেন। সেজন্যই কুমিল্লার তথাকথিত অখ্যাত নদী তিতাস ও তার তীরে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী মৎস্যজীবী মালো সম্প্রদায়ের এক বিশেষ সময়ের জীবনকথা পরিবেশনে উদ্যোগী হয়েছেন। উপন্যাসটিতে তিনি মালোদের জীবনকথা পরিবেশন করে তাদের সংস্কৃতির বিকাশ ও অবলুপ্তির একটি রূপরেখাও অঙ্কণ করেছেন। তাই উপন্যাসের এক জায়গায় আমরা দেখি — ''এই কাহিনী যারা সৃষ্টি করিয়াছিল তারা এখন চলিয়া গিয়াছে। এ সংসারে আর তাদের দেখা যাইবে না।''[১০০] উপন্যাসটি যে, তীব্রভাবে আঞ্চলিকতার দাবী রাখে তার প্রমাণে এ দু'টি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট বলে মনে হয়। এখন আমরা এই উপন্যাসটির সর্বত্র কীভাবে আঞ্চলিকতার নানা উপকরণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, সেই আলোচনা করব।

আমরা বারবার বলার চেষ্টা করছি যে, 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির পটভূমি হিসেবে ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ পূর্ববাংলার কুমিল্লা জেলার একটি বিশেষ অঞ্চলকে বেছে নিয়েছেন। উপন্যাসটির পটভূমিগত এই স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি তিনি বারবার বোঝানোর চেষ্টাও করেছেন। উপন্যাসের পটভূমিগত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে গিয়ে শুরুতেই তথাকথিত অখ্যাত তিতাস নদীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে — ''তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূল-জোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণ-ভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়; রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়ে ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারেনা। মেঘনা-পদ্মার বিরাট বিভীষিকা তার মধ্যে নাই। . . . তিতাস মাঝারি নদী। দুষ্ট পল্লীবালক তাকে সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে না। আবার নৌকায় ছোট বউ নিয়া মাঝি কোনদিন ওপারে যাইতে ভয় পায় না। তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মত বক্রতা নাই, কৃপণের মতো কুটিলতা নাই। কৃষ্ণপক্ষের ভাঁটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয়, কিন্তু কাঙাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্বেল করে না। . . . তিতাসের বুকে তেমন কোন ইতিহাস

নাই। সে শুধু একটি নদী।''[১০১] শুধু তাই নয় এই তিতাস নদী যে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির তার বিবরণও রয়েছে — ''দুরন্ত মেঘনা নাচিতে নচিতে কোন্‌কালে কোন্‌ অসতর্ক মুহূর্তে পা ফসকাইয়াছিল; বাঁ তীরটা একটু মচকাইয়া গিয়া ভাঙিয়া যায়। স্রোত আর ঢেউ সেখানে প্রবাহের সৃষ্টি করে। ধারা সেখানে নরম মাটি খুঁজিয়া, কাটিয়া, ভাঙিয়া, দুমড়াইয়া পথ সৃষ্টি করিতে থাকে। এক পাকে শত শত পল্লী দুই পাশে রাখিয়া অনেক জঙ্গল অনেক মাঠ-ময়দানের ছোঁয়া লইয়া ঘুরিয়া আসে — মেঘনার গৌরব আবার মেঘনার কোলেই বিলীন হইয়া যায়। এই তার ইতিহাস। কিন্তু সে কি আজকের কথা? কেউ মনেও করে না কিসে তার উৎপত্তি হইল। শুধু জানে সে একটি নদী। অনেক দূর-পাল্লার পথ বাহিয়া ইহার দুই মুখ মেঘনায় মিশিয়াছে। পল্লীরমণীর কাঁকনের দুই মুখের মধ্যে যেমন একটু ফাঁক থাকে, তিতাসের দুই মুখের মধ্যে রহিয়াছে তেমনি একটুখানি ফাঁক — কিন্তু কাঁকনের মতই তর বলয়াকৃতি।''[১০২] উপন্যাসটি শুরুর এই বিবরণ থেকে পাঠকের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, এর কাহিনি তিতাস নদী ও তার তীরে বসবাসকারী মানুষজনকে নিয়েই এগোবে। এরপর সেই অনুমানই সত্য হয়। উপন্যাসের কাহিনি যত এগোয় ততই তিতাস তীরবর্তী অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষজনের জীবন পরিক্রমার কথা উঠে আসে। এই উপন্যাসের চারটি ভাগেই এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যেমন এক জায়গায় ঔপন্যাসিক তিতাস তীরে বসবাসকারী মালো সম্প্রদায়ের বিররণ দিতে গিয়ে তাদের পাড়া বা গ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গ লিখেছেন — ''তিতাস নদীর তীরে মালোদের বাস। ঘাটে-বাঁধা নৌকা, মাটিতে ছড়ানো জাল, উঠানের কোণে গাবের মটকি। ঘরে ঘরে চরকি, টেকো, তকলি — সুতো কাটার, জাল বোনার সরঞ্জাম, এই সব নিয়াই মালোদের সংসার।''[১০৩] উপন্যাসটিতে একথা বলেই তিনি থামেন নি। মালোদের বসবাসকারী অঞ্চলটি সম্পর্কে তিনি আরও লিখেছেন — ''এখানে কয়েকঘর মালো থাকে। ঘাটে খুঁটি-বাঁধা কয়েকটি নৌকা, পাড়ে বাঁশের উপর ছড়াইয়া দেওয়া কয়েকটি জাল, এখানে-সেখানে মাটিতে কালো চারকোণা গর্তে গাবের দাগ, পাশে গাবের মট্‌কি গামলা বেতের ঝুড়ি — দেখিলেই চেনা যায় এখানে মালোরা থাকে।''[১০৪] উপন্যাসে গৃহীত মালোদের জীবনের সঙ্গে তিতাস নদী নির্ভর এই অঞ্চলটির যে অন্তরঙ্গ যোগ

আছে তাও ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ''পুঁথির পাতা পড়িয়া গর্বে ফুলিবার উপাদান এর ইতিহাসে নাই সত্য — কিন্তু মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রেম, বৌঝিয়েদের দরদের অনেক ইতিহাস এর তীরে তীরে আঁকা রহিয়াছে।''[১০৫]

উপন্যাসটির প্রথম ভাগের অন্তর্গত 'প্রবাস খণ্ড'-এর কিছু ঘটনা মেঘনা তীরবর্তী শুকদেবপুর গ্রামে ঘটলেও অধিকাংশ ঘটনাই তিতাস তীরবর্তী কোনও না কোন গ্রামে ঘটেছে। এরমধ্যে বেশির ভাগ ঘটনা মূলত তিনটি গ্রামে ঘটেছে — গোকর্ণঘাট, উদয়তারার বাপের বাড়ির গ্রাম ও বিরামপুর। এরমধ্যে বিরামপুর মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম এবং সেখানকার অধিবাসীরা মূলত কৃষিজীবী। বাকি দু'টি গ্রামের প্রায় সবাই মৎস্যোপজীবী মালো সম্প্রদায়ের মানুষ। উপন্যাসের প্রধান ঘটনাস্থল গোকর্ণঘাট গ্রাম, মালোদের স্থানীয় উচ্চারণে যা হল 'গোকন্নঘাট'। এই উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কিশোরকে নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্য বলতে শোনা যায় — ''শ্রীযুক্ত কিশোরচান মূল্যব্রহ্মণ। পিতা শ্রীযুক্ত রামকেশব মূল্যব্রহ্মণ। নিবাস গোকন্নঘাট, জিলা ত্রিপুরা।''[১০৬] উপন্যাসে মালো সংস্কৃতির যে বিবরণ প্রকাশ পেয়েছে তাতে উপন্যাসটির প্রথম দুটি ভাগে তো বটেই শেষের ভাগগুলিরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই গোকর্ণঘাট গ্রাম স্থান পেয়েছে। তবে তৃতীয় ভাগ থেকে বিরামপুর ও উদয়তারার বাপের বাড়ির গ্রামটির সংস্কৃতির পরিচয় আছে। তাই বলাই যায় যে, 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে কুমিল্লা জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট নদী তিতাস তীরবর্তী গোকন্নঘাট, বিরামপুর ও উদয়তারার বাপের বাড়ির গ্রামটির ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রকৃতির বিবরণ দিয়ে আঞ্চলিক সীমা-সংহতির দিক থেকে ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ একটি আঞ্চলিকতার পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে গৃহীত তিতাস নদী তীরবর্তী গ্রামগুলির হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অনেকগুলি নর-নারীকেই ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। এদের মধ্যে বেশির ভাগই মালো সম্প্রদায়ের মৎস্যোপজীবী মানুষ। এই উপন্যাসে কিশোর, সুবল, অনন্ত, তিলকচাঁদ, রামকেশব, দীননাথ মালো, নিত্যানন্দ, গৌরাঙ্গ, কালোবরণ ও তার ভাইয়েরা, দয়ালচাঁদ, রামপ্রসাদ, হরিমোহন, কৃষ্ণচন্দ্র, তামসীর বাপ, মোহন, উদয়তারার দাদা বনমালী ও তার গ্রামের অন্যান্য লোকজন, গোঁসাই বাবাজী, ধনঞ্জয়, মাগন সরকার, বাঁশীরাম মোড়ল ও তার স্ত্রীসহ শুকদেবপুর

গ্রামের মানুষজন, বাসন্তী, বাসন্তীর মা, অনন্তর মা, কিশোরের মা, কালোবরণের মা ও তার পুত্রবধূগণ, উদয়তারা ও তার বাপের বাড়ির গ্রামের মহিলারা, মঙ্গলার বউ, অনন্তবালা, জোবেদ আলী, বন্দে আলী, করমালী, শরীরতুল্লা, বাহারুল্লা, কাদির মিঞা, ছাদিরের মহুরি শ্বশুর, ছাদির মিঞা, রমু, রশিদ মোড়ল, খুশির মত অজস্র নরনারীর উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে শুকদেবপুরের মানুষগুলি বাদে সবাই তিতাস তীরবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা। শুকদেবপুরের মানুষগুলি মেঘনা তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করলেও তারা মালো সম্প্রদায়ের মানুষ। এই উপন্যাসে তিতাস তীরবর্তী অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলিম দুই ধর্মের লোকজনের মধ্যেই সেই অঞ্চল এবং তিতাস নদীর প্রভাব পড়েছে। যেমন, তিলকচাঁদের বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''নদীর বুকে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ-শিশুর অস্ফুট করতালি জাগায় যে মুক্ত বাতাস, তারই মৃদু স্পর্শ তিলকের বৃদ্ধ সঙ্কুচিত বুকখানাও পূর্ণতায় প্রসারিত করিয়া তুলিল।''[১০৭] আবার বাসন্তী ও তার মায়ের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক এক জায়গায় লিখেছেন — ''বুড়ি শুইয়া শুইয়াই তামাক টানিল, তারপর বাতি নিভাইল এবং সারা রাত মেয়েকে বুকে করিয়া রাখিল। তার স্তন দুটি শুকাইয়া দড়ির মত হইয়া গিয়াছে। মেয়ে তারই মধ্যে অলস স্তন দুটি ডুবাইয়া দিয়া গভীর আরাম পাইল। মা তার তোবড়ানো গালের সঙ্গে মেয়ের মসৃণ গৌরবর্ণ গালখানা মিশাইলে মেয়ের দুই চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিল।''[১০৮] তিতাস তীরবর্তী গ্রামগুলির মহিলাদের জীবনেও যে তিতাস নদীর প্রভাব অপরিসীম, তার বিবরণ ঔপন্যাসিক তাঁদের দৈনন্দিন কার্যাবলির মধ্যে দিয়েছেন — ''নারীরা সুতা পাকাইবার জন্য উঠানে বাহির হয়। চোঙার মত মুখ একটা খুঁটি স্থায়ীভাবে মাটিতে পোতা থাকে। তার উপর সুতা ভরা চরকি বসাইয়া দেয়। টেকোয় সুতা বাঁধিয়া উঠানের এ কিনারা থেকে ও কিনারায় পোঁতা একটি বড় খুঁটি বেড়িয়া আনে। তারপর ডান হাঁটুর কাপড় একটু গুটাইয়া লইয়া, নগ্ন উরু তুলিয়া তুলিয়া হাতের তেলোয় ঘষা মারিয়া উরুতে টেকো ঘুরায়।''[১০৯]

উপন্যাসটিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রচুর চরিত্র থাকলেও সেই অর্থে যথার্থ নায়ক নেই। অনেকের মতে অনন্তের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক নিজেকেই তুলে ধরেছেন এবং সে-ই এই উপন্যাসের নায়ক। কথাটির মধ্যে হয়তো যুক্তি আছে, তবে আমাদের মনে হয় এতে যুক্তির চেয়ে আবেগ ও ঔপন্যাসিকের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণের

বিষয়টি বেশি প্রকট হয়। কোনো চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্রষ্টা আত্মপ্রকাশ করলে চরিত্রটি নায়কের মর্যাদা পাবে, এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোটা মনে হয় একটু বাড়াবাড়ি। 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ সমগ্র উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে অনন্তের উপস্থিতি নায়ক হয়ে ওঠার জন্য যতটা প্রয়োজন ছিল, সে তুলনায় অত্যন্ত কম — উপন্যাসটির প্রথম ভাগে তার উপস্থিতি একদম নেই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে তার শৈশবের বর্ণনা আছে। চতুর্থ ভাগের প্রথম অংশে তাঁর প্রসঙ্গ এলেও উপস্থিতি সেইভাবে নেই। একমাত্র চতুর্থ ভাগের শেষ অংশ 'ভাসমান'-এ সে কিছুটা নায়কোচিত মহিমায় হাজির হয়েছে। তবে এই উপন্যাসে একেবারে নায়ক নেই এটা বলা যাবে না; বরং একটু তলিয়ে ভাবলেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তিতাস নদী ও তার তীরবর্তী অঞ্চলটি এই উপন্যাসের নায়ক হয়ে ওঠার অন্যতম প্রধান দাবিদার। ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ এই উপন্যাসের চারটি ভাগেই তিতাস নদী ও তার তীরবর্তী অঞ্চলকে উপস্থাপনের দিকে নজর দিয়েছেন। তিতাস তীরবর্তী গ্রামগুলির মানুষজনের কাছে এই নদীটি একটি জীবন্ত সত্তার মতই প্রতিভাত হয়েছে। তাই ঔপন্যাসিক বলেছেন — ''তিতাসের বুকে ঝড়-তুফানের রাতেও স্বামী-পুত্রদের পাঠাইয়া ভয় করে না। বউ মনে করে স্বামীরা তাদের বাহুর বাঁধনেই আছে, মায়েরা ভাবে ছেলেরা ঠিক মায়েরই বুকে মাথা এলাইয়া দিয়া শান্তমনে মাছ-ভরা জাল গুটাইতেছে।''[১১০] কতদিন ধরে তিতাস তার তীরবর্তী জনজাতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তা ঔপন্যাসিকেরও অজানা। তাই দীর্ঘদিন ধরে তিতাসের তীরে বসবাসকারী মানুষদের উপর এই নদীর প্রভাবের বিবরণ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''তিতাস একটি নদীর নাম। এ নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তার তীরের লোকেরা জানে না। . . . শুরুতে কে এই নাম রাখিয়াছিল, তারা তা জানে না। তার নাম কেউ কোনদিন রাখিয়াছে, এও তারা ভাবে না। ভাবিতে বা জানিতেও চায় না। কবে কোন্ দূরতম অতীতে এর পারে তাদের বাপ পিতামহেরা ঘর বাঁধিয়াছিল একথা ভাবা যায় না। এ যেন চির সত্য, চির অস্তিত্ব নিয়া এখানে বহিয়া চলিয়াছে। এ সঙ্গী তাদের চিরকালের। এ না হইলে তাদের চলে না। এ যদি না হইত, তাদের চলিতও না। এ না থাকিলে তাদের চলিতে পারে না। জীবনের প্রতি কাজে এ আসিয়া উঁকি

মারে। নিত্যদিনের ঝামেলার সহিত এর চিরমিশ্রণ।''[১১১] এভাবে উপন্যাসটির নায়কত্বের দিক থেকেও তিতাস নদী ও তার তীরবর্তী অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষজন প্রাধান্য পেয়েছে। কোনো উপন্যাসের ব্যক্তি চরিত্রের পরিবর্তে একটি বিশেষ অঞ্চল নায়ক হিসেবে উঠে আসছে, এ ঘটনা উপন্যাসটির আঞ্চলিকতাকেই সূচিত করে।

উপন্যাসে গৃহীত তিতাস তীরবর্তী মানুষগুলির জীবনচর্যার পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ মৎস্যজীবী এবং কৃষিজীবী — এই দুই শ্রেণির মানুষদের তুলে ধরেছেন। এদের মধ্যে কৃষিজীবী মানুষদের সংখ্যা কম; মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের এখানে কৃষিজীবী হিসেবে দেখানো হয়েছে। অবশ্য উপন্যাসের শেষে তিতাস শুকিয়ে গেছে এবং তার বুকে চর পড়েছে। এ সময় মৎস্যজীবী মানুষদের জীবনচর্যার একটা পরিক্রমা শেষ হয়েছে এবং সে অঞ্চলের নবগঠিত সমাজে কৃষিকাজ প্রধান জীবিকায় পর্যবসিত হয়েছে। একথা ঠিক যে, এ সময় মালো সমাজ, মালো-সংস্কৃতিও অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছে। যাই হোক, এই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষদের জীবিকার প্রশ্নে মাছ ধরা এবং তার আনুষঙ্গিক নানা কার্যকলাপকে বড় করে দেখানো হয়েছে। ঔপন্যাসিক এক জায়গায় লিখেছেন — ''তিতাসের তীর ছুঁইয়া যাদের বাড়িঘর তারা জেলে। তিতাসে মাছ ধরিয়া তারা বেচে, খায়। তাদের বাড়ি পিছু একটা করিয়া নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকে।''[১১২] মালোদের জীবনে এই মাছ ধরার গুরুত্ব কতখানি সে সম্পর্কে বলা হয়েছে — ''রূপার মত সাদা, ছোট ছোট প্রাণচঞ্চল অজস্র মাছ। এক একটা মাছে এক একটা প্রাণ। নৌকার ডরাতে জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে কেমন খেলা করে। দুই মিনিটেই যাদের মৃত্যু, তারা মরণকে অবহেলা করিয়া এমন শান্ত-চিত্তে ভাসে কি করিয়া! কিন্তু বড় ভালো লাগে দেখিতে।''[১১৩]

মালোপাড়ার ছেলেরা শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরে পৌঁছানোর সময়েই বুঝে যায় যে, তিতাসের বুকে মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করাই তাদের জীবনের ভবিতব্য। এজন্য পড়াশুনা, পাঠশালার মত বিষয়গুলির প্রতি তাদের মনোযোগ থাকে না। উপন্যাসের প্রথম ভাগে গোকর্ণঘাটের মালোপাড়ার সদ্য তারুণ্যে পৌঁছানো কিশোর ও সুবলের শৈশব-কৈশোরের বর্ণনা রয়েছে — ''একদিন দুইজনের বাপ তাদের

পাঠশালায় পাঠাইল। প্রথম দিন তারা চুপচাপ কাটাইল। পরের দিন ভিন্ন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করিয়া শিক্ষকের মার খাইল। তার পরের দিন নিজেদের মধ্যে মারামারি করিয়া শিক্ষকের হাতে যে মার খাইল, তাহার মাত্রা সহনাতীত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দুইজনেই একসঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। পাঠশালায় আর গেল না। গুরুজনের মার খাইল, তবু গেল না।''[১১৪] মালোপাড়া ছাড়াও তিতাস তীরবর্তী মুসলমানপাড়ার লোকজনও শিক্ষা-দীক্ষা, পাঠশালা-মোক্তবকে খুব একটা ভালোচোখে দেখেনা। তাই বৃদ্ধ কাদির তার নাতি রমুর পড়াশুনা করার জন্য মোক্তবে যাওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারে না। তার ধারণা পড়াশুনা শিখে মানুষ মিথ্যেকথা বলতে, জালজুয়াচুরি করতে, পরকে ঠকাতে শেখে। এজন্য সে ছেলে ছাদিরকে দু'কথা শুনিয়েও দেয় — ''দে তোর পুতেরে মক্তবে দে, কিন্তু কইয়া রাখলাম, যদি মিছাকথা শিখে, যদি জালজুয়াচুরি শিখে, যদি পরেরে ঠকাইতে শিখে, তবে তারে আমি কিছু কমু না, শুধু তোমার মাথাটা আমি ফাটাইয়া দিমু ছাদির মিয়া।''[১১৫] বলা বাহুল্য যে, শিক্ষা সম্পর্কে এরূপ ধারণা সে অঞ্চলের অনেকের মধ্যেই ছিল। যাই হোক, কিশোর ও সুবলের শিক্ষা-দীক্ষা বেশিদূর না এগোনোয় তারা তাদের জীবনের পরবর্তী গন্তব্যে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়। তাদের জীবনের এই পরবর্তী গন্তব্য হল — ''তারপর এক সময়ে কিছুদিন আগে পিছে দুজনেরই নাও-জালে হাতে খড়ি হইল। অল্পদিনের মধ্যেই পাকা জেলে বলিয়া পাড়ার মধ্যে তাদের নাম হইয়া গেল।''[১১৬]

শুধু পুরুষেরা নয়, মালোপাড়ার নারীরাও সরাসরি মাছমারার কাজে লিপ্ত না থাকলেও জালের জন্য সুতোকাটা, সুতো ধোওয়া, সুতো শুকানো, সুতো রং করার মতো নানা কাজে লিপ্ত থাকে। এই সুতো কাপড় বোনার কাজে লাগে না, এ দিয়ে মালোরা নিজেদের জাল তৈরি করে, ছেঁড়া জাল নতুন করে বোনে। তাই অনন্তর মা গোকর্ণঘাটে এসে যখন ছোট শিশুসন্তানসহ জীবন-জীবিকার প্রশ্নে কোনো কিছু ঠিক করে উঠতে পারে নি ও অসহায় অবস্থায় পড়েছে, তখন সুবলার বউ বাসন্তী সুতো এনে দিয়ে তার পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে — ''দুপুরের পর সুবলার বউ কতকগুলি সুতা কাটার হাতিয়ার লইয়া হাজির হইল। সেগুলি মাটিতে নামাইয়া বলিল, 'এই নেও বড় টাকু, মোটা সূতার লাগি; এই নেও ছোট টাকু, চিকন সুতার। আর এই একখানা পিঁড়ি দিলাম, ঘাটে গিয়া শণের লাছি এর উপরে আছড়াইয়া ধুইয়া

আনবা। তারপর রইদে শুখাইবা। রাইতে আইয়া সব শিখাইয়া দিমু।''[১১৭] এভাবে উপন্যাসটিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সেই অঞ্চলটি এবং তিতাস নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাই উপন্যাসের শেষে তিতাস শুকিয়ে তার বুকে চর পড়লে এর অভিঘাতও মালোদের জীবনে প্রবলভাবে পড়েছে। এসময়ের বিবরণ ঔপন্যাসিক বনমালীর জবানীতে অত্যন্ত মর্মন্তুদ ভাষায় দিয়েছেন — '' . . . তিতাস শুখাইয়া গিয়াছে, মালোরা জলছাড়া মীনের মত হইয়াছে। খাইতে পায় না। . . . সব মালোরাই এইরকম হইয়া গিয়াছে। তবু ত আমি বাঁচিয়া আছি, মাছের পোনার ভার কাঁধে লইয়া ঘোরাফেরা করিতে পারি; কত মালো যে মরিয়া গিয়াছে; কত মালো যে খাইতে না পাইয়া একেবারে বলবুদ্ধি হারাইয়া ঘর-বৈঠক হইয়া গিয়াছে। . . . নদী শুখাইয়াছে, মালোদের মাছ ধরাও উঠিয়াছে। ব্যবসা ছাড়িয়া তারা দলে দলে মজুরি ধরিয়াছে। আমিও মজুরি ধরিয়াছি।''[১১৮]

এই উপন্যাসে তিতাস তীরবর্তী মালো গ্রামগুলির ছবি আছে। ওই গ্রামগুলির হিন্দু ও মুসলমান — এই দুই প্রধান ধর্মের মানুষজনের কথাই আছে। তবে মুসলমানদের বিশেষ কোন গোষ্ঠীর কথা না থাকলেও হিন্দু ধর্মের মূলত মৎস্যজীবী মালো সম্প্রদায়ের কথা আছে। উপন্যাসটি থেকেই জানা যায় যে, এই মালো সম্প্রদায়ের লোকেদের আবার দু'টি গোষ্ঠী আছে — কৃষ্ণমন্ত্রী ও শিবমন্ত্রী অর্থাৎ কৃষ্ণের উপাসক 'বৈষ্ণব' ও শিবের উপাসক 'শৈব'। আমরা উপন্যাসের প্রথম ভাগে দেখতে পাই যে, কিশোরদের 'প্রবাস' যাত্রাকালে জনৈক মালো তিলককে জিজ্ঞাসা করেছে — ''আমি কই, তোমরা বিরাজ কর বৃন্দাবনে না কৈলাসে — তোমরা কৃষ্ণমন্ত্রী না শিবমন্ত্রী।''[১১৯] অবশ্য উপন্যাসটিতে শিবমন্ত্রী অর্থাৎ শৈব মালোদের পরিচয় নেই। এখানে মূলত কৃষ্ণমন্ত্রী অর্থাৎ বৈষ্ণব মালোদের বিস্তারিত বিবরণ আছে। ঔপন্যাসিক অনেক জায়গাতেই তাদের ধর্মাচরণের সঙ্গে যুক্ত রীতি-নীতি, আচার-সংস্কৃতি, নাচ-গান, আমোদ-উল্লাসের বিবরণ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে মনসাপূজা ও মনসার ভাসান গানের কথাও উপন্যাসটিতে আছে। কৃষ্ণমন্ত্রী মালোরা হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে সদা-সচেষ্ট থাকে। তাই মালো সম্প্রদায়ের দয়ালের সঙ্গে কায়স্থদের ঘনিষ্ঠতা দেখে সমাজপতিদের বলতে শোনা যায় — ''বাজারের কাছে তোমার বাড়ি। বাজারের কায়েতরা তোমার বাড়ি আসিয়া নাকি

তবলা বাজায় আর মেয়েদের দিকে নজর দেয়। ভাবিয়া দেখ, কায়েতের সঙ্গে মিশিতেছে বলিয়া তারা তোমাকে কায়েত বানাইবে না। তুমি মালোই থাকিবে। তারা তোমার বাড়ি আসিলে যদি সিংহাসন দাও, তুমি তাদের বাড়ি গেলে বসিতে দিবে ভাঙা তক্তা। তুমি রূপার হুকাতে তামাক দিলেও, তোমাকে দিবে শুধু কলকে খানা।''[১২০] তবে উপন্যাসটি অবশ্য মালোপাড়াগুলিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো বিরোধের আভাস নেই। এই দুই ধর্মের সহাবস্থানের দিকেই ঔপন্যাসিক জোর দিয়েছেন এবং এরা মিলেমিশেই বাস করেছে। মালোরা মূলত মৎস্যজীবী আর মুসলিমরা কৃষিজীবী। উপন্যাসটিতে দেখা যায় যে, কাদির-ছাদিরের সাহায্যার্থে বনমালী যেমন এগিয়ে এসেছে, তেমনি কাদিরের বাড়ির আপ্যায়নে বনমালীর বোন নয়নতারা অভিভূত হয়েছে। নৌ-যাত্রাকালে হিন্দুরা অনায়াসেই মুসলিম পাঁচপীরের নাম স্মরণ করেছে — ''পাঁচপীর বদরের ধ্বনি দিয়া প্রথমে লগি ঠেলা দিল তিলক।''[১২১]

উপন্যাসটির প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''. . . ব্যক্তির বিকাশের এই শর্তকে 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ (১৩৬৩) অনুসরণ করার প্রয়োজন লেখক অনুভব করেননি আদপে। তিতাসের মন্থর স্রোতের পাশে-পাশে উদাসীন মালোপাড়ার-জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু জড়িত জীবিকার ছবিকে কাব্যময় ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন অদ্বৈতবাবু।''[১২২] বলা বাহুল্য, উপন্যাসটি সম্পর্কে এই মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রায় সমগ্র উপন্যাসে মালোদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ কেন্দ্রিক জীবনচর্যার বিষয়টিই যেন এখানে চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসের প্রথম দিকে মালো-সংস্কৃতির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে মালোদের বিশেষ উৎসব 'মাঘমণ্ডলের ব্রত'-এর প্রসঙ্গ রয়েছে — ''মাঘ মাসের শেষ তারিখে সেই মালোপাড়াতে একটা উৎসবের ধুম পড়িল। এটা কেবল কুমারীদের উৎসব। নাম মাঘ-মণ্ডলের ব্রত।''[১২৩] এই 'মাঘমণ্ডলের ব্রত'-এর বিস্তারিত পরিচয় প্রদানের প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে, এটা মূলত মালো তরুণীদের উৎসব। এই উৎসবের বিবরণে তিনি লিখেছেন — ''মাঘ মাসের ত্রিশদিন তিতাসের ঘাটে প্রাতঃস্নান করিয়াছে; প্রতিদিন স্নানের শেষে বাড়িতে আসিয়া ভাঁটফুল আর দূর্বাদলে বাঁধা ঝুটার জল দিয়া সিঁড়ি পূজিয়াছে, মন্ত্রপাঠ করিয়াছে; 'লও লও সুরুজ ঠাকুর লও ঝুটার জল, মাপিয়া

জুখিয়া দিব সপ্ত আঁজল।' আজ তাদের শেষ ব্রত। তরুণ কলাগাছের এক হাত পরিমাণ লম্বা করিয়া কাটা ফালি, বাঁশের সরু শলাতে বিঁধিয়া ভিত করা হয়। সেই ভিতের উপর গড়িয়া তোলা হয় রঙিন কাগজের চৌয়ারি-ঘর। আজিকার ব্রত শেষে ব্রতিনীরা সেই চৌয়ারী মাথায় করিয়া তিতাসে জলে ভাসাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ঢোল-কাঁসি বাজিবে, নারীরা গীত গাহিবে।''[১২৪] এই 'মাঘমণ্ডলের ব্রত' থেকেই মালো তরুণীদের মনে রঙ্ লাগে এবং তাদের অভিভাবকেরা বিয়ের চিন্তাভাবনা শুরু করে। এই উপন্যাসে বাসন্তী ও তার মা-এর কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

কৃষ্ণমন্ত্রী মালোদের জীবনে দোল-উৎসব একটি অন্যতম বড় উৎসব। উপন্যাসে শুকদেবপুর ও গোকর্ণঘাট — এই দুই গ্রামের দোল উৎসবের ছবি রয়েছে। শুকদেবপুরের দোল-উৎসবের সময় কিশোরেরা সেই গ্রামের অতিথি ছিল। সেখানকার দোলের চিত্র এরূপ — ''তারা ঘটা করিয়া দোল করিবে, দশজনকে নিয়া আনন্দ করিবে। শুকদেবপুর গ্রামের সকলকেই তারা নিমন্ত্রণ করিল। মোড়লের গাঙের রায়ত হিসাবে কিশোররাও নিমন্ত্রিত হইল। কাল সকাল থেকে রাত অবধি হোলি, গানবাজনা, রঙখেলা, খাওয়া-দাওয়া হইবে।''[১২৫] এই দোল উৎসবেই কিশোরের এক মালো তরুণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, যে পরবর্তীকালে তার স্ত্রী হয়। তবে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয় নি। চার বছর পর গোকর্ণঘাটের দোল-উৎসবের সময় পাগল কিশোরের হাতেই তার স্ত্রী আক্রান্ত হয় এবং গ্রামবাসীরা কিশোরকে প্রচণ্ড প্রহার করে। এতে প্রায় একসঙ্গেই দু'জনে মারা যায়।

এই উপন্যাসের মালোরা কৃষ্ণমন্ত্রী হলেও তারা ধুমধাম করে কালীপূজা করেছে। গোকর্ণঘাটের সেই কালীপূজার রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুনের সুন্দর বিবরণ আছে — ''যে কালীপূজা হইবে, তাতে কালোর-মা, অনন্তর মা আর বৃন্দার-মা সংযমী থাকিবে। সংযমী যারা থাকে তারা আগের দিন নিরামিষ খায়। পূজার দিন প্রাতঃস্নান করে। পূজার জল তোলে, ফুল বাছাই করে, ভোগ নৈবেদ্য সাজায় আর ফুলের মালা গলায় নামাবলী গায়ে যে পুরোহিত পূজায় বসে তার নির্দেশ মতো নানা দ্রব্য আগাইয়া দেয় এবং প্রতিমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত নানা কাজ করে। কম

গৌরবের কথা নয়। অর্ধেক পূজা তারাই সমাধা করে। পুরোহিত তো কেবল মন্ত্রের জোরে।''[১২৬] এই কালীপূজা উপলক্ষে মালোপাড়ায় গান-বাজনার ধুম পড়ে। মালোরা রাতের পর রাত জেগে যাত্রাগান শোনে। এইসময় তারা গানবাজনা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও খাওয়া-দাওয়ার ধুম করে উত্তরায়ণ সংস্কৃতির দিনে। সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — ''. . . খাওয়া-দাওয়ার জন্য খরচ করে এই উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে। এই দিন পৌষ মাসের শেষ। পাঁচ ছদিন আগে থেকেই ঘরে ঘরেই গুড়ি-কোটার ধুম পড়ে। মুড়ি ভাজিয়া ছাতু কুটিবার তোড়জোড় লাগে। চাউলের গুড়ি রোদে শুখাইয়া খোলাতে টালিয়া পিঠার জন্য তৈরি করিয়া রাখে। পরবের আগের দিন সারারাত জাগিয়া মেয়েরা পিঠা বানায়। পিঠা রকমে যেমন বিচিত্র, সংখ্যায়ও তেমনি প্রচুর। পরের দিন সকাল হইতে লাগে খাওয়ার ধুম। নারী পুরুষ ছেলে বুড়া অতি প্রত্যুষে জাগিয়া তিতাসের ঘাটে গিয়া স্নান করে। যারা জলে যায় তারাও নৌকায় উঠিবার আগে গামছা পরিয়া ডুব দেয়। ঠক্ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকায় মাছ ধরার কাজে সুবিধা হয় না। দুত্তোর, পরবের দিনে কীসের মাছ ধরা, এই বলিয়া দুই চার খেউ দিয়াই জাল খুলিয়া ফেলে। ঘরে থাকিয়া নারীরা আর ঘাটে যাইয়া ছেলেপিলেরা নদীর উপর চোখ মেলিয়া রাখে, কার নৌকা কত সকালে আসিয়া ভিড়ে। যারা যত সকালে আসিবে তারা তত সকালে খাইবে। এবং যত সকালে আসিয়া খাওয়া শেষ করিবে গ্রামের নগরকীর্তনও তত সকালে আরম্ভ হইবে। সারাটা গ্রাম ঘুরিয়া কীর্তন করার জন্য সকলের আগে বাহির হয় মালোপাড়ার দল। সাহাপাড়া আর যোগীপাড়া হইতেও দেখাদেখি দল বাহির হয়। কিন্তু মালোদের মত কীর্তনে অত জৌলুস হয় না। তারা কীর্তন করে ঝিমাইয়া আর মালোরা করে নাচিয়া কুঁদিয়া লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া। তাই কদমা বাতাসাও ধরিতে পারে তারাই বেশি। সে যে কি আনন্দের! সে সময় পুরুষেরা কীর্তন করিয়া বাড়ি বাড়ি লুট ধরিতে যায় আর মেয়েরা ঘরে বসিয়া নানা উপকরণের পঞ্চান্ন-ব্যঞ্জন রান্না করে।''[১২৭]

মনসাপূজা মালোপাড়ার অন্যতম আকর্ষণের মধ্যে পড়ে। এজন্য সমগ্র শ্রাবণ মাস জুড়েই মালোপাড়ায় পদ্মাপুরাণ গান গাওয়া হয় — ''শ্রাবণ মাস রোজই রাত্রে পদ্মাপুরাণ গান হয়। বনমালী রাতের জালে আর যায় না। দিনের জালে যায়। আর রাত হইলে বাড়ি বাড়ি পদ্মাপুরাণ গান গায়। এক এক রাতে এক এক বাড়িতে

আসর বসে।''[১২৮] শ্রাবণ মাস শেষ হলে পদ্মাপুরাণ গাওয়াও শেষ হয় এবং ঘরে ঘরে মনসা পূজার আয়োজন করা হয়। এই মনসাপূজার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 'জালা-বিয়া'। এখানে মালোপাড়ার মনসাপূজা ও 'জালা-বিয়া'র সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় — ''শ্রাবণ মাস শেষ হইয়াছে, পদ্মাপুরাণ পড়া শেষ হইল। ঘরে ঘরে মনসা পূজার আয়োজন করিয়াছে। আর করিয়াছে 'জালা-বিয়া'র আয়োজন। বেহুলাসতী মরা লীখন্দরকে লইয়া পুরীর বাহির হইবার সময় শাশুড়ী ও জা'দিগকে কতকগুলি সিদ্ধ ধান দিয়া বলিয়াছিল, আমার স্বামী যেদিন বাঁচিয়া উঠিবে, এই ধানগুলিতে সেদিন চারা বাহির হইবে। চারা তাতে যথাকালেই বাহির হইয়াছিল। এই ইতিহাস পুরাণ-রচয়িতার অজানা হইলেও মালোপাড়ার মেয়েদের অজানা নাই। তাই বেহুলার এয়োস্তালির স্মারকচিহ্নরূপে মনসা পূজার দিন এক অভিনব বিবাহের আয়োজন করে। ধানের চারা বা জালা এর প্রধান উপকরণ। তাই এর নাম জালা-বিয়া। এক মেয়ে বরের মত সোজা হইয়া চৌকিতে দাঁড়ায়, আরেক মেয়ে কনের মত সাতবার তাকে প্রদক্ষিণ করে, দীপদানির মত একখানি পাত্রে ধানের চারাগুলি রাখিয়া বরের মুখের কাছে নিয়া প্রতিবার নিছিয়া-পুঁছিয়া লয়। এইভাবে জোড়ায় জোড়ায় নারীদের মধ্যে বিবাহ হইতে থাকে আর একদল নারী গাহিয়া চলে।''[১২৯]

মালোপাড়ার বিবাহ প্রসঙ্গও অন্যরকম — ''এ-পাড়ায় কুমারীরা কোনকালে অরক্ষণীয়া হয় না। তাদের বুকের উপর ঢেউ জাগিবার আগে, মন যখন থাকে খেলার খেয়ালে রঙিন, তখনই একদিন ঢোল সানাই বাজাইয়া তাদের বিবাহ হইয়া যায়।''[১৩০] এক্ষেত্রে যেমন ধুম-ধাম করে শাস্ত্রমতে সামাজিক বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়, তেমনি মালাবদল করে গান্ধর্ব বিয়েরও ব্যবস্থা হয়। শুকদেবপুরের প্রবাস জীবনে কিশোরের এইরকম গান্ধর্ব বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল সেখানকার মোড়ল গিন্নি — ''মোড়ল গিন্নির হাতে দুইটি ফুলের মালা। একটি কিশোরের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, 'শাস্ত্র মতে বিয়া কইর দেশে গিয়া। অখন মালা বদল কইরা রাখ।' মালাবদল হইয়া গেলে মোড়ল-গিন্নি ঘরের বাহির হইয়া শিকল তুলিয়া দিল।''[১৩১] হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীদের মত মালো নারীরাও নিজেদের স্বামী-শ্বশুরের নাম উচ্চারণ করে না। তাই শ্বশুরের নাম পাণ্ডব হওয়ায় আমরা জনৈকা নারীকে

'পান'কে 'বটপাতা' বলতে শুনি — ''কি দেখ্‌ছ মা, অপাক হইয়া? আমি খুব বেশি বটপাতা খাই? না? আমি আর কত খাই? আমার শাশুড়ি-এ যা বটপাতা খাইত।''[১৩২]

এভাবে এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক মালোদের আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরেছেন। তবে এই মালো-সংস্কৃতি চিরস্থায়ী হয় নি — কালের অনিবার্য গ্রাসে খুব শীঘ্রই অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়েছে। মালো সন্তান অদ্বৈত তাঁর এই উপন্যাসের শেষ ভাগে সেই অবলুপ্তির করুণ ছবিও এঁকেছেন। প্রথমে তিনি এই সংস্কৃতির প্রশংসা করে লিখেছেন — ''মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্য অন্যান্য মাল-মসলায় যে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায় পার্বণে, হাসি-ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতর প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। কারণ মালোদের সাহিত্য উপভোগ আর সকলের চাইতে স্বতন্ত্র।''[১৩৩] এই সংস্কৃতি ততদিনই মালোপাড়ায় বিরাজ করেছিল, যতদিন তিতাসে দু'কূলপ্লাবী জল ছিল এবং সেই জলে প্রচুর মাছ ছিল। তিতাসের উপর চর পড়ে জল শুকিয়ে গেলে মালোদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংস্কৃতিও বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। সেইসঙ্গে এসময় সে অঞ্চলে মূল ভূ-খণ্ডের কৃষিজীবী মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংস্কৃতিও হানা দেয়। ফলে মালোরাও এই চটুল সংস্কৃতিকে নিজেদের জীবনে গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। মালোদের এই সংস্কৃতি ধরে রাখতে না পারার পেছনে ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজের হতাশাকে প্রকাশ করেছেন — ''তাদের ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল। তাদের নিজস্ব একটা সামাজিক নীতির বন্ধন ছিল, সেইটিও ক্রমে ক্রমে শ্লথ হইয়া আলগা হইয়া গেল।''[১৩৪] এইসময় কিশোরের বাবা বৃদ্ধ রামকেশব একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করে বলেছে — ''উপরওয়ালা ফেলিয়াছে চৌদ্দ-সান্‌কির তলায়, কাঁদিয়া কি করিব।''[১৩৫] একথা নিছক রামকেশবের কথা বলে মনে হয় না, এই উক্তি সে সময়কার প্রত্যেকটি মালোর হৃদয় নিঃসারিত যন্ত্রণার কথা বলেই প্রতিভাত হয়। যাই হোক, শেষপর্যন্ত

কালের পলি এসে তিতাসে চর ফেলে দেয়। মালোদের জীবন-জীবিকারও আর উপায় থাকে না। নিজেদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে তারাও যেন হারিয়ে যায়। সে অঞ্চলে দু'কূল ভরা তিতাসের পরিবর্তে সবুজ-শ্যামল শস্যখেত নজরে আসে — ''দুই পারের চাষাদের গ্রামগুলি তেমনই সবুজ। কিন্তু মালোদের পাড়াগুলি যখনই চোখে পড়িতেছে, তখনই বুক টনটন করিয়া উঠিতেছে। গাছ-গাছালি আছে, কিছুদিন আগে যেখানে যেখানে ঘর ছিল তার অনেকই এখন খালি-ভিটা। ঘাটে আগে সারি সারি নৌকা ছিল, এখন আর নাই। মাঝে মাঝে দুই একটা কেবল বাঁধা রহিয়াছে। যেখানে তারা জাল শুখাইত, এখন সেখানে গরু চরিতেছে। ঘরগুলি কোথায় লুকাইয়াছে, ভিটাগুলি ভগ্ন।''[১৩৬] আর উপন্যাসের শেষে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে জানিয়েছেন — ''সে মালোপাড়া আর নাই। শূন্য ভিটাগুলিতে গাছ-গাছড়া হইয়াছে। তাতে বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝি বা নিঃশ্বাস ফেলে।''[১৩৭] এভাবে এই উপন্যাসে একটা অঞ্চলের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির বিস্তারিত পরিচয় ও তার অবলুপ্তির ছবি আঁকা রয়েছে। মালো সংস্কৃতির এই ছবি উপন্যাসটির আঞ্চলিকতা ধর্মকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষজনের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, যোগাযোগ ব্যবস্থার মত বিষয়গুলির প্রয়োজনানুযায়ী বিবরণ দিয়েছেন। তিতাস নদী নির্ভর মৎস্যজীবী মানুষগুলি বেশির ভাগই অত্যন্ত গরিব। নদীর উপর মাছ ধরেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তাই এদের খাদ্যতালিকায় খুব একটা উৎকৃষ্টমানের খাবার থাকে না। তবে এরা সাধারণ খাবার খেলেও মাছ এদের খাদ্য তালিকায় প্রায় সবসময় থাকে। তবে বড় মাছ খাওয়া এদের কপালে খুব একটা জোটে না — ''কিশোরেরা ছোট মাছের জেলে। বড় মাছ একটা মুখে পড়ে না, কেন না এ সব মাছ তারা ধরিতে পারে না। কোনোদিন কোনো বড় মাছ পথ ভুলিয়া তাদের জালে আসিয়া পড়িলেও পয়সার জন্য বেচিয়া ফেলিতে হয়।''[১৩৮] অবশ্য উৎসবের দিনগুলিতে এদের খাদ্যতালিকায় ব্যতিক্রম ঘটে এবং এরা বিভিন্ন ধরনের উৎকৃষ্ট মানের খাবার-দাবার খেয়ে আনন্দ-ফূর্তি করে। মালো নারীদের মধ্যে পান খাওয়ার চল ভালোই দেখতে পাওয়া যায়।

পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও মালোদের অত্যন্ত সাধারণ মানের পোষাকের কথা এই উপন্যাসে আছে। মেয়েরা সাধারণ মানের শাড়ি পরে থাকে। পুরুষেরা ধুতি পরলেও সঙ্গে একটা গামছা রাখে। মালোদের বাড়িঘরের ক্ষেত্রেও তেমন বৈচিত্র্য থাকে না — বাঁশ, মাটি দিয়ে এগুলি তৈরি করা হয়। নদী তীরে হওয়ার কারণে এসব ঘর-বাড়ি বন্যায় ভেঙেও যায়। এদের যোগাযোগের সর্বপ্রধান মাধ্যম হল নৌকা। নৌকায় করে তারা মাছ ধরে, একদেশ থেকে অন্যদেশে যায়।

এই উপন্যাসটি অদ্বৈত মল্লবর্মণ সাধুভাষায় রচনা করলেও চরিত্রদের সংলাপে স্থানীয় আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করেছেন। এরূপ কিছু সংলাপের দৃষ্টান্ত হল —

কিশোরের সংলাপ :

১। ''বা'র গাঙ্ দিয়া ধর্‌ত সুব্‌লা। খালি বালু দেখতে আর ভাল লাগে না। ধর্ কোনাকুনি ধর্। পার বাইবি ত অই পার দিয়া ধর্। এই পারে কিচ্ছু নাই।''[১৩৯]

২। ''নারে সুব্‌লা, আমার মন যেমন কয়, কথাখান ঠিক না। যারে লেংটা থাইক্যা দেখতাছি — ছোটকালে যারে কোলে পিঠে লইছি — হাসাইছি, কাঁদাইছি, ডর দেখাইছি, ভেউরা বানাইয়া দিছি — তারে কি বিয়ে করন যায়! বিয়া যায় তারে, যার লগে কোনকালে দেখাসাক্ষাৎ নাই। দেখাসাক্ষাৎ খালি মুখাচন্ডীর সময় — গীত-জোকারের লগে পিড়ির উপর শাড়ীর ঘোমটা তুইল্যা যখন চোখ মেইল্যা চায় — সে হয় সত্যের স্তিরি। আর সগল তো ভইন।''[১৪০]

বাসন্তীর সংলাপ :

১। ''মা, ওমা দেখো সুবলদাদা কিশোর দাদার কান্ড আমি চৌয়ারি ছাড়তে-না-ছাড়তে তারা দুইজনে ধরতে গিয়া কি কাইজ্যা। এ কয় আমি নিমু, সে কয় আমি নিমু। ডরে আর কেউ কাছেও গেল না। শেষে কি মারামারি! আমি কইলাম দুইজনে মিল্যা বানাইছ, দুইজনেই নিয়া রাইখ্যা দেও। মারামারি কর কেনে? শুইন্যা কিশোর দাদা ভালমানুষের মত ছাইড়া দিল। আর সুবলদাদা করল কি — মাগ্‌গো মা, দুই হাতে মাথাত্ তুইল্যা দৌড়!''[১৪১]

সুবলের মার সংলাপ :

১। ''এমন টুলাইন্যা গিরস্তি কত দিন চালাইবা! নাও করবা জাল করবা, সাউকারি কইরা সংসার চালাইবা! এই কথা আমার বাপের কাছে তিন সত্য কইরা তবে ত আমারে বিয়া করতে পার্‌ছ। স্মরণ হয় না কেনে?''[১৪২]

তিলকের সংলাপ :

১। ''হ শিক্ষিৎ হইলে শাদি-সম্বন্ধ কর্‌ব কি না। আরে সুব্‌লা, তুই বুঝ্‌বি কি! তারা মুখে মিঠা দেখায়, চোখ রাখে মাইয়া-লোকের উপর।''[১৪৩]

২। ''খলাতে দোল-পূর্ণিমায় খুব আরব্ধা হয়। মাইয়া লোকে করতাল বাজাইয়া যা নাচে। নাচেত না, যেন পরীর মত নিত্য করে। পায়ে ঘুঙ্‌রা, হাতে রাম-করতাল। এ নাচ যে না দেখ্‌ছে মায়ের গর্ভে রইছে।''[১০৯]

বাঁশিরাম মোড়লের সংলাপ :

১। ''তুমি আমরে শিব ঠাকুর বানাইলা। না জাল্লা, তুমি আমারে বুড়া শিব বানাইলা, আমার গৌরী বড় ভালো, তারে আবার নাচাইও না। আর, আমরা ত শিবমন্ত্রী না, আম্‌রা কিষ্ণমন্ত্রী। তোমারা কোন্ দেশের দেশী!''[১৪৫]

সমগ্র 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে এরূপ অজস্র সংলাপ আছে। আসলে ঔপন্যাসিক নিজে সে অঞ্চলের লোক হওয়ায় সেখানকার অনেককিছুর সঙ্গে এই আঞ্চলিক উপভাষাটি খুব ভালো জানতেন। উপন্যাসটির আলোচনায় সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন — ''সঙ্গত হয় যদি বলি, এটি লেখকের আত্মজনদের জীবনীমূলক, তিতাসপারের মালোগোষ্ঠীর জীবনীমূলক। . . . এতখানি নিবিড় আত্ম-আভিজ্ঞতা, নিবিড় বাস্তবতা বাংলা উপন্যাসে কমই মিলবে। তিতাস-তীরের কয়েকটি গ্রামের গোটা মালোসমাজ তাদের অকিঞ্চিতকর জীবন-যাপন নিয়ে করুণ বাঁচার লড়াই নিয়ে, ছোট ছোট সুখ-দুঃখ নিয়ে এই উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।''[১৪৬] এই বক্তব্যটি যে উপন্যাসটির আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়াও ঔপন্যাসিক সে অঞ্চলের জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত কিছু গানেরও প্রয়োগ এই উপন্যাসে করেছেন। এসব গানের কয়েকটি নীচে উদ্ধৃত করা হল —

১। ''সখি ঐ ত ফুলের পালঙ রইলো,
কই কালাচাঁদ আইলো।''[১৪৭]

২। ''উত্তরের জমিনেরে সোনা-বন্ধু হাল চষে,
লাঙ্গলে বাজিয়া উঠে খুয়া।
দক্ষিণা মলয়ার বায় চান্দমুখ শুখাইয়া যায়
কার ঠাঁই পাঠাইব পান গুয়া।''[১৪৮]

৩। ''সুখ-বসন্তকালে ডেকোনারে
অরে কোকিল বলি তুমারে।।...''[১৪৯]

৪। ''বসন্তকালে এলরে মদন —
ঘরে রয় না আমার মন।। ...''[১৫০]

৫। ''এলাহির দরিয়ার মাঝে নিরাঞ্জনের খেলা,
শিল পাথর ভাসিয়া গেল শুক্‌নায় ডুবল ভেলা।...''[১৫১]

৬। ''আরদিন উঠেরে চন্দ্র পূবে আর পশ্চিমে।
আজোকা উঠ্‌ছেরে চন্দ্র শানের বান্ধান ঘাটে।''[১৫২]

৭। ''মা যে-মতি চায় সে-মতি কর, কে তোমার দোষে,
বল মা কোথায় যাই দাঁড়াইবার স্থান নাই,
আমারে দেখিয়া সাগর শোষে,
মা, আমারে দেখিয়া সাগর শোষে।''[১৫৩]

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটিকে অনেকেই বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক উপন্যাস বলে মত দিয়েছেন। যেমন অলোক রায়ের 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থের 'আঞ্চলিক উপন্যাস' রচনায় দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়েকটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের সঙ্গে এই

উপন্যাসটিকেও আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন — ''মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ুরাক্ষী', 'গৃহকপোতী', ও 'সোমলতা', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (চারটি খণ্ড), সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী' ও 'কেয়াপাতার নৌকো' (দুই পর্ব), সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' প্রভৃতি কয়েকটা ব্যাপক অর্থে আঞ্চলিক উপন্যাস। . . . কুমিল্লা জেলার তিতাস নামে এক অখ্যাত নদীতীরের বাসিন্দা মালোদের জীবনকথা চারখণ্ডে সমাপ্ত 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ চিত্রিত।''[১৫৪] আর অধ্যাপক-সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'র সঙ্গে এই উপন্যাসটিকেও সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন — ''সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস। 'পদ্মানদীর মাঝি'র মতই 'তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে মানুষের জীবন নদীসূত্রে অদৃষ্টের সঙ্গে গ্রথিত। . . . আঞ্চলিক উপন্যাসের সব শর্ত এ দুটিতে পালিত। দুটিতেই জীবনবোধের বিস্তার ঘটেছে। মালো-গোষ্ঠীর জীবন তিতাস নদীর মতোই মন্থর গতি, তারই সমান্তরালে বয়ে চলেছে। তিতাস নদী-প্রকৃতি মালোদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে।''[১৫৫]

উপরের এই বিস্তৃত আলোচনার প্রেক্ষিতে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়েছে যে, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় শুরুতেই রচিত অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের আঞ্চলিকতার অনেকগুলি লক্ষণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আঞ্চলিকতার এই লক্ষণগুলির কারণেই উপন্যাসটিকে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

সমরেশ বসুর **'গঙ্গা'** (১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা সাহিত্যের একটি অত্যন্ত আলোচিত উপন্যাস। দক্ষিণবঙ্গের গঙ্গার উপর জীবিকা নির্বাহকারী মাছমারাদের জীবন পরিক্রমা সম্পর্কে রচিত এই উপন্যাসটির পরিচয় দিতে অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ জানিয়েছেন — ''গঙ্গা সমরেশ বসু লিখিত উপন্যাস। দক্ষিনবঙ্গের নদীনালা এবং মৎস্যজীবী মানুষের সুখদুঃখ জীবনযাপনের সংগ্রাম, প্রকৃতির কঠোরতা এবং সামাজিক জীবনের বৈষম্য নিয়ে স্থির, নিশ্চিত মধ্যবিত্ত জীবনের নিরাপত্তার এক বিপরীত

আখ্যান। এর একদিকে আছে মৃত্যু ও অস্তিত্বের সংগ্রামের এক মানবিক উপলব্ধি। গঙ্গা সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।''[১৫৬] অধ্যাপক দাশের এই উক্তিটির মধ্যেই উপন্যাসটির আঞ্চলিক সীমা-সংহতির বিষয়টি ধরা পড়েছে। তবে 'গঙ্গা' উপন্যাসটি যে অনেকাংশেই আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে রচিত তা অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এ সম্পর্কে প্রথমেই সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করতে হয়। তিনি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসগুলি সম্পর্কে আলোচনাকালে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর সঙ্গে এই উপন্যাসটিরও আঞ্চলিক লক্ষণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন — ''তিনটি উপন্যাসেই লেখকদের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যক্তিগত সাহস অভিজ্ঞতার প্রসারিত রূপের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনজনেই ধৃত বিষয়কে এমনভাবে নিঃশেষে ব্যবহার করেছেন যে পাঠান্তে পাঠকের মনে এই ফলশ্রুতির উদয় হয় — এর বেশি কিছু এ-জীবন সম্বন্ধে আমরা আর জানতে পারতাম না।''[১৫৭] বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সমালোচকেরাও আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে 'গঙ্গা' উপন্যাসটির সপক্ষে নিজেদের মতামত প্রদান করেছেন। তাই অধ্যাপক অলোক রায়ের 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থের 'আঞ্চলিক উপন্যাস' শীর্ষক আলোচনায় অন্যান্য উপন্যাসের সঙ্গে এই উপন্যাসটিকেও স্থান পেতে দেখা যায় — ''. . . সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী' ও 'কেয়াপাতার নৌকো' (দুই খণ্ড), সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া প্রভৃতি কতকটা ব্যাপক অর্থে আঞ্চলিক উপন্যাস।''[১৫৮] অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যও এইসময়ে রচিত বেশ কয়েকটি উপন্যাসের মত 'গঙ্গা' উপন্যাসটিতে যে 'আঞ্চলিক জীবন' প্রাধান্য পেয়েছে সেকথা মেনে নিয়েছেন — ''এ পর্যায়ে আরেকটি ধারা বাংলা উপন্যাসে, নিজেকে দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করেছে — 'আঞ্চলিক জীবন'। সংক্ষেপে বলা যায় . . . সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রভৃতি উপন্যাস।''[১৫৯] সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসটিকে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের সঙ্গে একত্রে বাংলা সাহিত্যের একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে এই উপন্যাস দু'টিতে আঞ্চলিক উপন্যাসের সব শর্ত পালিত হয়েছে — ''সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' সার্থক আঞ্চলিক

উপন্যাস। . . . 'গঙ্গা'য় মূল চেতনা নদীর প্রতিকূলতার সঙ্গে জড়িত মৃত্যুবোধ। আঞ্চলিক উপন্যাসের সব শর্ত এ দু'টিতে পালিত।''[১৬০] সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক জীবনকে পটভূমি করে রচিত তিনটি বাংলা উপন্যাসের নাম করতে গিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির সঙ্গে সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসটিরও নাম করেছেন — ''আঞ্চলিক জীবন এবং প্রায়ই অন্ত্যজ জীবন অথবা পরিচিত শ্রমজীবীজীবনকে অবলম্বন করে নবীন লেখকদের হাতে যে ক'টি উপন্যাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে আলোচনার যোগ্য বা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস তিনটি — সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'।''[১৬১] এই উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন — ''গ্রামের দিকে, গ্রামের বিশেষ বর্ণাশ্রিত গোষ্ঠীর দিকে সমরেশের দৃষ্টি পড়ল প্রথম গঙ্গা (১৯৫৭) উপন্যাসে। পুরোনো ধারা ছেড়ে গঙ্গাতে সমরেশ একটি নতুন ধারার দিকে আকৃষ্ট হলেন।''[১৬২] বলা বাহুল্য, এই 'নতুন ধারা' হল আঞ্চলিক উপন্যাসের ধারা। তিনি উপন্যাসটি সম্পর্কে আরও জানিয়েছেন — ''গঙ্গা পল্লীজীবনের কাহিনী, কিন্তু যে-কোনো পল্লীবাসীর কাহিনী নয়। গঙ্গা হল দক্ষিণ বঙ্গের একটি বিশেষ এলাকার — গঙ্গাতীরবর্তী ধীবরদের কাহিনী।''[১৬৩] সমালোচকদের এই সমস্ত উক্তি থেকে এই উপন্যাসটি একটি আঞ্চলিক উপন্যাস বলেই মনে হয়। তবে 'গঙ্গা' উপন্যাসটি আঞ্চলিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণের পূর্বে এর কাহিনি অংশ সম্পর্কে কিছু জানতে হয়।

সমরেশ বসু উপন্যাসটি বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। এই উপন্যাসটির পটভূমি হিসেবে তিনি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার মাছমারাদের জীবনকে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসটি অনেকটাই তাঁর অভিজ্ঞতার ফসল। তাই উপন্যাসটির ভূমিকাতে তিনি জানিয়েছেন — ''আতপুরের মালোপাড়ার কার্তিক দাস, পরেশ দাস এবং হালিশহরের নিমাই অধিকারী ও তাঁর পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এঁদের সঙ্গে অনেক দিন ও রাত্রি আমার কেটেছে গঙ্গার বুকে। এঁদের সাহায্য ছাড়া 'গঙ্গা' রচনা সম্ভব ছিল না।''[১৬৪] এছাড়াও মৌসুমী প্রকাশনী প্রকাশিত 'গঙ্গা' উপন্যাসটিতে 'গঙ্গা' : একটি সমীক্ষণ' নাম দিয়ে

অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রবন্ধ আকারে যে অংশটি লিখেছেন, সেখানেও ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতার বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। যাই হোক, এই উপনাসে গঙ্গার বুকে 'মাছমারা'দের জীবনের অত্যন্ত বাস্তব ছবি প্রকাশ পেয়েছে।

উপন্যাসটির শেষের কিছু অংশ বাদ দিলে প্রায় সমস্তটাই উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পেশায় 'মাছমারা' পাঁচুর অভিজ্ঞতার বিবরণ, সে-ই যেন উপন্যাসের কথক। পাঁচু একজন সাধারণ 'মাছমারা'। তার দাদা নিবারণ ছিল সাঁইদার অর্থাৎ সে অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ 'মাছমারা'। পাঁচু সমুদ্রে যেতে ভয় পায়। কারণ দুজনের স্ত্রী গর্ভবতী থাকা অবস্থায় পাঁচু তার দাদা নিবারণ সাঁইদারকে সমুদ্রের বুকে বিসর্জন দিয়ে এসছিল। দাদার মৃত্যুর পর তার মাছ ধরার সঙ্গী হয় নিবারণ সাঁইদারের ছেলে বিলাস। গ্রামে তিনজন বিলাস থাকায় এবং তেঁতুলতলায় তাদের বাড়ি হওয়ায় সে 'তেঁতলে বিলাস' হিসেবে পরিচিত হয়। বিলাস বাপের মতই জোয়ান। গ্রাম্য প্রতিযোগিতায় সমস্ত বীরদের হারিয়ে বিলাস সে এলাকার 'বাছাড়' নির্বাচিত হয়। এজন্য অপর মাছমারা প্রাক্তন 'বাছাড়' কদ্‌মে পাঁচুর সঙ্গে শত্রুতাও শুরু হয়। একটু গম্ভীর, স্পষ্টভাষী, রগচটা, ষণ্ডামার্কা, গোঁয়ার প্রকৃতির জোয়ান বিলাসকে সামলানো পাঁচুর ক্ষমতায় নেই। এই বিলাস নদীর বুকে মাছ ধরলেও দু'চোখে বাপের মত সমুদ্রের সাঁইদার হওয়ার স্বপ্ন দেখে — অকূলে ভেসে যেতে চায়। আষাঢ় থেকে আশ্বিন — বছরের এই চারমাস গঙ্গায় মাছ ধরে আয়-উপার্জন করে বাকি দিনগুলি ধার-বাকিতে কোনরকমে চালিয়ে নিয়ে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করে এদের জীবন অতিবাহিত হয়। এইরকম একবার গঙ্গা নদীতে মাছধরার মরসুম শুরু হলে সে অঞ্চলের সমস্ত 'মাছমারা'দের মত পাঁচুও বিলাসকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকদিনের খোরাকি সহ মাছ ধরে আয়-উপার্জনের আশায় নদীর বুকে পাড়ি দেয়। এরপর একের পর এক অঞ্চল পেরিয়ে তারা ভাসতে ভাসতে চন্দননগরে এসে আস্তানা করে। এখানেই উপন্যাসের বেশিরভাগ ঘটনা ঘটেছে। নদীর বুকে নৌকার উপরেই এদের দিন কেটেছে। চন্দননগরের মাছবাজারের একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী ফড়েনি ছিল দামিনী। উপন্যাসে অবশ্য তাকে তেজ ও ক্ষমতা হারানো বৃদ্ধারূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এই দামিনী ফড়েনি নিবারণ সাঁইদারের সঙ্গে ব্যবসা করেছে, সম্ভবত নিবারণের প্রতি তার দুর্বলতাও ছিল। দামিনীর মেয়ে বিধবা হওয়ার পর স্বৈরিণী

হয়েছিল। তার মেয়ে হল হিমি। উপন্যাসে সে ফড়েনি রূপে চিত্রিত। এরাই মাছ বিক্রির ক্ষেত্রে পাঁচুর মহাজন। গ্রামের আর একজন মহাজন হল পালমশাই, বছরের অন্যান্য অভাবের দিনে ধারে, নৌকা বন্ধক রেখে সে সমস্ত 'মাছমারা'দের চালায়।

যাই হোক, মাছ মারতে এসেই বিলাস দামিনীর নাতনি হিমির প্রতি আকৃষ্ট হয়; হিমিও বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের মধ্যে একটা মানসিক সম্পর্কও তৈরি হয়, অচিরেই যা শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ায়। তবে 'মাছমারা'র সঙ্গে ফড়েনির এই সম্পর্ক বিলাসের কাকা পাঁচু প্রথমে মেনে নিতে পারে নি। ইতিমধ্যে মাসখানেক গঙ্গায় মাছ না মেলায় সাময়িক 'টোটা' অর্থাৎ মন্বন্তর দেখা দেয়। এইসময় বিলাসের কাকা পাঁচু আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তবে মৃত্যুর পাঁচু বিলাসকে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার কথা বলে যায়; সেইসঙ্গ সে আরও বলে যায় যে, দামিনীর নাতনির মনটা 'পোস্কার'। তাই বিলাস যেন তাকে নিয়ে ঘর করে। পাঁচুর মৃত্যুর পর বিলাসের একান্ত সুহৃদ অত্যন্ত গরিব সয়ারাম গঙ্গার বুকে দাদা দণ্ডারামকে হারিয়ে বিলাসের সঙ্গী হয়। টোটা কেটে গেলে সবার জালেই প্রচুর মাছ ওঠায় তাদের আয়-উপার্জন ভালোই হয়। বিলাস সয়ারামকে টাকা-পয়সা দিয়ে বাড়ি পাঠালেও হিমির অনুরোধে কার্তিক মাসের চাকুন্দে মাকুন্দে খয়রার মরসুম পর্যন্ত থেকে যায়। হিমিও বিলাসের সঙ্গে 'অকূলে ভেসে যেতে' প্রস্তুত। এইসময়কালে সে অঞ্চলে 'সাজভাটা' উৎসব হয়। ইতিমধ্যে সয়ারাম ফিরে আসলে নির্দিষ্ট দিনে বিলাস, হিমি ও সয়ারাম তাদের গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তবে হিমি শেষপর্যন্ত বিলাসের সঙ্গে যায় না; বাগবাজারের কাছে এসে সে 'আমি এতটুকু পাণী, তোমার অকূলে আমি বেড় পাব না' বলে বিলাসের কাছে থকে চোখের জলে বিদায় নেয়। এরপর উপন্যাসের শেষ দেখা যায় — ''বেতনা নদীতে কালীনগরের গঞ্জের ভেড়িতে শাবর করেছে আঠারো গণ্ডা নৌকা। মাছমারাদের নৌকা, সাঁই নিয়ে সমুদ্রে যায় তারা। অগ্রহায়ণ পড়ে গেছে। উত্তরে বাতাস বয়। পালে হাওয়া লেগে গেছে, ডাক দিয়েছে সমুদ্র। ঢেউ লেগেছে রাইমঙ্গল আর ঝিল্লের মোহনায়। কালীনগর গঞ্জ থেকে চাল ডাল নুন তেল যোগাড়যন্ত্র হয়েছে, সাঁইদারের অপেক্ষা।

— সাঁইদার কে?

— বিলেশ। তেঁতলে বিলেস।

তেঁতলে বিলেশ সমুদ্রে যায়।''[১৬৫] — এখানেই উপন্যাসের শেষ।

এই উপন্যাসটির কাহিনি অংশের ঘটনাবলি কোন একটি জায়গায় ঘটেনি। উত্তর চব্বিশ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে শুরু করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ও হুগলী জেলার অনেক অঞ্চলই এই উপন্যাসে ধরা পড়েছে। এখানে যে স্থানগুলির নাম পাওয়া যায়, সেগুলি হল — ধলতিতা, পুরোখোঁড়গাছি, তেঁতুলিয়া, সারাপুল, ফতুল্লোপুর, ফরিদকাঠি, বীরপুর, পুঁড়্যা, আতুড়ে, ইটিণ্ডে, দণ্ডিরহাট, শাঁখচূড়া, টাকি, সন্দেশখালি, হাঁসনাবাদ, মিনাখাঁ, কুলটি, ডায়মণ্ডহারবার, বারাকপুর-বরানগর, চন্দননগর-জগদ্দল, হুগলী-নৈহাটি, ত্রিবেণী, বসিরহাট, গোপালনগর, মোল্লাহাট, গরিবপুর, রাণাঘাট, বনগাঁ, দক্ষিণেশ্বর, কামারহাটি, খড়দহ, নবাবগঞ্জ, শ্যামনগর, জগদ্দল, হালিশহর, ত্রিবেণী, টিটাগড় প্রভৃতি। আসলে উপন্যাসটির সমস্ত ঘটনা নদীবক্ষেই ঘটেছে। তাই নিম্নগতিতে গঙ্গা যে সমস্ত স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, এখানে সেসব স্থানের নাম ঔপন্যাসিক করেছেন। এই উপন্যাসে আষাঢ় থেকে কার্তিক পর্যন্ত মূলত 'মাছমারা'দের একটি মরসুমের জীবন পরিক্রমাকে সরাসরি নিয়ে আসা হয়েছে। মরসুমের শুরুতে নিম্নবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে 'মাছমারা'রা গঙ্গায় মাছ ধরতে আসে। তাই উপন্যাসের শুরুতে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ''আগাম দলের তিনটি নৌকা ভাটার টানে তরতর করে নেমে এল, পুবের কেষ্টপুরের খাল-গেট পেরিয়ে, নোনা বিলের পাশ কাটিয়ে। তিনটি বাছারি নৌকা। এল পুব থেকে। খাড়া পুব থেকে নয়। পুব-দক্ষিণ থেকে। দুটি এল পুরোখোঁড়গাছি থেকে। আর-একটি ধলতিতা গাঁয়ের।

আরো আসছে পেছনে পেছনে। তেঁতুলিয়া, সারাপুল, পুরোখোঁড়গাছি, ফতুল্লাপুর, ফরিদকাঠি, বীরপুর, তাবৎ পুব-উত্তর আর পুব-দক্ষিণ ঠেঙিয়ে আসছে যাবৎ মৎস্যজীবীরা। জেলে কৈবর্ত, নিকিরী, চুনুরী, মালো সবাই আসছে। ওদিককার রাজবংশীরাও কালে কালে মাটি হারিয়ে মৎস্যজীবী হয়েছে। তারাও আসছে।

আরো আসবে। আশেপাশে কাছ-ঘেঁষাঘেঁষি, পুঁড়্যা, আতুড়ে, ইটিণ্ডে, দণ্ডিরহাট, শাঁখচুড়া, টাকি — সবখানে সব মাছমারার ঘরে সাজো-সাজো রব পড়েছে। সবাই আসবে একে একে।''[১৬৬]

এখানেই শেষ নয়, ঔপন্যাসিক আরও লিখেছেন — ''আসছে, সবাই আসছে এদিকে। দিনে রাতে আসছে। চোখ থাকলে, উপরে উঠে একবার পুবে নজর করলেই দেখা যাবে কত আসছে। একে একে, সারি সারি, পাশাপাশি। দক্ষিণের একেবারে নাবাল থেকে পাল তুলে দিয়েছে সবাই জোয়ারের টানে। যে যেখান দিয়ে পারছে, গঙ্গায় আসছে সবাই। গঙ্গার ঘোলা কিন্তু মিঠে জলে। সব মৎস্যজীবীর ভাত-কাপড় যার কাছে আছে বাঁধা।''[১৬৭] আসলে বর্ষার মরসুমে 'মাছমারা'রা কেউ-ই ঘরে বসে থাকে না। এজন্য তারা সদ্য গঠিত সীমান্তের বেড়াজালও মানতে রাজি নয়। তারা সবাই সম্বৎসরের আয়-উপার্জনের নিমিত্তে বেরিয়ে পড়ে — ''গাঁয়ে গাঁয়ে ঘরে ঘরে যাত্রা করার জন্য তৈরি হচ্ছে সব। আজকাল বলে পাকিস্থানের বর্ডার, সেইখান থেকে আসছে সব আসছে এদিকে। না এসে উপায় কি! চিরকাল আসছে, আসবেও।''[১৬৮] এজন্য কোন একটি স্থানের 'মাছমারা'দের কথাই যে উপন্যাসটিতে পরিবেশিত হয়েছে এমন নয়, উপন্যাসটিতে নিম্নবঙ্গের প্রায় সমস্ত নদ-নদীর কথাও স্থান পেয়েছে। উপন্যাসের বেশিরভাগ ঘটনাই গঙ্গার বুকে ঘটলেও গঙ্গা ছাড়াও সেই অঞ্চলের কেষ্টপুরের খাল, ইছামতী, কালিন্দী, রাইমঙ্গল, বিদ্যেধরী, বামনধোপা, ভঙ্গিরকাটা খাল, উল্টোডাঙার খাল বা নিউক্যানেল, বেলেঘাটা খাল, করাচী নদী বা গাপতলা, মাতলা, চূর্ণী, ডানসা, পিয়ালী, ঠাকুরুন প্রভৃতি নদীর নাম ও প্রসঙ্গ এখানে এসেছে।

উপন্যাসটিতে বসিরহাট অঞ্চলের ধলতিতা গ্রামের পাঁচু এবং তার ভাইপো বিলাসের কথা পরিবেশিত হলেও ঔপন্যাসিক এদের কোন নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান নি। তিনি এদের নিম্নবঙ্গের ঐ সমস্ত অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন। তাই অন্যান্য আঞ্চলিক উপন্যাসের মত এই উপন্যাসে ভৌগোলিক দিক থেকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল প্রাধান্য পায় নি; নিম্নবঙ্গের সমগ্র গঙ্গা নদী অঞ্চলই উঠে এসেছে। আর উপন্যাসটির প্রায় সমস্ত ঘটনা যেহেতু গঙ্গার বুকের উপর ঘটেছে এবং সেখানকার 'মাছমারা'দের জীবন কাহিনিকে পরিবেশিত হয়েছে, তাই নিম্নবঙ্গের গঙ্গা নদীই এই উপন্যাসে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত থেকেও বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চলের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উপন্যাসটি অবশ্য নানা সময়ে গঙ্গার প্রকৃতি পরিবর্তনের ছবিও ধরা পড়েছে। এজন্য জালেঙ্গা জল, বরফ জল, নোনা জল, ঘোলা জলের মত গঙ্গায় নানা সময়ে দেখতে পাওয়া জলরাশিরও উল্লেখ করা

হয়েছে। এসবের পাশাপাশি ধলতিতা গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের কথাও এই উপন্যাসে পরিবেশিত হয়েছে। 'মাছমারা'দের গ্রামগুলির প্রতিনিধিত্ব করা এই ধলতিতা গ্রামটিও বাংলা সাহিত্যে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত থেকেও নানা কারণে বিচ্ছিন্ন হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে 'গঙ্গা' উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাসটির প্রথম শর্তটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে পালন করেছে। উপন্যাসটির অঞ্চলগত এই বিস্তৃতির দিকে দৃষ্টি দিয়ে তাই অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব বসু বলেছেন — ''আঞ্চলিক উপন্যাস পাঠকের অজ্ঞাতসারেই পাঠকমনে এক ভৌগোলিক চেতনার সঞ্চার করে থাকে। সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' পড়লে গঙ্গার পার্শ্ববর্তী গ্রামের সম্পর্কে একটু ধারণা হয়।''[১৬৯]

চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক মূলত নিম্নবঙ্গের 'মাছমারা'দের নিয়ে এসেছেন। তবে এদের কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এখানে জেলে, কৈবর্ত, নিকিরী, চুনুরী, মালো, রাজবংশী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষজন আছে। পাশাপাশি মুসলিম 'মাছমারা'দের কথাও এই উপন্যাসে আছে। সমস্ত উপন্যাসে আমরা যে সমস্ত পুরুষদের সঙ্গে পরিচিত হই, তারা হল — পঁচানন দাস (পাঁচু), নিবারণ, বিলাস, কদমে পাঁচু, সয়ারাম, গঙারাম, রসিক, বশীর, পাল মশাই, বোজেন ঠাকুর, দুলাল, রাম মালো, অর্জুন, অনন্ত, সনাতন, সকল মিঞা, নুরুল, আমানুল, পরাণ, সুরেন, শ্রীদাম প্রমুখ। আর নারীরা হল — গামলি পাঁচি, অমর্তের বউ, দামিনী, হিমি, আতরবালা প্রমুখ। উপন্যাসটির নায়ক হল বিলাস। তার বর্ণনায় পাঁচুর দৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ''দাদার বড় ছেলে। নাম বিলেস। তেঁতুলে বিলেস, অর্থাৎ তেঁতুলতলার বিলাস। যেন দ্বিতীয় নিবারণ মালো। এমনি চেহারাখানিই ছিল দাদারও। কালো কুচকুচে রঙ, পেটানো শরীর। নেহাইয়ের মত শক্ত। যেন নিমকাঠের কালো রঙ মাখা চকচকে মুর্তি। নাকটি ছোট। চোখ দুটি ঈষৎ গোল। ভ্রু কুঁচকে মুখ তুলে তাকালে মনে হয়, কেউটে সাপ যেন ফণা ধরে আছে। ভেড়ার লোমের মত কালো কোঁচকানো চুল। যেন জাতসাপের ডিম-ফোটা শলুই কিলবিল করছে মাথায়। হাসলে পরে চোখ ঢেকে যায়। চোখ নেই, নাক নেই, খালি এক মুখ হাসি। সাক্ষাৎ নিবারণ মালো। বনে জঙ্গলে দাঁড়িয়ে থাকলে রঙে রঙে মিশে যায়। গাব-আঠা-মাখানো নৌকার কাঁড়ারে শুয়ে

থাকলে, মানুষ থাকলে টের পাওয়া যায় না। এমন কালো।''[১৭০] এই বিলাস সম্পর্কে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন হল — ''উপন্যাসের নায়ক বিলাস সমরেশ বসুর সাহিত্য-জগতের তো বটেই, পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকের উল্লেখযোগ্য চরিত্রসৃষ্টিগুলির মধ্যে অন্যতম।''[১৭১]

উপন্যাসটিতে এই বিলাস গঙ্গাবক্ষে তো পাড়ি দিয়েছেই, পাশাপাশি সে আজীবন সমুদ্রে পাড়ি দেবার স্বপ্ন দেখেছে এবং উপন্যাসের শেষে সত্যি সত্যি সাঁইদার হয়ে সমুদ্রের উদ্দেশ্য পাড়ি দিয়েছে। উপন্যাসটির নায়িকা হিসেবে অনেকেই হিমির কথা বলে থাকেন। এ বিষয়ে সমালোচকদের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। উপন্যাসে হিমির উপস্থিতি ও ভূমিকা তাকে যথার্থ নায়িকার পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে নি। বরং এই উপন্যাসটির ঠিকমত নায়িকা বাছতে হলে গঙ্গা নদীকেই বেছে নিতে হয়। কারণ উপন্যাসের প্রায় সমস্ত ঘটনাই গঙ্গাবক্ষে ঘটেছে, উপন্যাসটিতে গঙ্গা নদী সমস্ত চরিত্রের উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করেছে, চরিত্ররাও গঙ্গার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম ভেবেছে। তাই 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থে বলা হয়েছে — ''সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনের সঙ্গে গঙ্গার আবর্ত ও জোয়ার-ভাঁটার টানের অনিশ্চয়তা ও বিপদের যোগ আছে।''[১৭২] ফলে গঙ্গা নদী আচেতন বস্তু হয়েও এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এই উপন্যাসে 'মাছমারা'দের জীবন-জীবিকার পূর্ণাঙ্গ ছবি ঔপন্যাসিক এঁকেছেন। এদের জীবনে প্রধান মরসুম হল বর্ষার মরসুম, যা আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর পর শুরু হয়ে আশ্বিন পর্যন্ত চলে। তবে অনেকের ক্ষেত্রে তা চাকুন্দ মাকুন্দে খয়রার মরসুম পেরিয়ে কার্তিক পর্যন্ত মোট পাঁচমাস চলে — ''বর্ষার চারমাস কাটিয়ে যদি গাঙের মানুষ, চাকুন্দে মাকুন্দে খয়রার ফেরে কাটিয়ে আসে কার্তিক, তবে পাঁচমাস। তারপর ঘরে ফেরে সে।''[১৭৩] এটাই 'মাছমারা'দের জীবনের সুখের সময়। বাকিটা টানের মরসুম। এ সময় গঙ্গায় মাছ পাওয়া যায় না। তাই অনেক সময় একসঙ্গে দশ-বিশ গণ্ডা জেলে-মালো জুটিয়ে 'মাছমারা'রা সাই তৈরি করে সমুদ্রে পাড়ি দেয়। এদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ সর্দারকে সাইদার বলে — ''টানের মরসুমে দশ বিশ গণ্ডা জেলে-মালো জুটিয়ে, ত্রিশ চল্লিশটি নৌকা আর পঞ্চাশ-ষাটটি জাল নিয়ে, যে সকলের হয়ে সর্দারি করে দক্ষিণে নিয়ে যেত মাছ ধরতে, তাকে বলে সাইদার,

দক্ষিণে যাওয়া হল সমুদ্রযাত্রা।''[১৭৪] 'মাছমারা'দের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে দক্ষ, সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তিই সাইদার নির্বাচিত হয়। খুবই কঠিন এই সাইদারদের জীবন। একদিকে যাত্রাপথে সমস্ত বিপদ-আপদের মোকাবিলা করে সম্পূর্ণ সাইয়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা যেমন তাদের করতে হয়, তেমনি ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতিকেও অনেক সময় তাদের বিসর্জন দিতে হয়।

এই উপন্যাসের নায়ক বিলাসের বাবা নিবারণ ছিল সাইদার। সে বাড়িতে স্ত্রী এবং ভ্রাতৃবধূ — এই দুই মহিলাকে আসন্ন প্রসবা রেখে ভাই পাঁচু সহ একটা আস্ত সাই নিয়ে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল — ''নিবারণ সাইদার। তাকে সব দেখাশোনা করতে হবে গিয়ে। সবাই যাত্রা করে বসে আছে। উপায় নেই। বলল, এট্টা যখন বেইরেছে, আর এট্টাও বেরুবে। দু-দণ্ড আগে আর পরে। কিন্তুন আর দেরী করা যায় না।''[১৭৫] তবে এই টানের মরসুমে সাই নিয়ে গিয়েও 'মাছমারা'দের জীবনের দুঃখ ঘোচে না — কারও কারও প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সাই ফিরে আসে — ''দক্ষিণে যাওয়া বড় যাওয়া। কথায় বলে, যমের দুয়ার দক্ষিণে। সমুদ্রে যাবার রেজেস্ট্রি অফিস পেরুলেই তাঁর রাজ্য। ফিরে আসা না আসা তাঁর হাত। দয়া করলে রেহাই নেই। ছাড়লে নেই কেউ মারার। ফি বছরেই দু-একজন থেকে যায়। সবাই যে ডাঙায় যায় তা নয়। সমুদ্রের গর্ভেও যায় কেউ কেউ। সেটাই যায় বেশি। বিশেষ মাছ-মারারা।''[১৭৬] এই উপন্যাসে নিবারণ সাইদারও সমুদ্রের বুকে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। অগ্রহায়ণ মাসে 'মাছমারা'রা সাই নিয়ে রওনা দিয়ে পৌষ, মাঘ মাস কাটিয়ে ফাল্গুনে ফিরে আসে। চৈত্র থেকেই তাদের দুঃখ শুরু হয়, যা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ কাটিয়ে আষাঢ়ের অম্বুবাচী পর্যন্ত চলে। এরপর 'মাছমারা'রা গঙ্গায় মাছ ধরার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় — ''অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন। ফাল্গুন পড়তে না পড়তে আসে দখনে বাওড়। সমুদ্র মেতে ওঠে নিজের লীলায়। . . .মাছমারা ফিরে আসে। কিন্তু বউ জাগে। কেন, না, এর নাম চৈত্রমাস। কথায় বলে চৈত-টোটা। অর্থাৎ চৈত্র-মন্বন্তর। . . .তারপর বৈশাখে নতুন জল আসতে থাকে, জ্যৈষ্ঠে চলে প্রস্তুতি, আষাঢ়ে, আসে অম্বুবাচী।''[১৭৭]

সাই ফিরে এলে 'মাছমারা'দের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে বটে; কিন্তু যারা সাইয়ে যায় না, তাদের অভাবের শেষ থাকে না। উপন্যাসে দেখা যায় যে,

নিবারণের মৃত্যুর পর তার ভাই পাঁচু দক্ষিণে সমুদ্রে যাওয়ার সাহস করে না ওঠায় তার পরিবারের অভাব শেষ হতেই চায় না —

''গত মাঘ মাসে নৌকা বাঁধা পড়েছিল মহাজনের কাছে। মাঘ ফাল্গুনে চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়। আষাঢ়ের আজ অর্ধেক পার হয়ে গেল। এতদিন বাদে দেনার উপরে আবার নতুন মুচলেকা দিয়ে, নৌকা ছাড়ানো হল। আজ পাঁচ বছর ধরে, ফি বছরে নৌকা বাঁধা পড়েছে। চক্রাকারে বাড়ছে দেনা।

কিন্তু উপায় কী। এ সময়ে যেমন করে হোক গঙ্গায় আসতেই হবে। প্রতি বছরই আশা থাকে, এ বছর হয়তো মহাজনের ঋণ শোধ হবে। হয় না। যদি গঙ্গার দয়া হয়, তবে কয়েক মাস চলে। তারপর আবার যে-কে-সেই।

তবু আসতে হবে। যার নৌকা নেই, মহাজনের কাছ থেকে নৌকা ভাড়া নিয়েও সে আসবে। এ মিঠে জলের টান, বড় টান। যদি দেয় তো গঙ্গাই দেবে হাত ভরে। না দিলে মরণ।''[১৭৮]

উপন্যাসে দেখা যায় যে, সয়ারাম ও তার দাদা দণ্ডারামকে দেনার দায়ে নিজের নৌকাই মহাজনের কাছ থেকে ভাড়ায় নিয়ে মাছ ধরতে যেতে হয়। মাছ ঠিকমত পেলে তাদের সাময়িক অভাব দূর হয়। কিন্তু সবসময় মাছ পাওয়াও যায় না — ''মাছ ব'লে কথা। যেমন তার মর্জি, তেমনি জলের মর্জি, সে কারুর প্রজা নয়। খাজন-টেকসোর ধার ধারে না। জল যদি এল তো, এমন এল তোমার ঘরবাড়ি খেত-খামার সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। না এলো তো কাঁদলেও দু'ফোঁটা আসবে না।''[১৭৯] এই কারণেই তাদের অভাব ঘোচে না। তাই অনেক 'মাছমারা' মাছ ধরার বৃত্তি ছেড়ে চাষাবাদ শুরু করে — ''অনেকে চাষ-আবাদ ধরেছে। মাছের কাজে নেই আর তারা। এখানে জীবন বড় সংশয়। বাঁচামরা জলের হাতে। যা দেন সবই তাঁর দয়া। না দিলে জল মইয়ে ফেললেও কিছু হবে না।''[১৮০] তবে যাদের উপায় থাকে না, তারা মাছের মরসুমে সাংলো জাল, পানসা জাল, বাছারি জাল, টানছাঁদি জাল, বাঁধাছাঁদি জাল, খুঁটে জাল ইত্যাদি নানা ধরনের জাল দিয়ে গঙ্গাবক্ষে মাছধরার কাজ করে। এই সমস্ত জালের মধ্যে সাংলো জাল হল ইলিশ মাছ ধরার জাল। এর বর্ণনায় ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''সাংলো জাল থাকে তোমার হাতে। জালের দুই লম্বা মুখ, দুই সলি পরানো আছে তাতে। সলি হল কঞ্চি। জালের মুখে সলি, জালের মুখ। ওপরের

সলিতে বাঁধা কাছি। সেই কাছি ভাটার ভিতর দিয়ে বাঁধা আছে নিচের সলির সঙ্গে। জাল তোমার হাঁ করে থাকবে মাটিতে। নীচের সলিতে থাকবে শিল, অর্থাৎ ভার। ওই ভার জাল জলের নীচে। আন্দাজ চাই। ঠেকিয়ে নাও জালটি মাটিতে। যখন ঠেকাবে, তখন এক হাত তুলে রাখবে। সব সময়, পাতালের মাটি থেকে সাংলো একহাত উঁচুতে থাকবে।''[১৮১] মাছ ধরতে আসার সময় এ সব জালে মাছ পড়ুক আর না-পড়ুক 'মাছমারা'রা মহাজনের হাত থেকে রেহাই পায় না। একদিকে শহরের ফড়েদের মধ্যেই তাদের মহাজন থাকে, অপরদিকে গ্রামের মহাজনও এসে সেখানে হাজির হয়। তাই চন্দননগরে পাঁচুদের মহাজন পালমশাইকে আসতে দেখা যায় — ''পূর্ণিমার দিনই পুব থেকে এল পালমশাই — মাছমারাদের মহাজন। . . . প্রতিবছরই আসে। মাছ পড়লে নিজেই ফড়ে পাইকেরদের ডেকে দরদস্তুর করে। মাছ বিক্রি করে, টাকা রাখে নিজের পকেটে। হিসেব রাখো কত শোধ যাচ্ছে। খাবার টাকা নেই? আচ্ছা, এই নাও চালের দাম। কী গেলাটাই গিলতে পার বাপু তোমরা।

মহাজনের এমনি কথা। আশ্রয় নেয় এসে গঞ্জের চালায়। হোটেলে খায়। কী খেয়ে থাকতে হবে সে ভাবনা নেই। মহাজন মানুষ, ঝুলি তার শূন্য থাকে না। নইলে সে মহাজন কেন। . . . পয়সাটি ফেলবে, হাতের কাছে সব হাজির।''[১৮২] এই সময় সমুদ্রে 'টোটা' অর্থাৎ সাময়িক মন্বন্তর দেখা দিলেও এইসব মহাজনদের হাত থেকে 'মাছমারা'রা রেহাই পায় ন।

গঙ্গার বুকেও মাছমারাদের জীবনে রোগভোগের অভাব থাকে না। এর মধ্যে বেশিরভাগই হল — না খেতে পাওয়ায় অপুষ্টিজনিত রোগ। অনাহার, অর্ধাহার থেকে আমাশয়ের মত মারাত্মক রোগ লেগেই থাকে — ''শমন এসেছে হাতে কলমে। করাল রোগ, আমাশয়ের মহামারী নিয়ে আসছে। এই জল, রোদ আর বৃষ্টি। পেটে নেই পুরোভাত। মাথা চাড়া দিচ্ছে রোগ। . . . ভয়ঙ্কর রক্ত-আমাশা দেখা দেয়।''[১৮৩] উপন্যাসে পাঁচুর এই রক্ত আমাশয় রোগেই মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও সর্বক্ষণ জলে থাকার কারণে তাদের শরীরে হাজা নামক দগদগে ঘা লেগেই থাকে। তবে যতই অসুখ-বিসুখ হোক না কেন, তাদের জীবনে ডাক্তার-কবিরাজের তেমন অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় না। তাই বিলাসের হাজা হলে সে নিজে নিজেই তার চিকিৎসা করে —

''হাতখান বুঝি ছিঁড়ে পড়ে রে সয়া। হাজা বড়ো দগদগ করে। ছইয়ে গোঁজা আছে প্যাকাটি, গুঁড়োর তলায় আছে গাবের আঠা। এট্টু গরম করে দি'নি।

গাবের আঠা গরম করে, বিলাসের দু'হাতে মাখিয়ে দিল সয়ারাম, নিজের হাতেও মাখল। জলের কাছি আর সহজে কেটে বসতে পারবে না।''[১৮৪]

গঙ্গায় মাছ না পাওয়া গেলে 'মাছমারা'দের দুঃখের তো অন্ত থাকেই না, মাছ পেলেও তাদের পরিস্থিতি খুব একটা পরিবর্তিত হয় না। কারণ তখন মাছের দাম পড়ে যায়। তাই 'টোটা' কেটে প্রচুর মাছের আমদানী ঘটলে দেখা যায় — ''মাছের পাইকারী দর একশো থেকে আশী, সত্তর, ষাট, পঞ্চাশে নেমে এল আস্তে আস্তে। যেমন করে জোয়ান কোটাল শেষ হয়। . . .দর কমল বটে মাছের। মাছমারারা তবু ক্ষান্ত হয় না সহজে। মাছ মাটিতে পুঁতে ফেলার দিন আসেনি। তাও হয়। অপর্যাপ্ত মাছ, পচে যায়, পড়ে থাকে বাজারে, হাওয়া দূষিত হয়। সে রকমও হয়েছে অনেক বার।''[১৮৫] যাই হোক, এই উপন্যাসে শেষপর্যন্ত 'মাছমারা'দের জালে প্রচুর মাছ পড়ে। ফলে তাদের আয়-উপার্জন ভালোই হয়। এরপর মরসুম শেষ হলে সবাই একে একে বাড়ি ফিরে আসে। এইসময় গঙ্গাও যেন বদলে যায় — ''নৌকা কম দেখা যায় গঙ্গায়। এতদিন যেন মাছমারাদের মেলা বসেছিল। এখন গঙ্গার বুকখানি বড়ো নিরালা নিরালা লাগে।''[১৮৬]

ঔপন্যাসিক 'মাছমারা'দের জীবনের সঙ্গে যুক্ত রীতি-নীতি, আচার-সংস্কৃতি, সংস্কার-বিশ্বাস, লোকাচার-লোককথার বাস্তব ছবিও এঁকেছেন। স্থানীয় উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে এই উপন্যাসে 'সাজার উৎসব' অর্থাৎ সর্বজনীন গঙ্গাপূজার উল্লেখ আছে। এজন্য প্রত্যেক 'মাছমারা'কে একটি ভাটার সময় পাওয়া সমস্ত মাছ চাঁদা হিসেবে 'সাজভাটা' দিতে হয়। এই সাজভাটা উপলক্ষে তারা নানা আমোদ-প্রমোদে মেতে ওঠে। নিম্নবঙ্গের সুন্দর বন অঞ্চলে চলে বনের রাজা ' দক্ষিণ রায়'-এর রাজত্ব। সে অঞ্চলে তাঁকে কেন্দ্র করে অনেক লোককথা প্রচলিত আছে; যার কিছু পরিচয় এই উপন্যাসেও আছে — '' . . . ইনি হলেন দক্ষিণ রায়। সোঁদর বনের রাজা। ডাঙার যত তুক, সব ওয়াঁর ছদ্মবেশ। হিসেবে কুলিয়ে ওঠা দায়। রাতবিরেতে, নয় তো সোঁদর বনের পাশে, নোঙর করলে, ওঁয়ার নাম নিতে নাই। দক্ষিণ রায়ের আর এক নাম বড় শেয়াল। ডেকে নে' গে' মুণ্ড ধরছাড়া করে মড়মড় করে

চিবুবে।''[১৮৭] এছাড়াও নিবারণ সাইদারকে কেন্দ্র করে পাঁচু সে অঞ্চলের নানা কাহিনির অবতারণা করেছে, যেগুলি লোককথার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

'মাছমারা'দের জীবনের নানা সংস্কার বিশ্বাসের পরিচয় দিতে গিয়ে এখানে যাত্রাপথের কিছু নিয়ম মানার কথা বলা হয়েছে — ''যাত্রা পথে কচ্ছপ। কাঁকড়া, কচ্ছপ, কলা — যাত্রার সময় অলুক্ষণে চিহ্ন। দু ভাইয়েরই বুকের মধ্যে নিঃশব্দে বিদ্যুৎশিখা একবার চিকচিক করে উঠল। এ কিসের ইঙ্গিত।''[১৮৮] আবার 'মাছমারা'রা সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে বাড়িতে তাদের স্ত্রীরা নানা দুশ্চিন্তায় দিন কাটায়। ফলে সেখান থেকে তাদের মনে নানা বিশ্বাসের জন্ম হয় — ''আগনে এল পচ্ছিমে শ্যাওটা, কী শীত। থেকে থেকে অগানে আবার দখনে বাওর। দেখে আমার বুক কাঁপতে নাগল। একি অঘটন গ'। এমন তো দেখিনী গ' বাপের জন্মে। সেই আমার বুক কাঁপল। কোলের ছেইলে আমার শুদু শুদু কেঁপ্লেকুঁপ্লে কেঁদে অস্থির। সেই তো আমার মন বলছিল গ'।''[১৮৯]

এই উপন্যাসে 'মাছমারা'দের জীবনের নানা আমোদ-উল্লাসের পরিচয়ও আছে। এর মধ্যে অন্যতম হল 'বাছাড়' নির্বাচন। উপন্যাসে একসময় বিলাসের বাবা নিবারণ ছিল 'বাছাড়'; পরে কদ্‌মে পাঁচুকে হারিয়ে বিলাস নিজে 'বাছাড়' নির্বাচিত হয় — ''ওর বাপ ছিল বাছাড়। সে সব আগের দিনের বিষয়। চার-পাঁচ মণের তালগাছের গুঁড়ি একদিকে ধরে তুলে, টেনে যে সবচেয়ে বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারবে, তাকে সবাই সম্মান দেয়, বাছাড় বলে।''[১৯০]

'মাছমারা'দের জীবনে বিয়ের প্রসঙ্গও এই উপন্যাসে আছে। তাদের সমাজে সাধারণত মেয়েদের বাল্যবয়সেই বিয়ে হয়ে যায়। তাই ঔপন্যাসিককে বলতে শোনা যায় — ''বিয়ের বয়সে যখন বিয়ে দিলে বাবা মা, তখন বউয়ের বয়স পাঁচ কি ছয়। সে বউ না পারে রাঁধতে বাড়তে, না জানে জাল বুনতে, সেলাই করতে। স্বামীর সঙ্গে শোয় তো দূরের কথা। এক্কা দোক্কা খেলছে, পিটুলির গোটা দিয়ে খেলছে ঘুটি। শ্বশুর শাশুড়ির বকুনি আর মার খেয়ে কেঁদেছে বসে ঠ্যাং ছড়িয়ে।''[১৯১] তবে এদের সমাজে নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে সামাজিক বিধিনিষেধ, লজ্জা-শরমের তেমন কড়াকড়ি নেই বললেই চলে — ''আরে মাছমারা, তোর লজ্জা নেই। সুদিনে তুই এক, দুর্দিনে তুই আর এক মানুষ। এমনি করে তোর ঘরণীকে ধরে একজন। তোকে ধরে আর

একজন।''[১৯২] হয়তো এজন্য অমর্তের স্ত্রী বিলাসকে প্রলোভিত করার জন্য বহু প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বিলাসও সুযোগ মতো তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে একসময় বিবেকের দংশনে ভুগে আবার হিমির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছে। দামিনী ফড়েনির নাতনি হিমিও চরিত্রের দিক থেকে সতী সাধ্বী ছিল না। তার মা-ও বিধবা হয়ে স্বৈরিণী হয়েছিল। আতরবালার পরিচয়েও ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন যে, 'আতর সধবা নয়, বিধবা নয়, শুধু ফড়েনী'। উপন্যাসটির এসব দিকে নজর দিয়ে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'য় আমরা পাই মৎস্যজীবীসমাজের অলৌকিক সংস্কার-বিশ্বাসে আবিষ্ট, নদী-সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা-টান-আবর্ত প্রভৃতি প্রকট ও গোপন বিপদের সহিত অবিরত সংগ্রামে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুরহস্যের সম্মুখীন, জলস্রোত ও মনোস্রোতের বেগবান প্লাবনের মধ্যে অত্যাজ্য সংস্কারে পরিণত জীবননীতির নোঙরে দৃঢ়সংবদ্ধ জীবনের অপূর্ব পরিচয়।''[১৯৩] তাই একথা বলাই যায় যে, রীতি-নীতি, আচার-সংস্কৃতি, বিশ্বাস-সংস্কারের প্রশ্নেও 'গঙ্গা' উপন্যাসটি আঞ্চলিকতার শর্ত পূরণ করেছে।

এই উপন্যাসটিতে 'মাছমারা'দের খাদ্যাভ্যাস-খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থানের পরিচয়ও ঔপন্যাসিক দিয়েছেন। মাছমারাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় নদীর বুকে নৌকায় কাটে। সেখানে নৌকাতে জ্বালাবার জন্য তোলা উনুন 'তিবড়ি'তে রান্নাবান্না করে তারা খাওয়া-দাওয়া সারে। এদের খাদ্যতালিকায় সাধারণত গরম ভাত, লঙ্কা-হলুদ বাটা ডাল এবং নুন থাকে। এসব দিয়েই তারা আধপেটা খেয়ে গঙ্গার বুকে মাছ ধরে। তবে জালে বেশি মাছ পড়লে, আয়-উপার্জন বেশি হলে তাদের খাদ্য তালিকাতেও পরিবর্তন আসে — ''মাছমারারা এখন ডাল খায়, একটু পিঁয়াজ কাঁচালঙ্কাও আসে। ডেঙো ডাটার সঙ্গে দু-চারটে গোল আলুর শখের খাওয়াও দেখা যায়। তাই সয়ারাম বাজারে যায়।''[১৯৪] পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রে 'মাছমারা'রা উর্ধাঙ্গ খালি রেখে নিম্নাঙ্গে নেংটির মত কাপড় পরিধান করে বর্ষার জলে ভিজতে ভিজতে মাছ ধরে। মেয়েরা শাড়ি পরলেও তাদের শরীরে ব্লাউজ সাধারণত থাকে না।

প্রত্যেক 'মাছমারা'র নিজস্ব বাড়িঘর থাকলেও বছরের অধিকাংশ সময় এদের নৌকায় কাটাতে হয় জন্য নৌকাই এদের বাসস্থানের পর্যায়ে উঠে আসে —

''মাছমারার বাহন হল নৌকা। যেমনই হোক, জলে ভাসবার মতো একটা হলেই হলো। না থাকলেই হল কোনো রকম ফুটো, ফাটল। থাকলে চলে না। কেননা, জলেই তোমার অষ্টপ্রহর বাস। অগতির গতি বলে, এখানে গঙ্গার খাতির নেই। ফুটো পেলে, ওখান দিয়ে ঢুকে উনি তোমাকে তলায় টানবেন।''[১৯৫] তাই প্রত্যেক 'মাছমারা' নিজের নৌকার প্রতি অতিরিক্ত যত্ন নেয় এবং সর্বাপেক্ষা যত্ন নেয়। এভাবে এই উপন্যাসে আঞ্চলিক খাদ্যাভ্যাস-খাদ্যতালিকা, পোশাক-আশাক, বাড়িঘরের প্রসঙ্গও এসেছে।

সমরেশ বসু 'গঙ্গা' উপন্যাসটি মান্যচলিত বাংলা ভাষাতেই রচনা করেছেন। তবে সংলাপের ক্ষেত্রে তিনি নিম্নবঙ্গে প্রচলিত সাধারণ কথ্যরীতি ব্যবহার করেছেন। এজন্য উপন্যাসে সে অঞ্চলে প্রচলিত বহু শব্দও স্থান পেয়েছে। যেমন — 'কুতঘাট', 'শাবর', 'তিবড়ি', 'গোনে', 'বেগোনে', 'বাছাড়', 'সাজার' 'সাজভাটা', 'দখনে বাওড়', 'পাথালি চলা', 'কোঁচা', 'মেকো', 'জোয়ান কোটাল' ও 'মরা কোটাল', 'ভারী গোন', 'আগ্না', 'চক', 'বেলিয়ে যাওয়া' প্রভৃতি অসংখ্য স্থানীয় শব্দ এই উপন্যাসে আছে। সুতরাং বলা যায় ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এখানে আঞ্চলিক উপন্যাসের শর্ত মেনে নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও উপন্যাসটিতে 'মাছমারা'দের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু গানও স্থান পেয়েছে। ঔপন্যাসিক বিলাসের মুখে এরূপ বেশ কয়েকটি গান জুড়ে দিয়েছেন। যেমন —

১। ''আমার কিছুই নাই মন
আমি ভাসব অকূল পাথারে হে
এই আমার মতি বিলক্ষণ।''[১৯৬]

২। ''আমার ডাক পড়েছে সাগরে,
ঠাকুর, আমার যেতে মন করে।''[১৯৭]

৩। ''সজনী আমায় না ডাক পিছে।
আমাকে ডাক দিয়েছে

মহাসাগরে।। . . .''[১৯৮]

৪। ''ওরে উত্তুরে বাতাস বয় রে
কী ভয় তোর ঝুটো ডাকাবুকো রে,
পানসা জালের সাঁই ডেকেছে সাগরে।।''[১৯৯]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসটিতে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রায় সমস্ত লক্ষণ প্রকটিত হয়েছে। উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার বিষয়টি অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিতেও স্পষ্ট হয়েছে। উপন্যাসটি মূল্যায়নে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''একটি বিশেষ অঞ্চলের মৎস্যজীবীসম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার এরূপ নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ও অন্তর্গূঢ় প্রেরণা বাংলা উপন্যাসে অন্যত্র দুর্লভ। লেখক শুধু উহাদের জীবনযাত্রার বহির্ঘটনাই বিচিত্র করেন নাই, উহাদের মুখের ভাষা, অন্তরের অর্ধস্ফুট চিন্তা ও আবেগের স্পন্দন, উহাদের জীবনবোধের সমস্ত প্রদোষান্ধকার অস্পষ্টতা ও রহস্যঘন নক্ষত্রদীপ্তি আমাদের নিকট অপূর্ব দক্ষতার সহিত উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। জেলেদের জীবনের সহিত তিনি এরূপ গভীরভাবে একাত্ম হইয়াছেন যে, নৌকাচালনাসংক্রান্ত সমস্ত পরিভাষা, নানারকমের ঢেউএর স্বরূপ ও সংজ্ঞা, — যাহার উল্লেখ ভদ্র সাহিত্যে পাওয়া যায় না, — তাহাও তিনি অবলীলাক্রমে আয়ত্ত এবং যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন।''[২০০] আর সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''গঙ্গা' প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আপত্তিগুলিকে ধামাচাপা না-দিয়েও, যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত অভিজ্ঞতার অভিনব উপন্যাসগুলির দিক তাকিয়ে এ-কথা বলতে হয় যে, 'গঙ্গা'র ঔপন্যাসিক দৃঢ়তা এ-জাতীয় অন্য উপন্যাসগুলির তুলনায় সিদ্ধির অনেক নিকটতর।''[২০১] অনেকে অবশ্য 'গঙ্গা' উপন্যাসটির শ্রেণী বিচার করতে বসে একে সমরেশ বসুর মৃত্যুচেতনা মূলক উপন্যাস বলে মত দিয়ে থাকেন। বিলাসের সমুদ্র যাত্রা আসলে মৃত্যুর অভিমুখেই যাত্রা। হয়তো সমালোচকদের এই বক্তব্যের সারবত্তা আছে; তবে সেটি আমাদের বিচার্য নয়। উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতার লক্ষণগুলি

যেভাবে প্রকটিত হয়েছে, তাতে একে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দিতে হয়।

প্রফুল্ল রায়ের **'পূর্বপার্বতী'** উপন্যাসটি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটির পটভূমি হল সুদূর নাগা পাহাড়। এখানে ঔপন্যাসিক প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের নাগাল্যান্ডের ভূমিপুত্রদের রোমাঞ্চকর জীবন পরিক্রমাকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই উপন্যাসটি তিনি 'দেশ' পত্রিকার প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষকে উৎসর্গ করেন। এই উপন্যাসটির 'লেখকের কথা' অংশে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন যে, সাগরময় ঘোষের উৎসাহ ও প্রেরণায় তিনি উপন্যাসটি রচনায় ব্রতী হন। সাগরময় ঘোষ তাঁকে নাগাদের জীবন পরিক্রমা সম্পর্কে অবহিত হতে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য নাগা পাহাড়ে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং এটি লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিজাত বিষয়ের উপন্যাস-সংরূপ। 'লেখকের কথা' অংশে ঋণস্বীকারের সময়েও এর আভাস পাওয়া যায় — ''সেই তিনটি পাহাড়ি সর্দার, যারা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমাকে তাদের জীবনকথা, রূপকথা, উপকথা এবং অসংখ্য উপাদান যুগিয়ে 'পূর্বপার্বতী' রচনা সম্ভব করেছে তাদের কাছে আমার ঋণ পর্বতপ্রমাণ।''[২০২] উপন্যাসটিতেও এর যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। তাই উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দ্বিধায় বলতে পারেন — ''ইহা ভারতের পূর্ব-সীমান্তের অধিবাসী পার্বত্য নাগা-উপজাতির একটি গোষ্ঠীর বিচিত্র রোমাঞ্চকর জীবন-কাহিনী। এই নাগা জাতির জীবন প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসের নাগপাশে দৃঢ়বদ্ধ ও যুগযুগান্ত নির্ধারিত সামাজিক রীতি-আচার ও গোষ্ঠীপতির বজ্রকঠোর শাসনের অচ্ছেদ্যভাবে শৃঙ্খলিত। লেখক আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি ও সু-নির্বাচিত তথ্য-সঞ্চয়নের সাহায্যে অরণ্য-ও-পর্বতচারী কয়েকটি মানবগোষ্ঠীর আদিম-প্রবৃত্তিপ্রধান জীবনচিত্রটি অপূর্ব বর্ণাঢ্যতা ও সঙ্গতিবোধের সহিত আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।''[২০৩]

ঔপন্যাসিক নিজে এই উপন্যাসটিকে 'ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস' বলে মত দিয়েছেন — ''ভারত সীমান্তের নাগা উপজাতির জীবনযাত্রা ভিত্তি করে এই উপন্যাস রচিত হয়েছে। নাগাদের মধ্যে গোষ্ঠী এবং বংশগত অসংখ্য ভাগ ও ভেদ রয়েছে।

নানা ভাষা এবং উপভাষার প্রচলন আছে। সমাজব্যবস্থা, উৎসব এবং ধর্মাচরণের আনুষঙ্গিক রীতিও সর্বত্র এক নয়। . . . নাগাভূমি। সংখ্যাতীত পাহাড়মালা, দুর্গম অরণ্য, নদী-জলপ্রপাত-ঝরনা-মালভূমি-উপত্যকা দিয়ে ঘেরা সীমান্তের এই দেশটি সমতলের বাসিন্দাদের কাছে অপরিসীম বিস্ময়ের বিষয় হয়ে রয়েছে। . . . নাগা পাহাড়ের নিসর্গরূপ অপূর্ব। ভয়ঙ্কর এবং সুন্দরের এমন সার্থক স্বচ্ছন্দ মিশ্রণ ভারতের অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। . . . এদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচুর রূপকথা ও উপকথা ছড়িয়ে আছে। . . . 'পূর্ব পার্বতী' জাতিতত্ত্বের গবেষণা নয়; নাগাদের কাম-লালসা-হিংসা, ন্যায়-অন্যায় বোধ এবং জীবনের দ্রুত পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস।''[২০৪] তবে এখানে নাগাদের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসেছে নাগাভূমির ভূগোলের বিস্তৃত পরিচয়ের প্রসঙ্গ। অধ্যাপক শিশির কুমার দাশের বক্তব্যে এর ভৌগোলিক পরিবেশের ভূয়সী প্রশংসা শোনা যায়। উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন — '' . . . পূর্ব পার্বতী (১৯৫৮) বিষয়বস্তু ও ভৌগোলিক পরিবেশের অভিনবত্বের জন্য সমাদৃত হয়।''[২০৫]

'পূর্বপার্বতী' উপন্যাসটির পরিচয় প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে — ''পূর্বপার্বতী' নাগাদের যন্ত্রণা, বাসনা ও সংগ্রামের সর্বপ্রথম লিপিরূপ। একাধারে তাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও উপন্যাস। যেমন বেগবর্ণময় তেমনি ধ্রুপদী। এই মহৎ ও বৃহৎ গ্রন্থটি বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের ভৌগোলিক পরিধিকে নিশ্চিতরূপে বহু বিস্তৃত করেছে।''[২০৬] উপন্যাসটির সূচনায় আমরা দেখি যে, নাগা পাহাড়ের কেলুরি বস্তির সবচেয়ে সেরা যুবক আঠারো বছরের সেঙাই রেঙকিলানকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ি নিয়মানুসারে শিকারে বের হয়েছে। অবশ্য অদম্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা কোনো শিকার পায় নি। এতে রেঙকিলানের মনে ভয় হয় যে, সে পাহাড়ি রীতি মেনে শিকারে যাবার আগের রাতে 'মোরাঙ'-এ না শুয়ে স্ত্রীর সঙ্গে 'কেসুঙ'-এ শোওয়ায় 'আনিজা' রাগ করায় এমন হয়েছে। ফলে ভয়ে সে অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে। এদিকে শিকার না পেলেও সেঙাই তাদের চিরশত্রু টিজু নদীর ওপারের সালুয়ালাঙ বস্তির খোনকেকে বর্শায় ফুরে দিয়ে আসে। ফেরার পথে সেঙাই তাদের কেলুরি বস্তির কাছে এক পাহাড়ি ঝর্নায় সালুয়ালাঙের সেরা তরুণী মেহেলিকে নগ্ন হয়ে স্নান করতে দেখে।

এসময় সে মেয়েটিকে বর্শা হাঁকরাতে উদ্যত হলেও সে পাহাড়ি রীতি মেনে আত্মসমর্পণ করায় সেঙাই তাকে ছেড়ে দেয়। তবে প্রথম দেখা থেকেই এই দুই শত্রুপক্ষের তরুণ-তরুণী পরস্পরের প্রেমে পড়ে।

কেলুরির সর্দার খাপেগার বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কেলুরি ও সালুয়ালাঙ বস্তির মানুষজনের মধ্যে একসময় হৃদ্যতা ছিল; কিন্তু কেলুরির জোহরি বংশের সেঙাই-এর ঠাকুরদা জেভেথাঙ সালুয়ালাঙের পোকরি বংশের মেয়ে জামাতসুর প্রেমে পড়ে তাকে হাসিল করতে চাইলে দুই বস্তির মধ্যে বিরোধ বাঁধে এবং সে বিরোধে সালুয়ালাঙের পোকরিরা জেভেথাঙের মুণ্ডু কেটে নিয়ে যায়। তাই যতদিন জোহরিরা পোকরিদের তিনটে মাথা কেটে না আনবে ততদিন তাদের প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। এজন্যেই সেঙাই খোন্‌কেকে বর্শা হাঁকরেছিল। এদিকে রহস্যময়ভাবে রেঙকিলানের মৃত্যু হয়। পাহাড়ি নাগারা ভাবে শিকারের নিয়ম না মানায় 'রেনজু আনিজা'র রোষেই তাই মৃত্যু হয়েছে। এতে সর্দার খাপেগা রেঙকিলানের স্ত্রী সালুনারুকে শাস্তি দিতে চাইলে সে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে প্রথমে সালুয়ালাঙ বস্তিতে এবং পরে পাহাড়ি ডাইনি বুড়ি নাকপোলিবার কাছে আশ্রয় নেয়। এই নাকপোলিবার কাছেই সেঙাইকে বশ করার ওষুধ আনতে যায় মেহেলি। মেহেলির সঙ্গে তার দাদা খোন্‌কের 'লগোয়া লেন্যু' অর্থাৎ প্রেমিকা লিজোমু ও বান্ধবী পলিঙাও যায়। ডাইনি বুড়ি নাকপোলিবা চারটি বর্শা আর দু'খুদি ধানের বিনিময়ে ওষুধ দিতে চায়। তবে জানিয়ে দেয় যে, সে ওষুধ সেঙাই-এর গায়ে মাখিয়ে দিতে হবে। এদিকে সেঙাইও প্রচণ্ডভাবে মেহেলির টান অনুভব করায় এক শীতের রাতে তাদের শত্রুপক্ষ সালুয়ালাঙে মেহেলিদের বস্তিতে গিয়ে হাজির হয়। তখন মোরাঙে পাহাড়ি তামুন্যু খোন্‌কের চিকিৎসা করছিল। কিন্তু তার ওষুধ কাজ না করায় সে জানিয়ে দেয় যে, খোন্‌কেকে আনিজায় পেয়েছে এবং তাকে বিসর্জন না দিলে গোটা সালুয়ালাঙ বস্তিতে আনিজার কোপ নেমে আসবে। ফলে তার কথামত সালুয়ালাঙের যুবকেরা খোন্‌কের অর্ধমৃত দেহ পাহাড় থেকে গভীর খাদে ফেলে দেয়। এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি সেঙাই মোরাঙের আড়ালে লুকিয়ে দেখছিল; কিন্তু ঠাণ্ডায় তার শরীর অবশ হয়ে পড়লে, সেও নীচে পড়ে যায়।

এদিকে রাতের অন্ধকারে মেহেলি দাদা খোন্‌কের দেহ মনে করে লুকিয়ে সেঙাইকে তার গাছের উপরের ঘরে নিয়ে আসে। সেঙাইকে পেয়ে সে দাদার

মৃত্যুশোক ভুলে যায় এবং সেঙাইকে বশে আনার জন্য নাকপোলিবার কাছে ওষুধ আনতে ছুটে যায়। তার সঙ্গে খোন্‌কের প্রেমিকা লিজোমুও ছিল। সেখানে গিয়ে সালুনারুর কাছে তারা জানতে পারে যে, সেঙাই-ই খোন্‌কের হত্যাকারী। একথা শুনে লিজোমু সেখান থেকে ছুটে মেহেলির ঘরে চলে আসে এবং সেঙাইকে তার 'লগোয়া লেন্যু' বানাতে চায়। এতে সেঙাই রাজি না হলে সে ক্রুদ্ধ হয়ে সেঙাইকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। অবশ্য সেঙাই বেঁচে যায় এবং সালুনারুর কাছে সব শুনে সালুয়ালাঙের লোকেরা মেহেলির সেই বাসায় আগুন ধরিয়ে লিজোমুকে পুড়িয়ে দিয়ে ভাবে যে, তারা সেঙাইকে পুড়িয়ে মেরেছে। এরপর মেহেলির বাবা নানকোয়া গ্রামের সর্দারের ছেলে বাঘমানুষ মেজিচিজুঙের সঙ্গে মোটা বউপণের বিনিময়ে মেহেলির বিয়ে ঠিক করে। এ বিয়েতে মেহেলির মত না থাকায় সে সালুয়ালাঙ বস্তি থেকে পালিয়ে সেঙাইদের কেলুরি বস্তিতে এসে আশ্রয় নেয় এবং বস্তির সর্দার খাপেগাকে ধর্মবাবা বানায়। অবশ্য তখন সেঙাই বস্তিতে ছিল না, সে সারুয়ামারুর সঙ্গে নুন আনতে কোহিমায় গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে পাহাড়ি গ্রামগুলিতেও ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের ছায়া পড়তে শুরু করে। কেলুরি বস্তিরই সেঙাই-এর বাবা সিজিটো এবং সারুয়ামারু পোড়া মাংস খাওয়ার নিমিত্তে নুন আনতে কোহিমা গিয়ে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের পাল্লায় পড়ে। তারা এদের ভদ্র পোশাক-আশাক, টাকাকড়ি প্রভৃতির লোভ দেখিয়ে খ্রিস্টান বানাতে উদ্যোগী হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়। তবে অনেক জায়গায় এইসব ধর্মগুরুদের প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়; যার মধ্যে অন্যতম হল গাইডিলিওর প্রতিরোধ। গান্ধীবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী বিপ্লবী নারী গাইডিলিও পাহাড়ি জাতির কাছে রানী হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। কোহিমাতেই খ্রিস্টান নিয়ম কানুন মানতে না চাওয়ায় সেঙাই ও সারুয়ামারু ফাদার পিয়ার্সন ও পুলিশ সুপার বসওয়েলের রোষানলে পড়ে। তবে সেখান থেকে কোনোরকমে বেঁচে তারা বস্তিতে ফিরে আসে। সেঙাই কেলুরি বস্তিতে ফিরে এলে নসু কেহেঙ মাসে তার ও মেহেলির বিয়ে ঠিক হয়। তবে নাগাদের বিয়ের রীতি অনুযায়ী বিয়ের আগে দু'মাস তাদের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে পিয়ার্সন মেহেলিকে উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সালুয়ালাঙের নাগাদের উপর ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। ঘটনাক্রমে সে সময় কেলুরি গ্রামে রানী

গাইডিলিও এলে বসওয়েল সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সে গ্রাম আক্রমণ করে। এই আক্রমণে রানী গাইডিলিও ধরা না পড়লেও কেলুরি বস্তি লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যায়, বুড়ি বেঙসানু সহ অনেকেই মারা যায়। সালুয়ালাঙের লোকেরা মেহেলিকে নিয়ে চলে যায়। ইংরেজদের আক্রমণ করার কারণে সেঙাইকে কোহিমায় ধরে এনে জেলে ভরে দেওয়া হয়। এত ঘটনাক্রমের প্রভাবে সেঙাই-এর মধ্যেও পরিবর্তন আসে — সেও পাহাড়ি হিংসা ভুলে আর পাঁচটা মানুষের মত হয়ে ওঠে। তাই উপন্যাসের শেষে দেখা যায় যে, হত্যা, মৃত্যুর মত ঘটনাগুলিতে পাহাড়ি প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে সেও বিচলিত হয়ে ওঠে — ''সেঙাই — সে বন্য এবং হিংস্র। হত্যা কিংবা মৃত্যু তার কাছে বিচলিত হবার মত ঘটনাই নয়। জীবনের সব রকম ভীষণতায় সে অভ্যস্ত। তবু মাধোলালের মৃত্যুতে সে কাঁদছে। লালসা, প্রতিহিংসা, আক্রোশ, কাম, তীব্র রতিবোধ — আদিম মানুষের উগ্র প্রবণতাগুলো এই মুহূর্তে তার মন থেকে মুছে গিয়েছে। একটি সুকুমার বৃত্তি তার স্ফুটনোন্মুখ চৈতন্যকে ভরে রেখেছে। সেটি হল মমতা, এবং মমতার সঙ্গে অপরিসীম বেদনা। বাইরে গাঢ় কুয়াশা জমেছে। পাহাড়ি চক্ররেখা ঘিরে সেই কুয়াশা স্তরে স্তরে তুলোর মতো ঝুলছে।

সেঙাই-এর মনে বেদনা ও মমতার জন্ম হল।

সেঙাই-এর আদিম জীবন শেষ হল।''[২০৭]

এইভাবে সেঙাই-এর আদিম জীবন শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী' উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে।

এই 'পূর্বপার্বতী' উপন্যাসটির প্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বাংলা উপন্যাসের সর্বজন শ্রদ্ধেয় সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''আঞ্চলিক সাহিত্যের নিদর্শণ রূপে শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের 'পূর্ব পার্বতী' (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭) . . . বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।''[২০৮] বাস্তবিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, এই উপন্যাসটিকে ঔপন্যাসিক নিজে 'ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস' বললেও এখানে ইতিহাসের মধ্যে থেকেই আঞ্চলিক উপন্যাসের নানা লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাপক অলোক রায়ের 'কথাসাহিত্য : সাহিত্যকোষ' গ্রন্থে সংক্ষেপে হলেও এই উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রধান দু'টি শর্ত — আঞ্চলিক পটভূমি ও সেখানকার অধিবাসীদের

জীবনচর্যা তুলে ধরার বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে — ''প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী' এবং 'কেয়াপাতার নৌকো'য় যথাক্রমে নাগাভূমি অঞ্চল ও পূর্ববাংলার একটি বিশেষ অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন মানব-জীবনের চিত্র উপস্থাপিত।''[২০৯] এই দু'টি ছাড়াও আঞ্চলিক উপন্যাসের আরও বেশ কিছু লক্ষণ এই উপন্যাসটিতে আছে। এই লক্ষণগুলি খুঁজে বের করে উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার প্রকৃতি নির্ণয় করাই আমাদের আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

কোনো উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলতে হলে উপন্যাসটিকে প্রথম যে শর্তটি মেনে চলতে হয়, তা হল এর পটভূমিগত শর্ত। 'পূর্বপার্বতী' উপন্যাসটির ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন সুদূর নাগা পাহাড়ের কিছু গ্রাম ও বস্তিকে। এই উপন্যাসে স্থান পাওয়া সেই সমস্ত নাগা গ্রাম ও বস্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — কেলুরি বস্তি, সালুয়ালাঙ বস্তি, সেনুকাঙ বস্তি, থেমাকেডিমা বস্তি, ইমপাঙ বস্তি, লাংফু বস্তি, ফচিয়াগা বস্তি, মোককচঙ বস্তি প্রভৃতি। এই সমস্ত গ্রাম ও বস্তির মাঝেই প্রবাহিত হয়েছে টিজু নদী। তবে এই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনাই যে এইসব পাহাড়ি গ্রাম ও বস্তিতে ঘটেছে এমন নয়; উপন্যাসের শেষদিকের বেশ কিছু ঘটনা শহরাঞ্চল কোহিমায় ঘটেছে। এছাড়া এখানে শহরাঞ্চলের মধ্যে নাগিনীমারা, ডিমাপুর, ইম্ফল, গুয়াহাটির প্রসঙ্গ আছে। তবে আমাদের মনে হয় শহরাঞ্চলের এই স্থানগুলি উপন্যাসটির ঐতিহাসিক ব্যাপ্তি দেওয়ার জন্যে আনা হয়েছে — এর মূল প্রেক্ষাপট সেই নাগা গ্রাম ও বস্তিগুলির মধ্যেই আবদ্ধ। কারণ উপন্যাসটির বেশিরভাগ ঘটনাই সেইসব পাহাড়ি গ্রাম ও বস্তিগুলিতে ঘটেছে। এগুলির মধ্যে সবথেকে প্রাধান্য পেয়েছে দু'টি গ্রাম — কেলুরি ও সালুয়ালাঙ। এই দু'টির মধ্যেও এখানে কেলুরি গ্রামের প্রসঙ্গ বেশি এসেছে। ঔপন্যাসিক এই গ্রামটির প্রকৃতি, মানুষজন, গাছপালা, কেসুঙ তথা ঘরবাড়ি, মোরাঙ থেকে শুরু করে মোষবলির হাড়িকাঠের বর্ণনা পর্যন্ত দিয়েছেন। এই কেলুরির পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে টিজু নদী, যা সালুয়ালাঙ থেকে একে পৃথক করেছে। এই গ্রামের এক ঝরনাতেই নগ্ন অবস্থায় স্নানরত সালুয়ালাঙের সেরা মেয়ে মেহেলিকে সেঙাই দেখতে পায়। উপন্যাসের শুরুতেই গ্রামটির বাহ্যিক পরিবেশের বর্ণনা আছে — ''পাহাড়ি উপত্যকা। ভেরাপাঙ গাছের ছায়াতল দিয়ে বিশাল একটা চড়াই-এর দিকে উঠে গিয়েছে। ভেরাপাঙ আর জীমবো গাছ। ঘনবদ্ধ।

পাহাড়ের তামাভ মাটি থেকে কণা কণা প্রাণ সঞ্চয় করে উদ্দাম হয়ে উঠেছে এই অরণ্য। মাঝে মাঝে সাঙালিয়া লতার ছায়াকুঞ্জ। যেখানেই একটু রন্ধ্র পেয়েছে সেখানেই পাথুরে মাটি চৌফালা করে মাথা তুলেছে আখুশি আর খেজাঙের ঝোপ। আতামারী লতা সাপের মত বেয়ে বেয়ে উঠে গিয়েছে খাসেম গাছের মগডালে।''[২১০] এরপর উপন্যাসটি যত এগিয়েছে ঔপন্যাসিক এই কেলুরি গ্রামসহ নাগা পাহাড়ের অন্যান্য অঞ্চলগুলির সঙ্গেও আমাদের পরিচিত করিয়েছেন। সত্যি বলতে কি, এই রকম পাহাড়ি গ্রাম এবং সেগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের অনেকের কাছেই চির অপরিচিতই থাকত যদি ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে সেগুলিকে এভাবে চিত্রিত না করতেন। এজন্য শ্রদ্ধেয় অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — ''পূর্বপার্বতী' . . . উপন্যাসে তিনি বিচিত্র মানবজীবনকে অপরিচিত ভূখণ্ডে খুঁজেছেন।''[২১১] এই 'বিচিত্র মানবজীবন'কে ঔপন্যাসিক কতটা খুঁজে পেয়েছেন, সেটা আমরা পরে খুঁজে বের করব। কিন্তু উপন্যাসটির পটভূমি হিসেবে যে তিনি মূল জনসমাজের বাইরের কোন অঞ্চলকে অত্যন্ত সফলভাবে এই উপন্যাসে তুলে এনেছেন — এতে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই।

এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক যে কয়েকটি নাগা বংশের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হল জোহরি বংশ, পোকরি বংশ, খোখিকেসারি বংশ, জোহেরি বংশ, জোরি বংশ, নিসুরি বংশ, সোচরি বংশ, নগুসেরি বংশ, অঙ্গামী বংশ, রেঙমা বংশ প্রভৃতি। আর যে সমস্ত চরিত্রের সাক্ষাৎ আমরা পাই, তারা হল সেঙাই, রেঙকিলান, খাপেগা, জেভেথাঙ, নিয়োনো, নড্রিলো, গ্যিহেনি, ওঙলে, পিঙলে, খোন্‌কে, সারুয়ামারু, সিজিটো, সাঞ্চামবাতা, ইটিভেন, লেন্‌টিনোকটাঙ, সাঞ্চামখাবা, পিঙকুটাঙ, লিকোক্যুঙবা, ইমটিটামজাক, এটোঙা, রিজিমাখুঙ, হালুং, হ্যাজাও, চিনাসঙবা, উলুবাঙ, যাসিমু, ফিরাঙ, মেহেলি, লিজোমু, পলিঙা, সালুনারু, নিতিৎসু, ডাইনি নাকপোলিবা, বেঙসানু, ফাসাও, নাজলি, জামাতসু, হেজালি, গাইডিলিও, ম্যাকেঞ্জি, পিয়ার্সন, বসওয়েল, স্টুয়ার্ট, জনসন, ভূষণ, ফুকন, মাধোলাল মারোয়ারি, বুধোলাল, বসন্ত প্রমুখ। এর মধ্যে দু'-চারজন ইংরেজ, বাঙালি ও মারোয়ারী ছাড়া সবাই বিভিন্ন বংশের নাগা নর-নারী। এরা তথাকথিত অসভ্য রূপেই উপন্যাসে চিত্রিত। এদের আচার-আচরণ, কার্যকলাপ থেকে শুরু করে সবকিছুতেই তার ছাপ আছে। তাই অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বলেছেন — ''এই উপন্যাসের নর-নারীদের মধ্যে সভ্য মানবের চরিত্রস্বাতন্ত্র্য দুর্নিরীক্ষ্য। ইহারা সকলেই এক সুপ্রাচীন ও স্বতঃস্বীকৃত জীবনবোধের মহাসমুদ্রে ভাসমান বিচ্ছিন্ন দ্বীপসমূহের ন্যায় কোনপ্রকারে মাথা তুলিয়া আছে। ইহাদের চরিত্রের মূল সেই সার্বভৌম সংস্কৃতির মধ্যেই মগ্ন; এই গভীর-প্রোথিত মূল মুক্ত আকাশে বিশেষ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে নাই। সমাজদ্রোহী চিন্তা হয়ত কাহারও মনে মৃদু স্পন্দন তুলিয়াছে, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের শ্বাসরোধী অভিভবে ইহা অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই।''[২১২] অবশ্য ধীরে ধীরে এদের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। উপন্যাসে বৃদ্ধ সর্দার খাপেগা তার গল্পে নাগা যুবক জাভেথাঙের শারীরিক বর্ণনায় বলেছে — ''মাথার চারিদিকে গোল করে নিখুঁত কামানো চুল। কানের লতিতে পিতলের নিয়েঙ গয়না, সেই গয়না থেকে লাল রেশমের গুচ্ছ দোদুল দুলছে। উজ্জ্বল তামাভ দেহে থরে থরে পেশীভাব। পরনে ওক ছালের লেঙতা। কড়ির বাজুবন্ধ। ছোট ছোট চোখে নিশ্চিত ঘাতকের ঝিলিক। হাতের থাবায় হাতখানেক লম্বা বর্শার ফলা।''[২১৩] আর পাহাড়ি নারী নিতিৎসুর বিবরণ দিতে গিয়ে সে জানিয়েছে — ''গলায় ছোট ছোট শঙ্খের মালা। মণিবন্ধে কড়ির কঙ্কণ। উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত। সোনালি স্তনচূড়া। পিঙ্গল চুলের গুচ্ছে টুঘুটুঘোটাঙ ফুল। কোহিমা থেকে বাপ এরি কাপড় এনে দিয়েছিল। কোমরের চারপাশ ঘিরে জানুর ওপর পর্যন্ত সেই শৌখিন আবরণ ঝলমল করে।''[২১৪] এ থেকেই সমস্ত পাহাড়ি নর-নারীর বহিরঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসটির নায়ক হিসেবে সেঙাই এবং নায়িকা হিসেবে মেহেলিকে অবিহিত করা যায়। তবে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে নাগা পাহাড়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে উপন্যাসটির একটি চরিত্রে পরিণত হয়েছে। কারণ উপন্যাসটির সমগ্র কাহিনি, ঘটনা, চরিত্রের উপর এই অঞ্চলটির অবিসংবাদিত প্রভাব আছে। অবশ্য উপন্যাসের শেষে নায়ক সেঙাই নাগা পাহাড়ের বাইরে গিয়ে প্রথম মানুষের জন্য দুঃখ-যন্ত্রণা অনুভব করে সভ্য হয়ে উঠেছে। তবে এটাও ঠিক যে, পাহাড়কে সে ভোলে নি। হয়তো জেল থেকে মুক্ত হবার পর সে পাহাড়েই ফিরে এসে হিংস্র পথে না গিয়ে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে পাহাড়ি মানুষগুলির মুক্তির কথা, উন্নতির কথা ভাববে এবং সেজন্য নিজেকে সমর্পণ করবে। ফলে এটা বলাই যায় যে,

চরিত্র চিত্রণের দিকে থেকেও 'পূর্বপার্বতী' উপন্যাসটিতে নাগা পাহাড় এবং সেখানে বসবাসকারী একদা আদিম মানুষদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই উপন্যাসে নাগাদের জীবন-জীবিকার বিবরণে জমি প্রস্তুত করে ধান, যব চাষের মত বিষয়গুলির উল্লেখ আছে। এতে হয়তো তাদের কিছুটা খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা হয়। তবে এরা বর্শা হাঁকরিয়ে বন্য পশু শিকারকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। এজন্য ছোট থেকেই পাহাড়ি শিশুরা তৈরি হয় — ''সামনের চত্তরে অনেকগুলো ছোট ছেলে বর্শা ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিশানা ঠিক করছিল। বড় হয়ে এরাই ওস্তাদ শিকারি হবে। . . . তাদের বয়স আট থেকে দশের মধ্যে। ন্যাংটো, হলদেটে গায়ের রং।''[২১৫] এই পশু শিকারের ক্ষেত্রেও তারা নানা নিয়ম-কানুন, প্রথাকে মেনে চলে — ''নাগাদের মধ্যে শিকারের একটি প্রথা আছে। শিকারিরা ঘন বনের ভেতর দিয়ে শিকারের সন্ধানে এগিয়ে যাবে। আর দু'জন মানুষ বহু দূরে পাহাড়ের প্রান্ত বেয়ে বেয়ে তাদের খাবার নিয়ে অনুসরণ করবে। বাঁশের চাঁচারিতে শব্দ তুলে দু'দলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়, এবং উভয় দলের অবস্থিতি বুঝিয়ে দেওয়া হয়।''[২১৬] শিকারে যাওয়ার আগের রাতে নাগা যুবকদের স্ত্রীর সঙ্গে শোওয়া নিষিদ্ধ। কেউ এই ভুল করে ফেললে 'রেন্‌জু আনিজা'র কোপে পড়তে হবে বলেই তাদের বিশ্বাস। তাই শিকারে গিয়ে রেঙকিলানকে আত্মদ্বন্দ্বে ভুগতে দেখা যায় — ''কাল রাতে সে মোরাঙে শুতে যায় নি। বউয়ের সঙ্গে এক শয্যায় শীতের রাত কাটিয়ে সেই কলুষিত দেহমন আর সেই অপবিত্র জঙগুপি কাপড় নিয়েই সে চলে এসেছে শিকারে। শিকারে আসার আগে শুদ্ধাচারের রীতি সে রক্ষা করেনি।''[২১৭] সেদিন শিকার না মেলায় তার আত্মদ্বন্দ্ব আরও বাড়ে এবং সে অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে। অবশেষে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে রেঙকিলান তার পাপাচারের মূল্য চোকায়। এভাবে রেঙকিলানের মৃত্যুকে সবাই 'রেন্‌জু আনিজা'র কোপ বলেই বিশ্বাস করে। ফলে শিকারে যাওয়ার আগের রাতে তার বউয়ের সঙ্গে শোওয়ার বিষয়টি সামনে এলে সবাই রেঙকিলানের এই অবস্থার জন্য তার বউ সালুনারুকে দায়ী করে এবং তাদের সর্দার বর্শা ফুঁরে তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়। সালুনারু অবশ্য জঙ্গলে পালিয়ে নিজেকে রক্ষা করে।

কৃষি ও শিকার ছাড়াও নাগাদের জীবনে লড়াই-যুদ্ধ লেগেই থাকে। এই সমস্ত লড়াই-যুদ্ধেরও কিছু নিয়ম-কানুন আছে, যা খাপেগার মুখে কেলুরি বস্তি ও সালুয়ালাঙ বস্তির মধ্যেকার যুদ্ধের গল্প থেকে জানা যায় — ''নাগাযুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী দুই দল দু'পাশের কিছুটা জঙ্গল পরিষ্কার করল। তারপর দু'দিকেই দু'টো মশাল জ্বালিয়ে পুঁতল। তারও পর যুদ্ধ আরম্ভের প্রাথমিক রীতি মেনে দু'দলই পরস্পরের দিকে ডিম ছুঁড়ে মারল। এই ডিম ছোঁড়া ভয়ানক অসম্মানের চিহ্ন। টিজু নদীর দু'পারে দুই প্রতিপক্ষ। কারো মাথায় মোষের শিঙের বাহারি মুকুট। হাতের মুঠোয় ভয়াল কুড়ালের মতো দা, কাঁধে বেতের খাঁচায় রাশি রাশি তীর। বুকের সামনে খাসেম গাছের ছাল দিয়ে বানানো ঢাল। মাথায় মোষের ছালের পেরঙ (শিরস্ত্রাণ), তাতে পিতলের কারুকাজ। তলপেটে গুঙ খেকঙ (লোহার আবরণ) আর বাহুসন্ধি পর্যন্ত বাঘছালের আমেজঙ খেকঙ (ঢাকনা)।''[২১৮] এত গেল দুই ভিন্ন গোষ্ঠীর লড়াই। এরা নিজেদের মধ্যেও সামান্য বিষয় নিয়ে মারামারি বাধিয়ে দেয় — ''যারা অত্যন্ত উৎসাহী, ঘর থেকে সাঁ করে তারা খারে বর্শা নিয়ে এসেছে। আকস্মিক খণ্ডযুদ্ধের প্রস্তুতি। এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই, হতবাক হবার কারণ নেই। পাহাড়ি গ্রামে বিন্দুমাত্র মতান্তর নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনে। বর্শার ফলায় সমস্ত ঝগড়াঝাঁটির অবসান হয়।''[২১৯] এ বিষয়ে নারী-পুরুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। কারণ — ''পাহাড়ি সমাজের রীতিতে মমতা নেই, করুণা নেই, সামান্য বিচ্যুতি ঘটলেও প্রেমিক পুরুষটি ক্ষমা করবে না।''[২২০] পুরুষদের প্রধান অস্ত্র বর্শা, আর মেয়েদের প্রধান অস্ত্র মেরিকেতসু। নারীরাও নিজেদের কেন্দ্র করে পাহাড়ি পুরুষদের মধ্যে লড়াই বাধানোকে গর্বের বলে মনে করে। তাই উপন্যাসে লিজোমুর উদ্দেশ্য মেহেলিকে বলতে শোনা যায় — ''খোন্‌কেকে পিরিত করিস, তা তো জানি। পাহাড়ি মাগি তুই; মোটেও একটা পুরুষকে নিয়ে খুশি থাকতে পারবি? . . . অনেক পুরুষকে একসঙ্গে মাতিয়ে দিবি, মজাবি। তারপর এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখবি। দু'বস্তিতে দাঙ্গা বাঁধাবি, রক্তে লাল হয়ে যাবে পাহাড়। তা না হলে কী জোয়ান মাগী হলি!''[২২১] মেহেলির নিজের বিয়ের ক্ষেত্রেও পাহাড়ে রক্ত ঝরছিল না বলে তাকে দুঃখ করতে দেখা যায়। অবশেষে তার কেলুরিতে অবস্থানের সময় তাকে উদ্ধার করতে আসা দুই

সালুয়ালাঙের যুবকের কেলুরির মানুষদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা তাকে স্বস্তি দেয়।

নাগা পাহাড়ে মূলত বিনিময় প্রথার মাধ্যমেই সমস্ত লেনদেন করা হয়। এই ব্যবস্থায় বর্শাকে সবচেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয়। ওষুধের দাম, নারীর ইজ্জতের মূল্য, বউপণ প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে মূল্য হিসবে বর্শা প্রথম সারিতে থাকে। এছাড়াও ধান, বিভিন্ন পশুও এবং তাদের শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও এই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তাই দেখা যায় যে, সেঙাইকে বশ করার জন্য মেহেলি ডাইনি নাকপোলিবার কাছে ওষুধ নিতে গেলে সে বলে — ''ওষুধের দাম আনবি চারটে বর্শা আর দু'খুদি (আড়াই সেরের মতো) ধান।''[২২২] এদিকে সেঙাই-এর বাবা সিজিটো সারুয়ামারুর স্ত্রী জামাতসুর ইজ্জত নষ্ট করে পালিয়ে গেলে খাপেগা সর্দার তার মা বেঙসানুকে বলে — ''শোন বেঙসানু, সিজিটো হুই জামাতসুর ইজ্জত নিয়েছে। তার দাম দিতে হবে তোকে। সারুয়ামারু হল জামাতসুর সোয়ামী। দু'টো শুয়ার আর সাতটা বর্শা দিয়ে দে সারুয়ামারুকে।''[২২৩]

অবশ্য উপন্যাসটিতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে নাগা পাহাড়ে টাকার আবির্ভাবকেও দেখানো হয়েছে। সারুয়ামারুর কাছে একটি রুপোলি মুদ্রা দেখে কেলুরি গ্রামের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায় — ''ঝকঝকে রুপোলি মুদ্রা। রোদ লেগে শুভ্র দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। অবাক বিস্ময়ে ধাতব বস্তুটির দিকে তাকিয়ে রইল সেঙাই। এ তার অচেনা। এর আগে কোনোদিনই এই গোলাকার মুদ্রাটির সঙ্গে তার পরিচয় হয় নি। বুড়ী বেঙসানুও সেটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে অবাক হয়ে। তার হিসেবহীন বয়সের অভিজ্ঞতায় এমন পদার্থ অজানাই রয়েছে।''[২২৪] এর পরের বিবরণে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ''ছোট্ট পাহাড়ি জনপদ কেলুরিতে এই প্রথম রুপোর টাকার আবির্ভাব। বিস্ময়ে ভয়ে সব মেয়েপুরুষ সেঙাই-এর মুঠির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একসময় সেঙাইর থাবা থেকে ছোঁ মেরে টাকাটা তুলে নিল একজন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। তার মুঠি থেকে আর একজন ছিনিয়ে নিল। তার মুঠি থেকে অন্য একজন নিল। এই প্রক্রিয়ায় টাকাটা মেয়েপুরুষের জটলায়

হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। টাকার এই আগমনকে বিস্ময় আর কৌতূহল দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো কেলুরি গ্রামের মানুষ।''[২২৫]

এই উপন্যাসে নাগা পাহাড়ের অধিবাসীদের জীবন-জীবিকার বিস্তারিত পরিচয়ের পাশাপাশি তাদের রীতি-প্রথা, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, লোককথা প্রভৃতিরও বিস্তারিত পরিচয় ঔপন্যাসিক দিয়েছেন। এই বিষয়টি শ্রদ্ধেয় সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোচরেও এসেছে — ''নাগাসমাজের নানাবিধ রীতি-প্রথা, উৎসব, অতিপ্রাকৃত সংস্কার ও পাপ-পুণ্য-ন্যায়-অন্যায়-মূলক জীবননীতির এক মনোজ্ঞ, তথ্যবহুল ও বাস্তব জীবনচর্যার সহিত দৃঢ়সংলগ্ন বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। সর্দারের স্বেচ্ছাচার, মোরাঙ-এ অবিবাহিত যুবকদের স্ত্রীসংসর্গ বর্জিত রাত্রিবাসের অলঙ্ঘ্য নির্দেশ, ঋতুচক্রের ও কৃষিকর্মের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎসবমণ্ডলী, আনিজার ক্ষমাহীন প্রতিহিংসা, ডাইনি নাকপোলিবার ইন্দ্রজাল ও বশীকরণমন্ত্র, বিবাহের পূর্বে বর-কন্যার দুইমাসব্যাপী বাধ্যতামূলক অদর্শন, শিকার-যাত্রার পূর্বে অশুচি স্ত্রীসংসর্গ পরিহার ইত্যাদি নানা কৌতুহলোদ্দীপক প্রথা ইহাদের জীবনকে একটা অত্যন্ত ঠাসবুনানো জটিল বিধি-নিষেধের জালে আবদ্ধ করিয়াছে। লেখকের তথ্যজ্ঞান ও বর্ণনা সরসতায় এই জীবনচিত্র পাঠকের নিকট অত্যন্ত উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে।''[২২৬] এই পাহাড়িদের শাসনবিধি, আচার-বিচারে যেমন কড়াকড়ি আছে, তেমনি শিথিলতাও আছে — ''পাহাড়ি গ্রামে যেমন নানা শাসনবিধি, আচার-বিচার, ন্যায়-অন্যায়ের কড়াকড়ি রয়েছে, ঠিক তেমনি খোলামেলা আকাশের নিচে দিনের আলোতে হঠাৎই হয়তো জীবনের আদিম প্রবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ দেখা যায়।''[২২৭] এদের সমাজে নারীদের যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়। তাই বিয়ের ক্ষেত্রে বউপণের ব্যবস্থা চালু আছে। খাপেগার গল্প থেকে জানা যায় যে, সেঙাই-এর ঠাকুরদা জেভেথাঙ নিতিৎসুকে বিয়ের ইচ্ছে প্রকাশ করলে — ''বিকেলের দিকে জেভেথাঙের পিসি বউ-পণ দেবার জন্য একশোটা বর্শা, পিতল আর কড়ির শৌখিন গয়না, কোহিমা থেকে কেনা এন্ডি কাপড় নিয়ে টিজু নদীর ওপারে চলে গিয়েছিল।''[২২৮] আবার নানকোয়া বস্তির বাঘমানুষ মেজিচিজুঙের সঙ্গে মেহেলির বিয়ের বউপণের বিবরণে বলা হয়েছে — ''টেনেন্যু মিঙ্গেলু। বউপণ। সেই বউপণ এসেছে নানকোয়া গ্রাম থেকে। পাঠিয়েছে মেজিচিজুঙের বাপ রাঙসুঙ।

দু'টো জোয়ান ছেলে এসেছিল রেঙমাপানি নদীর ওপারে মাঝারি আকারের গ্রাম নানকোয়া থেকে। সঙ্গে চারখানা বর্শা। অতিকায়। সেগুলোর গড়নের মধ্যে অতীতের ছাপ রয়েছে, প্রাচীনত্বের সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটে আছে। আর যৌতুক হিসেবে এসেছে কড়ির গয়না, কানের নীয়েঙ দুল, হাতির দাঁতের হার। মোষের শিঙের মুকুট, যার দু'পাশে হরিণের শিঙের বাহার। পেতলের গলাবন্ধ। আটর্ ফুলের সাজসজ্জা আর সাধারণ গড়নের পঞ্চাশখানা বর্শা।''[২২৯] সেঙাই-এর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্যেও মেহেলির ধর্ম বাপ খাপেগা সেঙাই-এর ঠাকুরমা বেঙসানুর কাছে বউপণ নিয়েছিল। বউপণ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও নাগারা নারীদের সম্মান দেয়। যেমন গর্ভবতী নারীদের আঘাত করা নাগা নিয়মের বিরোধী — ''গর্ভবতী নারীকে আঘাত করা এই পাহাড়ের নীতিবিরুদ্ধ কাজ। এমন অপকর্ম কেউ করে বসলে তার শাস্তি হল মৃত্যু।''[২৩০] এই নারীটি শত্রুপক্ষের হলেও তার আঘাতকারীকে এরা মৃত্যুদণ্ড দিতে এগিয়ে আসে। তাই দেখা যায় যে, পুলিশ সুপার বসওয়েল কেলুরি বস্তির গর্ভবতী নারী জামাতসুকে আঘাত করলে শত্রুপক্ষের হলেও সালুয়ালাঙের লোকেরা ক্ষেপে যায়।

নাগা যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রেম-মিলন প্রভৃতি বিষয়ে তেমন কড়াকড়ি নেই। একটু আনন্দের উপকরণ পেলেই তারা সকলে মিলে উচ্ছ্বাসে ভেসে ওঠে। এরা খুব হুল্লোড় করতেও ভালোবাসে। টেটসে উৎসব, জা কুলি উৎসবের দিনগুলিতে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে — ''আর কয়েকদিন পরেই জা কুলি উৎসব শুরু হবে পাহাড়ি জনপদগুলোতে। তারই প্রস্তুতি চলছে কেলুরি গ্রামে। গানবাজনা হবে, মোষ বলি দিয়ে সারা গ্রামের লোক ভোজ খাবে। খুশিতে, হুল্লোড়ে, রোহি মধুর মৌতাতে, নাচগানের মধুর নেশায় পাহাড়ি মানুষগুলো মাতাল হয়ে যাবে। জা কুলি উৎসবের দিনরাত্রি, প্রতিটি মুহূর্ত এই পাহাড় বুঁদ হয়ে থাকবে।''[২৩১] এইসব উৎসবের প্রধান অঙ্গই হল নাচগান। এরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে মিলে নাচ-গান শুরু করে দেয়। এক্ষেত্রে তারা কোনো ভেদাভেদ রাখে না। তাদের নাচের বিবরণে বলা হয়েছে —

''একদিকে ছ'টি জোয়ান ছেলে, পরস্পরের কাঁধের ওপর হাত দিয়ে দাঁড়ানো যেন একটি পাহাড়ি ছন্দ। আর একপাশে ছ'টি যুবতী মেয়ে। জোয়ানদের মতো

তারাও কাঁধে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটু পর্যন্ত তাদের বিচিত্র রঙের কাপড়ে মানুষের কঙ্কাল, মোষের মাথা আর বর্শা এবং ঢাল আঁকা রয়েছে। দু'টি দলের সকলেরই কোমরের ওপর থেকে ঊর্ধ্বদেহ অনাবৃত।

যুবতীদের কানে পিতলের নীশে দুল। মণিবন্ধে হাতির দাঁতের মোটা মোটা বালা। চুলের ভাঁজে ভাঁজে সম্বরের ছোট ছোট শিঙ গোঁজা। কানের পাতায় সাঙলিয়া লতার নীলাভ ফুল। ছেলেদের মাথায় মোষের শিঙের মুকুট। কানে আউ পাখির পালক গোঁজা। গলায় কড়ির মালা।

দুই দলের মাঝখানে তিনটি বাঁশের খুঁটি পোঁতা রয়েছে। সেই খুঁটিগুলোকে চক্রাকারে ঘিরে একবার দু'টো দল নাচতে নাচতে মুখোমুখি হচ্ছে। পরস্পরের মাথায় মাথা ঠেকছে। তার পরেই আবার পেছন দিকে পা ছুড়ে ছুড়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে পিছিয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে থামছে। মাত্র একটি মুহূর্ত। আবার সামনের দিকে ঝুঁকে ছন্দিত পা ফেলে ফেলে অন্য দলটির দিকে এগিয়ে যাওয়ার পালা।

'দ্রাম — ম্ — ম্ — ম্ — '

গম গম শব্দ উঠছে মেথি কেকোয়েনঘ্যু খুলি বাদ্যযন্ত্র থেকে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়েছে বাঁশির সুর। আর সেই আবহ বাজনার সঙ্গে পা ফেলে ফেলে নাচ চলেছে। উদ্দাম নাচ, দুর্বার নাচ, অবিরাম নাচ। পায়ের আঘাতে আঘাতে রাঙা ধুলোর মেঘ উড়ছে।

পাহাড়িদের এই নাচকে বলে ইয়াচুমি কোঘিল নাচ।''[২৩২]

এই নাচের সময় — ''মেয়ে আর পুরুষ — সব পাশাপাশি বসেছে। ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে একজন আর একজনের কাঁধের ওপর হাত তুলে দিয়েছে। আর নাচের তালে তালে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। উলঙ্গ আকাশের তলায় এই বিচিত্র পাহাড়ি গ্রাম। এই আকাশের মতো, এই পাহাড়ের মত অকপট তাদের হাসি আর শোকের প্রকাশ।''[২৩৩]

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের নিয়ম-কানুনে কড়াকড়ি আছে। অবিবাহিত যুবকদের নাগা যুবতীদের কামনা ও রিপুর তাড়না থেকে রক্ষা করার জন্য কিছু প্রথা চালু করা হয়েছে। এই প্রথা অনুযায়ী অবিবাহিত যুবকদের রাতের থাকার জায়গা মোরাঙে নাগা যুবতীদের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে — ''মোরাঙে মেয়েদের

প্রবেশ নিষিদ্ধ। . . . নাগা পাহাড়ের এই প্রথাকে অসম্মান করে কোনো মেয়ের মোরাঙে ঢোকার উপায় নেই। কোনোভাবেই, কোনো কারণেই এই প্রথা ভাঙা চলবে না। মোরাঙ হল অবিবাহিত জোয়ান ছেলেদের নৈতিক জীবনের পীঠভূমি। নারীর কামনা আর রিপুর তাড়না থেকে অনেক, অনেক দূরে এর নিষ্পাপ অস্তিত্ব, এর পবিত্রতা নারীদেহের আসক্তি দিয়ে কলুষিত করে তোলা রীতিমতো অপরাধ। সে অপরাধের শাস্তি নির্মম, নিষ্ঠুর। অনিবার্য মৃত্যু দিয়ে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।''[২৩৪] এদের মধ্যে অবাধ মিলনের বিষয়টি গুরুত্ব পেলেও কারও বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতে গিয়ে কোনো নাগা পুরুষ ধরা পড়ে গেলে সকলে মিলে তার তাৎক্ষণিক মৃত্যুদণ্ড অথবা জরিমানা করা হয়। তাই দেখা যায় যে, সেঙাই-এর বাবা সিজিটো সারুয়ামারুর স্ত্রী জামাতসুর সঙ্গে সহবাসে ধরা পড়লে প্রাণভয়ে পালিয়ে যায় এবং তার মা বেঙসানু সারুয়ামারুকে জরিমানা দিতে বাধ্য হয়।

নাগাদের বিশ্বাস-সংস্কারে দেবদেবী, আনিজা, ডাইনি প্রমুখও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাই অপদেবতা তথা আনিজাকে সন্তুষ্ট করতে মাঝেমাঝেই তাদের পশুবলি দিতে দেখা যায়। এজন্য প্রত্যেক বাড়িতেই একটি মোষবলির হাড়িকাঠ ও তার পাশে দেবতার জন্য একটি খয়েরি পাথর রাখা হয় — ''মোষবলির হাড়িকাঠের ঠিক পাশেই একটা খয়েরি রঙের পাথর। এ পাথর অতি পবিত্র। এ পাথর ঘরের চারপাশ থেকে দুষ্ট প্রেতাত্মাকে হাজার পাহাড় ফারাকে নির্বাসিত করে রাখে। পাহাড়ি মানুষগুলোর তাই বিশ্বাস। এমন পাথর প্রতিটি বাড়ির সামনে সযত্নে রক্ষিত আছে।''[২৩৫] পাহাড়ে বাঘ-মানুষ অর্থাৎ বাঘকে নিজের বশে রাখা মানুষ থাকে বলে নাগারা বিশ্বাস করে। তাকে সবাই ভয়ও করে — ''টেমি খামকোয়ান্যু (বাঘ-মানুষ)। ও নির্ঘাত বাঘ-মানুষ। শিগ্‌গির চল। চিতাবাঘ চালান করলে একেবারে সাবাড় হয়ে যাব সবাই।''[২৩৬] এই উপন্যাসে বাঘমানুষ হল নানকোয়া বস্তির মেজিচিজুঙ — ''এ নির্ঘাত হুই নানকোয়া বস্তির মেজিচিজুঙ। পশ্চিম, উত্তর আর দক্ষিণ পাহাড়ের বনে ওর অনেক বাঘ পোষা আছে। রাত্তিরে বাঘ নিয়ে বেরোয় ইদিকে সিদিকে — ''[২৩৭] এছাড়াও পাহাড়ে ডাইনি বুড়ি নাকপোলিবা থাকে। তাকে সবাই ভয় করলেও সে পাহাড়ি মানুষগুলোকে মানুষ বশ করার ওষুধ দেয়। এই উপন্যাসে ডাইনি বুড়ি নাকপোলিবা নিজেকে 'রেন্‌জু

আনিজা' অর্থাৎ অপদেবতা বলে পরিচয় দিয়ে নিজের কাজের বিবরণে জানিয়েছে — ''রেঙকিলান! রেন্‌জু আনিজা! আমিই তো রেন্‌জু আনিজা। তোর সোয়ামীকে আমিই মেরেছি। কী মজার খেলা বল তো। রেঙকিলানের নাম ধরে সেদিন দক্ষিণ পাহাড় থেকে ডাক দিলাম। ব্যস, তারপরেই শয়তানটা একেবারে খতম। আমি এতদিন খালি ভেবেছি ছোঁড়াটা আবার মরল কিনা। তুই আমাকে বাঁচালি। খেলাটা নতুন ধরেছি কিনা। বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। হিঃ-হিঃ-হিঃ — ''[২৩৮] উপন্যাসটিতে নাকপোলিবার কাছে দীক্ষা নিয়ে কেলুরি ও সালুয়ালাঙ — উভয় বস্তি থেকেই বিতাড়িতা রেঙকিলানের বিধবা স্ত্রী সালুনারুকে ডাইনিতে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়।

এগুলি ছাড়াও এই উপন্যাসে আরও কিছু পাহাড়ি প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়। তার মধ্যে অন্যতম হল যে, পাহাড়ে কোনো বিয়ে সম্পন্ন হলে নিজেরা সুখী হওয়ার উদ্দেশ্যে ছেলে পক্ষ থেকে মাংস বিতরণ করা হয়, যাকে 'আওশে ভোজ' বলে — ''একসময় কাটারি কেসুঙ থেকে আওশে ভোজের মাংস নিয়ে এল মেহেলি আর পলিঙা। এটা এই পাহাড়ি জনপদগুলির রীতি। আওশে ভোজের দিনে প্রতিবেশিদের মোষের মাংস বিতরণ করলে নব দম্পতির জীবন সুখ শান্তিতে ভরে উঠে।''[২৩৯] কারও আনন্দের মুহূর্ত এলেও ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। তাই পুত্র খোন্‌কের হত্যাকারী সেঙাই-এর মৃত্যু হয়েছে ভেবে সর্দারের কথামত সাঞ্চামখাবা মাংস বিলোতে রাজী হয়। আবার নাগা যুবকেরা শিকারে বের হলে যে পশু শিকার করে আনে তার মাংস সকলে মিলে ভাগ করে নেওয়াও এদের একপ্রকার রীতির মধ্যে পড়ে। আর আনিজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যখন তখন পশু-পাখি বলি দেওয়া এবং সেগুলির মাংস পুড়িয়ে খাওয়া এদের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয় হিসেবেই গৃহীত হয়।

এই সমস্ত প্রথা-সংস্কার, রীতি-বিশ্বাসের পাশাপাশি উপন্যাসটিতে নাগা উপজাতির কিছু লোককথার পরিচয়ও পাওয়া যায়। এই লোককথাগুলির মধ্যে কিছু কেলুরি বস্তির সর্দার খাপেগা বলেছে; আর বাকিগুলি সেঙাই-এর ঠাকুমা বুড়ি বেঙসানু বলেছে। বুড়ি বেঙসানু তার লোককথা পরিবেশনের নিরিখে অনেকটাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র সুচাঁদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তার মুখ থেকেই আমরা নানা পাহাড়ি সংস্কারের গল্প যেমন শুনতে পাই, তেমনি পাহাড়ি

অপদেবতা 'রেনজু আনিজা' থেকে শুরু করে নানা দেবদেবীর প্রসঙ্গও জানতে পারি। সে উপন্যাসটিতে নিজের বিশ্বাস মত পাহাড়ে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, 'সুঙকেনি' অর্থাৎ ভূমিকম্প প্রভৃতির ব্যাখ্যা যেমন দিয়েছে, তেমনি সে সবের পিছনে নানা গাল-গল্প, লোককথাকেও জুড়ে দিয়েছে। এইরকমই সূর্যদেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মুরগী বলি দেওয়ার একটি গল্পের অবতারণাও সে এই উপন্যাসে করেছে। এই উপন্যাসে পাহাড়ে প্রচলিত নাগাদের আর একটি রীতির কথাও বলা হয়েছে — ''জেনুর (মধ্যরাত্রি) আগে গ্রামে গ্রামে নাগারা একবার জেগে ওঠে। নাগা পাহাড়ের এ একটা প্রচলিত রীতি।''[২৪০] এছাড়াও উপন্যাসটিতে নাগা উপজাতিদের আর একটি প্রথার পরিচয় আছে। এই প্রথাটি হল যে, কোন বস্তির নারী যদি অন্য বস্তির মানুষের দ্বারা অপহৃত হয় বা বস্তি ত্যাগ করে, তাহলে সেই বস্তির খুব বদনাম হয় এবং অন্যান্য বস্তির লোকেরা তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে একঘরে করার ভাবনা-চিন্তা শুরু করে। এজন্য মেহেলি সালুয়ালাঙ ছেড়ে কেলুরিতে চলে এলে অন্যান্য বস্তির লোকেরা সালুয়ালাঙের মানুষদের সংস্রব ত্যাগ করতে উদ্যোগী হয়। তাই সালুয়ালাঙের লোকেরা মেহেলিকে উদ্ধারের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে তারা প্রথমে মেহেলির বাপকে বউপণ পাঠানো মেজিচিজুঙের বাবা নানকোয়া বস্তির সর্দারের সাহায্য চেয়েছে এবং পরে ইংরেজদের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করেছে।

এই উপন্যাসে নাগা পাহাড়ের অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস-খাদ্যতালিকা, পোশাক-আশাক, বাসস্থানের মত জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বিষয়গুলিরও বিস্তৃত বিবরণ আছে। এদের খাদ্যতালিকায় সবার উপরে থাকে নানা ধরনের পশুর মাংস। এরা সাধারণত এইসব মাংস আগুনে ঝলসিয়ে আধপোড়া অবস্থায় নুন অথবা পাহাড়ি ঝর্নার নোনা জল এবং টকজাতীয় বৈচী ফল সহযোগে খায়। এছাড়াও কাঁচা চাল, কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা আদাও এদের খাদ্য তালিকায় থাকে। তবে পাহাড়ের ভয়ঙ্কর শীতের কবল থেকে রেহাই পাবার জন্য এদের আবশ্যিক পানীয় হল উত্তেজক রোহি মধু, যা এরা বাঁশের চোঙায় করে ঢকঢক করে গিলে খায়। উপন্যাসটিতে এইরকম একটি খাদ্যদৃশ্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে — ''ওঙলে বড় বড় টঘুটুঘোটাঙ পাতার ওপর কাঁচা চাল, ঝলসানো বাসি মাংস, কাঁচা লঙ্কা আর আদা সাজিয়ে অপেক্ষা করছিল। বাঁশের চোঙায় ভর্তি রয়েছে উত্তেজক পানীয়। হলদে রঙের রোহি মধু। . . . থাবায় থাবায়

কাঁচা চাল মুখে তুলছে সেঙাই। সেই সঙ্গে, কাঁচা লঙ্কা আর খণ্ড খণ্ড মাংস। এক সময় খাবার শেষ হয়ে গেল। তারপর বাঁশের বিশাল পানপাত্রটা ঠোঁটের ওপর তুলে নিল সে। একটি মাত্র চুমুক। রোহি মধুর শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত শুষে নিয়েছে সে।''[২৪১] উত্তেজক পানীয় রোহি মধু ছাড়াও এরা প্রচুর পরিমাণে কাঁচা তামাক চিবিয়ে নেশা করে। সভ্যজগতের খাবার-দাবারের সঙ্গে এদের অধিকাংশের পরিচয় নেই। তাই সারুয়ামারুর সঙ্গে ইম্ফলের রাস্তায় এক হোটেলে মানুষজনকে ভাত খেতে দেখে সেঙাই অবাক হয়েছে। এরপর নিজে খেতে বসে ভাত, ডাল, মাগুর মাছের ঝোল প্রচুর তৃপ্তি সহকারে খেলেও আশ্চর্য তার থেকেও বেশি হয়েছে।

উপন্যাসটিতে নাগাদের পোশাক-আশাকের বিবরণে বলা হয়েছে যে, এদের নর-নারী নির্বিশেষ সকলের উর্দ্ধাঙ্গ একপ্রকার অনাবৃত থাকে। তবে এরা নিম্নাঙ্গে কাপড় পরিধান করে। নিম্নাঙ্গের কাপড়-চোপড় থেকেই এদের অবিবাহিত ও বিবাহিতের পরিচয় পাওয়া যায় — ''একজনের কোমরের চারপাশে হাতখানেক চওড়া পী ম্যুঙ কাপড়। গাঢ় কালো রঙের প্রান্তে ঘন লালের আঁকিবুকি। পরিষ্কার কৌমার্যের সংকেত। আর একজনের পরনে জাঙগুপি কাপড়, একেবারে জানু পর্যন্ত নেমে এসেছে। ঘন নীল রঙের উপর চারটে সাদা সাদা দাগ। সাদা দাগের আড়াআড়ি চারটে লাল রেখা আঁকা। বিবাহিতের পরিচয়।''[২৪২] ভয়ঙ্কর শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য এরা সারা গায়ে দড়ির লেপ জড়িয়ে রাখে। বাসগৃহে বা মোরাঙেও তারা লেপ ব্যবহার করে। নাগারা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সাজগোজ করতে ভালোবাসে। পিতলের নিয়েঙ গয়না, লাল রেশমের গুচ্ছ, ওক ছালের লেঙতা, কড়ির বাজুবন্ধ, ছোট ছোট শঙ্খের মালা, কড়ির কঙ্কণ প্রভৃতি তো পরিধান করেই সেইসঙ্গে রঙবেরঙের পশু-পাখিদের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং বিভিন্ন ধরনের পাহাড়ি ফুলে এরা নিজেদের সজ্জিত করে। সভ্যজগতের পোশাক-আশাকের খবর এরা জানেই না — ''প্যান্ট, জামা, কোট — বিচিত্র সব শব্দ, অদ্ভুত সব নাম। পাহাড়িদের কাছে এই নামগুলো একান্তই অজানা। নির্বাক তাকিয়ে থাকে সকলে।''[২৪৩] তাই মণিপুর জেলে কাটানো এটোঙার সাজপোশাকতাদের অবাক করে — ''এটোঙার সমস্ত দেহে অদ্ভুত সাজপোশাকঝলমল করছে। নীলচে হাফ প্যান্ট, মাথায় সাহেবি টুপি, সবুজ জামা, কাঁধ

থেকে কোমর পর্যন্ত ঝোলানো একটা মণিপুরী ঝোলা। পায়ে পাশুটে রঙের বুট জুতো। প্যান্ট, টুপি, শার্ট, জুতো — পাহাড়ি মানুষের জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় এই রহস্যময় বস্তুগুলোর অস্তিত্ব নেই। পাহাড়-বন-ঝরনা-সিঁড়িখেত ছাড়া এই সব অদ্ভুত জিনিস তারা কোনোদিনই দেখে নি।''[২৪৪]

নাগাদের বাসস্থানের বিস্তারিত পরিচয়ও এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। তারা পাহাড়ে যে সমস্ত বাড়িতে থেকে সংসার পাতে সেগুলিকে ওদের ভাষায় 'কেসুঙ' বলে। বংশ অনুযায়ী এই কেসুঙগুলির নামকরণ করা হয়। যেমন জোরি কেসুঙ, জোহেরি কেসুঙ প্রভৃতি। তবে অবিবাহিত যুবকেরা কেসুঙে থাকে না; তারা থাকে মোরাঙে; কারণ — ''মোরাঙই হল গ্রামের মর্যাদা, গ্রামের প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষর।''[২৪৫] এই উপন্যাসে মোরাঙের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। ঔপন্যাসিক এইরকম একটি মোরাঙের বিবরণে জানিয়েছেন —

''মোরাঙ মানেই গ্রামের প্রতিষ্ঠা, গ্রামের মর্যাদা, গ্রামের কৌলিন্য। . . . সামনের দিকে অর্ধবৃত্তের আকারে বাঁশের দরজা। দরজার দু'ধারে প্রকাণ্ড দু'টো মোষের মাথা বর্ষার ফলায় গাঁথা রয়েছে। ওপরে সোনালি খড়ের নতুন চাল। চালের দু'পাশে খড়ের গুচ্ছ দুলছে। দেওয়ালে দেওয়ালে অজস্র আঁকিবুকিতে মোষের রক্তের মাঙ্গলিক চিহ্ন। পৃথিবীর আদিমতম শিল্প।

দু'পাশে হাত তিরিশেক লম্বা পাহাড়ি দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে বর্শায় ফোঁড়া রয়েছে বাঘের মুণ্ডু, সম্বরের লেজ, মানুষের করোটি, হরিণ আর মোষের ছাল।

দরজা দিয়ে ঢুকেই বসার ঘর। তারপরেই চওড়া পথ চলে গিয়েছে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। সে পথের দু'ধারে সারি সারি বাঁশের মাচান। গ্রামের অবিবাহিত ছেলেদের রাত্রির বিছানা। এই মাচানগুলোর ওপর পাতা হয়। মাচানগুলোর নিচে রাশি রাশি বর্শা, তীর-ধনুক, ঢাল, মেরিকেতসু। নানা আকারের, নানা নামের ভয়াল সব অস্ত্রশস্ত্র। শত্রুর বর্শা থেকে গ্রামরক্ষার সুনিপুণ আয়োজন, ত্রুটিহীন বন্দোবস্ত।''[২৪৬]

এই সমস্ত মোরাঙে মেয়েদের প্রবেশাধিকার নেই। নাগা অবিবাহিত যুবতীদের গাছের ওপরে ঘর করে থাকতে হয় — ''গাছের ডালে ছোট্ট একখানি ঘর। বাঁশের দেওয়ালে লতার বাঁধন আর মাথায় আতামারি পাতার চাল। এই ঘরখানা মেহেলির।

রাতে এখানেই তার নিঃসঙ্গ বিছানা পাতা হয়। কুমারী মেয়ের একক শয্যা পুরুষের কামনা থেকে অনেক, অনেক উঁচুতে যেন উঠে এসেছে।''[২৪৭] উপন্যাসটিতে গুহাস্থিত ডাইনি নাকপোলিবার আস্তানার পরিচয়ও আছে — ''মেঝের এদিকে সেদিকে ইতস্তত ছড়ানো গুনু পাতা, মানুষ আর মোষের হাড়। যুচোঙন্যু পাখির বাদামি রঙের কঙ্কাজল। বাঁশের পাত্র, কাঠের মাচান। পাথরের খাঁজে খাঁজে আগুন জ্বালিয়ে এই ভয়ঙ্কর পাহাড়ি গুহায় খানিকটা উত্তাপ সৃষ্টি করেছে ডাইনি নাকপোলিবা।''[২৪৮] এসবের পাশাপাশি পাহাড়ি কবিরাজ 'তামুন্যু'র চিকিৎসা পদ্ধতির কথাও উপন্যাসে আছে। তবে বিচিত্র এই পদ্ধতি। তাই বর্শাবিদ্ধ খোন্‌কের চিকিৎসায় দেখা যায় — ''চারপাশে একবার চনমন করে তাকিয়ে তামুন্যু তার মুখখানা খোন্‌কের বুকের উপর রাখল এবং চুকচুক শব্দ করে ক্ষতমুখ থেকে লালাভ রক্তধারা শুষে নিল। পাহাড়ি চিকিৎসার এ এক বীভৎস পদ্ধতি, এক নারকীয় প্রক্রিয়া।''[২৪৯] পাহাড়িরা শরীর-স্বাস্থ্যের ব্যাপারে এইসব 'তামুন্যু'দের উপরই নির্ভর করে। আর যদি 'তামুন্যু' কোনো রোগীকে সারাতে না পারে, তাহলে 'আনিজা'র দোষ দিয়ে তাকে বিসর্জনের নির্দেশ দেয়। খোন্‌কের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটা দেখা যায়।

এই উপন্যাসটির ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিক অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তিনি মান্যচলিত বাংলায় উপন্যাসটি লিখলেও এখানে প্রচুর পরিমাণে নাগা শব্দের ব্যবহার করেছেন এবং পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে সেই সমস্ত শব্দের বাংলা অর্থও করে দিয়েছেন। এই উপন্যাসে ব্যবহৃত এইরূপ কিছু নাগা শব্দ হল — 'টেফঙ' (পাহাড়ি বানর), 'আপোটিয়া' (তুই মর), 'সু খুঙতা' (ক্ষয়িত চাঁদ), 'পেনেসেঙ্গু' (পুরোহিত), 'আসহোয়া' (বন্ধু), 'তামুন্যু' (চিকিৎসক), 'মেরিকেতস', 'থেনি মী' (স্ত্রীলোকের বর্ষা), 'লগোয়া পন্যু' (প্রেমিক), 'লগোয়া লেন্যু' (প্রেমিকা), 'আপোজি' (বান্ধবী), 'খুলি' (বাঁশি) 'খুঙ' (দোতারার মত বাদ্যযন্ত্র), 'আখুতসা' (চাল রাখার পাত্র), 'টেনেন্যু মিঙ্গেলু' (কন্যাপন), খুনো (আবাদী জমি), জেনু (মধ্যরাত্রি), আয়োঙ্গে (হার), খারোনজে (এক ধরনের দা), অ্যাবোয়া (তলোয়ার জাতীয় অস্ত্র), সাসুমেচু (ভয়ঙ্কর লোভী মানুষ), আসান্যু (সমতলের বাসিন্দা), সুঙকেনি (ভূমিকম্প) প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি নাগাভাষার প্রচুর গাছপালা, রীতি-নীতি, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির নাম যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি নাগাদের বিভিন্ন মাসের নাম,

ঋতুর নামের উল্লেখও করেছেন। নাগাদের মাসের নামগুলি হল — নগদা সু মাস, জা কুলি মাস, নসু কেহেঙ মাস, লে কেফু মাস, লো শি মাস, তেলেঙ্গা সু মাস প্রভৃতি। আর নাগা ঋতুর মধ্যে আমরা নট্‌সে ঋতু, সাঙসু ঋতু প্রভৃতি ঋতুর নাম জানতে পারি। ঔপন্যাসিক এসবের পাশাপাশি কিছু নাগাভাষার গানও উপন্যাসটিতে তুলে এনেছেন। এরূপ দু'টি গান হল —

১। ''আনা এচাঙচা লেচো,
রেচিঙ হামবঙ ইসোনিল।
আনা এচঙচো লোচো,
ইজেম হামবঙ ইসোনিল।''[২৫০]

২। ''ম্যুখে রেনি নুকেশে লে হো,
সুলে ফুচুলুগি।
এল হো নায়েঙ কোহালুগি লে হো,
আমহু রেমিন্যু!''[২৫১]

উপন্যাসটির ভাষা ব্যবহারের এই সাফল্য দেখেই শ্রদ্ধেয় সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন — ''লেখকের ভাষার অসাধারণ প্রকাশ ও দ্যোতনাশক্তি সমস্ত কাহিনীটিকে আমাদের নিকট জীবন্ত ও রসোচ্ছল করিয়া তুলিয়াছে। নাগাদের সংলাপ ও ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীটি বাংলাভাষায় আশ্চর্য সজীবতার সহিত ভাষান্তরিত হইয়াছে। আমাদের নিশ্চিত প্রত্যয় জাগে যে, যদি নাগারা বাংলা জানিত তবে নিঃসংশয়ে এইরূপ ভাষাতেই তাহাদের ভাব ও সীমাবদ্ধ জীবনবোধটি প্রকাশ করিত। তাহাদের প্রচুর রোষ-ব্যঙ্গ-ভর্ৎসনা মিশ্রিত সম্বোধন প্রণালী, তাহাদের স্পর্ধা জানাইবার ও গালাগালি দিবার বিশিষ্ট ভঙ্গী, তাহাদের প্রেম-বন্ধুতা সহৃদয়তা প্রভৃতি কোমলতর ভাব-প্রকাশের রীতি, তাহাদের অতিপ্রাকৃত বিভীষিকাবোধ, এমনকি তাহাদের দৈহিক প্রয়াস-প্রতিক্রিয়ার রূপটিও আশ্চর্য সুসঙ্গতির সহিত বাংলাভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছে।''[২৫২]

এইভাবে প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী' উপন্যাসটি বিচার-বিশ্লেষণ করলে এখানে আঞ্চলিক উপন্যাসের নানা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। ঔপন্যাসিক এখানে পটভূমি হিসেবে মূল জনসমাজ থেকে বাইরে অবস্থিত তথাকথিত বিচ্ছিন্ন অঞ্চল রূপে নাগা পাহাড়কে যেমন তুলে এনেছেন, তেমনি এই পাহাড়ে বসবাসকারী নাগা উপজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির জীবনচর্যার সর্বাঙ্গীণ চিত্রও প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এই বিষয়টির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে দেখি — ''উপন্যাসে বর্ণিত নাগাজাতি বর্বরতার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম না করিলেও উহার বিশিষ্ট জীবনবোধ, অবিচল সমাজানুগত্য, সর্বব্যাপী অতিপ্রাকৃত সংস্কারাধীনতা ও ক্ষাত্র আদর্শের একটা হিংস্র, রক্তলোলুপ বিকৃতির জন্য আমাদিগকে অনেক সভ্যতার হোমারিক যুগের গ্রীক রাজন্যবর্গের, এমন কি স্কটলণ্ড-ইংলণ্ডের সীমান্ত-প্রদেশের গোষ্ঠীবিরোধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই গোষ্ঠীজীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি, বংশাভিমান সর্বস্বতা, দুইটি দলের মধ্যে পুরুষপরম্পরাগত, অনির্বাণ বিরোধ, উহার অত্যাজ্য সমাজবিধি, উৎসবের বিভিন্ন উপলক্ষ ও প্রকরণ, দলপতির নির্বিচার শাসন, অপরাধবোধের সদাজাগ্রত উপস্থিতি, উহাদের মুখের ভাষায় মনের অনাবৃত প্রকাশ, আবেগের জ্বালাময় দাহ — সমস্তই ছবির ন্যায় গাঢ় বর্ণপ্রলেপে ও যথোপযুক্ত গতিবেগ ও নাটকীয়তার সহিত আমাদের নিকট অবিস্মরণীয়ভাবে অংকিত হইয়াছে।''[২৫৩] তিনি এখানেই থেমে থাকেন নি, এই উপন্যাসটির আরও প্রশংসা করে তিনি বলেছেন — ''. . . 'পূর্ব পার্বতী' বিশুদ্ধ আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা সর্বতোভাবে পূরণ করে।''[২৫৪] তার মত অনেকেই 'পূর্বপার্বতী' আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সফল বলে মত দিয়েছেন। আমরা পূর্বেই 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থটির এবং শ্রদ্ধেয় সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের এ সংক্রান্ত বক্তব্যের উল্লেখ করেছি। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'-এ এদেশে, স্বাধীনতার পরে, আঞ্চলিকতার তাগিদের পশ্চাতে দেশকে জানতে চাওয়ার একটা অবচেতন তৃষ্ণার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে কিছু লেখকের বেশ কয়েকটি উপন্যাসের নাম করেছেন, যার মধ্যে 'পূর্বপার্বতী'র কথাও আছে।

তবে প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী' উপন্যাসটি সম্পূর্ণ সফল আঞ্চলিক উপন্যাস, এটা এক কথায় মেনে নেওয়াও যায় না। উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রে এর সীমা-সংহতি, চরিত্র চিত্রণ, তাদের জীবন-জীবিকা, রীতি-নীতি, প্রথা-সংস্কার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, লোককথা, খাদ্যাভ্যাস-খাদ্যতালিকা, পোশাক-আশাক, বাসস্থান, ভাষা ব্যবহারের মত বিষয়গুলিতে প্রশ্নের তেমন অবকাশ নেই এটা ঠিকই; কিন্তু তা যতক্ষণ পর্যন্ত নাগা পাহাড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ঠিক ততক্ষণ পর্যন্তই। উপন্যাসটির পটভূমি শেষপর্যন্ত আদিম সংস্কৃতির নাগাপাহাড়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি; সেখান থেকে বেরিয়ে সভ্যজগতের আলো পৌঁছানো কোহিমায় চলে এসেছে। এখান থেকে খ্রিস্টান ধর্মযাজক, ইংরেজ সেনা অফিসার, রানী গাইডিলিও উপন্যাসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। ফলে নাগা সংস্কৃতির ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক সেঙাই নাগা পাহাড় থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে শিলং পাহাড়ের কারাগারে। সেখানে তার নবজন্ম ঘটেছে — সে মাধোলালের অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুতে বেদনা অনুভব করেছে, অন্যের প্রাণ নেওয়া যে সেঙাই-এর কাছে এতদিন অগ্রাধিকার পেত তার মধ্যেই দুঃখ, মমতার জন্ম হয়েছে। ফলে তার আদিম জীবনও শেষ হয়েছে। এদিকে ইংরেজদের আগ্রাসনে নাগা সংস্কৃতিও বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। অবশ্য আঞ্চলিক সংস্কৃতির ধ্বংস হওয়া আঞ্চলিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। আমরা এর আগেও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর মত সফল আঞ্চলিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি দেখতে পেয়েছি। তাই এটুকু বিতর্ক স্বীকার করেই 'পূর্বপার্বতী'কে একটি সফল আঞ্চলিক উপন্যাসের অভিধা দিতে হয়।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের **'গড় শ্রীখণ্ড'** প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। এটি বাংলা সাহিত্যের একটি বহুল আলোচিত উপন্যাস। এই উপন্যাসটির ঔপন্যাসিক সম্পর্কে অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ বলেছেন — ''আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। একদিকে পদ্মা অন্যদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা তাঁর কাহিনীর ভৌগোলিক সীমারেখা। উত্তরবঙ্গের মানুষ ও নিসর্গ তাঁর রচনার মূল উপকরণ। . . . তীব্র সমাজচেতনা এবং ইতিহাসবোধ তাঁর রচনার অন্যতম লক্ষণ।''[২৫৫] আর উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন — ''গড় শ্রীখণ্ড (১৯৫৭) অমিয়ভূষণ মজুমদার

রচিত উপন্যাস। উত্তরবঙ্গে পদ্মাতীরে 'বাঙাল নদী পদ্মা' যেখানে বন্ধনে পড়েছে সেখানেই গড় শ্রীখণ্ডের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা। সেখানে আছে মধ্যযুগের স্মৃতিবাহী জমিদার পরিবার, ব্রাত্য সঙ্গাররা, যারা একদা ছিল নৌসৈনিক, আছে নানা মানুষ, নানা বৃত্তির, নানা ঐতিহ্যের। পরিবর্তন চলেছে তাদের জীবনে, অনাহারে, দুর্ভিক্ষে, আশা, আশঙ্কায় অবিরাম চলমান মানুষের জীবন। কাহিনী শেষ হয় দেশ ভাগের সময়। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ — মানুষ, প্রকৃতি, রাজনীতি সমস্ত শক্তির টানাপোড়েনের মধ্যে বেঁচে থাকে গড় শ্রীখণ্ড।''[২৫৬] অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির প্রাথমিক পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছেন — ''অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড' (মার্চ, ১৯৫৭) বিগত দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশ-বিভাগের পটভূমিকায় বাঙলার এক সীমান্ত-অঞ্চলের বিপর্যস্ত জীবনযাত্রার কাহিনী। এই উপন্যাসে প্রধানতঃ সমাজের নিম্নতম শ্রেণী, মাঝামাঝি অবস্থার কৃষক সম্প্রদায় ও তখনও সচ্ছল সমাজনেতা ও গ্রামহিতৈষি জমিদারগোষ্ঠীর, আসন্ন পরিবর্তনের আভাসে অস্থির, নূতন পরিস্থিতির সহিত খাপ-খাওয়াইবার চেষ্টায় বিব্রত জীবনবৃত্ত অঙ্কিত হইয়াছে।''[২৫৭] এই দুই স্বনামধন্য সমালোচকের বক্তব্য থেকেই 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসটির মহাকাব্যিক ব্যাপ্তির আভাস পাওয়া যায়। অনেকেই এই উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস বলে মত দিয়ে থাকেন। এই মতের সারবত্তাও আছে। তবে এই উপন্যাসটির মহাকাব্যধর্মিতার মধ্যেই আঞ্চলিকতার কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে ঘটে যাওয়া বাংলার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ এবং স্বাধীনতা সমকালীন ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে পটভূমি করে উপন্যাসটি রচিত। এর কাহিনিকাল হল ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়কালের প্রেক্ষাপটে একটি অঞ্চলের সামগ্রিক জীবনকথা এই উপন্যাসটিতে পরিবেশিত হয়েছে। উপন্যাসের এই অঞ্চলটি হল পাবনা জেলার দক্ষিণে অবস্থিত পদ্মাপারের অঞ্চল, যার অদূরে চিকন্দি গ্রাম। এর পূর্বনাম সম্ভবত গড় শ্রীখণ্ড। এখানে নানা স্তরের লোকজনের বাস। এদের মধ্যে কেউ ভূস্বামী, কেউ শহুরে শিক্ষিতা মেয়ে, কেউ সম্পন্ন চাষি, কেউ ভূমিহীন চাষি, কেউ সম্পূর্ণ নিঃস্ব। এদের সবাইকে নিয়ে উপন্যাসটিতে চারটি কাহিনিবৃত্ত গড়ে উঠেছে। এগুলি হল সুরতুন, ফতেমা, মাধাই, ইয়াজ, ইসমাইলদের নিয়ে গঠিত

কাহিনিবৃত্ত; সান্যালমশাই, অনুসূয়া, সুমিতি, নৃপনারায়ণ, মনসা, সদানন্দদের নিয়ে গঠিত কাহিনিবৃত্ত; রামচন্দ্র, কৃষ্টদাস, ছিদাম, মুঙলা, পদ্ম, সনকা, ভানুমতীদের নিয়ে গঠিত কাহিনিবৃত্ত এবং আলেফ, এরফান, আল মাহমুদ, সাদেকদের নিয়ে গঠিত কাহিনিবৃত্ত। এই চারটি কাহিনিবৃত্তের মধ্যে শেষেরটি সর্বাপেক্ষা ছোট কাহিনিবৃত্ত। আর সান্যালদের কাহিনিবৃত্তটির প্রতি লেখকের পক্ষপাত ছিল বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অশ্রুকমার সিকদার বলেছেন — ''সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ সান্যাল-পরিবারের প্রতি লেখকের ব্যক্তিগত পক্ষপাত এসেছে উপন্যাসের এই কাহিনীতে আত্মজৈবনিক উপকরণ ব্যবহারের ফলেই।''[২৫৮] তবে উপন্যাসটির উৎকৃষ্টতম কাহিনিবৃত্ত হল সুরতন-মাধাই-ইয়াজদের নিয়ে গঠিত কাহিনিবৃত্তটি — ''শিল্পী হিসেবে তাঁর পক্ষপাত তো সুরতুন মাধাই রামচন্দ্র এরফানের প্রতি ধাবিত।''[২৫৯] উপন্যাসটি শুরুও হয়েছে সুরতুন অর্থাৎ সুরোর কাহিনি দিয়ে। সে ঐ অঞ্চলের অপরাধপ্রবণ সান্দার উপজাতির কন্যা। অভিভাবকহীন মেয়ে সুরো পেটের টানে চালের চোরাকারবারে জড়িয়ে পড়ে। তবে পুলিশে দারোগা কনক তাকে ধরেও ছেড়ে দেয়।

অবশ্য এর পূর্বেও সুরোর জীবনের একটি ইতিহাস আছে। এগারো বছর বয়সে এই সুরেতুন্নেছা অর্থাৎ সুরো ধর্ষিতা হয়েছিল। এর বিভীষিকা বালিকা সুরোর মনে একটা পাকা ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছিল — একটা মানসিক বিকার, যৌনতা সম্পর্কে ভয়ংকর একটা আতঙ্ক। সুরোকে দিঘা বন্দর রেল স্টেশনের পোর্টার মাধাই বায়েনের নিজের ঘরে আশ্রয় দেয়। মাধাই-ই তাকে রোজগারের হদিশ দেয়। দু'জনের মধ্যে ভালোবাসাও জন্মায়। কিন্তু বালিকা বয়সের সেই আতঙ্কের কারণেই সুরো ইচ্ছে থাকলেও মাধাই-এর কাছে নিজের শরীরকে সমর্পণ করতে পারে না — একদিন মাধাই যখন তাকে দৈহিক মিলনের প্রান্তে এনে হাজির করে, অকস্মাৎ মানসিক বিকারের তাড়নায় অনিচ্ছা ও আতঙ্কে সে উন্মাদিনীর মতো ছুটতে ছুটতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। হতবুদ্ধি মাধাই তাকে ধরতে পারে না। এইভাবে মাধাইকে বঞ্চিত করার জন্য পরে সে গভীরভাবে লজ্জিত হয়েছে, অনুশোচনাও করেছে; কিন্তু তার কাছে আর ফিরে যেতে পারে নি। ইতিমধ্যে সে চালের চোরাকারবারি ফতেমার কাছে আশ্রয় পেয়েছে। ক্রমে একটু একটু করে তরুণ ইয়াজের আগ্রহের জালে জড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য মাধাইকে সে ভুলতেও পারে নি।

এদিকে সুরোকে হারিয়ে মাধাই ভিন্নপথ ধরে। সে হতাশ হয়ে বেপরোয়াভাবে অবাধ বারবনিতা-সংসর্গ ধরে। এদের মধ্যে চাঁদমাল কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত জেনেও কারও সাবধান বাক্য না মেনে তার সঙ্গে আসঙ্গ লিপ্সায় মেতেছে। এর ফলও ফলেছে — মাধাইও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ইয়াজের কাছে সুরো মাধাই-এর এই খবর পেয়েছে। এর মধ্যে প্রবল বন্যায় দিঘার বন্দর ডুবে গেলে সুরো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে এবং সেদিকে রওনা দিয়েছে। অবশ্য সে আর মাধাই-এর সন্ধান পায় নি। এদিকে ইয়াজের সঙ্গে দেহের সম্পর্কের ফলে তার যৌন শীতলতার অবসান ঘটেছে। তবে তার দেহের সম্পর্ক ইয়াজের সঙ্গে হলেও মনের সম্পর্ক মাধাইয়ের দিকে অথবা দু'জনের দিকেই। শেষপর্যন্ত সুরো বুঝতে পেরেছে যে, ইয়াজই তার ভবিষ্যৎ। সুরতুন-ফতেমা-ফুলটুসি-মাধাই-ইয়াজদের নিয়ে কাহিনির যে ধারা, তা এখানেই শেষ।

উপন্যাসটির আরম্ভ সুরতুনকে নিয়ে, শেষও সেই সুরতুনকে দিয়েই। আরম্ভে ছিল মাধাই, শেষে এল ইয়াজ। এই উপন্যাসে আরও তিনটি কাহিনিবৃত্ত থাকলেও সমালোচকদের মতে এই সুরতুন-মাধাই-ফতমাদের মত নিম্নশ্রেণীর মানুষদের নিয়ে গড়ে ওঠা কাহিনিবৃত্তটিই শ্রেষ্ঠ কাহিনিবৃত্ত। তাই দেখা যায় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির জমিদারদের নিয়ে গড়ে ওঠা কাহিনিবৃত্তটির সমালোচনা করে বলেছেন যে, জমিদার-পরিবারের জীবনচিত্র বিষয়ক অংশটি উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশ। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কাহিনি সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন হল — ''এই উপন্যাসে আমরা এমন এক শ্রেণীর নর-নারীর পরিচয় পাইলাম যাহারা সচরাচর উপন্যাসের বিষয়ীভূত হয় নাই। মাটির কাছাকাছি যে মানুষের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন কাব্যে তাহাদের দর্শন এ যাবৎ না মিলিলেও এই উপন্যাসে যে তাহাদের আবির্ভাব এই ধারণা অযৌক্তিক নহে।''[২৬০] আর সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের মতে — ''কাহিনীর বিভিন্ন ধারার এক-একটি চলেছে সমাজের উঁচু-নিচু এক-একটি স্তরকে অবলম্বন ক'রে। সুরতুন-মাধাই-ফতেমাদের স্তরটি হল সমাজের সব চাইতে নিচের। . . . কাহিনীর ধারগুলির মধ্যে এইটেই স্বচ্ছন্দতম। . . . সব থেকে উপরে গড় শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত সান্যাল পরিবারের স্তর, উচ্চ সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কৃত্রিমতার স্পর্শ এইখানেই। . . . রামচন্দ্র কৃষ্ণদাস ভানুমতীদের স্তর, আলেফ

এরফানদের স্তর, এই স্তরটিও লেখকের প্রতিভার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত নয়। কিন্তু একেবারে নিচের স্তরের জন্যই, সুরতুন-মাধাই-ফতেমাদের জন্যই বাংলা কথাসাহিত্যের বিস্তীর্ণ এলকায় গড় শ্রীখণ্ডের এত মর্যাদা।''[২৬১] যারা এই উপন্যাসটিকে 'সান্যাল পরিবারের কাহিনী' বলে মত দিতে চান, তাদের উদ্দেশ্য অধ্যাপক অলোক রায় বলেছেন — ''কিন্তু গড় শ্রীখণ্ড শুধু সান্যাল পরিবারের কাহিনী নয়, উত্তরবঙ্গের একাধিক জনগোষ্ঠীর জীবনসংগ্রামের কাহিনী। তার মধ্যে সান্দারদের মেয়ে সুরো বা সুরতুন্নেছাকে একটু বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে — তাকে দিয়েই উপন্যাসের শুরু, আর তাকে দিয়েই উপন্যাসের সমাপ্তি। সেই সঙ্গে আছে 'বাঙাল নদী' পদ্মা আর তার তটভূমি — যা উপন্যাসকে দিয়েছে মাটির গন্ধ; আর মাটিঘেঁষা কিছু মানুষ — রামচন্দ্র মণ্ডল, মুঙ্‌লা, ছিদাম, আলেফ আর এরফান।''[২৬২]

অমিয়ভূষণ মজুমদারের এই 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসটির ঘটনাধারা পাবনা জেলার পদ্মাতীরবর্তী ফরিদপুর-নদীয়া ঘেঁষা চিকন্দি, বুধেডাঙা, চরণকাশি, মানিকদিয়ার গ্রাম ও বন্দর দিঘাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলটি মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হলেও বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে বিচ্ছিন্ন হিসেবেই উপস্থাপিত। ঔপন্যাসিক এর পরিচয় সম্পর্কে জানিয়েছেন — ''এই এক দেশ, শাল-মহুয়ার নয়, ধানের এবং পাটের। ফাল্গুনে এখানে উদাসকরা লাল রঙ নেই, এখানে গৈরিক অবান্তর। নিতান্ত মাটির দেশ। গাছ-গাছড়ার সবুজ রঙেও মাটির গাঢ়তা। বর্ষায় গাছপালাগুলি বাঁচবো-বাঁচবো বলে দেখ-দেখ করে বেড়ে ওঠে। তারপর আসে বর্ষণহীন অকরুণ দিন। ধু ধু নিস্ফল মাঠের দিকে তাকিয়ে চোখে পড়ে ফাট-ধরা কালচে মাটি, ইতস্তত দু-একটা বাবলা গাছ। গাছগুলোর পাতা নেই, আছে শুধু শুকনো কাঁটা। প্রাণ-শুকানো রৌদ্রে দাঁড়িয়ে আরো দৃঢ় আরো কর্কশ হবার তপস্যা করছে কাঁটাগুলি। বাঁচবো, বাঁচবো — এই রুদ্ধশ্বাস আকূতি সেগুলির। উদাসীনতা নয়, অত্যন্ত গভীর মোহ।''[২৬৩] এই বর্ণনা থেকেই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপন্যাসের বেশিরভাগ ঘটনা এই ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেই ঘটেছে। সুতরাং এদিক থেকে এই উপন্যাসটি আঞ্চলিকতার দাবী অনেকটাই পূরণ করেছে।

'গড় শ্রীখণ্ড' একটি বৃহদাকার উপন্যাস। এর চারটি কাহিনিবৃত্তে প্রচুর চরিত্রের সমাগম ঘটেছে। এই সমস্ত চরিত্ররা হল — সান্যাল মশাই, অনুসূয়া, নৃপনারায়ণ, সুমিতি, রূপনারাণ, মনসা, সদানন্দ মাস্টার, সুরতুন, মাধাই, ফতেমা, ইয়াজ, ইসমাইল, ফুলটুসি, টেপির মা, কনক দারগা, গোবিন্দ, গোঁসাই, রামচন্দ্র, কৃষ্টদাস, ছিদাম, মুণ্ডলা, পদ্ম, সনকা, ভানুমতী, আলেফ, এরফান, আল মাহমুদ, সাদেক, রজবালী, জয়নাল, ইয়াকুব, সোভান প্রমুখ। এরা প্রায় সবাই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির মানুষজন। উপন্যাসটিতে নির্দিষ্ট কোনো নায়ক বা নায়িকা নেই। তাই অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার বলেছেন — ''প্রত্যেক কাহিনীবৃত্তের পৃথক নায়ক-নায়িকা পাচ্ছি, কিন্তু কোনো দুটি চরিত্রকে সম্পূর্ণ উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকা বলা যাবে না। একটি বৃত্তের নায়ক-নায়িকা মাধাই-সুরতুন, অভিজাতবৃত্তটির সান্যাল-অনুসূয়া, তৃতীয় বৃত্তটির রামচন্দ্র-পদ্ম। কিন্তু সম্ভবত এই কথাটা লেখকের অনুমোদন পায়, সমগ্র 'উপন্যাসের নায়ক গড় শ্রীখণ্ড। নায়িকা পদ্মা।''[২৬৪] এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে, উপন্যাসটিতে প্রচুর চরিত্র থাকলেও একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল, এক্ষেত্রে গড় শ্রীখণ্ড অঞ্চলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তবে চরিত্রদের মধ্যেও একটা স্থানিক ব্যাপার-স্যাপার রয়ে গেছে। যেমন মাধবের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন — ''মাধাই বায়েন (কখনো মাধব বাদ্যকর) আমার-তোমার চোখে নীল, কখনো-বা খাকি উর্দিপরা একটি রেলওয়ে পোর্টারমাত্র। বড়ো-বড়ো চুলে পাতাকাটা সিঁথি, পায়ের মাপের চাইতে বড়ো একজোড়া চপ্পল পায়ে শিশ দিতে-দিতে যে বন্দর দিঘার স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে এর-তার সঙ্গে ইয়ার্কি মেরে বেড়ায়, সুরোর হাতে সে-ই নীলপক্ষী আঁকিয়ে দিয়েছে।''[২৬৫]

এই উপন্যাসের চরিত্রদের জীবন-জীবিকার বিবরণও ঔপন্যাসিক অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। এই বৃহদাকার উপন্যাসে নানা পেশার, নানা বৃত্তির লোকের সমাবেশ ঘটেছে। এদের মধ্যে যেমন সান্যালদের মত অভিজাত ভূ-স্বামী সামন্তপ্রভুরা আছে, তেমনি শহুরে শিক্ষিতা মেয়ে, সম্পন্ন চাষি, ভূমিহীন চাষি, এমনকী সম্পূর্ণ নিঃস্ব মানুষজনও আছে। আবার চাকুরিজীবী অথবা চাকুরি থেকে অবসর নেওয়া মানুষজনেরও সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যায়। এছাড়াও অভাবের টানে নিঃস্ব, রিক্ত মানুষদের মন্বন্তর ও যুদ্ধের সমকালে চালের চোরাকারবারে যুক্ত হতে

দেখা যায়। এসবের পাশাপাশি ঐ অঞ্চলের রীতি-নীতি, সংস্কার-বিশ্বাসের কিছু ছবিও এখানে আছে। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে এখানে দুই প্রধান ধর্ম — হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের মানুষদের দেখা যায়। এর মধ্যে হিন্দু ধর্মের মধ্যে থেকেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কিছু কার্যাবলির উল্লেখ এখানে আছে। আর একেবারে নিঃস্ব, নির্দিষ্ট বৃত্তিহীন, স্বভাব-অপরাধী, যাযাবর মুসলিম সান্দার গোষ্ঠীর মানুষজনকে দেখতে পাওয়া যায়। তবে একটি সফল আঞ্চলিক উপন্যাসে যেভাবে একটি নির্দিষ্ট স্থানের রীতি-নীতি, সংস্কার-বিশ্বাস, লোককথা-লোকঐতিহ্যের পরিচয় প্রকাশ পায়, এই উপন্যাসে তার একান্ত অভাব। এখানে একটি মিশ্র সংস্কৃতি প্রকাশ পেয়েছে। এতবড়ো উপন্যাসটিতে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভবও ছিল না। হয়তো এই কারণেই আঞ্চলিক উপন্যাসের রীতি মেনে এখানে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাস-খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়াও সম্ভব হয় নি। আসলে অন্ত্যজ শ্রেণীর আদিম মনোভাবাপন্ন মানুষগুলিই এই উপন্যাসের সবচেয়ে উৎকর্ষের দিক — তাদের না আছে চালচুলো, না আছে ঘরবাড়ি, না আছে নির্দিষ্ট রীতি-নীতি, না আছে বিশ্বাস-সংস্কার। উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার দিক থেকে এটি একটি বড় ত্রুটি।

তবে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটির ভাষার প্রশংসা করে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — '' . . . সে উপন্যাসেও অমিয়ভূষণের ভাষার শান্ত, ধীর চাল, সুসমঞ্জস গঠন। এবং অনাবিষ্ট ভঙ্গী উপন্যাসের বিষয় গাম্ভীর্যের উপযুক্ত আধার হয়েছিল।''[২৬৬] এই উপন্যাসটি তিনি মান্যচলিত বাংলাতে লিখলেও সেই ভাষায় প্রচুর পরিমাণে স্থানীয় আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় এমন শব্দ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তিনি সংলাপের ক্ষেত্রে ভদ্র, অভিজাত, শিক্ষিত চরিত্রদের মুখে মান্যচলিত বাংলার সংলাপ বসিয়েছেন। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর চরিত্রদের মুখে স্থানীয় ভাষার সংলাপ দিয়েছেন। যেমন—

১। ''সুমিতি ভয় ঢেকে ভয়ে-ভয়ে বললো, 'সান্যালদের বাড়ি চেনো?

'জে, মা'ঠান, তেনারা মুনিব'।

'তোমরা পথ চিনে নিয়ে যেতে পারবে তো'?

‘জে, আপনি উঠলিই গেলাম’।

‘যদি দরকার হয় কাল তোমাদের দারোগাসাহেব খুঁজে পাবে ন’?

‘তা আর পাবেন না! তিনি তো আমাদের বাড়ির ’পরে ঘোড়া থামায়ে পাঠায়ে দিলেন’।’’[২৬৭]

২। ‘‘এরফান রে — ’

‘কী কও বড়োভাই’?

‘জমি ধরবো’?

‘জমি’?

‘হয়। বিশ টাকায় বিঘা, এক বছরের খাইখালাসি’।

‘ভাবে দেখি’।’’[২৬৮]

৩। ‘‘আলেফ বললো, ‘একটা কামে আলাম। খবর শুনছো না’?

‘রোজই শুনতিছি, কোনটা কও’?

‘কমিটি নাকি কী হবি’?

‘হবি তো এই মাসেই’।

‘তাইলে সেক্রেটারি কে হয়’?’’[২৬৯]

৪। ‘‘ফতেমা বললো, ‘কেমন দেখলি’?

‘তা সেইরকম। শিস দিয়ে বাজারের মধ্যে ঘুরতিছিলো’।

‘তোকে কিছু কলে’?

‘না আম্মা, তোমার জয়নুল-সোভানকে দেখলাম। তারা তাগরে আব্বার দোকান জাঁকায়ে বসেছে। একজন কলে, কসাই আবার নিকা করছে, কিন্তুক ধরেছে ক্ষয়কাশ’।

‘জয়নুল-সোভানও তোকে কিছু কলে না’?

‘আমি তাদের সামনে গিছি? দুর থিকা দাঁড়ায়ে দেখলাম’।

‘এবার গেলি কথা কয়ে আসিস’। ফতেমা বললো।’’[২৭০]

৫। ‘‘ইয়াজ বললো, ‘ওঠো, সুরো, চরণকাশির বড়ো সেখের বাড়িত কিছু খাবার পাওয়া যায় কিনা দেখি’।

সুরো বললো, ‘তা যেন দেখবা, সে কোন দ্যাশ? দ্যাশ না ভাগ হইছে? আমরা না মোছলমান’?

ইয়াজ বললো, ‘হয়! সুরো সান্দারনি এক মোছলমান, আমুও আর এক হেঁদু। ফতেমাকে আম্মা কতাম, বাপ কেডা জানি নে। এই না চরণ কাশি।’’[২৭১]

অমিয়ভূষণের ‘গড় শ্রীখণ্ড’ উপন্যাসটির এই সমস্ত লক্ষণের নিরিখে উপন্যাসটিকে আপাতভাবে একটি আঞ্চলিক উপন্যাস বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায় যে, এই উপন্যাসটি কখনোই একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের পর্যায়ে পৌঁছায় নি। উপন্যাসটির আঞ্চলিক উপন্যাস না হওয়ার পেছনে প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করেছে এর বিপুলায়তন ও কাহিনিগত বিস্তৃতি। এখানে ভৌগোলিক সীমা-সংহতির চেয়ে সামগ্রিকতাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাসটির এই বিষয়টি সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও নজর এড়িয়ে যায়নি। তিনি এর মূল্যায়নে বলেছেন — ‘‘‘গড় শ্রীখণ্ডে’ একটি যুগের জাতীয় বেদনা বিপুল ঐকতানে ঝংকৃত হয়েছে। জাতীয় জীবনের একটি গোটা সমাজের কথা চিত্রিত হয়েছে এই উপন্যাসে। জীবনের সেই বেদনাকে এই উপন্যাসে সর্বত্র প্রায় হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক, ছিন্নমূল হবার পূর্বক্ষণটিতে কোথায় টান পড়ে, কেমন করে গুঁড়িয়ে যায় বহুকালগত সম্পর্ক, ছিন্নমূল হবার অপূর্ব নিরভিমান মন নিয়ে সেগুলিকে দেখেছেন, তাঁর নিরাসক্তির রাজসিংহাসন বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি, বেদনায় হৃদপিণ্ড উন্মূল হয়ে যাবার কথা, তখনও। উত্তরবঙ্গের জীবন, কোনোপ্রকার আঞ্চলিকতার প্রয়াস ব্যতিরেকেই ধৃত হয়েছে পরম নিশ্চিতিতে ও বিশ্বাসে।’’[২৭২] আসলে গড় শ্রীখণ্ডে ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ মজুমদার একসঙ্গে কালচেতনা, স্থানচেতনা, মানবচেতনা থেকে শুরু করে জাতীয়চতনা পর্যন্ত অনেক কিছুকেই ধরেছেন। ফলে উপন্যাসটি কখনোই একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয় নি। এর মধ্যে অনেকাংশেই মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসের লক্ষণ প্রকটিত হয়েছে।

অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার উপন্যাসটির এই লক্ষণটি স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন — ''মহাকাব্যের মধ্যে যে সমগ্রতা পাই, যে উপন্যাস মহাকাব্যের আদলে গড়ে ওঠে, তার মধ্যেও আমরা সেই সমগ্রতা আশা করি। 'গড় শ্রীখণ্ডে'র মধ্যে সর্বোতভাবে সেই পরিপূর্ণতা আছে।''[২৭৩]

'গড় শ্রীখণ্ড' বাংলা সাহিত্যের একটি মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস বলে স্বীকৃত হলেও এর আঞ্চলিকতাকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। এটা মেনে নিতেই হয় যে, এখানে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের মত মূল জনসমাজ বহির্ভূত কোনো অঞ্চল এবং সেখানে বসবাসকারী একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীণ জীবনচর্যার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ্যে আসেনি। আঞ্চলিক প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির নিবিড় মেলবন্ধনও সর্বত্র দৃঢ়ভাবে দানা বাধে নি। তবে এটাও ঠিক যে, এই উপন্যাসের পটভূমি পাবনার পদ্মাতীরবর্তী একটি অঞ্চলকে গ্রহণ করা হয়েছে, যা মূল জনসমাজের মাধ্যে অবস্থিত হয়ে নানা কারণে বিচ্ছিন্ন হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। এই উপন্যাসে যে সোন্দর সম্প্রদায় ও তাদের সুকঠোর জীবনচর্যার কথা উঠে এসেছে, বাংলা সাহিত্যের নিরিখে তা অভিনব হিসেবেই বিবেচিত হয়। উপন্যাসের নিম্ন চরিত্রের সংলাপের ভাষাতেও তিনি বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপকে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বৃহদায়তন 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসটিকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাস বলে বিবেচনা করাই যায়।

সুবোধ ঘোষের **'শতকিয়া'** উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। এটি লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে অধিকাংশ পাঠকই স্বীকার করে নেন। এ বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যেও খুব একটা মতবিরোধ নেই। তাই অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শুনি — ''শতকিয়া সুবোধ ঘোষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।''[২৭৪] শুধু তাই নয়, বিহার রাজ্যের (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্য) মানভূম এলাকার একটি বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে লেখা এই উপন্যাসটির আলোচনাকালে তিনি একে সুবোধ ঘোষের একটি শক্তিশালী উপন্যাস বলে মন্তব্য করেছেন — ''শতকিয়া' (আগষ্ট, ১৯৫৮) সুবোধ ঘোষের আর একটি শক্তিশালী উপন্যাস। ইহাতে মানভূম-অঞ্চলের আদিম সংস্কারপ্রধান জীবনযাত্রার সহিত উহার

প্রকৃতি পরিবেশের এক আশ্চর্য অন্তঃসঙ্গতি ও একাত্মতা রূপ পাইয়াছে; দাশু ঘরামি ও সকালীর জীবনে এই আরণ্য-প্রকৃতি উহার নদী, পাহাড়, জঙ্গল, এমন কি হিংস্র জন্তু সমেত যেন নিবিড় সংযোগ আবদ্ধ ও বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে।।''[২৭৫] এই বক্তব্যের মধ্যেই তিনি উপন্যাসটির আঞ্চলিকতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর পাশাপাশি অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় সরাসরি 'শতকিয়া'র আঞ্চলিকতার লক্ষণগুলিকে মেনে নিয়ে উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলে মত দিয়েছেন। এর মধ্যে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন -- ''সাম্প্রতিক আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে আর তিনটির নাম অবশ্য উল্লেখ্য -- সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৪৯-৫০), সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' (১৯৫৮), প্রভাত দেব সরকারের 'ওরা কাজ করে' (১৯৬৪)।''[২৭৬] আর দুর্গাশঙ্কর বাবুর মনে হয়েছে -- ''বিহারের মানভূম অঞ্চলের আদিম নরগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার বিস্তারিত পরিচয়বহ উপন্যাস সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া'। মানভূমের ভূপ্রকৃতি -- মধুকুপির মূক প্রকৃতি কাহিনীর প্রধান চরিত্র দাশু ঘরামির জীবনকে শতপাকে বেষ্টন করেছে। একদিকে দাশুকে আশ্রয় করে ঐ অঞ্চল-প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তার স্ত্রীর পরপর দুই খ্রিষ্টধর্মী পুরুষকে বিবাহের মধ্য দিয়ে সে শুনতে পেয়েছে তার সযত্নলালিত সংস্কৃতির সর্বনাশ-সংকেত।''[২৭৭] এসব উক্তি থেকে এই উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাস বলেই মনে হয়। তবে 'শতকিয়া'র আঞ্চলিকতার স্বরূপ নির্ণয়ে করতে বসলে উপন্যাসটির কাহিনি-বস্তুর পরিচয় নিতেই হয়।

সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' উপন্যাসটির কাহিনি-বস্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে শুরু হয়ে স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অবশ্য স্মৃতিচারণায় এখানে বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির সময়কালের কথাও এসেছে। উপন্যাসটি তৎকালীন বিহার (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) রাজ্যের ছোটনাগপুর মালভূমির মানভূম এলাকার একটি বিশেষ অঞ্চলের পটভূমিকায় রচিত। উপন্যাসে সেই বিশেষ অঞ্চলটি মধুকুপি গ্রাম নামে উপস্থাপিত। এই বৃহদায়তন উপন্যাসটিতে মধুকুপি গ্রাম এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলটির কয়েক বছরের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তার সর্বাঙ্গীণ রূপকে দেখানো হয়েছে। ফলে এখানে একদিকে দাশু ঘরামির মাধ্যমে পুরাতন

সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি যন্ত্রনির্ভর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও খ্রিষ্টান ধর্মের আগ্রাসনে সেই সংস্কৃতির অবসানে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন উঠে এসেছে।

উপন্যাসটির শুরুতেই আমরা এর কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা নায়ক দাশু ঘরামিকে পাঁচ বছর জেলে কাটিয়ে গ্রামে ফিরে আসতে দেখি। এতদিন জেলে থাকাকালীন অবস্থায় সে নিজের মধুকুপি গ্রামটিকে নিয়ে যে রঙিন স্বপ্নে মশগুল ছিল, তা গ্রামে ঢোকার আগেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। সে লক্ষ করে — গ্রামে নতুন রাস্তা হয়েছে, বৈশাখ মাসে ক্ষীণজল থাকা খরস্রোতা ডরানি নদীর উপর সেতু নির্মিত হয়েছে। বাড়িতে এসে দাশু আরও বিস্মিত হয়ে যায়। জেলে যাবার সময় অষ্টাদশী স্ত্রী মুরলীকে সে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিল, আজ মুরলী সে অবস্থায় নেই — তার বহিরাঙ্গিক অবয়ব, পোশাক-পরিচ্ছদে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে, সেইসঙ্গে মানসিকতাও বদলে গেছে। তার একান্ন টাকা পণে বিয়ে করা ঝালদার মহেশ রাখালের মেয়ে মুরলী এখন আর আদিবাসী বধূটি নেই, সে সভ্য জগতের মেয়েদের মতো সায়া-শাড়ি পরে, সাজগোজ করে এবং সিস্টার মাদলিনের খপ্পরে পড়ে খ্রিস্টান আদব কায়দা শিখে সেলাই মেশিন চালিয়ে দু'পয়সা রোজগারও করে। দাশুকেও সে খ্রিস্টান বানাতে চায়। কিন্তু দাশু তার স্বধর্ম থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে রাজি হয় না। তার স্বপ্ন একটি জমি সংগ্রহ করে সেখানে কৃষিকাজ করে জীবন অতিবাহিত করা। এজন্য কপালবাবার প্রতি দাশুর আগাধ আস্থা। একসময় পর্যন্ত মধুকুপির আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ লোকের জমিতে মুনিষ খেটে, ছোটকালু-বড়কালু পাহাড়ে কাঠ-পাতা সংগ্রহ করে বা পশু শিকার করে, ডরানির স্রোতে গা এলিয়ে মহুয়ার মদ আকণ্ঠ পান করে স্বাধীনভাবে খুব সুখেই দিন কাটাতো। কিন্তু ধনতন্ত্রের আগমনে সেই অঞ্চলে একের পর এক কয়লাখনি, কারখানা গড়ে ওঠায় এরা অনেকেই সেসব কোলিয়ারির শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। এরা অনেকেই স্বধর্মের নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা ভুলে গেছে — কেউ খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হয়েছে, আবার কেউ কেউ ধনী ঈশান মোক্তারের কর্মচারী দুখন সিংহের নেতৃত্বে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আদব কায়দা নিজেদের জীবনে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে।

ধনতন্ত্রের হাত ধরেই সে অঞ্চলের আদিম সংস্কৃতির বাহক বাঘিন কানারানীকে হত্যার উদ্দেশ্যে মধুকুপিতে নব্য খ্রিস্টান পলুশ হালদারের আবির্ভাব ঘটে। স্বধর্মত্যাগী পলুশ দাশুর স্ত্রী মুরলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সিস্টার দিদির সংস্পর্শে আসার পর খ্রিস্ট ধর্মে পাঠ নেওয়া মুরলীরও আদিবাসী জীবন, আদিবাসী আদব-কায়দা আর ভালো না লাগায় দাশুর ঘরে দমবন্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। ইতিমধ্যে দাশুর সন্তান তার গর্ভে আসে। সে দাশুকে স্বধর্ম ত্যাগ করানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে — দাশুকে কল-কারখানায় কাজ নেওয়ার পরামর্শ দেয়, খ্রিস্টান হতে বলে। কিন্তু দাশু কোনোকিছুতেই প্রলোভিত না হয়ে নিজের স্বপ্ন, নিজের ধর্ম আঁকড়ে ধরে থাকে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও নিজের, স্ত্রী মুরলীর এবং মুরলীর গর্ভে থাকা অনাগত শিশুটির জন্য দু'মুঠো খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না। অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও সে চিঠা লিখে ঈশান মোক্তারের থেকে জমি সংগ্রহ করতে পারে না। তার অনেক সাধনার কপালবাবা, ছোটকালু-বড়কালু পাহাড়, জঙ্গল, ডরানি নদীও তাকে খালি হাতে ঘরে ফেরায়। সে গ্রামে পূর্বের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-সংস্কৃতি, পূজা-পার্বন ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, জাতপঞ্চের শাসনও ধরে রাখতে চায়, কিন্তু পারে না। দেখা যায় যে, পুরোনো জাতপঞ্চের মাথা রতন, পুরোহিত সনাতন লাইয়া শ্রমিকে পরিণত হয়েছে, আর দুখন সিংহ পুলিশের মুন্সি চৌধুরীজি এবং কনস্টেবল রামাই দিগোয়ারের সহায়তায় নতুন জাতপঞ্চ তৈরি করে আদিবাসী সংস্কৃতির কিছু বিষয় ধরে রাখলেও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করতে উঠে পড়ে লেগেছে। দাশু পুলিশের মুন্সী চৌধুরীজীর লোভার্ত দৃষ্টি থেকেও মুরলীকে রক্ষা করতে পারে না।

ফলে একদিন ঝালদার মহেশ রাখালের মেয়ে মুরলী বাপের সঙ্গে দাশুকে, দাশুর সংসারকে, দাশুর সংস্কৃতিতে ত্যাগ করে ঘর ছাড়ে। ঐদিনই পলুশের গুলিতে কানারানী মারা যায়। দাশুর ঘর ছেড়ে মুরলী অবশ্য বাপের বাড়ি যায় নি, সে খ্রিস্টান হয়ে জোহানা নাম গ্রহণ করেছে এবং পলুশ হালদারকে বিয়ে করে নতুন জীবন শুরু করেছে। এর আগে অবশ্য অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। ইতিমধ্যে বনের মধ্যে পলুশের স্ত্রী সকালীর সঙ্গে এবং সে অঞ্চলের দুর্ধর্ষ ডাকাত গোপী লোহারের সঙ্গে দাশুর সাক্ষাৎ হয়েছে। এরা দু'জনেই স্বধর্মনিষ্ঠ এবং সেখানকার সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে

উদ্‌গ্রীব। তাই সকালী মুরলীকে হত্যা করে তাঁর স্বামী পলুশকে স্বধর্মে ফেরাতে চায়। আর গোপী লোহারের ডাকাতি এবং হত্যার লক্ষ সেই অঞ্চলের সুদখোর মহাজন, ঠিকাদার, শোষক মালিক শ্রেণী। মুরলী চলে যাওয়ার পর বনের কাঠ-পাতা চুরির অপরাধে তিন বছরের জন্য দাশুর আবার জেল হয়। জেল থেকে বেরিয়ে দাশু দেখে যে, সে অঞ্চলের অবস্থার আরও পরিবর্তন ঘটে গেছে — রাস্তায় কলের গাড়ি চলতে শুরু করেছে, স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। দাশু গ্রামে ফিরলে মধুকুপিকেও আর আগের অবস্থায় পায় না। সেখানে ঈশান মোক্তার ও দুখন সিংহ আরও বড়লোক হয়েছে। এরমধ্যে ঈশান মোক্তারের ছেলে লালবাবু ভোটের প্রার্থী হয়েছে। আদিবাসীদের কেউ কেউ মারা গেছে, যারা বেঁচে আছে তাদের কেউ কেউ এদের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে, আর অনেকেই কোলিয়ারিতে, সরকারের টেস্ট রিলিফে কাজ নিয়েছে। সনাতন লাইয়ার ট্রাক্টরের ড্রাইভার হয়েছে। এদিকে জোহানা ওরফে মুরলী পলুশ হালদারকে ছেড়ে খ্রিস্টান ডাক্তার রিচার্ড সরকারকে বিয়ে করেছে। এক্ষেত্রে রিচার্ডের ক্লীবত্ব জোহানা অর্থাৎ মুরলীকে মানসিক দিক থেকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। অবশ্য এ বিয়ের আগে মুরলী দাশুর এক পুত্রসন্তানকে জন্ম দিয়েছে। সিস্টার দিদি সেই শিশুটিকে ছোট থেকেই খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য অনাথ বাড়িতে রেখে দিয়েছে। এরমধ্যে দাশু ঘরামি মারাত্মক কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। পলুশের প্রাক্তন স্ত্রী সকালী স্বধর্মনিষ্ঠ দাশুকে এ অবস্থাতেও আপন করে নিতে চেয়েছে; কিন্তু দাশু রাজি হয় নি। তার প্রচেষ্টাতেই পলুশ-সকালীর পুনর্মিলন হয়েছে এবং তারা নতুন সংসারের স্বপ্ন নিয়ে অন্যত্র পাড়ি দিয়েছে। এর আগে অবশ্য পলুশ খ্রিষ্টধর্মের আদব-কায়দা ত্যাগ করে স্বধর্মে ফিরে এসেছে। এদিকে দাশুর আয়ুও কমে এসেছে। মৃত্যুর আগে নিজের সন্তানের সঙ্গে মিলিত হওয়াই তার কাছে শেষ ইচ্ছা বলে পরিগণিত হয়েছে। নিজের পুত্রসন্তানের সঙ্গে দাশু মিলিতও হয়েছে, তবে সিস্টারদিদির কথামত স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে অ্যাসাইলামে ভর্তি হয়ে নিজের রোগের চিকিৎসা করায় নি। দাশুর ডরানির জলে আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসটি শেষ হয়েছে।

'শতকিয়া' উপন্যাসটির পটভূমি হিসেবে ঔপন্যাসিক সুবোধ ঘোষ ছোটনাগপুর মালভূমির মানভূম এলাকার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসে

গোবিন্দপুর, ঝালদা, কুলডিহা, কুমারধুবি ধুরকুণ্ডা, খেলারী, লোহার ডাগা, মাইথান, নিরসাচটি, বাঘমুণ্ডি রেঞ্জ, রামগড় মুরি, রাঁচি, পালমৌ ইত্যাদি জায়গার নাম থাকলেও এর বেশিরভাগ ঘটনা মধুকুপি গ্রাম, ডরানি নদী, ছোটকালু-বড়কালু পাহাড়, খানাপিনার জঙ্গল, বাবুর বাজার, হারানগঞ্জ অঞ্চলে ঘটেছে। তবে এখানে সবথেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে মধুকুপি গ্রাম। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা এই গ্রামের বর্ণনা পাই —

''আর কতদূর?

আর খুব বেশি দূর নয়। এই বাবুবাজার থেকে পুরনো সড়ক ধরে তিন ক্রোশ দক্ষিণে চলে গেলেই মধুকুপি নামে সেই গাঁ, যে গাঁয়ে দাশু ঘরামির একটি ঘর আছে আর ঘরণীও আছে।

গাঁয়ের পাশে ডরানি নামে সেই ছোট নদীটিও আছে, যে নদীতে বৈশাখ মাসেও হাঁটুজল থাকে। আর, সেই পাহাড় দুটিও আছে ; ছোটকালু ও বড়কালু, কাদামাখা মোষের গায়ের মতো কালো-কালো আর মেটে-মেটে রঙের দুটি বেঁটে আকারের পাহাড়। বোশেখের ভয়ানক শুকনো দুপুরে যখন ডরানির স্রোতের কিনারাতে কোন বকও বসে থাকে না, তখন এই দুটি পাহাড়ের গায়ের উপর ছাগল চরে বেড়ায়, কচি বটের পাতা খায়। আর, শ্রাবণের শেষে পাহাড়ের গায়ে, এমন কি মাথার উপরেও পাথরের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ ঘাস যখন ঘন হয়ে গজিয়ে ওঠে, তখন গাঁয়ের রোগা-রোগা গরুর দল কাঁকুরে ডাঙার কুশে ঘাস ছেড়ে দিয়ে বরং ছোটকালু আর বড়কালুর কোলে বুকে ও মাথায় চড়ে তাজা ঘাসের গোছা খেতে ভালোবাসে।''[২৭৮]

ডরানি নদী, ছোটকালু-বড়কালু পাহাড় আর খানাপিনার জঙ্গল নিয়েই গড়ে উঠেছে এই গ্রামের প্রকৃতি। এরপর উপন্যাসটি যত এগিয়েছে, আমরা এই মধুকুপি গ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলির আরও বিস্তারিত পরিচয় পেয়েছি। এসব থেকেই উপন্যাসটির একটি স্বতন্ত্র জগৎ গড়ে উঠেছে। ফলে এর পটভূমিকায় মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানাভাবে বিচ্ছিন্ন থাকা একটি অঞ্চল এবং সেখানকার প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বৃহদায়তন 'শতকিয়া' উপন্যাসটিতে মুখ্য-গৌণ মিলে প্রচুর চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই ঐ অঞ্চলের ভূমিপুত্র। এই চরিত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দাশু ঘরামি, মুরলী, পলুশ হালদার, সকালি, সিস্টার মাদলিন, নিতাই মুদি, জাতপঞ্চের বুড়া রতন, সনাতন লাইয়া, সুরেন মান্‌ঝি, গোপী লোহার, কালু দাগী, হরিপদ, পল্টনী দিদি, বাতাসী, দুখন সিং, ঈশান মোক্তার, ডাক্তার রিচার্ড সরকার, পুলিশের মুন্সি চৌধুরীজী, কনস্টেবল রামাই দিগোয়ার, সিপাহী অর্জুন সিং, দারোগা মুখার্জ্জীবাবু প্রমুখ। এছাড়াও মানবেতর প্রাণী বাঘিন কানারানী, জড় পদার্থ ছোটকালু-বড়কালু পাহাড়, ডরানি নদীও উপন্যাসটির চরিত্র রূপে পরিগণিত হয়। দাশু ঘরামি নিঃসন্দেহে এই উপন্যাসের নায়ক। সে আদিবাসীদের আদিম বিশ্বাস ও সংস্কারকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। উপন্যাসের শেষপর্যন্ত, সে মৃত্যুবরণ করলেও স্বধর্মচ্যুত হয় নি। দাশুর এই সংস্কারের প্রতীকই যেন, বাঘিন কানারানী। দাশুর বিশ্বাসে — ''কানারানী তো বাঘিন নয়; বনমাতা বটে।''[২৭৯] তাই দেখা যায় যে, যতক্ষণ মুরলী দাশুর ঘরে ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত কানারানী জীবিত থেকে সবকিছু আগলে রেখেছিল। কিন্তু মুরলীর দাশুকে ত্যাগ তথা গৃহত্যাগের পরেই নব্য খ্রিস্টান পলুশ হালদারের গুলিতে একচক্ষু কানারানী মারা গেছে। নায়ক দাশুর এবং অন্যান্য আদিবাসী মানুষগুলির বিশ্বাসে সব সময় অদৃশ্যভাবে 'কপালবাবা' থেকে গেছে। ফলে আদিবাসীদের এই দেবতাটিও উপন্যাসের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটির নায়িকা মুরলী হলেও পরে খ্রিস্টান জোহানায় রূপান্তরিত হওয়া মুরলীর চেয়ে সকালি অনেক বেশি আদিমতার তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছে। পাশাপাশি ডাকাত হলেও গোপী লোহারের মধ্যে আদিম সংস্কৃতির প্রতি আলাদা টান লক্ষ করা যায়। কারণ তার ডাকাতি তথা আক্রমণের লক্ষবস্তু সবসময় সুদখোর মহাজন, শোষক মালিক বা শ্রমিক ঠকানো ঠিকাদারই হয়েছে। সে দাশুর মধ্যে আদিম সংস্কারের প্রতি ভালোবাসা, জমিজমার প্রতি টান দেখে নিঃস্বার্থ সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে, এমনকি নিজে ধরা পড়ে ফাঁসির সাজা পেলেও এক সাগরেদ মারফৎ দাশুকে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। তবে এটা ঠিক যে ছোটকালু-বড়কালু পাহাড়, ডরানি নদী ও কপালবাবার জঙ্গলকে নিয়ে যেভাবে মধুকুপি গ্রামটি এই উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে সবকিছুকে ছাড়িয়ে এই গ্রামটিই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। এই গ্রামটির

সার্থক প্রতিনিধি দাশু ঘরামি। ঔপন্যাসিক তাকে যে পুরোপুরি আঞ্চলিক চরিত্র হিসেবে গড়ে তুলেছেন, তা সমালোচকেরাও স্বীকার করে নিয়েছেন — ''মানভূমের ভূ-প্রকৃতি ও ধ্যানধারণা এখানে রূপ পেয়েছে। . . . কপালবাবার জঙ্গল, ছোট কালু ও বড় কালু পাহাড়, ডরানী নদী, মধুকুপির আকাশ বাতাস, বাঘিনী কানারানী — সব কিছু দাশুর জীবনে পরম অর্থবহ হয়ে উঠেছে। সমগ্র উপন্যাস আদিম আরণ্যক গন্ধে ভরপুর।''[২৮০] দাশু ঘরামি ছাড়াও পুলিশের দারোগা মুখার্জ্জীবাবু, সিস্টার দিদি মাদলিন, ডাক্তার রিচার্ড সরকারের মত নব্য খ্রিস্টান ও শিক্ষিত কয়েকজনকে বাদ দিলে এই উপন্যাসের প্রায় সমস্ত চরিত্র এমনকি ঈশান মোক্তার, দুখন সিংহের মত শোষকেরাও আঞ্চলিক চরিত্র হিসেবে পরিগণিত হয়।

এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক পটভূমি এবং আঞ্চলিক চরিত্র সৃষ্টির পাশাপাশি ঐ অঞ্চলের মানুষদের জীবন-জীবিকার ছবিও এঁকেছেন। এদের নির্দিষ্ট কোনো পেশা নেই। তাই ঔপন্যাসিক দাশু ও তার পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে বলেছেন — ''জাতের পেশা নামে ধরাবাঁধা কোন পেশা নেই। ঘরের চালা ছেয়ে দু পয়সা রোজগার করতে প্রতি বছরের দুটি মাস গোবিন্দপুর যেত দাশু; দাশু তাই দাশু ঘরামি। দাশুর বাবা ছিল কাঠুরিয়া, বাবার বাবা মাটিয়াল।''[২৮১] অবশ্য উপন্যাসে মধুকুপিকে জনমজুরের গাঁ হিসেবে দেখানো হয়েছে — ''মধুকুপি জনমজুরের গাঁ, যে গাঁয়ের মানুষেরা সবাই মনিষ। পরের মাটি কাটে, পরের জমি চষে, পরের গো-গাড়ি হাঁকায়, পরের ঘরের চালা ছায় আর পরের পালকিতে বেহারা খাটে।''[২৮২] এরা জঙ্গলকেও পর ভাবে না; জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে অনেক সময় জঙ্গলের উপরেও নির্ভরশীল হয়ে পড়ে — সেখান থেকে লতা-পাতা, কাঠ সংগ্রহ করে সেসব বিক্রি করে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে, বন্য ফলমূল খায়, পশু শিকার করে নিয়ে আসে। বনে কাঠ বা লতা-পাতা কাটার অস্ত্র হিসবে এরা টাঙ্গি বা কাটারি ব্যবহার করে। শিকারের সময়ে এগুলির পাশাপাশি তীর-ধনুকও ব্যবহার করে। টাঙ্গি এদের কাছে প্রায় সবসময় থাকে। তবে জঙ্গলের চেয়েও এরা জমিকে বেশি ভালোবাসে — ''জঙ্গলকে একেবারে পর ভাবে না, কিন্তু ক্ষেতের মাটিকে বেশি ভালোবাসে; কাঁড় টাঙ্গি ছেড়ে দেয় নি, কিন্তু লাঙ্গল কোদাল হাতে তুলে নিয়েছে। কর্মঠ ভূমিজ জীবনের ছোট্ট একটি

উপনিবেশ এই মধুকুপি।''[২৮৩] তাই দেখা যায় যে, দাশু ঘরামি এক টুকরো জমির জন্য সর্বদা উদ্‌গ্রীব থেকেছে — দেড় বিঘা জমি রক্ষার জন্য রায়বাবুর সরকারের গলায় টাঙ্গির কোপ মেরে পাঁচ বছরের জন্য জেলে গেছে, ঈশান মোক্তারের কাছে চিঠা দিয়ে জমি চেয়েছে, ভোটের পর জমির মালিকানা পাবে ভেবে আশান্বিত হয়েছে। শেষপর্যন্ত দাশুর স্বপ্ন যেমন সফল হয় নি, তেমনি মধুকুপিও নিছক জনমজুরের গাঁ থাকে নি। এ গাঁয়ের প্রায় সমস্ত জমিজমার মালিক হয়েছে ঈশান মোক্তার ও তার ছেলেরা; কিছু জমির ভাগ দুখন সিংহও পেয়েছে। আর যারা এককালে মুনিষ ছিল তাদের স্থান হয়েছে বিভিন্ন কোলিয়ারির কয়লাখাদে অথবা টেস্ট রিলিফের মাটি কাটার কাজে। সনাতন লাইয়ার মত কেউ কেউ অবশ্য ট্রাক্টরের ড্রাইভারি বা অন্য কোনো যন্ত্রনির্ভর কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যন্ত্রের গোলাম হয়ে গেছে। এছাড়াও এই উপন্যাসে কলের মিস্ত্রী (পলুশ হালদার), মোক্তার (ঈশান মোক্তার), পুলিশ (চৌধুরীজী বা রামাই দিগোয়ার), ডাক্তার (রিচার্ড সরকার)-এর মতো অন্যান্য বৃত্তি ও পেশার লোকজনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

এই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির আদিবাসী মানুষগুলির রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, ঐতিহ্য-লৌকিকতা, ধর্ম-কর্ম, পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠানের বাস্তব ছবি যেমন আছে, তেমনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এসবের উপর সভ্যসমাজের আগ্রাসনের ছবিও প্রকাশ পেয়েছে। তবে আদিবাসী সম্প্রদায়ের দাশু ঘরামি ও তার বিশ্বাস এই উপন্যাসের মূল। সে মানভূমের ঐতিহ্য ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। বাঘিন কানারানী তার কাছে 'বনমাতা' বলে শ্রদ্ধা পেয়েছে, আর আদিবাসীদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সিস্টার দিদি মাদলিনকে তার 'মানুষখাগী বাঘিন' বলে মনে হয়েছে — ''কানারানী নয়; তোর সিস্টার দিদিই মানুষখাগী বাঘিন বটে।''[২৮৪] উপন্যাসের শেষদিকে সিস্টার দিদির উদ্দেশ্যে দাশুকে এক চরম প্রশ্ন করতে দেখা যায় — ''তোমার বহিনকে তুমি এটা কেমন সুখ দিলে দিদি? . . . পেটের ছেইলাকে কোলে নিতে পারলে না যে, সে মানুষ কেমন সুখের মানুষ বটে?''[২৮৫] এখানে শুধু দাশুর ক্ষোভ প্রকাশ হয়েছে এমন নয়, এখানে স্বধর্মনিষ্ঠ দাশুর ভেতরে অন্য ধর্মের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে। ঐ অঞ্চলে

বড়লোক হয়ে ওঠা দুখন বাবুকেও আদিবাসীদের ধর্মচ্যুত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হতে দেখা যায়। এজন্য সে আদিবাসীদের জাতপঞ্চ ভেঙে নতুন জাতপঞ্চ তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছে। এজন্য সে কিছু নতুন নিয়ম-কানুনও বেঁধে দিয়েছে — ''কুঁকড়া খাবে না, কুঁকড়া বলি দিবে না, করমে ঘরের বেটি বহিন বহুরি নাচবে না; আর বেটি বহিনের বিয়ার বয়স বারো বছরের বেশিটি হবে না। আর . . . বনচন্ডীর পূজাও করতে হবে।''[২৮৬] প্রাথমিক অবস্থায় দাশু এর বিরোধিতা করেছিল। অবশ্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের খ্রিস্টান বা অন্য কোনো মতাদর্শে দীক্ষিত হওয়া থেকে দাশু আটকাতে পারে নি। তাই দেখা যায় তাদের একসময়ের জাতপঞ্চ রতন সাধারণ শ্রমিকের পর্যায়ে নেমে এসেছে, তাদের লাইয়ার অর্থাৎ পুরোহিত সনাতন ট্রাক্টরের ড্রাইভারির কাজ নিয়েছে।

এইসব আগ্রাসন ছাড়াও আদিবাসী সংস্কৃতির অনেক ছবিই এই উপন্যাসে আছে। তাই সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — ''মানভূমের আদিবাসীদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, লৌকিক সংস্কার-বিশ্বাস-মানসিকতার আলেখ্য 'শতকিয়া'। আঞ্চলিক জীবনযাত্রা ও বিশ্বাসের প্রতিনিধি দাশু ঘরামি। . . . তার পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রা, পরিবর্তিত সময়স্রোত, আদিম সংস্কৃতি ও জীবনবোধের সম্পূর্ণ ছবি 'শতকিয়া'।''[২৮৭] এই আদিবাসীদের জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে 'কপালবাবা'। এদের বিশ্বাস যে, তাদের জীবনের সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় 'কপালবাবা'র ইচ্ছায়। ছোটকালু-বড়কালু পাহাড়, জঙ্গলে কপালবাবার অবস্থান হলেও মধুকুপিতে 'জাহির থান' হল কপালবাবার আস্তানা। সেখানে আদিবাসীরা তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য মোরগ বলি দেয়, সেখানকার বেলগাছের পাতা চিবিয়ে নিজেদের রোগ সারায় — ''. . . মধুকুপির মনে একটা অহংকারও আছে যে, গাঁয়ের কোন মানুষ আজ পর্যন্ত গোবিন্দপুর হাসপাতালের ওষুধ মুখে দেয় নি। কপালবাবার সেই বেলগাছের পাতাই যথেষ্ট, মধুকুপির সব রোগের ওষুধ, সব ভয়ের কবচ আর সব মানতের আশ্বাস।''[২৮৮] এদের বিশ্বাস কোনো কারণে 'কপালবাবা' অসন্তুষ্ট হলে আর রক্ষে থাকে না — ''সেই সময় ভয়ানক রাগ করেছিল কপালবাবা। আর, এক মাসের মধ্যে মধুকুপির পঞ্চাশের বেশি মানুষের প্রাণ কলেরায় শেষ হয়ে গেল। ছেলে বুড়ো

জোয়ান, মাগি আর মরদ, সব লাশ ওই ডরানির জলে ফেলে দিতে হয়েছিল। কিছু ভেসে গেছিল, কিছু শেয়ালে খেয়েছিল, খুঁজলে বোধহয় ডরানির বালুর কোন গর্তে আজও দু–একটা খুলি পাওয়া যাবে।''[২৮৯] 'কপালবাবা' এদের জীবনে এতটাই অনিবার্য প্রভাব ফেলে যে, ধর্ম পরিবর্তন করলেও এদের অবচেতনে তাঁর অস্তিত্ব থেকে যায়। তাই খ্রিস্টান পলুশ হালদার ও জোহানায় রূপান্তরিত হওয়া মুরলীও অবচেতনে তাঁর নাম স্মরণ করে।

'কপালবাবা' ছাড়াও আদিবাসীদের সিনবোঙা, জাহির বুরু, কুদরার মত বেশ কিছু 'বোঙা' অর্থাৎ দেবতার উল্লেখ এই উপন্যাসে আছে। দাশুর স্মৃতিতে আদিবাসীদের 'করম' উৎসবের আনন্দমুখর দিনগুলির কথাও বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। অবশ্য উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত আদিবাসীদের এই সংস্কৃতি টিকে থাকে নি — উচ্চবর্ণের হিন্দু ধর্ম এবং খ্রিস্টান ধর্ম প্রায় সবটাকেই গ্রাস করে ফেলেছে। এই উপন্যাসে আদিবাসীদের বিয়েতে কন্যেপণ দেওয়ার উল্লেখ আছে — একান্ন টাকা কন্যাপণে দাশু ঘরামি ঝালদার মহেশ রাখালের মেয়ে মুরলীকে বিয়ে করেছিল। অবশ্য সে বিয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয় নি — কিছুটা দাশুর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, আর কিছুটা সভ্য জগতের আকর্ষণে মুরলী বিয়ে ভেঙে দিয়েছে। এই সূত্রে আদিবাসীদের বিয়ে ভাঙার বিষয়টিও উপন্যাসে এসেছে। তাই মুরলীর দাশুকে ছেড়ে যাবার সময় সনাতন লাইয়া চেচিয়ে বলে — ''তবে এখনি সিঁদুর মাটি করুক মহেশ রাখালের বেটি।''[২৯০] জাতপঞ্চের বুড়া রতন দাশুকে পাতপানি চিরে ফেলতে বলে, গরুচরানি মেয়েগুলি মুরলীর হাতের বালা ভেঙে দেওয়ার কথা বলে। ঔপন্যাসিক লিখেছেন — ''লাল গালার বালা আছে যে হাতে, সেই হাতটা দাশুর চোখের সামনে এগিয়ে দিয়ে তেমনি ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকে মুরলী। কেঁদমাঠের কালো কুচকুচে লাঠির একটি বাড়ি দিয়ে মুরলীর হাতের বালা ভেঙে দু টুকরো করে দেয় দাশু। মুরলীও সেই মুহূর্তে সেই হাত নামিয়ে আর চিমটি দিয়ে মাটির ধুলো তুলে নিয়ে সিঁথির সিঁদূরের উপর ঘষে দেয়। আর, বড় বুড়া রতন একটা পাকুড়পাতার উপর এক ঘটি জল ঢেলে দিয়ে পাতাটিকে দাশুর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়।''[২৯১] দাশু এই পাকুড় পাতা চিরে দিলেই তাদেই বিচ্ছেদ হয়ে যায়। খ্রিস্টান জোহানায় রূপান্তরিত হওয়া মুরলীর প্রথমে

‘কলের মিস্ত্রী’ পলুশ হালদারকে এবং পরে ডাক্তার রিচার্ড সরকারকে বিয়ে করার মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসে নব্য খ্রিস্টানদের বিয়ের রীতির পরিচয়ও আছে।

এই উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক মানভূম অঞ্চলের অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকা, পোশাকপরিচ্ছদ, বাসগৃহ প্রভৃতির পরিচয়ও দিয়েছেন। মকাই অর্থাৎ ভুট্টা সেদ্ধ বা ছাতু এই অঞ্চলের গরিব আদিবাসীদের প্রধান খাদ্য বলে বিবেচিত হয়। এর পাশাপাশি ভাত খাওয়ার চলও তাদের মধ্যে আছে। এছাড়াও টাঙ্গি অথবা তীর-ধনুক নিয়ে জঙ্গলে পশুশিকার করে তার মাংসও এরা খায়। পানীয়ের মধ্যে মহুয়ার মদ ব্যাপক প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। ‘করম’ উৎসব উপলক্ষে আদিবাসীদের আকণ্ঠ ‘হাঁড়িয়া’ পান করার কথাও বলা হয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে এই আদিবাসীদের তেমন শৌখিনতা ছিল না। একটি ধূতির মত কাপড় পুরুষদের লজ্জা নিবারণ করার জন্য যথেষ্ট। আর নারীরা শরীরে একটা গামছা জড়িয়ে আদুড় গায়ে থাকতে অভ্যস্ত। তাই জেল ফেরৎ দাশু মুরলীকে সায়া-শাড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখে যেমন অবাক হয়ে গেছে, তেমনি প্রচণ্ড রেগেও গেছে — ‘‘সবচেয়ে বেশি বদলে গিয়েছে দাশু ঘরামির ঘরণী মুরলী। . . . কী ভয়ানক আশ্চর্যের জিনিস সেই মুরলীর এই চেহারা! দাশু ঘরামির চোখের ফ্যালফ্যাল বিস্ময় আস্তে আস্তে কটকট করে জ্বলতে থাকে। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু — বেঁচে আছিস মুরলী?’’[২৯২] অবশ্য সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষগুলি পোশাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন হয়েছে। উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির বাসগৃহের পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক অনেকবার দাশুর বাড়ির কথা বলেছেন — ‘‘দাশু ঘরামির ঘর। সেই পাঁচ হাত উঁচু মাটির দেয়াল, খাপরার চালা, আর পুরনো জামকাঠের একটা দরজা।’’[২৯৩] এটা মধুকুপির অধিকাংশ আদিবাসীর বাসগৃহের বাস্তব অবস্থা। এইভাবে উপন্যাসটিতে গৃহীত অঞ্চলটির অধিবাসীদের জীবনচর্যার পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক তাদের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহের একটা আঞ্চলিক রূপকে তুলে এনেছেন।

এসবের পাশাপাশি এই উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির আঞ্চলিক ভাষারূপের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। বর্ণনার ভাষার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক মান্য চলিত বাংলাকে

গ্রহণ করেছেন। সংলাপের ভাষাতে তিনি মান্য চলিত বাংলা ব্যবহার করলেও সেখানকার ভূমিপুত্রদের কথা-বার্তায় বারবার আঞ্চলিক ভাষারীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে মান্যচলিত বাংলাতেও তিনি প্রচুর আঞ্চলিক শব্দকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। যেমন — চিঠা, কোর্ফা, গরঞ্জি, কানালি, ঝাঁজলি আর কালিশ, সাঁজা, শিয়ালগীর, ঘাসিন, সালিয়ানা, নাইহর নাই, শশুরার নাই, ঝরানি, সুঁদের, পৈঁছা প্রভৃতি। কিছু আদিবাসী গানের পরিচয়ও এই উপন্যাসে আছে। উপন্যাসের ভাষারীতির এই সমস্ত দিকে লক্ষ করে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''উপন্যাসটির সংলাপ ও চরিত্রদের জীবন-আলোচনায় এই অঞ্চলের আদিম গোষ্ঠীর বাগ্‌রীতি উহার চিত্রলতা ও ব্যঞ্জনাধর্ম লইয়া চমৎকারভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।''[২৯৪] সুতরাং উপন্যাসটিতে ভাষাগত দিক থেকেও আঞ্চলিকতার ধর্ম মানা হয়েছে।

এইভাবে 'শতকিয়া' উপন্যাসটির বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রায় সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। তাই এই উপন্যাসটিকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষিতে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস অভিধা দিতে বাধা থাকা উচিত নয়। সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে যে মেনে নিয়েছেন, তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু একটু সচেতনভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে, এই উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক পটভূমি থাকলেও শেষপর্যন্ত 'শতকিয়া' পুরোপুরি আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠে নি। হয়তো একে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে রচনা করা ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্যও ছিল না। তিনি এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল থেকে স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত মানভূমের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পট পরিবর্তনের চিত্র অঙ্কনেই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। এই সূত্রেই উপন্যাসটিতে মধুকুপি গ্রাম এবং সেখানকার আদিবাসীদের কথা এসেছে, যাদের প্রতিনিধি দাশু ঘরামি। কিন্তু উপন্যাসে ঈশান মোক্তার, দুখন সিং, সিস্টার দিদি মাদলিনের উপস্থিতি ও কার্যকলাপ আঞ্চলিকতার গন্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজ প্রেক্ষাপটকেই তুলে আনে। এই উপন্যাসের অনেক ঘটনাই মধুকুপির বাইরে হারানগঞ্জে ঘটেছে। আর এসব ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে আদিবাসী মুরলীর চেয়ে খ্রিস্টান জোহানা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে আদিবাসী সমাজের চেয়ে, নব্য খ্রিস্টান সমাজকেই বেশি

প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এটাও ঠিক যে, কোনো সমাজই অঞ্চলকে ছাড়িয়ে গড়ে উঠতে পারে না। হয়তো একারণেই 'শতকিয়া'য় মধুকুপি গ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের প্রকৃতি এবং সেখানকার আদিবাসীদের জীবনচর্যার বাস্তবসম্মত ভাবে উঠে আসা উপন্যাসটিতে 'আঞ্চলিক রঙ্' সৃষ্টির উপযোগী হয়েছে এবং উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিকতার নিরিখে 'শতকিয়া'র শ্রেণীবিচার করতে বসে আমরা বাংলা সাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসটিকে আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাস বলেই ক্ষান্ত থাকব।

প্রফুল্ল রায়ের **'সিন্ধুপারের পাখি'** (১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পটভূমিকায় রচিত। এই উপন্যাসে তিনি দেশ থেকে নির্বাসিত রাজদণ্ডভোগী বন্দীদের জীবন আলেখ্য তুলে আনার দিকে জোর দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এখানে আন্দামানের প্রকৃতি ও সমাজব্যবস্থার একটি ছবি উঠে এসেছে। ফলে উপন্যাসটির আঞ্চলিক পটভূমিকা তৈরি হয়েছে। এখানে তিনি আন্দামানের কারাব্যবস্থা, উৎকট শাস্তি ও দৈহিক অত্যাচার সহ্য করে কয়েদিদের মানসিক অবস্থাকে চিত্রিত করেছেন। এজন্য উপন্যাসটি আন্দামানের কারাগারে বন্দীদের বঞ্চিত জীবনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ও করুণ দিবাস্বপ্নের গুরুত্বপূর্ণ আখ্যান হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই উপন্যাসটিকে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় আনা উচিত নয়। কিন্তু অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তির প্রেক্ষিতে এই উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় স্থান দেওয়া হয়েছে। তিনি উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক পর্যায়ে ফেলতে না চাইলেও এর মধ্যেকার ভৌগোলিক বর্ণনা ও প্রতিবেশচিত্রের প্রশংসা করেছেন — ''অবশ্য ইহা ঠিক আঞ্চলিক পর্যায়ে পড়ে না; কেননা যদিও ইহাতে আন্দামানের ভৌগোলিক বর্ণনা ও প্রতিবেশচিত্র প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, তথাপি ইহার মানব-প্রকৃতি-পরিচয় স্থান-প্রভাবিত নহে।''[২৯৫] এটা ঠিকই যে, 'সিন্ধুপারের পাখি' উপন্যাসটির আঞ্চলিক পটভূমি আছে; কিন্তু রামপিয়ারী, চান্নু সিং, লখাই, ভিখন, তোরাব, আলি, লাডিন, ডি-কুনহা, মিমিথিন, উজগের সিং-এর মত এই উপন্যাসের কোনো চরিত্রই আঞ্চলিক চরিত্র নয়। পাশাপাশি আঞ্চলিক উপন্যাসে গৃহীত অঞ্চলটির অধিবাসীদের সর্বাঙ্গীণ জীবনচর্যাকে তুলে আনার যে প্রবণতা থাকে — সেটাও এখানে অনুপস্থিত। আমরা এই উপন্যাসে স্থানীয় লোকজনের

জীবন-জীবিকা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, লোককথা-লোকঐতিহ্য, পুরাকথার মতো বিষয়গুলি যেমন খুঁজে পাই না, তেমনি তাদের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ির বাস্তব রূপকেও দেখতে পাই না। চরিত্রদের ভাষা-সংলাপ সম্পর্কেও একথা সত্য। এখানে মূলত জেলের খাবার, জেলের পোশাক, জেলখানায় প্রচলিত ভাষারূপকে ব্যবহার করা হয়েছে। আর প্রায় সবারই বাসগৃহ হল আন্দামানের জেলখানা। তাই প্রফুল্ল রায়ের 'সিন্ধুপারের পাখি' উপন্যাসকে কারা উপন্যাসের মত উপন্যাসের অন্য কোনো শ্রেণী হিসেবে বিচার বিশ্লেষণ করা হলেও উপন্যাসটির আঞ্চলিক পটভূমিকাকে মাথায় রেখেও একে আঞ্চলিক উপন্যাস তো দূরস্থান, আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাসের আলোচনাতেও ফেলা যায় না।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের **'দুখিয়ার কুঠি'** উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসটির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন — ''. . . 'দুখিয়ার কুঠি'র পরিমিত পরিসরে অমিয়ভূষণ ভিন্ন ধরনের শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ক্রম-অগ্রসরমান একটি রাজপথের ধাক্কায় একটি গ্রাম ও একটি মেয়ের প্রতিক্রিয়াকে প্রায় প্রতীকে-রূপকে সাজিয়ে ফেলেছেন লেখক।''[২৯৬] উপন্যাসটি শীর্ণ-অগভীর চর ও চোরাবালি-সংকুল গদাধর নদীর এক পারে ছোট নোংরা মহকুমা শহর গদাধরপুর এবং অন্য পারে ঝোপঝাড়ে আকীর্ণ জীর্ণ 'দুখজাগানিয়া কুঠি', যার চলতি নাম 'দুখিয়ার কুঠি'কে পটভূমি করে রচিত। এর কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, অনেক দিন আগে ব্যাধির ভয়ে এখানকার প্রায় সবাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য পরে কেউ কেউ ফিরেও এসেছিল। এই ফিরে আসা মানুষগুলির মধ্যেই ছিল 'কুম্‌রি', যে পরে 'ডাঙ্গর আই' নামে পরিচিত হয়েছিল। সে ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজের কন্যা। গ্রামে ফেরার পথেই শহরের ব্যববসায়ী চোরাকারবারী লখাই চক্রবর্তী তাকে ধর্ষণ করে। এতে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়, যার নাম সে মাতালু রাখে। ছোট থেকেই মাতালু মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মানুষ হয়। তার কাছে নিজের পিতৃপরিচয় অজ্ঞাতই থেকে যায়। অবশ্য লখাই তার পুত্র-পরিচয় জানে। মাতালু ভালোবাসে মালতীকে। কিন্তু নারীমাংসলোলুপ লম্পট লখাই টাকার জোরে মালতীকে বিয়ে করে ঘরে তোলে। মালতীর টানেই 'দুখজাগানিয়ার কুঠি' ছেড়ে মাঝে মাঝে মাতালু শহরে চলে আসে।

দুজনের দেখাও হয়, তবে তারা অসহায়। লখাই ধনবল, জনবল, বিবাহমন্ত্রের বল — সব কিছুতেই মাতালুর চেয়ে একসময় লখাই-এর চেয়ে এগিয়ে। ক্রমে লখাই-এর সঙ্গে মাতালুর প্রবল শত্রুতা শুরু হয়। একরাতে নদীতীরের বনভূমিতে আফিমের চোরাকারবারীদের হাতেনাতে ধরার জন্য বন্ধু কাঁকরুকে সঙ্গে নিয়ে মাতালু বের হয়। অন্ধকার বনভূমিতে পিতাপুত্র দুই শত্রুতে দীর্ঘক্ষণ ধরে ভয়ঙ্কর লুকোচুরি খেলা চলে। ক্রমে লখাই ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, দুর্বল ও কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এসময় মাতালু বজ্রমুষ্ঠিতে লখাই-এর গলা চেপে ধরে। একেবারে অন্তিম মুহূর্তে কোণঠাসা, ভীত, পরাজিত লখাই দেশি ভাষায় মাতালুকে পুত্র সম্বোধন করে বসে। এতদিন পর পিতৃপরিচয় পেয়ে মাতালুর বজ্রমুষ্ঠি কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। আর এই শিথিলতার সুযোগ নিয়ে লখাই পলায়ন করে। মাতালু তার পিছু পিছু ধাওয়া করেও নাগাল পায় না; নিজেই নদীর চোরাবালিতে গিয়ে পড়ে ভয়ংকর মৃত্যুবরণ করে।

এদিকে লখাই কোনোরকমে পালিয়ে মাতালুর ঘরেই আশ্রয় নেয়, যেখানে আছে তার পূর্ব-ধর্ষিতা ডাঙ্গর আই। বর্তমানে সে মাতালুর মা। এই লখাই ধর্ষণের মধ্য দিয়ে ডাঙ্গর আইয়ের শরীরে যে আগুন জ্বালিয়েছিল, তা আজও নেভে নি। তাই সে লখাইকে সাগ্রহে গ্রহণ করে। এদিকে রাত্রিশেষে মাতালুর বন্ধু কাঁকরু দুখিয়ার কুঠিতে মাতালুর মৃত্যুর দুঃসংবাদটা দিতে হাজির হয়। কিন্তু সে দেখে যে, ডাঙ্গর আইয়ের মুখে হাসি হাসি ভাব। এই মুখ লজ্জাতেও সুন্দর। এই সকালেই সে যেন কিছু প্রসাধন করেছে। ঘরের এক কোণে আলনায় মাতালুর প্যান্ট শার্ট মৃদু হাওয়ায় দুলছে। যদিও ডাঙ্গর আই পুত্র মাতালুর মৃত্যু সংবাদ জানত না, তবে পুত্রের মৃত্যুর রাতটিতেই তার মৃত্যুর জন্য অন্যতম দায়ী পুরুষটির সঙ্গে রতিসম্ভোগ এবং ভোরে প্রসাধন করার বিষয়টির মধ্যে তার অবচেতন মনে দীর্ঘদিনের চাপা থাকা আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এটাই উপন্যাসের গভীরতর ব্যঞ্জনার দিক। একদিকে পুত্রের মৃত্যু, অপরদিকে সেই মৃত্যুর জন্য দায়ী মানুষটির সঙ্গে রতিসম্ভোগের আনন্দ — এরূপ নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে।

আঞ্চলিকতার নিরিখে উপন্যাসটির বিচার করলে দেখা যায় যে, ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসটির পটভূমি হিসেবে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানাভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা একটা অঞ্চল এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষজনের জীবনচর্যাকে

গ্রহণ করেছেন। এখানে এই অঞ্চলটি হল 'দুখজাগানিয়ার কুঠি' বা দুখিয়ার কুঠি, যা গদাধর নদীর একপাড়ে অবস্থিত। নদীর অপরপারে মহকুমা শহর গদাধরপুর থাকলেও তার প্রকৃতির সঙ্গে দুখিয়ার কুঠি এলাকার প্রকৃতি মেলে না। এই শহরের লোক লখাই চক্রবর্তী ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। আর দুখিয়ার কুঠির মানুষেরা হল ডাঙ্গর আই, মাতালু, কাঁকরু প্রমুখেরা। শহরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থাকলেও দুখিয়ার কুঠিতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিরাজ করে। উপন্যাসে এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, লোককথা-লোকসংস্কৃতি, নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ প্রভৃতির বিবরণ আছে। বর্ণনার ভাষার ক্ষেত্রে এই উপন্যাসে মাঝেমাঝেই আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি সংলাপের ভাষার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক স্থানীয় উপভাষাকেও গ্রহণ করেছেন। ফলে উপন্যাসটি অনেকটাই আঞ্চলিক উপন্যাস বলে আমাদের মনে হয়। তবে অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'দুখিয়ার কুঠি' সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। এখানে মহকুমা শহর গদাধরপুর এবং গ্রামাঞ্চল দুখিয়ার কুঠির মিশ্র সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করেছে। ঔপন্যাসিক একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষদের জীবনচর্যার পরিবেশনের চাইতে অনেক বেশি অন্ত্যজ জীবনের রূপ এবং তথাকথিত সভ্য জগতের নগ্ন অবস্থাকে দেখিয়েছেন। ডাঙ্গর আই এবং লখাই-এর দৃশ্যাবলীর মধ্যে সেটাই দেখানো হয়েছে। মাতালু অনেকটা আঞ্চলিক চরিত্র হিসেবে রচিত হলেও সর্বদা আঞ্চলিকতাকে সে বহন করে চলে নি। 'আঞ্চলিক রঙ্'-এর বিষয়টিও এই উপন্যাসে তীব্রভাবে প্রকাশ পায় নি। তাই 'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসটিকে আমরা পুরোপুরি আঞ্চলিক উপন্যাস না বলে একে আঞ্চলিকতার লক্ষণসম্পন্ন উপন্যাস বলতে পারি। কারণ এখানে পটভূমি হিসেবে 'দুখজাগানিয়ার কুঠি' অর্থাৎ দুখিয়ার কুঠি সংলগ্ন অঞ্চলটি গ্রহণের মাধ্যমে একটি আঞ্চলিক পটভূমি গৃহীত হয়েছে।

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের **'চরকাশেম'** উপন্যাসটি ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি নিম্ন-পূর্ববঙ্গের গরিব চাষিদের আর্থ-সামাজিক জীবনের নিখুঁত ছবি পরিবেশন করেছেন। উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ জানিয়েছেন — ''চরকাশেম অমরেন্দ্র ঘোষ রচিত উপন্যাস। শ্রমজীবী মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রাম এই উপন্যাসের মূল বিষয়। গোষ্ঠীজীবনের কাহিনীর একটি নিখুঁত

রূপায়ণ এই কাহিনীতে বিদ্ধৃত।''[২৯৭] তাঁর এই কথাতেই উপন্যাসটির আঞ্চলিক লক্ষণের ঈঙ্গিত আছে। উপন্যাসটি সম্পর্কে অধ্যাপক ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন — ''নদীর বুকে ক্রমে একটু করে চর জেগে ওঠছে, সেই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কাশেমের হৃদয়াবেগ — তার কৌতূহল সংশয় হতাশা উল্লাস যেন সদ্যযৌবনা প্রেমিকার প্রতি অনুভবের রঙ-বদলের বৈচিত্র্য। 'চর তো নয় দুধের সর'। চর জাগায় গ্রাম-জোড়া চাঞ্চল্য চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। পুরোনো গ্রামের অনেক লোক নতুন চরে উপনিবেশ গড়ে তুলল। এইসব চাষি-জেলের দলের কাছে নয়া উপনিবেশের বৈশিষ্ট্য হল কোনো ধনী জোতদার নয়, তাদের মতোই এক নিঃস্ব চাষি এর মালিক, যে কিছুদিন আগে ঋণের দায়ে বেচে-দেওয়া এক ক্রীতদাস।''[২৯৮] শুধু এটুকুই নয়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ' — বাংলা সাহিত্যের আঞ্চলিকতার আলোচনায় প্রথম সারিতে থাকা এই তিন উপন্যাসের সঙ্গে এই উপন্যাসটির তুলনা টেনে তিনি আরও বলেছেন — ''তারাশঙ্করের 'কালিন্দী', মানিকের হোসেন মিয়ার দ্বীপ, নারায়ণের 'উপনিবেশ' এই সব নাম-করা বই পাঠকের মনে পড়বে।''[২৯৯]

দেশবিভাগ, মন্বন্তর, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, পোড়ামাটির নীতি প্রভৃতির অভিঘাতে নিম্ন-পূর্ববঙ্গে নদীর বুকে ধীরে ধীরে জেগে ওঠা একটি চরকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর সব হারানো গরিব চাষিদের কৌতূহল, সংশয়, হতাশা, উচ্ছ্বাসের ছবি নিয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। এই চরটির নামই হল চরকাশেম। এটি ঐ লোকগুলির কাছে 'চর তো নয় দুধের সর'-এর মতো আকর্ষণের বস্তু বলে পরিগণিত হয়েছে। এই মানুষগুলির নেতৃত্বস্থানীয় হল কাশেম মিঞা। সে-ই এই উপন্যাসের নায়ক। তার ভালোবাসার মানুষ ফুলমন। সে কাশেমের মনিবকন্যা এবং ছোটবেলায় কাশেমের খেলার সঙ্গী ছিল। কিন্তু বড় হয়ে ফুলমন কাশেমের উপর প্রভুত্ব ফলাতে শুরু করে নানা অমানবিক আচরণ করে। তাই এসবের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ফুলমনের বিয়ের রাতে কাশেম তাকে ডাকাতি করে আনায়। হয়তো তার এ কাজের আড়ালে গোপন প্রেমও লুকিয়ে ছিল। তবে ফুলমনের দ্বারা কাশেম প্রতিহত হয়। তার প্রেম, স্বপ্ন, ভালোবাসা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। এই প্রেম-ভালোবাসা উপন্যাসটির

একটা দিক। তবে এখানে সদ্য জেগে ওঠা চরটিকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ ও মন্বন্তরে সব হারানো বহু মানুষের স্বপ্ন-সম্ভাবনাকে বড় করে দেখানো হয়েছে। এজন্য উপন্যাসটিতে মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন চরকাশেমের প্রকৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান থেকে শুরু করে সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া মানুষগুলির জীবনচর্যাকে ঔপন্যাসিক তুলে এনেছেন। এই মানুষগুলির মধ্যে বেশিরভাগ হল মুসলমান, কিছু হিন্দুও আছে। তবে দাঙ্গার পটভূমিকায় উপন্যাসটি লেখা হলেও এখানে হিন্দু-মুসলামানের মধ্যে সহাবস্থান ঘটিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের ছাপ রেখেছেন। পেশার দিক থেকে এরা গরিব চাষি, ক্ষেতমজুর, জেলে। দুই-এক ঘর ধনী কৃষক এবং পেশাদার চোরের উল্লেখও এখানে আছে। ঔপন্যাসিক এদের সকলের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, লোককথা-লোসংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, ভাষা-সংলাপকে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। ফলে উপন্যাসটি একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের দিকে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। কিন্তু ঔপন্যাসিক নিজে কমিউনিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় যৌথ বিল্পবের সমর্থক ছিলেন। এই উপন্যাসেও তাঁর সেই রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব পড়েছে। এজন্য উপন্যাসটির শেষদিকে চরটিকে কেন্দ্র করে এই মানুষগুলি আন্দোলনে নেমেছে — ঔপন্যাসিক বুভুক্ষু চাষিদের শ্লোগান-মুখর মিছিলে সামিল করেছেন। ফলে উপন্যাসের পরিণতিতে শিল্পগত দিক থেকে বড় রকম বিপর্যয় ঘটে উপন্যাসটিকে আঞ্চলিকতার লক্ষণ থেকে অনেকটাই দূরে ঠেলে দিয়েছে। ফলে শেষ পর্যন্ত 'চরকাশেম' লেখকের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

শক্তিপদ রাজগুরুর **'তবু বিহঙ্গ'** উপন্যাসটি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি পশ্চিম রাঢ়ের বনভূমির প্রান্তে অবস্থিত ঊষর প্রান্তরে গড়ে ওঠা গোপালপুর নামে এক উদ্বাস্তু শিবিরের পটভূমিকায় রচিত। ঔপন্যাসিক ঐ উদ্বাস্তু শিবিরের এক কর্মাধ্যক্ষের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ঐ সেখানে হাজির হওয়া মানুষজন ও তাদের কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এই উদ্বাস্তু শিবিরের মরা ডালে অবস্থার বিপর্যয়ে পড়ে কত অঞ্চলের কত 'বিহঙ্গ'-এর মত এসে আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে আছে মুরারি সিদ্ধান্ত ও তার মেয়ে শোভা, উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কপিল ও তার পরিবারের লোকজন, সুরশিল্পী সুরেশ ও তার মেয়ে

গীতকুশলা কচি, জিতেন ডাক্তার, উন্মাদিনী বিন্দী, স্বৈরিণী কমল, নটবর, নিকুঞ্জ, বাসন্তী প্রমুখ। এদের মধ্যে মুরারি সুযোগসন্ধানী। দুর্বলকে উৎপীড়ন, অসহায়ের নামে কুৎসা রটনা, অসন্তোষের ধোঁয়ায় ফু দিয়ে আগুন জ্বালানোর মত দুর্বৃত্তের কাজগুলি সে করে থাকে। সে নিজের মেয়ের সতীত্বের বিনিময়ে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে নিতে চায়। তার ঐ মেয়েই যখন অসহ্য দুঃখে আত্মহত্যা করে, তখন সেই আত্মহত্যার দায় মুরারি কল্পনাতীত নির্লজ্জতার সঙ্গে উদ্বাস্তু শিবিরের বিরোধীপক্ষের ঘাড়ে চাপায়। এদিকে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ কপিলের নিদারুণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মানব জীবনের আর একটি রূপকে এই উপন্যাসে উদ্‌ঘাটন করেছেন। তার শ্রমবিমুখতা এবং উপার্জনে অক্ষমতার জন্য নিজের পরিবারেই তার মূল্য কমে গেছে। দেখা যায় যে, তারই অপদার্থতায় একসময় তার স্বগ্রামবাসী ও এযাবৎকাল তার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ এক নমশূদ্র যুবক সমাজনেতৃত্বের পদে আসীন হয়েছে। ফলে নতুন পরিবেশে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মর্যাদা স্খলিত হয়েছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, একসময় দেখা যায় তার স্ত্রী ও ছেলেপিলে তাকে একবাক্যে বর্জন করে চিরপোষিত ব্রাহ্মণ-সংস্কারকে বিসর্জন দিয়ে নিম্নবর্ণের এক ধনী ব্যবসায়ীর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুরশিল্পী সুরেশ ও তার মেয়ে কচি, আত্মগ্লানিতে ক্ষীন্ন জিতেন ডাক্তার, কোলের ছেলে হারিয়ে উন্মাদিনী বিন্দী, সন্তান-স্নেহাতুরা স্বৈরিণী কমল, অবস্থার উন্নয়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নটবর প্রমুখদের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মানব প্রবৃত্তির নানা দিক এই উপন্যাসে উদ্‌ঘাটন করেছেন। তবে সবকিছুই এসেছে উপন্যাসে গৃহীত উদ্বাস্তু শিবিরটির সীমা-সংহতির মধ্যে। তাই এই উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোচনাকালে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শোনা যায় -- ''মানবচরিত্রের কি বিচিত্র রূপ, ভালো-মন্দের কি অদ্ভুত সংমিশ্রণ, তির্যক মনোবিকারের কি স্মরণীয় রেখাচিত্রই না এই উদ্বাস্তু পরিবারগুলির সমষ্টিগত, সংকীর্ণ জীবনপরিধির মধ্যে উদাহৃত হয়েছে। লেখক প্রকৃত জীবনশিল্পীর অর্ন্তদৃষ্টির সহিত ইহাদের বহির্জীবনের বিক্ষোভকে গৌণ স্থান দিয়া উহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন ও ইহারই মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির গূঢ় চরিত্র-রহস্যটি ব্যক্ত করিয়াছেন।''[৩০০]

যাই হোক, এই উপন্যাসটিতে পশ্চিম রাঢ়ের বনভূমির প্রান্তদেশে অবস্থিত গোপালপুরের উদ্বাস্তু শিবিরটির মাধ্যমে একটি আঞ্চলিক প্রতিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা আছে।

ঔপন্যাসিক সেই উদ্বাস্তু শিবিরের কর্মাধ্যক্ষের মাধ্যমে উপন্যাসটির ঘটনাবলিকে তুলে ধরে সেখানকার খুঁটিনাটি বিবরণকে প্রকাশ করেছেন। ফলে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষজনের জীবনচর্যা এই উপন্যাসে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। তাই বাংলা উপন্যাসের আঞ্চলিকতার আলোচনায় এই উপন্যাসটি স্থান পায়। তবে শক্তিপদ রাজগুরুর 'তবু বিহঙ্গ' উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায় না। কারণ এখানে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও নানা দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা একটি অঞ্চল এবং সেখানকার জীবনচিত্রের সার্বিক পরিচয়ের বিবরণ থাকলেও মানুষগুলি কেউ-ই ঐ অঞ্চল থেকে উঠে আসে নি। সবাই ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে সবকিছু হারিয়ে একটু মাথা গোঁজার জন্য সেই উদ্বাস্তু শিবিরে এসে হাজির হয়েছে। এদের প্রায় প্রত্যেকেরই রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জগৎ আলাদা। তাই প্রায় কেউ-ই গোপালপুরের উদ্বাস্তু শিবিরটিকে ভালোবাসতে পারে নি, আপন করে নিতে পারে নি — শুধু জীবনের এক গভীর সংকটকালে সেখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে এবং নিজেদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে দেখা গোপালপুরের উদ্বাস্তু শিবিরটিও এক সময় ভেঙে গেছে। সুতরাং আঞ্চলিক উপন্যাসে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ জীবনচিত্র উঠে এসে যে 'আঞ্চলিক রঙ্' প্রকাশ পায়, তা এখানে থাকলেও অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। তবে এটা ঠিক গোপালপুরের উদ্বাস্তু শিবিরটিকে কেন্দ্র আঞ্চলিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার একটি প্রবণতা ঔপন্যাসিকের মধ্যে দেখা যায়। একারণেই 'তবু বিহঙ্গ' উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যের আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাসের আলোচনায় ফেলা যায়।

মনোজ বসুর বসু তাঁর **'বন কেটে বসত'** (১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটিতেও পূর্ববর্তী 'জলজঙ্গল' উপন্যাসের মত নিম্নবঙ্গ সুন্দরবন ও সেখানকার মানুষজনকে পটভূমি করেছেন। তথাকথিত সভ্যজগৎ থেকে গিয়ে হাজির হওয়া গগনের সেই অঞ্চল সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাই এই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। ঔপন্যাসিক এখানে যথার্থ আঞ্চলিক পরিবেশ গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। উপন্যাসটির কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, সমতলে কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পেরে বিনি-বউ ওরফে বিনোদিনী ও বোন চারুকে রেখে ডাক্তারি শেখার জন্য গগন নিম্নবঙ্গের সুন্দরবন

অঞ্চলের কোকিলবাড়ি গ্রামের মনোহর ডাক্তারের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। যাত্রাপথে জগন্নাথ ও বলাই-এর সঙ্গে তার দেখা হয়। এরা বিশেষ করে জগন্নাথ কথার জালে সহায়সম্বলহীন গগনকে বোকা বানিয়ে কুমিরমারিতে গদাধরের হোটেলে নিয়ে গিয়ে সেখানে গগনকে চৌধুরীগঞ্জের ছোট চৌধুরীমশায়ের ভাগনে বলে তার নাম করে প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করিয়ে নিজেরাও খেয়েদেয়ে তাকে একলা রেখে চলে যায়। ফলে বাদা অঞ্চলে গিয়ে প্রথমেই গগন বিপদে পড়ে। এরপর জলকাঁদাময় অনেকটা পথ পেরিয়ে কোকিলবাড়ির মনোহর ডাক্তারের বাড়িতে সে হাজির হয়। সেখানে গিয়ে গগন দেখে মনোহর ডাক্তার চিকিৎসার নামে লোক ঠকিয়ে ভালোই বিষয় সম্পত্তি করেছে। তার ওষুধের মধ্যে প্রধান হল 'রাঙা-বড়ি' -- এই বড়ি তৈরির পদ্ধতি একমাত্র মনোহর ডাক্তার ছাড়া সে অঞ্চলের কেউ জানে না। প্রথমদিকে গগনকে সেখানে চাকরের মতই থাকতে হয়। ধীরে ধীরে গগনের কাছে স্পষ্ট হয় যে, ডাক্তারি শেখানোর চেয়ে নিজের অবিবাহিতা আইবুড়ো মেয়ে ভুতি ওরফে লতিকার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে মনোহর ডাক্তার বেশি আগ্রহী। অবশ্য গগনের আগেই সে বাড়িতে হরিদাস নামে একজন ছিল যে 'রাঙা-বড়ি' তৈরির পদ্ধতি শেখার উদ্দেশ্যে মনোহরের সমস্ত ফাইফরমাস খাটত। সে ভুতিকে তার প্রেমের জালে জড়িয়ে ফেলে -- উদ্দেশ্য বাপ না শেখালেও মেয়ের কাছ থেকে রাঙা-বড়ি তৈরির পদ্ধতি শিখবে। কিন্তু হরিদাসের উদ্দেশ্য মনোহরের কাছে ধরা পড়ে গেলে সে বিতাড়িত হয় এবং গগনের গুরুত্ব বাড়ে। এদিকে একদিন গগনের সাহায্যে ভুতি হারিদাসের সঙ্গে পালিয়ে যায়। এরপর গগনও ডাক্তারির একরকম কিছুই না শিখে কোকিলবাড়ি ত্যাগ করে কুমিরমারিতে গিয়ে ওঠে। প্রথমদিকে সে ডাক্তারির চেষ্টা করলেও পসার জমাতে পারে না। ফলে সে বয়রাখোলা নামক একটি গ্রামের মানুষদের উৎসাহে পাঠশালা খুলে গুরুমশাইগিরি শুরু করে। কিন্তু বন্যা ও অভাবের তাড়নায় ছাত্রের অভিভাবকরা পয়সা দিতে না পারায় সে পাঠশালা উঠে যায়।

এদিকে বাদাবনে যাত্রার প্রথমদিন থেকেই জগন্নাথের সঙ্গে গগনের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রথমদিন সে গগনকে অপদস্থ করলেও পরে বাদা অঞ্চলে সে-ই গগনের একমাত্র সহায় হয়ে ওঠে। এজন্য সে গগনকে 'বড়দা' বলে ডাকতেও শুরু করে। গগন কোকিলবাড়ি ছাড়ার পর কুমিরমারিতে তার ডাক্তারি করাতে,

বয়রাখোলে পাঠশালা খোলায় সে উৎসাহ দিয়েছিল। কিন্তু যখন গগন কোনোভাবেই নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারল না, তখন জগন্নাথ তাকে আরও নীচে একেবারে বাদা অঞ্চলে নিজেদের আস্তানায় 'আলা'য় নিয়ে গিয়ে হাজির করে। এই আলাটি ছিল চৌধুরীগঞ্জের চৌধুরীদের, যার ম্যানেজার অনিরুদ্ধ আর বিশ্বস্ত কর্মচারী কালোসোনা। সুন্দরবনের অসংখ্য নদ-নদী থেকে সারারাত মাছ ধরে এনে খুব ভোরে সে অঞ্চলের লোকজন এখানে মাছ বিক্রি করে। আর জগন্নাথ, বলাই-রা সেসব মাছ সমতলের সকালের বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে আসে। জগন্নাথের মতো নৌকা চালানোয় পারদর্শী লোক সে অঞ্চলে আর দু'টি নেই। তবে বিষয়-সম্পত্তি, স্থায়ীভাবে বসবাস করার মতো বাসনাও তার মধ্যে দেখা যায় না। তবে লেখাপড়া জানা হিসেবি গগনকে পেয়ে জগন্নাথ নিজেই আলা খোলার পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনা মতো তার জঙ্গলের একটি জায়গা পরিষ্কার করে আলা খুলেও দেয়। প্রথমদিকে দু'চারজন মাছ নিয়ে এলেও ধীরে ধীরে সে আলা জমে যায়। গগন ঘেরিদার বনে যায়, যার প্রধান অবলম্বন জগা অর্থাৎ জগন্নাথ। এখানে রাতে মাছ আসে, গগন খাতায় হিসেব করে সে মাছের পরিমাণ লিখে রাখে, জগন্নাথেরা বাজারে তা বিক্রি করে পয়সা এনে দিলে জেলেরা পয়সা পায়। এভাবেই রাতে পরিশ্রম ও দিনে আরাম-আয়েসে আড্ডা মেরে তাদের সময় কাটে। অবশ্য তাদের আলায় আসা মাছের মধ্যে বেশিরভাগই চৌধুরীদের ঘেরি থেকে চুরি করে আনা মাছ। ফলে এদের সঙ্গে মাঝেমাঝেই চৌধুরীদের কর্মচারীদের বিরোধ বাঁধে। এভাবেই বাদা অঞ্চলে গগনের জীবন কাটছিল।

এদিকে বাড়ি থেকে পয়সার তাগাদা দিয়ে গগনের শ্যালক খোঁড়া নগেনশশী মাঝেমাঝেই চিঠি পাঠাচ্ছিল। গগন সে সবের ঠিকমত উত্তর না দেওয়ায় এবং পয়সাকড়ি না পাঠানোয় একদিন নগেনশশী বিনি-বউ ও চারুকে নিয়ে সে অঞ্চলে এসে হাজির হয়। ফলে প্রথম কোনো ভদ্রঘরের মহিলার পা সে অঞ্চলে পড়ে। এরা রীতিমত ভদ্রগৃহের নিয়ম-কানুন, আচার-আচরণ, রীতি-সংস্কার চালু করে সেই বাদা অঞ্চলেও সভ্যজগতের ছোঁয়া নিয়ে আসে। ধীরে ধীরে গগনের ঘেরির সমস্ত কর্তৃত্ব নগেনশশীর হাতে চলে যায়। সে চৌধুরীদের সঙ্গে সমঝোতাও করে নেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে জগন্নাথ সেখানে অস্বস্তি অনুভব করে। ফলে সে এদের সংস্পর্শ ত্যাগের

সিদ্ধান্ত নেয়। গগনের বোন চারুও তার সঙ্গ দেয়। তাই উপন্যাসের শেষে দেখা যায় আরও নতুন অঞ্চলের সন্ধানে সে সুন্দরবনের আরও নিচের দিকে রওনা দিয়েছে। ঔপন্যাসিক লিখেছেন -- ''বনের বাঘ মানষেলায় যায় না, মানুষ-বাঘাও তেমনি সহজে আসতে চায় না এই সব দুর্গম বনজঙ্গলে। সেইটে বড় বাঁচোয়া। সেইজন্যে বোকাসোকা জগাদের প্রয়োজন। বন কেটে এরা বসত বানায়। পুরোপুরি বানানো হয়ে গেলে তারপরে দলকে দল বড়দরের মানুষেরা এসে পড়েন। ভালো ভালো দালান-কোঠা হয়। ভারী ভারী মহাজনী নৌকো — এবং ক্রমশঃ ধোঁয়াকল-স্টিমার দেখা দেয় জলে। ঝনঝন টাকাপয়সা বাজে। ভালো রাস্তাঘাট হয় জুতো-পায়ে বাবুদের চলাচলের জন্য। ঠেলা খেয়ে এরা চলে যায় আদাড়ে-আঁস্তাকুড়ে। হেজেমেজে মরে কতক। গগন দাসের মত এককালের দুঃখ সুখের সাথী কতজনে ভীড়ে যায় বড়দের সঙ্গে। আর যারা নিতান্তই জগাদের মতন, নতুন জায়গার তল্লাসে আবার তারা বেরিয়ে পড়ে।''[৩০১]

এই উপন্যাসের ঘটনাবলি মূল ভূভাগ ও বাদাভূমি — দুইস্থানেই ঘটেছে। মূল ভূভাগে কিছু করতে না পারাতেই গগন ভাগ্যান্বেষণে বাদা অঞ্চলে রওনা দিয়েছিল। তবে এরপরেও বিনি-বউ, চারু, নগেনশশীকে কেন্দ্র করে ঔপন্যাসিক মাঝে মাঝেই মূল ভূভাগের বিবরণ দিয়েছেন। তবে উপন্যাসটির বেশিরভাগ ঘটনাই বাদা অঞ্চলে ঘটেছে। সেই অঞ্চলের কুমিরমারি, বয়রাখোল, কোকিলবাড়ি, চৌধুরীগঞ্জ, সাঁইতলা, কেশডাঙা প্রভৃতি স্থানের নাম এখানে আছে। এর মধ্যে কুমিরমারি সে অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটাই শহরের মত। এখানেও উপন্যাসের কিছু ঘটনা ঘটেছে। তবে বেশিরভাগ ঘটনা ঘটেছে বাদাভূমি সাঁইতলায়, যেখানে গগনকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথেরা 'আলা' তৈরি করেছিল। উপন্যাসটিতে ঐ অঞ্চলটির ভূ-প্রকৃতি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন। আর এলাকাটি একসময় মূল জনসমাজ থেকে পুরোটাই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। ফলে এই বাদা অঞ্চলটিকে নিয়ে উপন্যাসটির আঞ্চলিক পটভূমি গড়ে উঠেছে। গগন, বিনি-বউ, চারুবালা, নগেনশশী, মনোহর ডাক্তার, ভুতি ওরফে লতিকা, জগন্নাথ, বলাই, অনিরুদ্ধ, কালোসোনা, হরিদাস, গদাধর, রাধেশ্যাম, পচা, সুদাম, গোপাল ভরদ্বাজ, কানা-ন্যাপলা, বুদ্ধীশ্বর, মুলুক

মিঞা, অন্নদাসী, তৈলক্ষ মোড়ল, নায়েব প্রমথ হালদার, নিবারণ, হর ঘড়ুই, ক্ষ্যাপা ঠাকুর মহেশ, শশী গোয়ালা প্রমুখদের এই উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে দেখা যায়। এদের মধ্যে অনেকেই মূল ভূখণ্ডের মানুষ। কিন্তু জগা ওরফে জগন্নাথ, বলাই, অন্নদাসী, রাধেশ্যাম, কালোসোনা, ক্ষ্যাপা মহেশ প্রমুখেরা পুরোপুরি ঐ অঞ্চলটি থেকেই উঠে এসেছে। জগন্নাথই এই উপন্যাসের নায়ক। চারুলতা ও তার প্রশংসা করে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''উপন্যাস মধ্যে দুইটি চরিত্র মাত্র আত্মমহিমায় অধিষ্ঠিত, সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন — চারুবালা ও জগন্নাথ।''[৩০২] বস্তুত এই জগন্নাথের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক বাদা অঞ্চলের জীবনকেই দেখিয়েছেন। তার মাধ্যমে সমস্ত বাদা প্রকৃতি যেন আত্মপ্রকাশ করেছে। এসবের পাশাপাশি বাদা অঞ্চলের রীতি-নীতি, জীবন-জীবিকা, সংস্কার-বিশ্বাস, লোককথা থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ প্রভৃতিরও বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন। ফলে এই উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাসের দিকে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন — ''. . . লেখক এই আঞ্চলিক জীবনযাত্রার, উহার নৌকা-বাওয়া, মাছ-ধরা, ভেড়ি-বাঁধা প্রভৃতি বৃত্তির, উহার অলৌকিক সংস্কার-বিশ্বাসের, উহার ক্ষণিক আনন্দোচ্ছ্বাস ও বে-পরোয়া জীবন-নীতির একটি নিঁখুত, তথ্যসমৃদ্ধ, প্রাণরসোচ্ছল চিত্র আঁকিয়াছেন ও তাঁহার অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডার হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বাংলা উপন্যাসের একটি সম্পূর্ণ নূতন জগতের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।''[৩০৩] তবে তিনি উপন্যাসটির কিছু অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি দিতেও ভোলেন নি — ''বন কেটে বসত' (১৯৬১) সুন্দরবনের অরণ্যপরিবেশে জীবনসংগ্রামের তীব্রতা, মাছ-ভেড়ির অধিকার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাই যেন চরিত্রস্বাতন্ত্র্যকে অভিভূত করিয়াছে। যে নর-নারীর পরিচয় এই উপন্যাসে পাই তাহারা যেন প্রতিবেশ-প্রভাবে অনেকটা সঙ্কুচিত। বহিঃপ্রকৃতির তীব্রতর শক্তির দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠভূমি হইতে বিতাড়িত। কোন বিশুদ্ধ মানবিক দ্বন্দ্ব জমাট বাঁধিবার পূর্বেই বাহিরের প্রবল অভিঘাত উহাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। বিষয়বস্তুর কিছুটা অতিপল্লবিত বিস্তার মানব সত্তার বিকাশকে ক্ষুণ্ন ও ব্যাহত করে।''[৩০৪]

'বন কেটে বসত' উপন্যাসটি ভৌগোলিক দিক থেকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সীমা-সংহতির বিষয়টি উঠে এলেও এখানে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেক বৈশিষ্ট্যই অনুপস্থিত। এখানে বাদা অঞ্চলের নির্দিষ্ট কোনো জনপদ উঠে আসে নি। ফলে তাকে কেন্দ্র করে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সামগ্রিক জীবনচর্যার বিষয়টিও অনুপস্থিত থেকে গেছে। সাঁইতলা এখানে গুরুত্ব পেলেও শেষ পর্যন্ত তা আর বাদার মানুষজনের আভাসভূমি থাকে নি — সেখানে নগেনশশীর মতো মূল ভূখণ্ডের লোভী, স্বার্থপর মানুষেরা আস্তানা গেড়েছে। আর এর স্থপতি জগা ওরফে জগন্নাথ আরও নীচে বসতি স্থাপনের আশায় এক অজানা রাজ্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে। সে নিজেই ঐ অঞ্চলের লোক থাকে নি। এখানে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সামগ্রিক জীবনচিত্র উঠে আসার চেয়ে স্বাধীনতার পর আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তনগুলি এসেছিল বাদা অঞ্চলেও পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল তার ছবিই প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটির পরিচয় অংশেও একথা বলা আছে — ''বাদাবন প্রকৃতির বিচিত্র লীলাভূমি। বাদা অঞ্চলের মানুষের বসতি স্থাপনের পিছনে আছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও গ্লানিময় জীবন-সমস্যা। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই এই সব ছিন্নমূল মেহনতী মানুষের। 'বন কেটে বসত' উপন্যাসের শেষে লেখক সমাপ্তি টানেন নি। সেটি সম্ভব নয়। কারণ, এই সব মানুষেরা শুধু বন কেটে বসত বানায়। কিন্তু টিকতে পারে না। ঠেলা খেয়ে আরও গভীরে বনাঞ্চলে চলে যায়, নতুন জায়গার সন্ধানে — অথৈ কালাপানির সামনে। জগন্নাথের মত সরল নির্লোভ লোকেরা মিলেমিশে বন কেটে বসত নির্মাণ করে। তারপর লোভী স্বার্থপর মানুষের দল এসে তাদের উৎখাত করে সব কিছু ভোগ করে। 'বন কেটে বসত' বাদার মানুষের সুখ-দুঃখের বাস্তব কাহিনী — বাদাবনের ইতিহাস। বিভিন্ন চরিত্রকে, বিশেষতঃ গগনকে অনুসরণ করে পাঠক বাদা রাজ্যে নিজের অজান্তেই চলে আসেন। যখন ঘোর ভাঙে, তখন পাঠক দেখেন — সামনে অথৈ কালাপানি। আর এখানেই লেখকের এই দুর্লভ উপন্যাস রচনার সার্থকতা।''[৩০৫] ফলে আঞ্চলিক উপন্যাসের বেশ কিছু উপাদান থাকলেও এই উপন্যাসটি একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হতে পারে নি।

আবদুল জব্বারের **'ইলিশ মারির চর'** (১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলায় জেগে ওঠা একটি চরকে পটভূমি করে রচিত। এই চরটির নাম

হল ইলিশ মারির চর। এই উপন্যাসে সেই চরটির প্রকৃতি এবং সেখানকার মৎস্যজীবী মানুষজনের কঠোর জীবন সংগ্রমের ছবি ঔপন্যাসিক এঁকেছেন। এই উপন্যাসটিতে সেই চরটির মৎস্যজীবী মানুষদের মধ্যে প্রচলিত লোককথা, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতিরও নানা বাস্তব ছবি স্থান পেয়েছে। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসটিতে মাঝে মাঝেই আঞ্চলিক উপভাষার প্রয়োগ করেছেন। এগুলি আঞ্চলিক উপন্যাসেরই লক্ষণ। তবে 'ইলিশ মারির চর' উপন্যাসটিতে একটা অঞ্চল থাকলেও এখানে আঞ্চলিকতার লক্ষণ খুব বেশি স্পষ্ট নয়।

রমাপদ চৌধুরীর **'বন পলাশীর পদাবলী'** (১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি বন পলাশী নামক একটি গ্রামকে পটভূমি করে লেখা। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসটি সম্পর্কে মনে হয়েছে যে, এখানে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এর গ্রামজীবন থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দিনের নতুন গ্রামের রূপরেখা এঁকেছেন। তিনি উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন — ''রমাপদ চৌধুরীর 'বন পলাশীর পদাবলী'তে (জুন, ১৯৬২) — সাম্প্রতিক পল্লীজীবনের নতুন রূপরেখা ও অন্তরস্পন্দন মনকে দোলা দেয়। ইহা নিছক বস্তুবর্ণনা বা ঘটনা বিবৃতি নয়, আদর্শায়িত ভাবচিত্রও নয়, অথচ উভয় উপাদানেরই সংমিশ্রণে গঠিত।''[৩০৬] অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় উপন্যাসটির মধ্যে ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর আত্মপ্রক্ষেপ পড়েছে বলে মনে করেছেন — ''এখানেও ঘটেছে আত্মপ্রক্ষেপ। তার সূচনা সাত বছর বয়স থেকে। প্রবাসী লেখকের বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখে দেখা তার নিজ গ্রাম, যৌবনে কখনো কখনো আশা আদর্শের চোখে দেখা, অর্ধবেকার জীবনে কর্মব্যাপদেশে বিভিন্ন জেলার পঁচিশ তিরিশটি গ্রামকে সমালোচনা আর বিশ্লেষণের অণুবীক্ষণ দৃষ্টির সামনে ফেলে দেখা।''[৩০৭] যাই হোক, এই উপন্যাসে মূলত বনপলাশী নামক গ্রাম এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষদের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বাংলার অন্যান্য গ্রামের সঙ্গে এই গ্রামটির কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও উপন্যাসে গ্রামটিকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে গ্রামটিকে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়েও স্বতন্ত্র বলেই মনে হয়। ফলে আঞ্চলিক পটভূমিকা থাকায় এই উপন্যাসটি অনেকটাই আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

প্রভাত দেব সরকারের **'ওরা কাজ করে'** (১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটিও অনেকটাই আঞ্চলিক উপন্যাসের ধাঁচে লেখা। অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তিনটি সাম্প্রতিক আঞ্চলিক উপন্যাসের কথা বলতে গিয়ে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' এবং সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' উপন্যাসের সঙ্গে এই উপন্যাসটির কথাও বলেছেন — ''প্রভাত দেব সরকারের 'ওরা কাজ করে' উপন্যাসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ক্ষেতমজুরদের জীবনযাত্রার ছবি পাই। পীরপুর গ্রাম সহস্র গ্রামের প্রতিনিধি; ক্ষেতমজুর চন্দন, মুকুন্দ, শিবু, অধরদের দেখা পাই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে। আঞ্চলিক সীমাসংহতি, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, বৃত্তির ঐক্যবন্ধন, জীবনযাত্রার একমুখীনতা এইসব মানুষের মধ্যে বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের মাটি, মাটির কাছাকাছি জীবন ও মানুষ, আঞ্চলিক ভাষা, আবহ ও পরিবেশ — সবটা মিলিয়ে একাত্ম হয়ে উঠেছে। এই নিরন্ন দরিদ্র ক্ষেতমজুরদের জীবনের দুঃখবেদনা, দারিদ্র্যপীড়ন, ন্যায়নীতি, ধর্মকর্ম, দিনযাপনের বাস্তব কাহিনীর মধ্য দিয়ে এক অখণ্ড জীবনবোধের উপলব্ধি ঘটেছে এই উপন্যাসে।''[৩০৮] অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসটি সম্পর্কে মূল্যায়ন হল — ''প্রভাত দেব সরকারের 'ওরা কাজ করে' (শ্রাবণ, ১৩৭১) — কল-কারখানার নিকটবর্তী অথচ কৃষিনির্ভর পল্লী-শ্রমিকের অনিশ্চিত জীবন যাত্রার কাহিনী।''[৩০৯] এঁদের বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় এই উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণ পুরোমাত্রায় আছে।

উপন্যাসের কাহিনি অংশেও দেখা যায় ঔপন্যাসিক এখানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পীরপুর গ্রামের অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ছবি এঁকে সেখানকার ক্ষেতমজুরদের জীবনচর্যাকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই সেই গ্রামের ক্ষেতমজুরদের জীবনযাপন প্রণালী, রীতি-সংস্কার, লোক-সংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা প্রভৃতি সমস্ত কিছুই এখানে স্থান পেয়েছে। ফলে এই উপন্যাসটি একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হওয়ার দিকে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। তবে এটাও ঠিক এখানে পীরপুর গ্রাম বাংলার আর পাঁচটা সাধারণ গ্রামের চেয়ে খুব বেশি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে হাজির হয় নি। এখানকার অধিবাসীদের জীবনচর্যা বাংলার সাধারণ গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে অনেকটাই মেলে। ফলে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে

থাকার মতো বিষয়টি এক্ষেত্রে পুরোপুরি দেখা যায় না। ফলে উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতার লক্ষণ রয়েছে।

সুশীল রায়ের **'অনল আয়তি'** (১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি বলাগড় থেকে কলকাতা পর্যন্ত ভাগিরথীর দুই তীরবর্তী জনপদকে পটভূমি করে রচিত। এর সময়সীমা ১৮০১-১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়টি বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব, তখন বাংলায় ইংরেজ শাসন জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছিল। বাঙালিরাও ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা ত্যাগ করে আধুনিক চেতনায় উদ্দীপিত হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ঔপন্যাসিক সতীদাহকে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন। অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় উপন্যাসটির আলোচনাকালে বলেছেন — ''এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে সেকালের ধর্মবিশ্বাস মূর্ত। সেকালের বিচিত্র মানসিকতা এখানে রূপায়িত। সেকালের বিচিত্র ধর্মসংস্কার, নারীত্বের অবমাননা, পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা, দাম্পত্য আদর্শের কলুষতা, স্ত্রীর অধিকার ও অপমান, ব্যক্তিমর্যাদার অভ্যুদয় — সবকিছুর প্রতীক হয়ে উঠেছে সতীদাহ অনুষ্ঠান।''[৩১০] এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় 'অনল আয়তি' উপন্যাসটির ঐতিহাসিক মূল্য বিদ্যমান। তবে এসব কিছু দেখানো হয়েছে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে পটভূমি করে। তাই সুশীল রায়ের 'অনল আয়তি' উপন্যাসটির ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেও এর আঞ্চলিক লক্ষণগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

আঞ্চলিক পটভূমিকায় লেখা মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম উপন্যাস **'কবি বন্দ্যোঘটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু'** (১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ)। এই উপন্যাসটির পটভূমি ষোড়শ শতাব্দীর রাঢ় বাংলা। এই পটভূমিতে তিনি এক চুয়াড় যুবকের কবি হবার প্রচেষ্টা ও তার পরিণতিকে এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। উপন্যাসটি এবং এর লেখিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — ''মেদিনীপুর বিচিত্র আদিবাসী সম্প্রদায়, লোকসংস্কৃতির জন্মভূমি ও ধাত্রীভূমি। সেই মেদিনীপুরে অবস্থিতি কলিঙ্গসীমান্তে হবার দরুণ চৈতন্যপ্রভাবে সেখানকার নিম্নবর্গের জাতির মধ্যে মানুষ হিসেবে নিজেকে জানবার ও জানাবার একটি প্রয়াস নিশ্চয় দেখা দিয়েছিল। একদিকে মেদিনীপুরের সাধারণ মানুষের বিপুল বর্ণাঢ্যতা, অন্যদিকে বর্ণশাসিত-সমাজবহির্ভূত আরণ্য চুয়াড় সম্প্রদায়, তাদের সম্পূর্ণ পৃথক অস্তিত্ব, দেবোপাসনা,

টোটেম ও ট্যাবু, বিশ্বাস-প্রথা-ব্যবহার, চান্দ্রবৎসর গণনা, মাতৃকা-আরাধনা লেখিকার মনকে আকর্ষণ করেছিল। সেই আরণ্য চুয়াড়দের মধ্যে এক যুবক কেমন করে কবি হয়ে উঠল, তারই কাহিনী এই উপন্যাস।''[৩১১] এই উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে 'কবি বন্দ্যোঘটি গাঞিঁর জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসটি ঐতিহাসিক যুগ অবলম্বনে রচিত হলেও এখানে আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠার অনেক উপকরণ আছে। তবে উপন্যাসের প্রকরণ হিসেবে উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের চেয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলাই বেশি সঙ্গত।

প্রফুল্ল রায়ের **'কেয়াপাতার নৌকো'** উপন্যাসটির প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। পরে উপন্যাসটির আরও বেশ কয়েকটি পর্ব প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে এর প্রচ্ছদে লেখা হয়েছে — ''কেয়াপাতার নৌকো' বিশাল পরিসরে শুধু মহাকাব্যিক উপন্যাসই নয়, বাঙালি জাতির চরম দুঃসময়ের এক মহামূল্যবান ইতিহাসও।''[৩১২] এই বক্তব্য থেকে উপন্যাসটির বিশালতা ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার আলোচনায় এই উপন্যাসটি প্রথম দু'টি পর্বই স্থান পায়। কারণ দেশভাগের প্রেক্ষিতে রচিত উপন্যাসটির এই দুই পর্ব ঔপন্যাসিক পূর্ববঙ্গের রাজদিয়া নামক একটি মফস্বল শহরের সর্বাঙ্গীণ চিত্র এঁকেছেন, যা এগুলির আঞ্চলিকতাকেই সূচিত করে।

উপন্যাসটির প্রথম পর্বে বিনু ওরফে বিনয় নামক বারো বছরের এক কিশোরের পূজার ছুটি উপলক্ষে 'রাইজদা' অর্থাৎ রাজদিয়ায় ছুটি কাটানোর অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। সে তার বাবা অবনীমোহন, দুই দিদি সুধা ও সুনীতি এবং অসুস্থ রুগ্ন মা সুরমার সঙ্গে মায়ের সম্পর্কিত আত্মীয় হেমনাথ মিত্র ওরফে 'হেমকত্তা'র বাড়ি বেড়াতে আসে। এখানে এসেই আজীবন কলকাতায় কাটানো বিনুর চোখে মফস্বল বাংলার প্রকৃতি ও সৌন্দর্য তার অপূর্ব রূপ সমেত ধরা পড়ে। পাশাপাশি দাদু 'হেমকত্তা'র বাড়ির দৈনন্দিন কার্যকলাপ, পরিবারের এবং সে অঞ্চলের মানুষজনের হেমনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাদের উপর হেমনাথের প্রভাব, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি, মানুষজনের সংস্কার-বিশ্বাস, দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে সেখানকার আচার-অনুষ্ঠান, ঐ অঞ্চলের মানুষজনের ভাষা-সংলাপ বিনুকে আশ্চর্য

করে। অচিরের বাড়ির চাকর কুড়ি-একুশ বছরের যুগলের সঙ্গে বিনুর বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়ায় যুগল তাকে সে অঞ্চলকেন্দ্রিক প্রচুর গল্প শোনায় এবং বিভিন্নস্থানে ঘুরতে নিয়ে যায়। উপন্যাসটির প্রথম পর্বে এ সমস্ত কিছুরই বিবরণ আছে। রাজদিয়া অঞ্চলটি বিনুর বাবা অবনীমোহনেরও ভালো লাগে। তার সে অঞ্চলে থেকে যাবার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়েই উপন্যাসটির এই পর্বটি সমাপ্ত হয়েছে।

'কেয়াপাতার নৌকো'-এর দ্বিতীয় পর্বটি রাজদিয়ায় বিনুর কৈশোর থেকে যৌবনে পৌঁছানোর কাহিনি। উপন্যাসের পূর্ববর্তী পর্বটিতে এই অঞ্চলটি সম্পর্কে বিনু যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, এই পর্বে তা আরও বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি সে সময়কার স্বাধীনতা আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিমের মধ্যেকার বিভাজন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ প্রভৃতি সব প্রসঙ্গই উপন্যাসটির এই পর্বে উঠে এসেছে। ইতিমধ্যে বিনুর মা সরমা মারা যায়। বিনুর দুই দিদি বিয়ে করে কলকাতায় চলে আসে। স্ত্রী বিয়োগের পর অবনীমোহনের সে অঞ্চলের উপর থেকে উঠে যাওয়ায় সেও কলকাতায় ফিরে আসে। এই সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সময় 'হেমকত্তা'র আশ্রিতা ছোটবেলায় মা পরিত্যক্তা ও উদাসীন পিতার কন্যা চিরদুঃখী ঝিনুক কিছু নারীমাংস লোলুপ উগ্র সাম্প্রদায়িক মানুষের দ্বারা ধর্ষিতা হয়। চরম সাম্প্রদায়িক হানাহানির সময় এই ঝিনুককে নিয়ে বিনুর রাজদিয়া ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার মধ্য দিয়েই উপন্যাসের এই পর্বটি শেষ হয়েছে।

'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসের এই দুই পর্বের কাহিনি অংশ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ঔপন্যাসিক দু'টি পর্বেরই পটভূমি হিসেবে পূর্ববঙ্গ 'রাইজদা' অর্থাৎ রাজদিয়া অঞ্চলকে গ্রহণ করেছেন। তিনি বিনু ওরফে বিনয়ের দৃষ্টিতে সে অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রকৃতি, মাঠ-ঘাট, নদীনালা, হাটবাজার এবং মানুষজনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। উপন্যাসটির এই দুই পর্বে বিনু, তার মা-বাবা ও দুই দিদি সহ 'হ্যামকত্তা' ও তার পরিবারের লোকজন এবং প্রচুর হিন্দু-মুসলিম চরিত্র আছে। বিনুরা ছাড়া প্রায় সবাই সে অঞ্চলের মানুষজন। এদের মধ্যে হ্যামকত্তার বাড়ির চাকর যুগল এবং ইংরেজ 'লালমোহন' অর্থাৎ লারমোরের নাম আলাদা করে উল্লেখ করতেই হয়। ঔপন্যাসিকের বর্ণনাগুণে সেখানকার মানুষজনের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, লোকাচার-লোকসংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ,

ভাষা-সংলাপ প্রভৃতি সবকিছুই উঠে এসেছে। তিনি এই দুই পর্বের প্রধান চরিত্র 'হ্যামকত্তা' ওরফে হেমনাথ মিত্রকে যেভাবে তুলে এনেছেন তাতে মনে হয় তার মধ্যে দিয়ে সমগ্র রাজদিয়া অঞ্চল প্রতীকায়িত হয়েছে। এসবই উপন্যাসটির এই দুই পর্বের আঞ্চলিকতাকে সূচিত করে। হয়তো ঔপন্যাসিক শুধু এই দু'টি পর্বে উপন্যাসটি লিখলে 'কেয়াপাতার নৌকো'কে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস বলাও যেত। তবে তিনি 'বাঙালি জাতির চরম দুঃসময়ের এক মহামূল্যবান ইতিহাস' রচনা করার উদ্দেশ্যে উপন্যাসটির আরও একাধিক খণ্ড রচনা করে একে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। হয়তো এ কাজে তিনি সফলও হয়েছেন। তবে পরবর্তী পর্বগুলি আমার আলোচনার আসে নি। তাই সমগ্র উপন্যাসের সাপেক্ষে আঞ্চলিকতার আলোচনা করা হল না। দু'টি পর্বে যতটুকু আঞ্চলিকতার লক্ষণ স্পষ্ট হয়েছে, তা-ই আলোচিত হল।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের **'তৃণভূমি'** (১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটির পটভূমি হিসেবে তাঁর জন্মভূমি মুর্শিদাবাদ জেলার দ্বারকানদীর দুই তীরের 'কুলহীন ধুসর সমুদ্রের মতো তৃণভূমি' অঞ্চলকে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসটিতে ঐ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি থেকে শুরু করে অধিবাসীদের জীবনচর্যা সংক্রান্ত অনেক বিষয় উঠে এসেছে। অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকের উপন্যাসগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে এই উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন — ''সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'তৃণভূমি' সমকালে আক্রান্ত হলেও মুর্শিদাবাদের হিজল বন দ্বারকা নদী এক অপরূপ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। সাম্যবাদী আন্দোলন, আদিবাসী ও গরিব হিন্দু মুসলমান গয়লা ক্ষেতমজুর চাষি বিদ্রোহ, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ব্যর্থ প্রয়াস — পশ্চিমবঙ্গের চেনাকালের রাজনৈতিক দুর্যোগের পটভূমিতে হিজল বনের প্রকৃতির আশ্রয়লালিত মানুষগুলির সুখদুঃখের কাহিনী এই উপন্যাসে চিত্রিত।''[৩১৩] ফলে এই উপন্যাসটিতে আপাতভাবে আঞ্চলিক উপন্যাসের অনেক লক্ষণ প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই উপন্যাসটির পটভূমি হিসেবে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষজনের জীবনচর্যা উঠে এলেও সমকালের ভিত্তিতে সমাজ বিবর্তনের বিষয়টি অনেক বেশি করে উঠে এসেছে। সেই সময়ের রাজনীতির প্রসঙ্গও এখানে এসেছে। তাই ষাট-

সত্তরের দশকের মুর্শিদাবাদের একটি অঞ্চলের সমাজ বিবর্তনের চিত্র হিসেবে উপন্যাসটির মূল্য যতখানি, আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে ততটা নয়।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'** (১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি দেশভাগের অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালের ঢাকা জেলার শীতলক্ষ্যা নদী তীরবর্তী হিন্দু-মুসলিম জনজীবনকেন্দ্রিক একটি গ্রামকে পটভূমি করে লেখা। এখানে দেশ ভাগের আগে হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে প্রেম-মমতা-ভালোবাসা, পূজা-পার্বণ, মেলা, উৎসবের ছবি প্রকাশ পেলেও দেশভাগের প্রাক্‌মুহূর্তে ক্ষুধা, ধর্ষণ, খুন, দাঙ্গা, রাজনৈতিক হানাহানি, নিষ্ঠুরতায় সে চিত্র কীভাবে বদলে গেল তা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে একটি বিশেষ অঞ্চলের নদী, বিল, অবাধ প্রান্তর, আকাশ, ধান ক্ষেত, সোনালী বালির চর, তরমুজের ক্ষেত, সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা প্রভৃতির সঙ্গে জড়িয়ে উপন্যাসের চরিত্রগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে। ঐ অঞ্চলটির রীতি-নীতি, আচার-সংস্কৃতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, লোককথা-লোকাচার, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, ভাষারীতি প্রভৃতি ব্যবহার করে 'আঞ্চলিক রঙ্' ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক। এক্ষেত্রে তিনি অনেকটাই সফলও হয়েছেন। তবে এতকিছু থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি -- আঞ্চলিক উপন্যাসের সমস্ত শর্ত এখানে মেনে চলা সম্ভব হয় নি, তার চেয়ে অনেক বেশি দেশভাগের উত্তেজনা, পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনের মতো রাজনৈতিক বিষয় উঠে এসেছে। তাই আঞ্চলিকতার চেয়ে অন্য তাৎপর্য নিয়েই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই উপন্যাসটি আলাদা জায়গা করে নিয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর **'অরণ্যের অধিকার'** (১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বীরসা মুন্ডার নেতৃত্বে অরণ্যের অধিকারকে কেন্দ্র করে সংঘটিত মুন্ডাদের বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনাকে পটভূমি করে এই উপন্যাসটি রচিত। তাই উপন্যাসটির একটা ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। পাশাপাশি উপন্যাসটিতে মুন্ডাদের বাসভূমি এবং তাদের জীবন পরিক্রমার প্রচুর ছবি উঠে এসেছে, যেগুলি আঞ্চলিক উপন্যাসের নানা লক্ষণকেই প্রকাশ করে। তাই সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় এই উপন্যাসটিকে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ উপন্যাসের সঙ্গে এক গোত্রে ফেলতে চেয়েছেন।

‘অরণ্যের অধিকার’-এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত **‘অপারেশন বসাই টুডু’** (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি ঝাড়গ্রামের অরণ্য অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — ‘‘অপারেশন বসাই টুডুর পটভূমি ঝাড়গ্রামের অরণ্য অঞ্চল। পটভূমিটি বিশাল, কাল ১৯৭০-৭৬, বিষয় — উপন্যাসের নায়ক বসাই টুডুকে খতম করার জন্য শাসক দল, সরকারী প্রশাসন ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর মিলিত উদ্যোগ। বাদ্রারি, জাগুলো, বাকুলি কদমকুঞা — রাঢ়-ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ অনুর্বর জঙ্গল এলাকায় ছড়ানো, এইসব গ্রামে বসাই টুডুকে নিকাশ করার সশস্ত্র অভিযান। কিন্তু তাকে নিকাশ করা যায়নি। ক্ষেতমজুর আর আদিবাসীরা পুরুষাণুক্রমে উঁচুতলার মানুষের পদতলে পিষ্ট হয়ে আসছে। ওদের বহুকালের ঋণ আর পেটবেগারীর শোষণ ও বন্ধন মুক্তিলাভের ইতিহাস রূপায়িত হয়েছে এই উপন্যাসে।’’[৩১৪] এ থেকেই বোঝা যায় উপন্যাসটিতে রাজনীতির একটা বিশেষ ভূমিকা থাকলেও ঝাড়গ্রামের সেই অঞ্চলটির বিস্তারিত পরিচয়ও আছে। এই উপন্যাসটিকে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের স্বীকৃতিও দেওয়া হয়। তবে এখানে রাজনীতির পাশাপাশি ঝাড়গ্রামের সেই অঞ্চলটি এবং সেখানকার উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষগুলির জীবন পরিক্রমার কথাও আছে। তাই মহাশ্বেতা দেবীর ‘অপারেশন বসাই টুডু’ উপন্যাসটি আদতে রাজনৈতিক উপন্যাস হলেও এখানে আঞ্চলিক উপন্যাসের নানা লক্ষণ আছে।

মেদিনীপুরের শালবনী অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষদের জীবনচর্যা অবলম্বনে গুণময় মান্না তাঁর **‘শালবনী’** (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি রচনা করেন। উপন্যাসটির আলোচনা কালে অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন — ‘‘যে-কোনো অঞ্চল-ভিত্তিক উপন্যাসে আঞ্চলিক ভূ-প্রকৃতি আর জল-বায়ুমণ্ডল সহ এক বা একাধিক জনজাতি-গোষ্ঠীর রূপায়ণ ঘটে থাকে। কোথাও অত্যন্ত নির্দিষ্টভাবে একটি গোষ্ঠীকে তুলে ধরেন লেখক, কোথাও ঐ বিশেষ অঞ্চলটির জনবিন্যাসের প্রতিই থাকে সবিশেষ লক্ষ। ‘শালবনী’ দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে।’’[৩১৫] এখানে তিনি একরকম এই উপন্যাসটির

আঞ্চলিক লক্ষণের উপস্থিতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে মেদিনীপুর-খড়গপুর এবং বাঁকুড়া-গড়বেতার মাঝে অবস্থিত শালবনী অঞ্চল। অঞ্চলটিতে বট, পাকুড়, শিমূল, কুল, খেজুর, বেল, মহুয়া প্রভৃতি গাছ বনভূমি তৈরি করেছে। তবে সবথেকে বেশি আছে শালগাছ। শালবনের কথা মাথায় রেখেই অঞ্চলটির নাম হয়েছে শালবনী। এই নামেই উপন্যাসটির নামকরণ করা হয়েছে। উপন্যাসেও সেই বনাঞ্চলটির বিবরণের পাশাপাশি সেখানকার উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবনচর্যার কথাও আছে। এগুলি যে কোনো সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। তবে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসে আঞ্চলিকতার যে সমস্ত লক্ষণ থাকে তার অনেককিছুই 'শালবনী' উপন্যাসটিতে পাওয়া যায় না। এজন্য সে এলাকার জীবনচিত্র হিসেবে উপন্যাসটি সফল হলেও আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে পুরোপুরি সফল হয় নি।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের **'মহিষকুড়ার উপকথা'** (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে গণ্য করা হয়। উপন্যাসটির সূচনায় ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন — ''আমাদের এই গল্পটা মহিষকুড়া নামে এক নগণ্য গ্রামকে কেন্দ্র করে। এত ছোট, এত নগণ্য, চারিদিকের জঙ্গলে এমন ঘেরা যে তাকে আবিষ্কার করার জন্য জিপগাড়ির বহর সাজিয়ে অভিযান করলে মানিয়ে যায়; বরং সুখ ও মৃদু উত্তেজনায় কারণ : বনের হিংস্র জন্তুদের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, পিকনিকের আবহাওয়ায় নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে, কারণ মনে হতে থাকে এরা বোধহয় বনে পথ হারিয়ে যাওয়া এক মানবগোষ্ঠীর বংশধর, যারা এই বিচ্ছিন্নতাকে চোখের মণির মতো রক্ষা করে।''[৩১৬] ঔপন্যাসিকের এই বক্তব্যের মধ্যেই 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসের আঞ্চলিকতার ইঙ্গিত আছে।

অমিয়ভূষণ মজুমদার সম্পর্কে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় মন্তব্য করেছেন— ''উত্তরবঙ্গের যে অঞ্চলে অমিয়ভূষণের বসবাস, তার অল্প দূর থেকেই তরাই বনভূমির শুরু। এই অঞ্চলে নানা গোত্রের উপজাতি বা ট্রাইবের বাস। অনেক ট্রাইবের সংমিশ্রণও ঘটেছে। আঞ্চলিক মমতার টানেই হোক, কি নৃতাত্ত্বিক আগ্রহের কারণেই হোক, অথবা বণিক সভ্যতার কলুষিত স্পর্শের থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত —

এই কারণেই হোক, অমিয়ভূষণের কথাসাহিত্যে এদের প্রবেশদ্বার অবারিত। যে শিকড়ের সন্ধানে অমিয়ভূষণ বার বার ইতিহাসের দূর কালে পাড়ি দেন, এই সব উপজাতি জনজাতির মধ্যে, আরণ্যক ও অর্ধ-আরণ্যকদের আদিমতার মধ্যে সেই শিকড়ের অনেকখানি আভাস পাওয়া যায়। যে জন্যই হোক, অমিয়ভূষণের কথাসাহিত্যে এই সবের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।''[৩১৭] এসব কথা তাঁর 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসটির ক্ষেত্রে একেবারে সত্য। এই উপন্যাসটি উত্তরবঙ্গের কোচবিহার-আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্স অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত হয়েছে। সেইসব অঞ্চলের মহিষ বাথানগুলি এই উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এগুলিকে কেন্দ্র করে সেখানকার মানুষজন ও তাদের জীবনচর্যার ছবি এখানে উঠে এসেছে। এখানে মহাজনদের দ্বারা আদি অধিবাসীরা কীভবে শোষিত হয় তার ছবি আছে। পাশাপাশি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনিবার্য ফল যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে এদের জীবনধারার পরিবর্তনের রূপটিও এই উপন্যাসে ধরা পড়েছে। একসময় বনমহিষ ছিল এদের কাছে পরিত্রাতা শক্তির প্রতীক। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের জীবন থেকে সেই মহিষও হারিয়ে যায়। তার স্থানে আসে বড় বড় লরি। উপন্যাসটিতে এই লরি শোষকদের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। কীভাবে পরিবেশ ধ্বংস করে যান্ত্রিক সভ্যতা ক্রমশ গ্রামীণ জনজীবনকে গ্রাস করে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারই বাস্তব ও জীবন্ত চিত্র এই উপন্যাসটিতে আছে। সেইসঙ্গে নর-নারীর চিরন্তন হৃদয় সম্পর্কের দিকটিও উপেক্ষিত হয় নি। উপন্যাসটি শেষ হয়েছে ঔপন্যাসিকের হতাশাপূর্ণ দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে — ''এতো বোঝাই যাচ্ছে, শহরের রাজারা, যারা রাজ্য চালায়, তারা পোষ না-মানা কোনো মর্দা মোষকে নিজের ইচ্ছা মতো বনে চরতে আর কোনোদিনই দেবে না। যদিও হঠাৎ তোমার রক্তের মধ্যে এক বুনো বাইসন আঁ-আঁা-ড় করে ডেকে ওঠে।''[৩১৮]

এইভাবে উপন্যাসটিতে কালের বিবর্তনের চিত্র উঠে এলেও মহিষকুড়া গ্রাম এবং সেখানকার আদি অধিবাসী মানুষগুলিও নিজেদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে। উপন্যাসটিতে আসফাক, ছমির, সাত্তার, নসির, চাউটিয়া, মুন্নাফ, কমরুন প্রমুখ এইসব আদি অধিবাসী। এরা সবাই ধর্মের দিক থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। এদের মতই জাফরুল্লা মুসলিম সম্প্রদায়ের হলেও সে শোষক শ্রেণীর

প্রতিনিধি। ঔপন্যাসিক এদের মাধ্যমে মহিষকুড়ার মানুষগুলির জীবন-জীবিকা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, নিজস্ব ধর্মাচরণ পদ্ধতি, লোকাচার-লোকসংস্কার, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, ভাষা-সংলাপ প্রভৃতির বাস্তবরূপকে তুলে এনেছেন। ফলে উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠার এক ধরনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তবে এই উপন্যাসটিতে কালের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন, রাজনীতি প্রভৃতি প্রসঙ্গও এসেছে। এ সবের প্রভাব সমকালে সর্বত্রই পড়ছিল। তাই আঞ্চলিক কাঠামো থাকলেও 'মহিষকুড়ার উপকথা' পুরোটা সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হতে পারে নি।

মহাশ্বেতা দেবী পালামৌ জেলার এক অখ্যাত গ্রামে মেলা উপলক্ষে তীরখেলা দেখতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তাকে ভিত্তি করে **'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর'** (১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি রচনা করেন। সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় এই উপন্যাসটির কাহিনিকে 'বীরসার কাহিনির অনুবৃত্তি' বলেছেন। এখানেও রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে। তবে রাজনীতিকে ছাড়িয়ে পালামৌ-এর সেই অখ্যাত অঞ্চলটি এবং সেখানকার মানুষজনের জীবন পরিক্রমাও উঠে এসেছে। ফলে 'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর' উপন্যাসটি অনেকটাই আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

সমরেশ বসুর **'বাথান'** (১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি গোপালকদের জীবনচর্যা অবলম্বনে রচিত। একদিকে তাদের পারিবারিক জীবন, অপরদিকে গোপালনের অর্থাৎ 'বাথান' জীবনকে নিয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। এর পটভূমি বর্ধমান-নদিয়া জেলার বিস্তৃত তৃণক্ষেত্র, চারণভূমি। এসব স্থানেই গোপালকদের গরু-মহিষ নিয়ে যেতে হয়। ঔপন্যাসিক গোপালকদের জীবনপরিক্রমার মধ্য দিয়ে সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক জীবনচিত্রকে অনেকটাই প্রকাশ করেছেন। তবে উপন্যাসটিতে মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং সেখানকার বাস্তব জীবনচর্যা যথাযথভাবে উঠে আসে নি।

অভিজিৎ সেনের **'রহু চণ্ডালের হাড়'** (১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি উত্তরবঙ্গের এক যাযাবর-গোষ্ঠীর জীবন আলেখ্য। এখানে তাদের জীবনের ইতিবৃত্ত রচনার প্রয়াস করেছেন ঔপন্যাসিক। এখানে তাদের দেড়শ বছরের ইতিহাস ধরা

পড়েছে। এদের না আছে স্থায়ী বাসস্থান, না আছে স্থায়ী জাতি-ধর্ম;এদের একটাই পরিচয় যে, এরা হল বাজিকর — মুলুক মুলুক ঘুরে 'বান্দর লাচানো', 'ভাল্লু লাচানো', 'পিচ্‌লু বুঢ়া-বুঢ়ীর কাঠের পুতুল লাচানো', 'ভান্‌মতীর খেলা', 'বাঁশবাজি', 'দড়িবাজি'। 'নর-রাক্ষস হয়া কাঁচা হাঁস, কাঁচা মুরগা কড়মড় কড়মড় করে্য খাওয়া' এগুলো সব এদের কাজ। রহু এদের পূর্বপুরুষ। সেই রহু চণ্ডালের হাড় দিয়েই এদের যত কেরামতি। অনেক জায়গা ঘোরার পর এরা শেষপর্যন্ত মালদা জেলাতে এসে থিতু হয়েছে। উপন্যাসটিতে মালদার গ্রামীণ জনপদজীবনের ভূ-প্রকৃতি, শস্যক্ষেত, নদ-নদী, মানুষের রীতি-নীতি, আচার-সংস্কৃতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিষয়গুলি প্রাধ্যন্য পেয়েছে। বাজিকরদের লোকজীবন-লোককথার নানা পরিচয়ও এখানে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে উপন্যাসটি অনেকটাই আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত হয়েছে। তবে শেষপর্যন্ত 'রহু চণ্ডালের হাড়' আঞ্চলিক উপন্যাস না হয়ে একটি জনজাতির ইতিবৃত্ত হয়ে বাংলা উপন্যাসের তথা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত বাংলা সাহিত্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস দেবেশ রায়ের **'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'** (১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ)। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পাওয়া এই উপন্যাসটি দেবেশ রায় অভিনব আঙ্গিকে রচনা করেছেন। অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ উপন্যাসটির পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন — ''তিস্তাপারের বৃত্তান্ত (১৯৮৮) দেবেশ রায়ের রচিত উপন্যাস। ১৯৮০ থেকে ৮৭-এর মধ্যে এর বিভিন্ন পর্ব কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের বিশালাকায় উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম এবং চরিত্রের অজস্রতায় ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে স্বতন্ত্র।''[৩১৯] তিনি এই বৃহদাকারের উপন্যাসটির বিষয়বস্তুর পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে আরও বলেছেন — ''তিস্তানদীর তটবর্তী অঞ্চলের ভূগোল ও সেইসঙ্গে জড়িত সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাত্যহিক কর্মজীবন, মানুষে মানুষে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও অস্তিত্বের সংগ্রামের জটিল মূহূর্তগুলি খণ্ড খণ্ড উপকাহিনীতে গ্রথিত হয়ে এক মহাকাব্যিক বিস্তার লাভ করেছে।''[৩২০] অধ্যাপক দাশের এই উক্তি থেকেই উপন্যাসটির আঞ্চলিকতার ইঙ্গিত মেলে। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখেও উপন্যাসটির স্বকীয়তা ধরা পড়েছে। তিনি উপন্যাসটি

সম্পর্কে জানিয়েছেন — ''ইতিহাস ছাড়া সমাজ হয় না, সমাজ ছাড়া ইতিহাস নেই — যে কোনো সজাগ ঔপন্যাসিককে এই বোধকে তাঁর উপন্যাসে আলাদা করে ব্যবহার করতেই হয়। দেবেশ রায়ের 'মানুষ খুন করে কেন', 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' . . . এই বোধদীপিত উপন্যাস।''[৩২১] তাঁর কথাতেও উপন্যাসটির বিশেষ অঞ্চলের সমাজ ও ইতিহাস উঠে আসার প্রসঙ্গ এসেছে।

এই বৃহদাকার উপন্যাসটি ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় নন্দনপুর-বোয়ালমারির নিতাই সরকার, ঘুঘুডাঙার আকুলুদ্দিন, বানারহাটের যমুনা উরাওনি এবং গয়েরকাটার রাবণ চন্দ্র রায়দের উৎসর্গ করে লিখেছেন — ''এই বৃত্তান্ত তারা কোনোদিনই পড়বে না, কিন্তু তিস্তাপারে জীবনের পর জীবন বাঁচবে।''[৩২২] এই উপন্যাসটিতে একটি পরিশিষ্ট এবং ছয়টি পর্ব আছে — আদিপর্ব, বনপর্ব, চরপর্ব, বৃক্ষপর্ব, মিছিলপর্ব এবং অন্ত্যপর্ব। এই পর্বগুলি অজস্র উপশিরোনামযুক্ত পর্বাঙ্গ নিয়ে গঠিত। এখানে সেভাবে তেমন কোনো কাহিনিবৃত্ত নেই — নানা ধরনের মানুষজন এবং বিভিন্ন ঘটনা সম্বলিত করে উপন্যাসটি এগিয়ে চলেছে। ঔপন্যাসিক উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তিস্তা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশী সম্প্রদায়ের পাঁচশো বছরের ইতিহাসকে ধরতে চেয়েছেন। এখানে গৃহীত এলাকাটি ছোট — উত্তর-পশ্চিমে কালিম্পং থানা, উত্তর-পূর্বে ভূটান, পূর্বে জলঢাকা নদী পেরিয়ে মাদারিহাট পেরিয়ে তোর্সা নদী, দক্ষিণে জলপাইগুড়ি শহর, বার্নেস, জল্পেশ, পশ্চিমে শিলিগুড়ি থানা। এই এলাকাটি অনেকটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলেও দিনে দিনে সংযুক্ত হয়েছে। তবে এই সংযুক্তকরণ প্রাকৃতিকভাবে হয় নি — মানুষ সংযুক্ত করেছে, মানুষের নতুন পর্যায়ের আধুনিকতা। এই সংযুক্তকরণের বৃত্তান্তই হল তিস্তাপারের বৃত্তান্ত। এজন্য উপন্যাসটির আলোচনা কালে সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন — ''তিস্তাপারের বৃত্তান্ত যেমন তিস্তানদীর জলপ্রবাহের বৃত্তান্ত, তেমনি সেই প্রবাহ আর দুই পারের জমির টানাটানিরও বৃত্তান্ত, সেই সঙ্গে তীরের মানুষদের কর্মকাণ্ডেরও বৃত্তান্ত। তিস্তায় বাঁধ তৈরি হচ্ছে ফলে পরোক্ষভাবে সরকারী কর্মকাণ্ডেরও বৃত্তান্ত। একই সঙ্গে মানবিক, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক এবং উন্নয়নশীল মহাকাণ্ড। তবে বাঁধ তৈরির মহাকাণ্ডের অনেকটাই এখানে নেপথ্যে। তবু প্রকৃতি ও মানুষ এখানে একাকার।''[৩২৩]

উপন্যাসটির শুরু হয়েছে তিস্তা তীরবর্তী অঞ্চলের ক্রান্তির হাটের বিবরণ দিয়ে। এখানে দুপুর থেকে বিক্রেতাদের আগমন শুরু হয় এবং বিকেলে হাট বসে। ঔপন্যাসিক পাতার পর পাতা জুড়ে হাটে আগত মানুষগুলির গুঞ্জন মুখর কার্যাবলির বিবরণ দিয়েছেন। এই হাটেই লটারিওয়ালার মাইকে ঘোষণা করা হয় যে, সেখানে হল্‌কা ক্যাম্প বসবে, সেটেলমেন্টের জরিপ চলবে। কারণ তিস্তার জলকে উন্নয়নের কাজে লাগানোর জন্য তার উপর ব্যারেজ তৈরি করা হবে। এরপর সরকারী জরিপের আয়োজন হয়েছে। ফলে এখানে জরিপ বাবুরা উপস্থিত হয়েছেন, সরকারী চেইন পড়েছে। এই জরিপ উপলক্ষে সেখানে অন্য অনেকের মধ্যে সে অঞ্চলের জোতদার গয়ানাথ উপস্থিত হয়েছে, জামাই আসিন্দির এসেছে, আর আদিবাসী আধিয়ার ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারু বর্মন তো সব সময় উপস্থিত থেকেছে। বাঘারু তার নাম নয়, এক সময় সে বাঘ মেরেছিল বলে সে অঞ্চলে 'বাঘারু' নামে পরিচিতি পেয়েছে। এই জরিপে তিস্তার বাঁধ নির্মাণের জন্য নদীর ম্যাপ আঁকা হয়। তাই একটু দূরে সে অঞ্চলের মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষজনের সঙ্গে আদিবাসীরা ও অন্যান্য নানা সম্প্রদায়ের মানুষেরা ভীড় করেছে। এদের মধ্যে মিশ্র নিষাদ গোত্রের সাঁওতাল, মুন্ডা প্রভৃতি নানা গোষ্ঠীর লোকজন আছে। সেখানে হাজির হয়েছে সমাজের নানা স্তরের মানুষজন — কৃষক, মজুর, নেতা সবাই আছে। এরা সবাই উন্নয়নের জন্য শ্লোগান দিয়েছে।

এরপর তিস্তার ব্যারেজকে কেন্দ্র করে জোতদার গয়ানাথ, এম. এল. এ, ঠিকাদার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষক, মজুরদের জীবন পরিক্রমার বিবরণকে সঙ্গে নিয়ে উপন্যাসটি এগিয়ে গেছে। এসবের মধ্যেই ইতিহাসের নিঃশব্দ সঞ্চরণ আছে। এই সময় বাঘারু বাথানে নির্বাসিত অবস্থায় থেকেছে। উপন্যাসের ঘটনাক্রমে এই ব্যারেজ তৈরিকে কেন্দ্র করে দুই বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের কথা ও সেখানকার রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে। বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে বাস্তুত্যাগীদের আগমন-নির্গমনকে দেখানো হয়েছে। অনিবার্য ভাবে উন্নয়নের প্রসঙ্গও এসেছে। যদিও সাধারণ মানুষের কাছে এই উন্নয়নের স্বরূপ অধরাই থেকে গেছে। অবশ্য রাজনীতি ও বর্হিবিশ্বের ঘটনা সমূহ আর নিঃশব্দ থাকে নি। ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ বার্তা বিনিময়ের প্রসঙ্গ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাংলাদেশ অভিমুখে কুচকাওয়াজ। দুই তরফের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হৃদ্যতাপূর্ণ সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ আছে। এসবের মধ্যে 'আইডেন্টিটি হারা', 'পরিচয়-

খোয়ানো' রাজীব গান্ধী বা এরশাদের নাম না-জানা সে অঞ্চলের এক মেয়ের ধর্ষণের প্রসঙ্গ আছে। উপন্যাসটি আরও এগোলে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আসা প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রোষের প্রসঙ্গ আছে। ফলে রাত তিনটের সময় আপলচাঁদ ফরেস্টে গয়ানাথ জোতদার বন্যার জলপ্রবাহ দেখেছে। তিস্তার জল অনেক চর ডুবিয়ে দিয়ে দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রমে তিস্তার ব্যারেজ-বিরোধী আন্দোলনও শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে এসেছে উত্তরখণ্ড গঠনের প্রসঙ্গ। এজন্য রাজনীতির কারবারিরা বাঘারুদের নিয়ে মিছিল বের করে ফায়দা লোটার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসনের সক্রিয়তায় সেই আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। তাই পুলিশের জিপ এসে নির্মমভাবে মিছিল ভেঙে দিয়েছে।

মহা সমারোহে তিস্তা ব্যারাজের উদ্বোধনের প্রসঙ্গ উপন্যাসটির শেষে এসেছে। এজন্য 'জলুশ'-এর আয়োজন করা হয়। এই জলুষ উপলক্ষে পিতৃ-পরিচয়হারা মাদারি ও তার মা-র প্রসঙ্গ ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে এনেছেন। ছোট মাদারিকে এজন্য আনন্দ-উৎসাহে মেতে উঠতে দেখা যায়। তার কোনো পিতৃপরিচয় তো ছিলই না, উপন্যাসের শেষে মা ছাড়া হয়ে সে বাঘারুর কাছে আশ্রয় নিয়েছে। মাদরিকে সঙ্গে নিয়ে বাঘারুর সে অঞ্চল ত্যাগের বিবরণ দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছ — ''বাঘারু তিস্তাপার ও আপলচাঁদ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মাদারিও তার সঙ্গে যাচ্ছে। যে-কারণে তিস্তাপার ও আপলচাঁদের শালবন উৎপাটিত হবে — সেই কারণেই বাঘারু উৎপাটিত হয়ে গেল। যে কারণে বাঘারু চলে যায়। তার ত শুধু একটা শরীর আছে। সেই শরীর এই নতুন তিস্তাপারে, নতুন ফরেস্টে বাঁচবে না। এই নদীবন্ধন, এই ব্যারেজ, দেশের অর্থনীতি বদলে দেবে, উৎপাদন বাড়াবে। বাঘারুর কোনো অর্থনীতি নেই। বাঘারুর কোনো উৎপাদন নেই। বাঘারু ব্যারেজকে, এই অর্থনীতি ও এই উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করল। বাঘারু কিছু-কিছু কথা বলতে পারে বটে কিন্তু প্রত্যাখানের ভাষা তার জানা নেই। তার একটা শরীর আছে। সেই শরীর দিয়ে সে প্রত্যাখ্যান করল।''[৩২৪] ঔপন্যাসিক আরও জানিয়েছেন — '' . . . এ-রকম হাঁটতে হাঁটতে যখন বাঘারুর মনে হবে নতুন একটা ফরেস্ট, নতুন একটা নদী খুঁজে পেল, তখন বাঘারু থামবে। সেই নতুন নদী, নতুন ফরেস্টটা বাঘারু এই শরীর দিয়েই চিনবে।''[৩২৫]

এই উপন্যাসটি শুরু হয়েছে তিস্তায় ব্যারেজ তৈরির প্রসঙ্গ দিয়ে। অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় ব্যারেজের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। এর মাঝে উপন্যাসটিতে আরও আসংখ্য বিষয় স্থান পেয়েছে। এসব ঘটনা দ্বারা ঔপন্যাসিক উন্নয়নের নাম করে সারা ভারতের আধুনিক কালের কর্মকাণ্ডকে ধরতে চেয়েছেন। সমগ্র উপন্যাস জুড়েই এই তিস্তার ব্যারেজ তৈরি সংক্রান্ত ঘটনার অবতারণা করা হলেও উপন্যাসের শেষপর্যন্ত তা সমাপ্ত হয় নি। তবে এই ব্যারেজ তৈরিকে কেন্দ্র করে সে অঞ্চলে এক নতুন আধুনিকতার উদয় হয়েছে। ফলে বহুবিধ আবেদন নিয়ে উপন্যাসটি হাজির হয়েছে। এসবের মধ্যেই এর আঞ্চলিকতার দিকটিও প্রকাশ পেয়েছে।

আকারে বৃহৎ হলেও 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসটির গৃহীত অঞ্চলটি যথেষ্ট ছোট। সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছেন — ''যে-কোনো নদীর দৈর্ঘের এক-একটা অংশ জলের চেহারায়, তীরের চেহারায়, লোকবসতির চেহারায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। ১৬৮ কিলোমিটার দীর্ঘ তিস্তার গোটা দৈর্ঘকে নয়, দেবেশ বেছে নিয়েছেন তার ছোট একটি অংশকে। তিস্তা যেখানে পার্বত্য ভূমি পেরিয়ে কালিম্পং থানা ছাড়িয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় ঢুকেছে, সেইখানে আপলচাঁদ ফরেস্ট ছাড়িয়েই যে এলাকা, যার অল্প দক্ষিণেই জলপাইগুড়ি শহর, সেই এলাকা নিয়েই দেবেশের উপন্যাস।''[৩২৬] উপন্যাসটির বিস্তৃত পরিসরে ঔপন্যাসিক যতটা সম্ভব এই অঞ্চলটির বিস্তৃত পরিচয় তুলে এনেছেন। তাই সে অঞ্চলের খুঁটি-নাটি সমস্ত বিষয় এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি সে অঞ্চলের মানুষগুলির জীবনচর্যার বিস্তৃত বিবরণকেও ঔপন্যাসিক এখানে তুলে এনেছেন।

উপন্যাসটিতে প্রচুর চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। তবে এখানে পুরুষ চরিত্রের সংখ্যাই বেশি, সে তুলনায় নারীদের সংখ্যা খুবই কম। এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র হল বাঘারু। তার সম্পর্কে অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন — ''তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এর বাঘারুর মতো চরিত্র আমরা বাংলা উপন্যাসে এর পূর্বে পাইনি। কেবল শারীরিক অর্থে নয়, শিল্পের দিক থেকেই সে একান্ত অভিনব।''[৩২৭] উপন্যাসটিতে সে তিস্তা-তীরবর্তী ভূমিলগ্ন আদিমতাগন্ধী মানুষগুলির প্রতিনিধি। তার কোনো নাম নেই, সে একবার বাঘকে মেরেছিল জন্য সে অঞ্চলে ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারু

বর্মন নামে পরিচিত হয়েছে। নিজের নামকরণ প্রসঙ্গে এম. এল. এ তার বাঘ হত্যার গল্প শুনিয়ে বলেছে — ''. . . সেইঠে মোর নাম হয়া গেইল বাঘারু। বাঘাখানক মুই হারি দেছু, স্যালায় মোর নাম হইল বাঘারু।''[৩২৮] সে সরকারী অফিসার-কর্মীদেরও জানায় — ''মোর নাম ঠিকানা নাই রো। মোর দেউনিয়া।''[৩২৯] বাঘারুর একটাই পরিচয় — সে গয়ানাথ জোতদারের মুনিষ। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্ররাও সেই অঞ্চলটির সার্থক প্রতিনিধিত্ব করেছে। গয়ানাথ জোতদার, জামাই আসিন্দির, মাদারি, এম. এল. এ, মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোকজনগুলো, নিষাদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজন, রাজবংশী সম্প্রদায়ের কৃষক-শ্রমিকেরা সবাই অঞ্চলটির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে। মাদারির মা, ধর্ষিতা হওয়া মেয়েটির মত নারী চরিত্রগুলিও আঞ্চলিক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত।

এই উপন্যাসটিতে শুধু এই চরিত্রদের উপস্থিতি নেই, সেইসঙ্গে তাদের সামগ্রিক জীবনচিত্রও প্রকাশিত হয়েছে। ফলে তাদের জীবন-জীবিকা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, লোকাচার-লোককথার প্রসঙ্গও এসেছে। পাশাপাশি তাদের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাকের বিবরণও আছে। উপন্যাসটির আঞ্চলিক চরিত্রের মুখে উত্তরবঙ্গে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষা কামরূপী বা রাজবংশীর যথাযথ প্রয়োগ ঔপন্যাসিক করেছেন। এগুলি যে কোনো সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এজন্য দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রায় সমস্ত লক্ষণই প্রকাশিত হয়েছে।

তবে উপন্যাসটিতে তিস্তার ব্যারেজ নির্মাণকে কেন্দ্র করে আধুনিক ভারতবর্ষে তথা সারা বিশ্বে উন্নয়নের নাম করে যে সকল কার্যকলাপ সংঘটিত হয় তার স্বরূপকে ঔপন্যাসিক সুকৌশলে পরিবেশন করেছেন। ব্যারেজের দ্বারা নদীর প্রবাহকে বেধে ফেলে, বৃক্ষ তথা বনভূমি উৎপাটন করে, কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের শ্লোগান দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে গরিব মানুষগুলির কতটা উন্নয়ন হয়, সে সংক্রান্ত বিতর্কটিকেও তিনি উস্কে দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে যার সূত্রপাত ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা' নাটকটির মধ্য দিয়ে। এসবের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনজাতির প্রায় পাঁচশ বছের জীবনকথাকেও তিনি এই উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন। ফলে সবকিছু মিলিয়ে উপন্যাসটি মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি লাভ করে বাংলা

সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসের স্বীকৃতি লাভ করেছে। অবশ্য মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস আঞ্চলিক উপন্যাস হবে না — একথা কোথাও বলা হয় নি। বরং এধরনের উপন্যাসের সঙ্গেই আঞ্চলিক উপন্যাসের যোগসূত্র বেশি থাকে। তাই 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসটি আর সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের দিকেই এগিয়ে গেছে।

'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' (১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি মহাশ্বেতা দেবী মধ্যপ্রদেশের পিরথা নামক এক আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামকে পটভূমি করে রচনা করেছেন। এক অলৌকিক বিষয় নিয়ে সেই গ্রামটির মানুষজনের জীবন পরিক্রমা অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত। স্বাভাবিকভাবে এই উপন্যাসটিতে মধ্যপ্রদেশের পিরথা নামক গ্রামটির সেই বিশেষ অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষজনের বাস্তব ছবি উঠে এসেছে। এগুলি আঞ্চলিকতার লক্ষণ।

গুণময় মান্নার **'মুটে'** (১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি মেদিনীপুরে ঘাটাল বাজারকে পটভূমি করে লেখা। ঐ বাজারের মুটে সুধীর সাঁতরা এই উপন্যাসের নায়ক। তাকে কেন্দ্র করে মুটেদের জীবনের পেশাগত নানা দিক এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। সেইসঙ্গে ঘাটাল বাজারের বাস্তব ছবিও উপন্যাসে আছে। সুধীরের ছেলে প্রবীরকে কেন্দ্র করে হিংসাত্মক রাজনীতির প্রসঙ্গও এই উপন্যাসে আছে। ছেলের মঙ্গল কামনায় সুধীর শিবের গাজনে 'ভক্তে' হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐ অঞ্চলের গাজন উৎসবের ছবিও প্রকাশ পেয়েছে। তবে উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক রূপচিত্রের চেয়ে ব্যক্তিজীবনের কথাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তাই আঞ্চলিক পটভূমি থাকলেও 'মুটে' তেমনভাবে আঞ্চলিকতার লক্ষণাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি।

ভগীরথ মিশ্রের **'চারণভূমি'** (১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটিতে 'ভকত'দের জীবন কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। এরা ভেড়া চরোয়া বা ভেড়িহার নামেও পরিচিত। এই উপন্যাসে নিজেদের পেটের ভাত যোগানোর জন্য এবং মহাজনদের ঋণ শোধ করার জন্য 'ভকত'রা ভেড়ার পাল নিয়ে বেড়িয়েছে। এরা যাযাবর না হলেও বাড়ির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এদের ভাগ্যে তেমন নেই। বছরের অধিকাংশ সময় এদের ভেড়ার পাল নিয়ে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়। মাসে-দু'মাসে এরা কিছু গেঁহু বা জনার কিনে বাড়ির স্ত্রী-সন্তানদের দিয়ে আবার চারণভূমিতে ফিরে আসে।

দুর্গম বিপদ-সঙ্কুল জীবনে এরা যেমন অনেক দেশে যায়, তেমনি অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতাও অর্জন করে।

এই উপন্যাসে রাঁচি, পুরুলিয়া, হাজারিবাগ, দুমকা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা চারণভূমিতে ভেড়ার পাল নিয়েই 'ভকত'দের জীবন পরিক্রমাকে দেখানো হয়েছে। ফলে উপন্যাসটিতে সে সব চারণভূমির ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রকৃতির পাশাপাশি আঞ্চলিকতার দিকটিও স্থান পেয়েছে। এই 'ভকত'দের 'ম্যাড়াল' বা নেতা হল রামনা ভকত। তার সঙ্গে আছে মুনসী ভকত, দাহো ভকত, পদিনা ভকত, বিষমি ভকত প্রমুখেরা। এদের মধ্যে মুনসী ভকত উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত। সে এবং অন্যরাও আঞ্চলিক চরিত্রের মতোই আচার-আচরণ করেছে। উপন্যাসটিতে চারণভূমি গুলিকে কেন্দ্র করে ভেড়িহার জীবনের সুখ-দুঃখ, রীতি-নীতি, সংস্কার-বিশ্বাস, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, নিজস্ব ভাষাভঙ্গী প্রভৃতি সবই উঠে এসেছে। ফলে উপন্যাসটিতে এক ধরনের 'আঞ্চলিক রঙ্'-ও প্রকাশ পেয়েছে। তবে ভগীরথ মিশ্রের 'চারণভূমি' আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠে নি — আঞ্চলিকতার পটভূমিকায় এক ধরনের বৃত্তিজীবী মানুষের জীবন পরিক্রমার বাস্তব দলিল হয়ে উঠেছে।

১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'মহুলবনীর সেরেঞ'** উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকদের নানা ভাবে আকর্ষণ করে। উপন্যাসটির ভূমিকা অংশে লেখা হয়েছে — ''এই কাহিনীর সময়কাল ১৯৮৫-৮৬; যেসময় নিস্তরঙ্গ, নিরীহ, অথচ প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা আদিবাসী জনজীবন উত্তাল হতে শুরু করেছে ঝাড়খন্দ-আন্দোলনে।''[৩৩০] উপন্যাসটি ঝাড়গ্রাম এলাকার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে পটভূমি করে লেখা। এখানে বিশ শতকের আশির দশকের প্রেক্ষিতে ঐ সব অঞ্চলের আদিবাসীদের জীবনচর্যার ছবি উঠে এসেছে।

উপন্যাসটি 'পরজান বুড়ো', 'মহুলবনী রেয়াক্ কথা', 'মুখিয়ার কুল্হি', 'জাহের থান' প্রভৃতি নামে অধ্যায় বিভাজন করে রচিত। এটি শুরু হয়েছে একটি সাঁওতালি ভাষার গান দিয়ে —

''দোল চালাওএন কুড়ি পাতা দাড়াকান্
ফিরফিরি দ কুড়ি কিরিঞা তাপে

কুড়ি কোয়াক্ পানদেরে হেল্‌দে ডুমুর পাতা
ফিরফিরি দ কুড়ি কিরিঞা তাপে।''[৩৩১]

এরপর উপন্যাসের মূল ঘটনাস্থল হিসেবে মহলবনী গ্রাম উঠে এসেছে। ছোট্ট এই গ্রামটিতে একটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন বসবাস করে। গ্রামের সবাই অত্যন্ত গরিব, কৃষিকাজই এদের প্রধান জীবিকা। এদের লেখাপড়ার সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই, শুধু সনাতন, সহদেব ও অঘোর পড়াশুনা শিখে চাকরি পেয়েছে। তবে প্রচণ্ড অভাব থাকলেও এরা কারণে-অকারণে নানা উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আনন্দ ফূর্তিতে মেতে থাকে। আশির দশকে সমগ্র বাংলা জুড়ে পঞ্চায়েতিরাজ কায়েম হওয়ায় তার কার্যকলাপের আওতায় এই গ্রামটিও আসে। তবে এই অঞ্চলে পঞ্চায়েত প্রধানদের চেয়ে গ্রাম্য মুখিয়ারা অনেক বেশি ক্ষমতাবান। আদিবাসীরা তাদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করে সমস্ত নির্দেশ পালন করে। এদের যোগ্য সঙ্গত দেয় গ্রাম্য পুরোহিত ও চিকিৎসক পাহানেরা। আপাত সরল এই আদিবাসীদের একবার খেপিয়ে তুলতে পারলে তারা কতটা ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে তার ছবি এই উপন্যাসে আছে। সেই এলাকায় সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার হিসেবে অলক্তক কাজে যোগ দেয়। সে নিজের হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার, অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রচণ্ড নিষ্ঠার মাধ্যমে সকলের মন জয় করে নেয় এবং আদিবাসীরাও তাকে আপনার ভাবতে শুরু করে। অলক্তক হাসপাতালে চিকিৎসা করার পাশাপাশি মহুলবনীতেও সপ্তাহে একদিন বসে বিনে পয়সায় গ্রামের লোকদের চিকিৎসা করা শুরু করে। এটাই গ্রামের মুখিয়া ও মাঝি হারেমদের বিরক্তির কারণ হয়। অঘোরের বউ সহেলির সঙ্গে তার একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা তারা মেনে নিতে পারে না। ফলে গ্রাম্য সালিশি 'কুলহি' বসে তাকেও বিচারের আওতায় আনা হয়। এমতাবস্থায় সহেলির আত্মহত্যা এবং অলক্তকের সে অঞ্চল থেকে বদলি হওয়ার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে। এর পাশাপাশি উপন্যাসটিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, ঝাড়খণ্ড আন্দোলন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

যাই হোক, এই উপন্যাসটির মূল পটভূমি আদিবাসীদের গ্রাম মহুলবনী। উপন্যাসটির অধিকাংশ ঘটনাই এই মহুলবনী গ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ঘটেছে। পাশাপাশি বারবার মেদেনীপুর, ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, লালগড়, বেলাপাহাড়ি প্রভৃতি

স্থানের উল্লেখ আছে। উপন্যাসের ঐ অঞ্চলের প্রকৃতির বিবরণ তো আছেই, তবে ঔপন্যাসিক সেখানকার আদিবাসীদের জীবনচর্যার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কলকাতার ছেলে অলক্তক সাঁওতালদের এই জীবনচর্যা খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছিল। তাই এস. ডি. ও. সাহেবের সঙ্গে আলাপচারিতায় তাকে বলতে শোনা যায় — ''কলকাতা থাকতে আদিবাসীদের সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না আমার। ওই দু-চারটে বইয়ে পড়া, কি সিনেমায় দেখা চরিত্র। কিন্তু এখানে এসে বুঝতে পারলাম, ওদের জীবন আমাদের থেকে একেবারেই অন্যরকম। ওরা কালচারালি কতটা রিচ্ তা ভাবতে পারবেন না। ওদের জীবন পরবে-নাচে-গানে ওতপ্রোত হয়ে আছে। ওরা গরিব, দারিদ্র্যের সীমা-পরিসীমা নেই, কিন্তু দুঃখ ভুলতে ওরা মেতে থাকে ওদের পরব আর নাচে গানে। কী অসম্ভব প্রাণপ্রাচুর্য ওদের — ''[৩৩২]

এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্রচুর আদিবাসী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সনাতন বেসরা, সহদেব সোরেন, অঘোর মুর্মু, প্রহ্লাদ টুডু, আহার হেমব্রম, কালাচাঁদ হাঁসদা, নেগা মাণ্ডি, পরজান বুড়ো, পঞ্চু বেসরা, লখন হাঁসদা, সময় মুর্মু, রামদাস মাণ্ডি, ডাকোহিলি, সরলা টুডু, সহেলি প্রমুকের মতো অজস্র আদিবাসি সম্প্রদায়ের মানুষের ভীড় এই উপন্যাসে আছে। ঔপন্যাসিক এই আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, লোককথা-লোকঐতিহ্য, নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস, লোক-সংস্কৃতি, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, বাসগৃহ প্রভৃতি সবকিছুর জীবন্ত বিবরণ দিয়েছেন। পাশাপাশি তাদের কৌম জীবনে গোষ্ঠীপতি মুখিয়ার শাসন, ডাইনি প্রথার মত কুপ্রথার বিষয়গুলিও অত্যন্ত স্বাভাবিকরূপে এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। আদিবাসীদের লোককথাকার পরজানবুড়ো সময়-সুযোগ পেলেই তার পরবর্তী প্রজন্মের ছেলে-ছোক্‌ড়াদের তাদের আদিকথা শুনিয়েছে। সে পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের রহস্য, মেঘ-বৃষ্টির প্রসঙ্গ, সকালে মোরগ ডাকা সংক্রান্ত প্রচুর গল্প শুনিয়েছে। এই গল্পগুলি আজগুবি ও কাল্পনিক হলেও তার বিশ্বাসে ও উপস্থাপনার গুণে আদিবাসীদের কাছে সত্য বলেই পরিগণিত হয়। তার গল্পে ''কেন হাঁসদাদের আদি আদিবাসী বলা হয়। কেন হাঁসদারা জিহুপাখির মাংস খায় না। এমন কি জিহুপাখির ডিম নীলরঙের বলে তারা নীলরঙের কোনোকিছুই ছোঁয় না। হেমব্রমরা

কেন সুপারি দাঁতে কাটবে না। সোরেনদের কেন সিপাহী বলা হয়। মাণ্ডিদের বা কেন ব্যবসায়ী বলা হয়। টুডুদের বলা হয় বাজনদার। আর রাজা বলা হয় কিস্কুদের।''[৩৩৩] এসব কথা উঠে আসে। এখানে আদিবাসীদের নানা 'বোঙা' অর্থাৎ দেবতাদের প্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনি তাদের পূজা উপলক্ষে আনন্দ-ফূর্তি, হই-হুল্লড়ের প্রসঙ্গও আছে। উপন্যাসের আদিবাসীদের লোক-সংস্কৃতির পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে 'বাহা' উৎসব ও বিয়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে। উপন্যাসটিতে সরাসরি সাঁওতালি ভাষার সংলাপ না থাকলেও আদিবাসী মানুষগুলির কথা-বার্তায় ঔপন্যাসিক প্রচুর সাঁওতালি শব্দ ব্যবহার করেছেন। অবশ্য পাঠকের যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য তিনি এগুলির বাংলা অর্থও করে দিয়েছেন। উপন্যাসটিতে প্রচুর সাঁওতালি ভাষায় প্রচুর আদিবাসী গানের পরিচয়ও আছে।

এইভাবে উপন্যাসটিতে ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামজীবনের হুবহু বাস্তব ছবি প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট জনপ্রিয় উপন্যাস হিসেবেও স্বীকৃত। একে কেন্দ্র করে সফল সিনেমাও তৈরি হয়েছে। উপন্যাসটি পাঠ করে যে কেউ আদিবাসী অধ্যুষিত মূল জনসমাজ বিচ্ছিন্ন সেই অঞ্চলটির বিস্তারিত বিবরণ পেয়ে যায়। ফলে পাঠকের অবচেতন মনে 'আঞ্চলিক রঙ' সঞ্চারিত হয়ে যায়। এভাবে এখানে আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য উপন্যাসটির শেষ দিকে রাজনীতির অনুপ্রবেশ কিছুটা হলেও এর আঞ্চলিকতায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। তবে সবদিক বিচারে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহুলবনীর সেরেঞ' উপন্যাসটিকে একটি সফল আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবেই বিবেচনা করা যায়।

'ব্যাধখণ্ড' (১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি প্রাচীনকাল থেকে বনজঙ্গলে বসবাসকারী ব্যাধ ও শবরদের জীবন কাহিনি অবলম্বনে রচিত। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এই ভূমিপুত্রদের জীবনকে কীভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল সেটাই হল এই উপন্যাসের বিষয়। এখানে ব্যাধ এবং শবর সম্প্রদায়ের মানুষজন এবং তাদের বসবাস করা অঞ্চলটির ছবি আছে। ফলে মহাশ্বেতা দেবীর এই উপন্যাসটিতেও আঞ্চলিক উপন্যাসের নানা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

এছাড়াও সুব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯৫০ খ্রিঃ —)-এর **'পৌর্ণমাসী'** (১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ), **'মধুকর'** (১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ) ও 'রসিক' (১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসে পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলের জীবনচিত্র উঠে এসেছে। অনিল ঘড়াই (১৯৫৭ খ্রিঃ —) মেদিনীপুরের এগরা অঞ্চলে জন্মালেও তাঁর বাল্য ও কৈশোরের অনেকটাই অতিবাহিত হয় নদীয়া জেলার কালীগঞ্জে কাটায় তিনি মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলার গ্রামঞ্চলকে তিনি ভালোভাবেই চিনেছিলেন। এছাড়াও পুরুলিয়া ও সাঁওতাল পরগণায় দীর্ঘদিন ঘুরেছিলেন। এই ঘোরার সুবাদেই তিনি এই সমস্ত জেলার অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষজন সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করেন। উপন্যাস লেখার সময় তাঁর এই অভিজ্ঞতাগুলি অত্যন্ত কাজে লেগেছে। ফলে তাঁর অনেক উপন্যাসে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত হয়ে নানা কারণে স্বতন্ত্র কোনো অঞ্চল এবং সেখানকার জনসমাজের জীবনচর্যা উঠে এসে উপন্যাসগুলি আঞ্চলিক উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত হয়েছে। বিশ শতকে রচিত তাঁর এই ধরনের দু'টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে — 'নুনবাড়ি' (১৯৮৯ খ্রিঃ) এবং 'বনবাসী' (১৯৮৯ খ্রিঃ)। এই উপন্যাস দু'টিতে গ্রামজীবনের কথা উঠে এসেছে। ফলে এই উপন্যাসগুলি অনেকটাই আঞ্চলিকতার লক্ষণাক্রান্ত হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড) : সম্পাদনা - আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ ৩৭৯
২। তদেব, পৃ ১৭৬
৩। তদেব, পৃ ১৭৬
৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৪-২০০৫, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ৬২৬
৫। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) : সম্পাদনা - আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, তৃতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৩৯৭, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ ১৩৯
৬। তদেব, পৃ ১৪০
৭। বাংলা সাহিত্যসঙ্গী : শিশিরকুমার দাশ (সংকলন ও সম্পাদনা), প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১০, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ ১৬২
৮। জলজঙ্গল : মনোজ বসু, নতুন মুদ্রণ — শ্রাবণ, ১৪১৫, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রঃ) লিমিটেড, কলকাতা, 'লেখকের ভাষায়' অংশ।
৯। তদেব, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বোধন করে ১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৮ তে লেখা মনোজ বসুর বক্তব্য।
১০। তদেব, পৃ ৫
১১। তদেব, পৃ ২৩
১২। তদেব, পৃ ৫

১৩। তদেব, পৃ ৫
১৪। তদেব, পৃ ৭
১৫। তদেব, পৃ ৫–৬
১৬। তদেব, পৃ ১১৫
১৭। তদেব, পৃ ২৩
১৮। তদেব, পৃ ৫৭
১৯। তদেব, পৃ ১১৬
২০। তদেব, পৃ ৬৩
২১। তদেব, পৃ ১৩
২২। তদেব, পৃ ১০
২৩। তদেব, পৃ ৭৪
২৪। তদেব, পৃ ১০
২৫। তদেব, পৃ ১১২
২৬। তদেব, পৃ ৫
২৭। তদেব, পৃ ৬৫
২৮। তদেব, পৃ ৬৫
২৯। তদেব, পৃ ৬৫
৩০। তদেব, পৃ ৬৮
৩১। তদেব, পৃ ৫৬
৩২। তদেব, পৃ ৫৭
৩৩। তদেব, পৃ ২৭
৩৪। তদেব, পৃ ৪৭
৩৫। বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৩৭
৩৬ । বাঙালির ইতিহাস : ড. নীহাররঞ্জন রায়, তৃতীয় মুদ্রণ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাউভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ ৪৬৬
৩৭। রচনাবলী (দশম খণ্ড) : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নবম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ ৩৬৪
৩৮। তদেব, পৃ ৩৮৩
৩৯। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধার, পৃ ৫৭৮
৪০। বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ১১৪
৪১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৭৮
৪২। নাগিনী কন্যার কাহিনী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অষ্টম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৩, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পৃ ৫
৪৩। তদেব, পৃ ৬
৪৪। তদেব, পৃ ৮–৯
৪৫। তদেব, পৃ ১৪
৪৬। তদেব, পৃ ১৫–১৬
৪৭। তদেব, পৃ ২৭
৪৮। তদেব, পৃ ৯৮–৯৯
৪৯। তদেব, পৃ ১৫১
৫০। তদেব, পৃ ১২–১৩
৫১। তদেব, পৃ ৮৭
৫২। তদেব, পৃ ১৪
৫৩। তদেব, পৃ ৪৯
৫৪। তদেব, পৃ ১১
৫৫। তদেব, পৃ ১৪–১৫
৫৬। তদেব, পৃ ১৫
৫৭। তদেব, পৃ ৩৩–৩৪
৫৮। তদেব, পৃ ৩৭
৫৯। তদেব, পৃ ১৭
৬০। তদেব, পৃ ৪৭
৬১। তদেব, পৃ ৪৬
৬২। তদেব, পৃ ৭৭
৬৩। বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৭৮
৬৪। নাগিনী কন্যার কাহিনী, পৃ ৮৩
৬৫। তদেব, পৃ ২৮

৬৬। তদেব, পৃ ৭-৮
৬৭। তদেব, পৃ ২৯
৬৮। তদেব, পৃ ২৯
৬৯। তদেব, পৃ ১৫২
৭০। তদেব, পৃ ৬৫-৬৬
৭১। তদেব, পৃ ৯
৭২। তদেব, পৃ ১৯
৭৩। তদেব, পৃ ৬১
৭৪। তদেব, পৃ ৯৬
৭৫। তদেব, পৃ ১৪
৭৬। তদেব, পৃ ১৫
৭৭। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৭৯
৭৮। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম সংস্করণ : নভেম্বর ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ২৫৩
৭৯। তারশঙ্কর অন্বেষা : সম্পাদনা সরোজবন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২৮ জানুয়ারী ১৯৮৭, রমা প্রকাশনী, কলকাতা, গ্রন্থের গুণময় মান্নার 'তারাশঙ্করের নাগিনী কন্যার কাহিনী' প্রবন্ধ, পৃ ৫৪
৮০। তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা : গৌরমোহন রায়, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৪, অগ্রহায়ণ ১৪০১, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, পৃ ১৭৫
৮১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৫৭০
৮২। কালের প্রতিমা : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পঞ্চম সংস্করণ : বৈশাখ ১৪১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ৪৪
৮৩। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড) : ক্ষেত্র গুপ্ত, দ্বিতীয় প্রকাশ ২৮ শে জানুয়ারী, ২০০৮, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, পৃ ১২৯
৮৪। আরোগ্য নিকেতন : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সপ্তদশ মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পৃ ৬-৮
৮৫। তদেব, পৃ ২৮
৮৬। তদেব, পৃ ১১
৮৭। তদেব, পৃ ৩৫-৩৬
৮৮। তদেব, পৃ ১৩৮
৮৯। তদেব, পৃ ৭-৮
৯০। তদেব, পৃ ২৪
৯১। তদেব, পৃ ২৫
৯২। তদেব, পৃ ১৩৫
৯৩। তদেব, পৃ ১২৯
৯৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৭৬৫
৯৫। সংসদ বাংলা সাহিত্যস, কলকাতা, পৃ ৯৩
৯৬। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা : সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ৩১০
৯৭। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম সংস্করণ : নভেম্বর ২০০৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ৩২১
৯৮। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৭৬৭-৭৬৮
৯৯। তিতাস একটি নদীর নাম : অদ্বৈত মল্লবর্মণ, অষ্টাদশ প্রকাশ : পৌষ ১৪১১, পুথিঘর, কলকাতা, ভূমিকা অংশ, পৃ ১-৪
১০০। তদেব, পৃ ১৮০
১০১। তদেব (পৃ ১৩)
১০২। তদেব, পৃ ১৪
১০৩। তদেব, পৃ ৩৩
১০৪। তদেব, পৃ ৪১
১০৫। তদেব, পৃ ২৬
১০৬। তদেব, পৃ ৭৮
১০৭। তদেব, পৃ ৫৮
১০৮। তদেব, পৃ ৩০০
১০৯। তদেব, পৃ ২২৩
১১০। তদেব, পৃ ২০
১১১। তদেব, পৃ ২৪-২৫
১১২। তদেব, পৃ ৩১

১১৩। তদেব, পৃ ৬২
১১৪। তদেব, পৃ ৩৭–৩৮
১১৫। তদেব, পৃ ২৮০
১১৬। তদেব, পৃ ৩৮
১১৭। তদেব, পৃ ১০৯
১১৮। তদেব, পৃ ৩৩৫–৩৩৬
১১৯। তদেব, পৃ ৪৮
১২০। তদেব, পৃ ১১৯
১২১। তদেব, পৃ ৪০
১২২। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ৩২২
১২৩। তিতাস একটি নদীর নাম, পৃ ৩৩
১২৪। তদেব, পৃ ৩৩–৩৪
১২৫। তদেব, পৃ ৬৩
১২৬। তদেব, পৃ ১৪৩
১২৭। তদেব, পৃ ১৫১–১৫২
১২৮। তদেব, পৃ ২৪১
১২৯। তদেব, পৃ ২৪৪–২৪৫
১৩০। তদেব, পৃ ৩৩
১৩১। তদেব, পৃ ৭৭
১৩২। তদেব, পৃ ১০৩
১৩৩। তদেব, পৃ ৩১৫
১৩৪। তদেব, পৃ ৩২৪
১৩৫। তদেব, পৃ ৩২৭
১৩৬। তদেব, পৃ ৩৪০
১৩৭। তদেব, পৃ ৩৫০
১৩৮। তদেব, পৃ ৫২–৫৩
১৩৯। তদেব, পৃ ৪৪
১৪০। তদেব, পৃ ৬২
১৪১। তদেব, পৃ ৩৫–৩৬
১৪২। তদেব, পৃ ৩৭
১৪৩। তদেব, পৃ ৪২
১৪৪। তদেব, পৃ ৬৩
১৪৫। তদেব, পৃ ৫৪
১৪৬। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ৩১০–৩১১
১৪৭। তিতাস একটি নদীর নাম, পৃ ৩৫
১৪৮। তদেব, পৃ ৪৩
১৪৯। তদেব, পৃ ৭০
১৫০। তদেব, পৃ ৭০
১৫১। তদেব, পৃ ৮৫
১৫২। তদেব, পৃ ৮৫
১৫৩। তদেব, পৃ ২৪২
১৫৪। অলোক রায়ের 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' গ্রন্থের দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় রচিত 'আঞ্চলিক উপন্যাস' অংশ, তৃতীয় সংস্করণ : আগস্ট ২০০২, সাহিত্যলোক, পৃ ৫–৬
১৫৫। কালের প্রতিমা, পৃ ২৪৬
১৫৬। বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ৬১
১৫৭। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃ ৩২১
১৫৮। সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, পৃ ৫
১৫৯। উপন্যাসের কথা : দেবীপদ ভট্টাচার্য, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দে'জ সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৩, দে'জ, কলকাতা পৃ ১৮৩
১৬০। কালের প্রতিমা, পৃ ২৪৬
১৬১। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃষ্ঠা ৩২১।
১৬২। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ২৫৫
১৬৩। তদেব, পৃ ২৫৫
১৬৪। গঙ্গা : সমরেশ বসু, সপ্তম মুদ্রণ : আগস্ট ২০১১, মৌসুমি প্রকাশনী, কলকাতা, 'ভূমিকা' অংশ

১৬৫। তদেব, পৃ ১৯১
১৬৬। তদেব, পৃ ১
১৬৭। তদেব, পৃ ২
১৬৮। তদেব, পৃ ৩
১৬৯। বাংলা সাহিত্যের নানারূপ : শুদ্ধস্বত্ত্ব বসু, ষষ্ঠ মুদ্রণ, শ্রাবন ১৪১০, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, পৃ ১৪৩
১৭০। গঙ্গা, পৃ ১৩
১৭১। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃ ৩২২
১৭২। সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, পৃ ৬
১৭৩। গঙ্গা, পৃ ৩৬
১৭৪। তদেব, পৃ ৪
১৭৫। তদেব, পৃ ৬
১৭৬। তদেব, পৃ ৫
১৭৭। তদেব, পৃ ৩৭-৩৮
১৭৮। তদেব, পৃ ১৫
১৭৯। তদেব, পৃ ৩
১৮০। তদেব, পৃ ২৬
১৮১। তদেব, পৃ ১১৬
১৮২। তদেব, পৃ ১৩৮
১৮৩। তদেব, পৃ ১৪০-১৪১
১৮৪। তদেব, পৃ ১৬৬
১৮৫। তদেব, পৃ ১৬৮
১৮৬। তদেব, পৃ ১৭৬
১৮৭। তদেব, পৃ ৪
১৮৮। তদেব, পৃ ৬
১৮৯। তদেব, পৃ ৮
১৯০। তদেব, পৃ ২৫
১৯১। তদেব, পৃ ২৬-২৭
১৯২। তদেব, পৃ ৬১
১৯৩। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৭৬৮
১৯৪। গঙ্গা, পৃ ১৬৭
১৯৫। তদেব, পৃ ৬৬)
১৯৬। তদেব, পৃ ১২৬
১৯৭। তদেব, পৃ ১০৯
১৯৮। তদেব, পৃ ১৮৮
১৯৯। তদেব, পৃ ১৮৮
২০০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৭৭০
২০১। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃ ৩২৩
২০২। পূর্বপার্বতী : প্রফুল্ল রায়, পঞ্চম রাজ সংস্করণ : মাঘ ১৪১৫, জানুয়ারী ২০০৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, লেখকের কথা অংশ
২০৩। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৭৭৩
২০৪। পূর্বপার্বতী, লেখকের কথা
২০৫। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ১২৮
২০৬। পূর্বপার্বতী, পেছনের মলাট
২০৭। তদেব, পৃ ২৮৮
২০৮। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৭৭৩
২০৯। সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, পৃ ৬
২১০। পূর্বপার্বতী, পৃ ৯
২১১। কালের প্রতিমা, পৃ ২০৯
২১২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৭৭৫
২১৩। পূর্বপার্বতী, পৃ ১৫
২১৪। তদেব, পৃ ১৫-১৬
২১৫। তদেব, পৃ ২২৩
২১৬। তদেব, পৃ ১১
২১৭। তদেব, পৃ ২২
২১৮। তদেব, পৃ ১৯-২০

২১৯। তদেব, পৃ ৪৩
২২০। তদেব, পৃ ২২৬
২২১। তদেব, পৃ ৩১
২২২। তদেব, পৃ ৩৩
২২৩। তদেব, পৃ ৮৮
২২৪। তদেব, পৃ ১১৫
২২৫। তদেব, পৃ ১১৬
২২৬। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৭৭৫-৭৭৬
২২৭। পূর্বপার্বতী, পৃ ২২৫
২২৮। তদেব, পৃ ১৮
২২৯। তদেব, পৃ ১১৯
২৩০। তদেব, পৃ ২৬৯
২৩১। তদেব, পৃ ৫২
২৩২। তদেব, পৃ ৬৬-৬৭
২৩৩। তদেব, পৃ ৬৬
২৩৪। তদেব, পৃ ৬৩-৬৪
২৩৫। তদেব, পৃ ৪৬
২৩৬। তদেব, পৃ ৮৬
২৩৭। তদেব, পৃ ৮৭
২৩৮। তদেব, পৃ ৯৪-৯৫
২৩৯। তদেব, পৃ ৯২
২৪০। তদেব, পৃ ৭৫
২৪১। তদেব, পৃ ২৭
২৪২। তদেব, পৃ ১০
২৪৩। তদেব, পৃ ৬৮
২৪৪। তদেব, পৃ ১৮৭
২৪৫। তদেব, পৃ ১৫
২৪৬। তদেব, পৃ ৩৪-৩৫
২৪৭। তদেব, পৃ ৭৬
২৪৮। তদেব, পৃ ৩২-৩৩
২৪৯। তদেব, পৃ ৬৩
২৫০। তদেব, পৃ ৫৭
২৫১। তদেব, পৃ ১৮৬
২৫২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৭৭৬
২৫৩। তদেব, পৃ ৭৭৩-৭৭৪
২৫৪। তদেব, পৃ ৭৭৩
২৫৫। সংসদ বাংলা সাহিত্যস, পৃ ১৬
২৫৬। তদেব, পৃ ৬২
২৫৭। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৭৫৬
২৫৮। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস : অশ্রুকুমার সিকদার, চতুর্থ সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৪১৫ নভেম্বর ২০০৫, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ ২৬১
২৫৯। তদেব, পৃ ২৬১
২৬০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৭৫৯
২৬১। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ২৫২
২৬২। বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি : অলোক রায়, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৯, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ ২৫৬
২৬২। গড় শ্রীখণ্ড : অমিয়ভূষণ মজুমদার, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী ২০১০, মাঘ ১৪১৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ৬২
২৬৪। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, পৃ ২৬০
২৬৫। গড় শ্রীখণ্ড, পৃ ১৫
২৬৬। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ৪৬
২৬৭। গড় শ্রীখণ্ড, পৃ ১৪
২৬৮। তদেব, পৃ ১৪৬
২৬৯। তদেব, পৃ ২৫৩
২৭০। তদেব, পৃ ৩৫৪

২৭১। তদেব, পৃ ৩৯১–৩৯২
২৭২। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ৩৩২
২৭৩। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, পৃ ২৫৭
২৭৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৬৬৩
২৭৫। তদেব, পৃ ৬৬২
২৭৬। কালের প্রতিমা, পৃ ২৪৬
২৭৭। সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য, পৃ ৬
২৭৮। সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র (৩) : সম্পাদনা উত্তম ঘোষ ও সমীরকুমার রায়, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০৪ জানুয়ারী ১৯৯৯, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, পৃ ১১৮
২৭৯। তদেব, পৃ ১২০
২৮০। কালের প্রতিমা, পৃ ২৪৬
২৮১। সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র (৩), পৃ ১১৮
২৮২। তদেব, পৃ ১১৮
২৮৩। তদেব, পৃ ১১৮
২৮৪। তদেব, পৃ ১৪৩
২৮৫। তদেব, পৃ ৪০২
২৮৬। তদেব, পৃ ১৯১
২৮৭। কালের প্রতিমা, পৃ ২৪৬
২৮৮। সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র (৩), পৃ ১১৮
২৮৯। তদেব, পৃ ১২৭
২৯০। তদেব, পৃ ২৪৮
২৯১। তদেব, পৃ ২৪৮
২৯২। তদেব, পৃ ১২৫
২৯৩। তদেব, পৃ ১২৪
২৯৪। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৬৬২
২৯৫। তদেব, পৃ ৭৭৬
২৯৬। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃ ৩৩২
২৯৭। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ৭৪
২৯৮। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (ষষ্ঠ খণ্ড), পৃ ২৪৫–২৪৬
২৯৯। তদেব, পৃ ২৪৬
৩০০। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৭১৩
৩০১। বন কেটে বসত : মনোজ বসু, নতুন মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ, ১৪১৫, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ২৪০
৩০২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৬৩৬
৩০৩। তদেব, পৃ ৬৩৬
৩০৪। তদেব, পৃ ৬৩৫–৬৩৬
৩০৫। বন কেটে বসত, পৃ পরিচয় অংশ
৩০৬। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৭৬১
৩০৭। কালের প্রতিমা, পৃ ১৫৮
৩০৮। তদেব, পৃ ২৪৭
৩০৯। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ৮১৬
৩১০। কালের প্রতিমা, পৃ ১৯৬–১৯৭
৩১১। তদেব, পৃ ১৯৩
৩১২। কেয়াপাতার নৌকো : প্রফুল্ল রায়, প্রথম অখণ্ড প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০০৩, দশম অখণ্ড সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, উপন্যাসের প্রচ্ছদ
৩১৩। কালের প্রতিমা, পৃ ২৩৩–২৩৪
৩১৪। তদেব, পৃ ২৮০
৩১৫। বিষয় : বাংলা উপন্যাস (সংযোজন খণ্ড) কালের দর্পণে সমাজের প্রতিবিম্ব : বীরেন্দ্র চন্দ (সম্পাদিত), গ্রন্থের সুমিতা চক্রবর্তীর 'শালবনি : অরণ্য-মানুষ-রাজনীতি' প্রবন্ধ, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৪, উত্তরধ্বনি, কলকাতা, পৃ ৩২৩
৩১৬। রচনা সমগ্র (ষষ্ঠ খণ্ড) : অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৮, আষাঢ় ১৪১৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ২৪০
৩১৭। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, পৃ ২৫৫
৩১৮। রচনা সমগ্র (ষষ্ঠ খণ্ড) : অমিয়ভূষণ মজুমদার, পৃ ২৮২

৩১৯। সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, পৃ ৯৪
৩২০। তদেব, পৃ ৯৪
৩২১। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ৩৪৬
৩২২। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত : দেবেশ রায়, চতুর্দশ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৮, মাঘ ১৪১৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, উৎসর্গ অংশ
৩২৩। বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা : সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পৃ ৩২০
৩২৪। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, পৃ ৫০৪
৩২৫। তদেব, পৃ ৫০৪
৩২৬। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, পৃ ৩২০
৩২৭। কালের প্রতিমা, পৃ ৩৪১
৩২৮। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, পৃ ৯৭
৩২৯। তদেব, পৃ ৩৪৩
৩৩০। মহুলবনীর সেরেঞ : তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৫, মাঘ ১৪০১ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ভূমিকা অংশ
৩৩১। তদেব, পৃ ৯
৩৩২। তদেব, পৃ ১৪৮
৩৩৩। তদেব, পৃ ৪২

উপসংহার

উপসংহার

বিশ শতকে মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত থেকেও নানা কারণে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা কোনো বিশেষ অঞ্চল এবং সেখানকার গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষগুলির জীবনচর্যার বিবরণে সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যে অনেক উপন্যাসই রচিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে বেশ কিছু উপন্যাসে আঞ্চলিকতার বেশিরভাগ লক্ষণ সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। এগুলিকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর অনেক উপন্যাসে আঞ্চলিকতা পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হলেও সমস্ত লক্ষণ সার্থকভাবে প্রকটিত হয় নি। এগুলিকে আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কোনো বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে রচিত সমস্ত উপন্যাস পুরোপুরি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি একথা সত্য। তবে আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত এই ধরনের উপন্যাসগুলিতে মূল ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত অথচ মূল জনসমাজ থেকে নানা কারণে বিচ্ছিন্ন কোনো অঞ্চল এবং সেখানকার জনজীবনের বাস্তব ছবি উঠে এসেছে। শিল্প-সাহিত্য এবং শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে যুক্ত বেশিরভাগ মানুষ সাধারণত মূল জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষজনের জীবনধারা সম্পর্কে জানতে পারেন। কারণ বেশিরভাগ শিল্পী-সাহিত্যিক, সমাজ বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক মূল জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে নিজেদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন। মূল ভূখণ্ডের মধ্যে প্রচুর অঞ্চল আছে যেগুলিকে মূল জনসমাজের ভেতর থেকেও নানা কারণে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়। এই রকম অঞ্চলগুলিকে পটভূমি করেই আমার আলোচিত উপন্যাসগুলি রচিত হয়েছে। আঞ্চলিক এবং আঞ্চলিকতার লক্ষণযুক্ত উপন্যাসগুলিতে মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অঞ্চল এবং সেখানকার জনজীবন সম্পর্কিত অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাই এই ধরনের উপন্যাস থেকে বৈচিত্র্যে ভরা আমাদের এই দেশের নানা বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। পশ্চিমবাংলার কয়লাখনি অঞ্চল, পূর্ববাংলার পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চল, বৈষ্ণবলালিত পশ্চিম মুর্শিদাবাদ, বিহারের ভাগলপুরের নাঢ়া-বইহার-লবটুলিয়া, লালমাটির দেশ বীরভূমের রাঢ় অঞ্চল, বাংলা সীমান্তবর্তী অঞ্চল, বিহারের জিরানিয়ার তাৎমাটুলি, ইছামতী তীরস্থ নদীয়া, পূর্ববাংলার কুমিল্লার তিতাস নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, নাগাল্যান্ডের নাগা পাহাড়,

পশ্চিম বাংলার গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চল, সুন্দরবনের বাদা অঞ্চল, মানভূমের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল, পূর্ববাংলার রাজদিয়া, উপজাতি অধ্যুষিত সুন্দরবন ও জঙ্গলমহল, মেদিনীপুরের শালবনী, উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদী তীরবর্তী অঞ্চল, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সমকালীন ঝাড়গ্রাম অঞ্চল, পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চল প্রভৃতি নানা অঞ্চলের প্রকৃতি ও জনজীবনের কথা এই ধরনের উপন্যাসগুলিতে উঠে এসেছে। এই উপন্যাসগুলি রচিত না হলে সম্ভবত এই সমস্ত অঞ্চলের কথা তথাকথিত সভ্যসমাজের কাছে কোনোদিনই পৌঁছাত না।

শুধু তাই নয়, এই উপন্যাসগুলির যেমন একটি বিশেষ অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রকৃতি উঠে এসেছে, তেমনি এগুলিতে এমন অনেক চরিত্র নির্মাণ করা হয়েছে, যারা সেই বিশেষ অঞ্চলটির নানা ধরনের নরনারীর সার্থক প্রতিনিধিত্ব করেছে। রঞ্জন, কাঞ্চন, কুবের, হোসেন মিঞা, কপিলা, গৌরহরি, রসময়, যুগলপ্রসাদ, দোবরু পান্না, ভানুমতী, শৈলজা দেবী, দেবু ঘোষ, ছিরে পাল, রাম ভল্লা, তিন কড়ি, দুর্গা মুচিনী, নিতাই কবিয়াল, বনোয়ারীলাল, করালীচরণ, ঢোঁড়াই, বৌকা বাওয়া, ভবানী বাড়ুয্যে, নাগিনী কন্যা পিঙলা, শবলা, জীবনমশাই, সেঙাই, গাইডিলিও, মাছমারা বিলেশ, দাশু ঘরামি, হ্যামকত্তা, বীরসা মুণ্ডা, বসাই টুডু থেকে শুরু করে প্রচুর চরিত্র এই সমস্ত উপন্যাস থেকে উঠে এসেছে। এইসব উপন্যাসে কয়লাখনি অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায় থেকে শুরু করে পশ্চিম মুর্শিদাবাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়, পদ্মা তীরবর্তী ধীবর-মাঝি সম্প্রদায়, ময়ূরাক্ষী তীরস্থ রাঢ় অঞ্চল বীরভূমের কৃষক, জেলে, মাঝি, দুলে, বাগ্‌দি, কামার, কুমোর, বায়েন, কবিওয়ালা, সাঁওতাল, কাহার, বাউল, বৈষ্ণব, পূর্ববঙ্গের কুমিল্লার তিতাস তীরস্থ মালো সম্প্রদায়, গঙ্গানদীর উপর নির্ভরশীল মাছমারা মানুষজন, তাৎমাটুলির তাৎমা জনজাতি, নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন নাগা গোষ্ঠীর মানুষজন, পূর্ববাংলার রাজদিয়া অঞ্চলের মানুষজন, সুন্দরবন বাদা অঞ্চলের সংগ্রামী মানুষজন, জঙ্গলমহলের উপজাতি সম্প্রদায়, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়, মহিষ বাথানের সঙ্গে যুক্ত লোকজন, বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষজন প্রভৃতি সবার বিস্তারিত বিবরণ আছে। এরা সবাই এই উপন্যাসগুলিতে নিজেদের অঞ্চলটির সার্থক প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই মানুষগুলির প্রকৃতি, কার্যকলাপ, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোক-সংস্কৃতি, লোককথা, বিশিষ্ট

ধর্মবিশ্বাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ি, ভাষা-সংলাপ প্রভৃতি সমস্ত কিছু নিজেদের সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এই উপন্যাসগুলি পাঠ করলে আবহমান কাল ধরে চলে আসা মূল জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন অনেক অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতি ও জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহ্য, সংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোককথা, লোকাচার, লোকসংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা-সংলাপ প্রভৃতির নানারূপ বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানা যায়। ফলে এই উপন্যাসগুলির মাধ্যমে ঔপন্যাসিকেরা অনেকটাই আঞ্চলিক ইতিহাসকেও সংরক্ষণ করে ফেলেছে। এই উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যের পটভূমির বিস্তারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

তবে বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার যাত্রাও কোনো এক জায়গায় থেমে থাকেনি — সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এতে বিবর্তন এসেছে। প্রথমদিকে মূলত রবীন্দ্র পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এক শ্রেণির কথসাহিত্যিক কোনো বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে ছোটগল্প-উপন্যাস রচনা শুরু করেছিলেন। তাই বিশ শতকের বিশের দশক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে মূল জনসমাজের বাইরের শহরতলি, বস্তি, কয়লাখনি অঞ্চল প্রভৃতি প্রাধান্য পেতে শুরু করে। তবে সে সময় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিকরা যে ধরনের ভাবনা পোষণ করতেন তার ফলে তথাকথিত বাস্তবতা দেখাতে গিয়ে এঁরা নিজেদের গল্প-উপন্যাসে একধরনের রোমান্টিক বাস্তবতা আমদানি করেছিলেন। এজন্য এঁরা নিজেদের লেখায় মূল জনসমাজের বাইরের অঞ্চলকে পটভূমি করলেও কোনো সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস রচনা করতে পারেন নি। এরপর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে পূর্ব বাংলার পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলকে পটভূমি করে সেখানকার জেলে-মাঝিদের বাস্তব জীবনচর্যাকে তুলে ধরলেও উপন্যাসটি শেষপর্যন্ত পদ্মাতীরবর্তী একটি বিশেষ অঞ্চল ও সেখানকার জেলে-মাঝিদের জীবনচর্যার কাহিনি না হয়ে ময়নাদ্বীপকে কেন্দ্র করে কুবের-কপিলার রোমান্টিক আখ্যান হয়ে উঠেছে। সরোজকুমার রায়চৌধুরী ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী পশ্চিম মুর্শিদাবাদকে পটভূমি করে রচিত তাঁর ট্রিলজি ‘নতুনফসল’-এ বৈষ্ণব জীবনের বিশেষ আলেখ্য রচনা করেছেন। তবে এখানেও সাধারণ কৃষিভিত্তিক গ্রামজীবনের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। এইসময় বিভূতিভূষণ বর্তমান বিহারের ভাগলপুরের অন্তর্গত একটি বিশেষ অঞ্চলের বনভূমি

উৎপাটন করে বসতি নির্মাণের বিবরণ তুলে এনেছেন তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাসটিতে। এখানে আঞ্চলিক পটভূমি থাকলেও উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাসের চেয়েও অনেক বেশি প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণের প্রকৃতি বর্ণনার আখ্যান হয়ে উঠেছে। এরপরই বাংলা উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটে। তিনি তাঁর জন্মভূমি লালমাটির দেশ বীরভূমকে পটভূমি করে একের পর এক উপন্যাস রচনা করে বাংলা সাহিত্যের সার্থক আঞ্চলিক রসস্রষ্টার আখ্যা পেয়েছেন। তাঁর 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি' প্রভৃতি উপন্যাসে আঞ্চলিক পটভূমি গৃহীত হলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আঞ্চলিকতার বাইরেও এই উপন্যাসগুলির একটা আলাদা পরিচিতি আছে। তবে বীরভূমের কোপাই নদী তীরস্থ হাঁসুলীর বাঁকের মতো আকৃতির বাঁশবাদি নামক একটি গ্রামকে পটভূমি করে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' নামে তিনি যে উপন্যাসটি লিখেছেন, তা সব অর্থেই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে কাহার সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সামগ্রিক পরিচয় ও অবলুপ্তির যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা সত্যিই খুব দুর্লভ। এই উপন্যাসটির পরে অনেকে আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়ে সাফল্য লাভ করলেও কোনো উপন্যাসই আর আঞ্চলিকতার নিরিখে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'কে ছাপিয়ে যেতে পারে নি। বিশ শতকের প্রথমার্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তিন খণ্ডে 'উপনিবেশ' ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এগুলিতে আঞ্চলিক পটভূমি থাকলেও প্রথমটির ক্ষেত্রে সুদূর বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচিতি এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে নীল বিদ্রোহ সমকালীন নদীয়া-যশোরের আঞ্চলিক ইতিহাস বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। অবশ্য বিশ শতকের দুই অর্ধে দুই 'চরণ'-এ প্রকাশিত সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটির ক্ষেত্রে বিহারের জিরানিয়া (সম্ভবত পূর্ণিয়া) অঞ্চলের সামগ্রিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই অঞ্চলের তাৎমা সম্প্রদায়ের মানুষগুলির জীবনচর্যা পরিবেশন করে এই উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সার্থকতা লাভ করলেও এখানে শেষপর্যন্ত তাৎমাদের সামগ্রিক জীবনচর্যাকে ছাপিয়ে নায়ক ঢোঁড়াই-এর ব্যক্তিজীবনের কাহিনি বড় হয়ে উঠেছে। এভাবে বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা উপন্যাসের আঞ্চলিকতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় তা চরম পর্যায়ে পৌঁছে এক অন্য

মাত্রায় নিয়ে এসেছিল, যার আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করা আর কোনো উপন্যাসের পক্ষেই সম্ভব হয় নি।

দেশ ভাগের যন্ত্রণা, ভারতীয় গণতন্ত্রের বহুত্ববাদ, নক্‌শাল আন্দোলন, বামপন্থার বিকাশ, বিশ্বায়নের প্রভাবে বাঙালী সংস্কৃতির বিবর্তন, উত্তর আধুনিকতা, নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদ প্রভৃতি বিষয়কে মাথায় রেখে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা কথাসাহিত্যিকেরা উপন্যাসের চর্চা করেছেন। এসবের মধ্যেও তাঁদের কেউ কেউ নিজেদের উপন্যাসে কোনো বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করেছেন। ফলে পূর্ববর্তী অর্ধের চেয়ে এই অর্ধের আঞ্চলিকতার অভিমুখ অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ সময়কালে বাংলা সাহিত্যে অনেকেই মূল জনসমাজের মধ্যে অবস্থিত অথচ নানা কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা কোনো বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে অনেকেই উপন্যাস লিখেছেন। এই সময় একদিকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো পুরাতন কথাসাহিত্যিকরা কোনো বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে উপন্যাস রচনা করেন, তেমনি মনোজ বসু, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সমরেশ বসু, অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রফুল্ল রায়, সুবোধ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নিজেদের উপন্যাসে আঞ্চলিক পটভূমি গ্রহণ করেছেন। এই অর্ধের প্রথমদিকে তারাশঙ্করের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসটি রচিত হয়। এখানে সাঁতালির বিষবেদে সম্প্রদায়ের বাস্তবনির্ভর জীবনচর্যার বিস্তৃত বিবরণ উঠে এসেছে। তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাস না হলেও এখানে রাঢ় অঞ্চলের তৎকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ আছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ কুমিল্লার তিতাস তীরস্থ মালোসম্প্রদায়ের জীবনচর্যার জীবন্ত ছবি তুলে এনেছেন তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে। এই উপন্যাসে আধুনিক সংস্কৃতির চাপে মালো-সংস্কৃতির অবলুপ্তির দিকটিকেও দেখিয়েছেন মালো সন্তান অদ্বৈত। প্রফুল্ল রায়ের অন্তরে সর্বদা দেশ ভাগের যন্ত্রণার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তিনি নাগাল্যান্ডের নাগা পাহাড়কে পটভূমি করে নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত নাগাদের জীবনচর্যার বাস্তব ছবি তুলে ধরেছেন 'পূর্বপার্বতী' উপন্যাসে। আন্দামানের আঞ্চলিক প্রকৃতি সহ সেখানে দীর্ঘদিন ধরে বন্দী থাকা কয়েদিদের সুখ-দুঃখপূর্ণ জীবনচিত্র তুলে এনেছেন 'সিন্ধুপারের পাখি' উপন্যাসটিতে। তাঁর 'কেয়াপাতার নৌকো' দেশভাগের স্মৃতিবিজড়িত পূর্ববঙ্গের

রাজদিয়া অঞ্চলের জীবনচর্যা নির্ভর উপন্যাস। অমিয়ভূষণ মজুমদারের ‘গড় শ্রীখণ্ড’, ‘দুখিয়ার কুঠি’, ‘মহিষ কুড়ার উপকথা’ উপন্যাসগুলিতে সীমান্তবর্তী অঞ্চল বা উত্তরবঙ্গের গ্রামঞ্চলকে পটভূমি করা হলেও এগুলি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। এই সময় মনোজ বসু নিম্নবঙ্গ সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের প্রকৃতি ও জীবনচর্যার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর ‘জলজঙ্গল’ ও ‘বন কেটে বসত’ উপন্যাস দু’টিতে। সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ উপন্যাসে উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমা অঞ্চলের ‘মাছমারা’দের জীবনচর্যা উঠে এসেছে। এই সময়কালে অমরেন্দ্র নাথ ঘোষের ‘চরকাশেম’, রমাপদ চৌধুরীর ‘বন পলাশীর পদাবলী’, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘তৃণভূমি’, প্রভাত দেবসরকারের ‘ওরা কাজ করে’, সুশীল রায়ের ‘অনল আয়তি’, শক্তিপদ রাজগুরুর ‘তবু বিহঙ্গ’ প্রভৃতি উপন্যাস আঞ্চলিক পটভূমিকায় রচিত হয়েছে। তবে এগুলিতে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস হয়ে ওঠার বেশিরভাগ লক্ষণই নেই। অবশ্য এসবের মধ্যে ব্যতিক্রম সুবোধ ঘোষের ‘শতকিয়া’ উপন্যাসটি। এখানে তিনি মানভূমের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলির জীবনচর্যার ছবি এঁকেছেন। এই উপন্যাসে মধুকুপি গ্রামটি এই সমস্ত গ্রামের প্রতিনিধিরূপে উপস্থাপিত। এই গ্রামের সন্তান হল দাশু ঘরামি। সে-ই পুরাতন সংস্কৃতির চালক-বাহক। এখানে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে দাশুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাচীন সংস্কৃতিও অবলুপ্তির দিকে চলে গেছে। এই উপন্যাসে হিন্দুধর্মের প্রতি খ্রিস্টান ধর্মের আগ্রাসনের ছবিও দেখিয়ে আঞ্চলিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখানো হয়েছে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ উপন্যাসটির আঞ্চলিক পটভূমি থাকলেও এখানে সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগের যন্ত্রণা প্রাধান্য পেয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর একাধিক উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ এবং তাদের বসবাসকারী অঞ্চলগুলির আঞ্চলিক ছবি প্রকাশ পেয়েছে। তবে এই উপন্যাসগুলির আঞ্চলিক লক্ষণের চাইতেও রাজনৈতিক আবেদন বেশি বলে গণ্য হয়। তিনি অঞ্চলচিত্রের চাইতে আদিবাসীসমাজের অধিকার আদায়ে উপন্যাসগুলিতে বেশী সরব হয়েছেন। অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসে অঞ্চল চিত্রের চাইতে যাযাবর জনজাতির বিবর্তন প্রাধান্য পেয়েছে। তবে দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে অনেকটাই সফল। এই বৃহৎ উপন্যাসটিতে উত্তরবঙ্গের তিস্তা তীরবর্তী রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিবর্তনের

পাশাপাশি ঐ সমস্ত অঞ্চলের প্রকৃতির বিবরণ সহ সমস্ত কিছু আঞ্চলিক উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক মেনে পরিবেশিত হয়েছে। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহুলবনীর সেরেঞ'–এ ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক পরিকাঠামো ও বিস্তার থাকলেও রাজনীতির প্রবেশ ঘটে উপন্যাসটির আঞ্চলিকতা অনেকটাই বিঘ্নিত হয়েছে। অনিল ঘড়াই, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র প্রমুখ বিশ শতকের শেষ দশকে পৌঁছে আঞ্চলিক জীবনকথা পরিবেশনে উদ্যোগী হলেও শেষ পর্যন্ত সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস লিখে উঠতে পারেন নি।

এভাবে বিশ শতকের বিশের দশক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে আঞ্চলিকতার যে সূচনা হয়েছিল পরবর্তী আশি বছরে তাতে নানাভাবে বিবর্তন হয়েছে। তবে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মতো সবদিক থেকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস লেখা আর সম্ভব হয়নি। স্বাধীনোত্তরকালে ভারতের বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর বাংলা সমাজব্যবস্থার বিবর্তনের কারণে হয়তো সেরূপ উপন্যাস লেখা সম্ভবও ছিল না। তাই 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'জলজঙ্গল', 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'পূর্বপার্বতী', 'গঙ্গা', 'শতকিয়া'র মত সফল আঞ্চলিক উপন্যাসগুলি বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে রচিত হলেও তারপর এক 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'কে বাদ দিলে আর সেই অর্থে সফল আঞ্চলিক উপন্যাস রচিত হয়নি। এসময়ে রচিত উপন্যাসগুলিতে আঞ্চলিক পটভূমি থাকলেও এগুলি আঞ্চলিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ভিন্নতর আবেদন নিয়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে আশার কথা বিশ শতকের পর এখন একবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হলেও আঞ্চলিক উপন্যাসের উপযোগিতা শেষ হয়ে যায়নি। এখন বহু ঔপন্যাসিক নিজেদের উপন্যাসের উপাদান হিসেবে নানা নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আসছেন। ফলে বাংলা উপন্যাসে নানা দিক থেকে অভিনবত্ব আসছে। এসবের মধ্যে মূল জনসমাজের বাইরের কোন অঞ্চল এবং সেখানকার জনসমাজকে নিয়েও প্রচুর উপন্যাস রচিত হচ্ছে। ফলে বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব আসছে, নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে।

গ্রন্থপঞ্জী

(Biblography)

গ্রন্থপঞ্জী

(Biblography)

আকরগ্রন্থ :

১। গঙ্গোপাধ্যায়; নারায়ণ —– রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), সম্পাদনা আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা ১৩৮৬, চতুর্থ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪০০।

২। গঙ্গোপাধ্যায়; নারায়ণ —– রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), সম্পাদনা আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, তৃতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৩৯৭।

৩। গঙ্গোপাধ্যায়; নারায়ণ —– রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), সম্পাদনা আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৮৬, তৃতীয় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৮।

৪। গঙ্গোপাধ্যায়; নারায়ণ —– রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), সম্পাদনা আশা দেবী ও অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৮৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯০।

৫। ঘোষ; অমরেন্দ্রনাথ; —– চরকাশেম, প্রকাশক সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার, বুক ওয়ার্ল্ড লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ : ১৯৬২।

৬। ঘোষ; সুবোধ —– রচনা সমগ্র, প্রকাশক সমীরকুমার নাথ, নাথ পাবলিশিং ২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলকাতা – ৭০০০২৯, প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪০৪ জানুয়ারি ১৯৯৯।

৭। চট্টোপাধ্যায়; বঙ্কিমচন্দ্র —— বঙ্কিম রচনাবলী, অশোক বুক এজেন্সী, ৩৬বি কলেজ রো, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ২০০৩।

৮। চট্টোপাধ্যায়; শরৎ রচনা সমগ্র (সম্পুর্ণ উপন্যাস, প্রথম খণ্ড), ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ৭৭এ, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৮।

৯। চৌধুরী; রমাপদ —— বনপলাশীর পদাবলী, প্রকাশক ফণীভূষণ দে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ : জুন ১৯৬২, নবম মুদ্রণ : এপ্রিল ১৯৮৫।

১০। ঠাকুর; রবীন্দ্রনাথ —— উপন্যাস সমগ্র, ইস্ট ইন্ডিয়া পাবলিশার্স, ২৭এ, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা – ৭০০০১২, প্রথম প্রকাশ (ইস্ট ইন্ডিয়া পাবলিশার্স) : মাঘ ১৪১১, জানুয়ারি ২০০৫।

১১। দেবসরকার; প্রভাত —— ওরা কাজ করে, কলকাতা বাক্ সাহিত্য, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৩৭১

১২। দেবী; মহাশ্বেতা —— অরণ্যের অধিকার, প্রকাশক বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৮৪, চর্তুবিংশ মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১৯।

১৩। দেবী; মহাশ্বেতা —— কবি বন্দ্যোঘটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু, প্রকাশক বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম করুণা সংস্করণ : চৈত্র ১৩৮৬, দ্বিতীয় সংস্করণ : আশ্বিন ১৪১০।

১৪। দেবী; মহাশ্বেতা — চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর, প্রকাশক বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮৭, চতুর্থ মুদ্রণ : কার্তিক ১৪১৮।

১৫। দেবী; মহাশ্বেতা — ব্যাধখন্ড, প্রকাশক সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তক মেলা জানুয়ারী ১৯৯৪, মাঘ ১৪০০।

১৬। দেবী; মহাশ্বেতা — রচনা সমগ্র (অষ্টম খন্ড) দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪১০, এপ্রিল ২০০৩।

১৭। দেবী; মহাশ্বেতা — রচনা সমগ্র (পঞ্চদশ খন্ড), টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা, দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪১১, এপ্রিল ২০০৪।

১৮। বন্দ্যোপাধ্যায়; অতীন — নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে (অখন্ড সংস্করণ), প্রকাশক শ্রী বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭১, দ্বাদশ অখন্ড সংস্করণ : মে ২০১২।

১৯। বন্দ্যোপাধ্যায়; তপন — মহুলবনীর সেরেঞ, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৫, মাঘ ১৪০১।

২০। বন্দ্যোপাধ্যায়; তারাশঙ্কর —— আরোগ্য নিকেতন, প্রকাশক শ্রী সোমশুভ্র মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ : চৈত্র, ১৩৫৯, সপ্তদশ মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪১০।

২১। বন্দ্যোপাধ্যায়; তারাশঙ্কর —— কবি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৪৮, ত্রিংশ মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৭।

২২। বন্দ্যোপাধ্যায়; তারাশঙ্কর —— কালিন্দী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৪৭, চতুর্দশ মুদ্রণ : পৌষ ১৪১২।

২৩। বন্দ্যোপাধ্যায়; তারাশঙ্কর —— গণদেবতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭৩, প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৪৯, পেপার ব্যাক সংস্করণ প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৮৪, নবম মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯।

২৪। বন্দ্যোপাধ্যায়; তারাশঙ্কর —— ধাত্রীদবেতা, প্রকাশক মনীষী বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : দেবীপক্ষ ১৩৪৬, অষ্টাদশ মুদ্রণ : পৌষ ১৪০৫।

২৫। বন্দ্যোপাধ্যায়; তারাশঙ্কর —— নাগিনী কন্যার কাহিনী, প্রকাশক শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৫১, অষ্টম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৩।

২৬। বন্দ্যোপাধ্যায়; তারাশঙ্কর —— পঞ্চগ্রাম, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭৩, পেপার-ব্যাক সংস্করণ প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮৭, ষষ্ঠ মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৮।

২৭। বন্দ্যোপাধ্যায়; তারাশঙ্কর —— হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, প্রকাশক ময়ূখ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৫৪, চৌত্রিশতম মুদ্রণ : জুলাই ২০১০।

২৮। বন্দ্যোপাধ্যায়; বিভূতিভুষণ —— আরণ্যক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, ছাত্রপাঠ্য পেপার-ব্যাক সংস্করণ প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩, দ্বাবিংশ মুদ্রণ : ভাদ্র ১৪১৫।

২৯। বন্দ্যোপাধ্যায়; বিভূতিভূষণ —— ইছামতী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা ৭৩, পেপার-ব্যাক সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৮২, পঞ্চদশ মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬।

৩০। বন্দ্যোপাধ্যায়; মানিক —— পদ্মানদীর মাঝি, প্রকাশক মনীষী বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৪৩ (১৬ জুলাই ১৯৩৬), চুয়াল্লিশতম মুদ্রণ : মাঘ ১৪১৮, জানুয়ারী ২০১২।

৩১। বসু; মনোজ —— জলজঙ্গল, প্রকাশক ময়ূখ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১লা কার্তিক, ১৩৫৮, নতুন ষষ্ঠ সংস্করণ : বৈশাখ ১৪০২, নতুন মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১৫।

৩২। বসু; মনোজ —— বন কেটে বসত, প্রকাশক মনীষী বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬৮, নতুন মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ ১৪১৫।

৩৩। বসু; সমরেশ —— গঙ্গা, প্রকাশ দেবকুমার বসু, মৌসুমী প্রকাশনী, ১এ কলেজ রো, কলকাতা–৯, মৌসুমী প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৭৪, সপ্তম মুদ্রণ : আগস্ট ২০১১

৩৪। বসু; সমরেশ —— বাথান, প্রকাশক ফণীভূষণ দে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৮৫।

৩৫। ভাদুড়ী; সতীনাথ —— ঢোঁড়াই চরিত মানস, প্রকাশক ময়ূখ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৮, সপ্তম মুদ্রণ : আগস্ট ২০১০।

৩৬। মজুমদার; অমিয়ভূষণ —— গড় শ্রীখণ্ড, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৭, সংস্করণ : ১৯৮৭, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০২, মাঘ ১৪০৮, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১২, মাঘ ১৪১৬।

৩৭। মজুমদার; অমিয়ভূষণ —— রচনা সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৮, আষাঢ় ১৪১৫।

৩৮। মজুমদার; অমিয়ভূষণ —— রচনা সমগ্র (ষষ্ঠ খণ্ড), প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৮, আষাঢ় ১৪১৫।

৩৯। মল্লবর্মণ; অদ্বৈত —— তিতাস একটি নদীর নাম, প্রকাশক শ্রী অনিলকুমার ভট্ট াচার্য, পুথিঘর, ২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৩, অষ্টাদশ প্রকাশ : পৌষ ১৪১১।

৪০। মান্না; গুণময় —— মুটে, প্রকাশক সুরজিৎ ঘোষ, প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৭, ৫৭/২ ই কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯২।

৪১। মান্না; গুণময় —— শালবনী, সিগনেচার বুক শপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৮।

৪২। মিত্র; প্রেমেন্দ্র —— পাঁক, কলকাতা রিডার্স কর্ণার, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৫৩।

৪৩। মিশ্র; ভগীরথ —— চারণভূমি, প্রকাশক সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৪, মাঘ ১৪০০।

৪৪। মুখোপাধ্যায়; শৈলজানন্দ —— কয়লাকুঠির দেশ, প্রকাশক অমিতাভ সেন, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৮/১ চিন্তামনি দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৫, প্রথম নিউ এজ সংস্করণ : এপ্রিল ২০০০, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০১৪।

৪৫। মুখোপাধ্যায়; শৈলজানন্দ —— নির্বাচিত উপন্যাস (প্রথম খণ্ড), প্রকাশক সলিল সাহা, দীপায়ন, ২০ কেশব সেন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪০৯, নভেম্বর ২০০২।

৪৬। মুখোপাধ্যায়, সুব্রত —— মধুকর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৮

৪৭। মুখোপাধ্যায়; সুব্রত —— রসিক, প্রকাশক সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯১, দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০০২।

৪৮। রাজগুরু; শক্তিপদ —— তবু বিহঙ্গ, প্রকাশিকা এ দত্ত, নতুন প্রকাশক, কলকাতা - ৭০০০০৭, প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৭।

৪৯। রায়চৌধুরী; সরোজকুমার —— নতুনফসল, প্রকাশক ঝুমা রায়চৌধুরী, অঞ্জলি প্রকাশনী, ই-৪০, কালাচাঁদ পাড়া, কামডহরি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৮৪, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০২।

৫০। রায়; প্রফুল্ল —— কেয়াপাতার নৌকো, প্রকাশক : শ্রী বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম অখণ্ড প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০০৩, দশম অখণ্ড সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

৫১। রায়; প্রফুল্ল —— পূর্বপার্বতী, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭, প্রথম দে'জ সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৮৫ এপ্রিল ১৯৭৮, পঞ্চম রাজ সংস্করণ : মাঘ ১৪১৫ জানুয়ারি ২০০৯।

৫২। রায়; প্রফুল্ল —— সিন্ধু পারের পাখি, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৮৮ এপ্রিল ১৯৮১, তৃতীয় সংস্করণ : মাঘ ১৩৯৫, জানুয়ারি ১৯৮৯।

৫৩। রায়; দেবেশ —— তিস্তা পারের বৃত্তান্ত, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৯৫, জুলাই ১৯৮৮, চতুর্দশ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৮, মাঘ ১৪১৪।

৫৪। রায়; শুশীল —— অনল আয়তি, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩৭৩।

৫৫। সিরাজ; সৈয়দ মুস্তাফা —— তৃণভূমি, বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭০, দ্বিতীয় সংস্করণ : মাঘ ১৩৮৪, তৃতীয় মুদ্রণ : ১লা বৈশাখ ১৪০৩।

৫৬। সেন; অভিজিৎ —— রহু চণ্ডালের হাড়, প্রকাশক দিলীপ চক্রবর্তী, জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম জে.এন.সি সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১০, পরিমার্জিত সংস্করণ : ২ মে, অক্ষয় তৃতীয়া ২০১৪।

৫৭। সেনগুপ্ত; অচিন্তকুমার —— বেদে, প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলিকাতা - ৭০০০২০, প্রথম সিগনেট সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৫৪।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০, প্রথম প্রকাশ : ২০ মে ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংশোধিত মুদ্রণ : আগস্ট ২০০০, তৃতীয় মুদ্রণ : মে ২০০৯।

২। ইসলাম; ড. নজরুল —— বাংলা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, ভাষা ও সাহিত্য, ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ১৯৯২, দ্বিতীয় প্রকাশ : ২০০৭।

৩। গঙ্গোপাধ্যায়; নারায়ণ —— সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ডি. এম লাইব্রেরি, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৩৬৮।

৪। গঙ্গোপাধ্যায়; মানব —— উপন্যাস সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রজ্ঞা বিকাশ, ঘোষ এন্ড কোং, ১২নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৫ই নভেম্বর ২০০৫।

৫। গঙ্গোপাধ্যায়; সুনীল —— সাহিত্য এবং সাহিত্য, এন. ই. পাবলিশার্স, ১৬, মতিলাল মল্লিক লেন, কলকাতা – ৭০০০৩৫, প্রথম প্রকাশ : ২৬ জুন, ২০০৯।

৬। গিরি; সত্যবতী ও মজুমদার; সমরেশ (সম্পাদিত) —— প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, রত্নাবলী, ৫৫ডি, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪১২।

৭। গুপ্ত; ক্ষেত্র —— বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (১ম খণ্ড), গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, চতুর্থ সংস্করণ : নভেম্বর ২০০৮।

৮। গুপ্ত; ক্ষেত্র —— বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (২য় খণ্ড), গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, তৃতীয় প্রকাশ : ২০শে জানুয়ারি, ২০০৮।

৯। গুপ্ত; ক্ষেত্র —— বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ : মাঘ ১৪১৩, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

১০। গুপ্ত; ক্ষেত্র —— বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড), গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৪ শে জানুয়ারি, ২০০৮।

১১। গুপ্ত; ক্ষেত্র —— বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (৫ম খণ্ড), গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৫।

১২। গুপ্ত; ক্ষেত্র —— বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (ষষ্ঠ খণ্ড), গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : অগাস্ট ২০০৬।

১৩। গোস্বামী; অরিন্দম —— সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্য, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ; আগস্ট ২০০১।

১৪। ঘোষ; প্রসূন —— উপন্যাসের নানাস্বর, এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীন চন্দ্র দাস রোড, কলকাতা – ৭০০০৯০, প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪১১, জানুয়ারি ২০০৫।

১৫। চক্রবর্তী; সুমিতা —— উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৮।

১৬। চট্টোপাধ্যায়; কুন্তল —— সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, ৩৯এ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, চতুর্থ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ : আশ্বিন ১৪১১/ অক্টোবর ২০০৪।

১৭। চট্টোপাধ্যায়; ড. মানস —— বাংলা উপন্যাসের নিঃসঙ্গ নায়ক, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০২।

১৮। চট্টোপাধ্যায়; হীরেন —— কথা-সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১০।

১৯। চট্টোপাধ্যায়; হীরেন —— সাহিত্য প্রকরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পরিবেশক – বামা পুস্তকালয়, ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ২৫ শে বৈশাখ ১৪০২, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : পৌষ সংক্রান্তি ১৪০৬।

২০। চন্দ; বীরেন্দ্র (সম্পাদিত) —— বিষয় : বাংলা উপন্যাস (সংযোজন খণ্ড) কালের দর্পণে সমাজের প্রতিবিম্ব, উত্তরধ্বনি, পরিবেশক বইওয়ালা, ১৪৯, ক্যানাল স্ট্রিট, শ্রীভূমি, কলকাতা – ৭০০০৪৮, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৪।

২১। চৌধুরী; ভুদেব —— বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (চতুর্থ পর্যায়), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৪, মাঘ ১৪০০।

২২। চৌধুরী; শীতল (সম্পাদিত) —— বাংলা উপন্যাসের নানাকথা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৩, মাঘ ১৪১৯।

২৩। ঠাকুর; রবীন্দ্রনাথ —— সাহিত্যের পথে, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০১৭, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৪৩, চতুর্থ সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৭৫, পুনর্মুদ্রণ : কার্তিক ১৪০৯।

২৪। দত্ত; ভবোতোষ —— সাহিত্যের কথা, সাহিত্যলোক, ৩২/২ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৪০৬, জুন ১৯৯৯।

২৫। দত্ত; সরোজ —— ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্নাবলী ৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০, ১৯ মে ১৯৯৩।

২৬। দাশ; অমরেশ —— তারাশংকরের উপন্যাস, বামা পুস্তকালয়, ১১/এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৯৮।

২৭। দাশ; শিশিরকুমার (সংকলন ও সম্পাদনা), —— বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, শিশু সাহিত্য সংসদ প্র. লি. ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা – ৭০০০০৯, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১০।

২৮। দাস; অমিতাভ —— আখ্যান তত্ত্ব, ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স, ৬২/২, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১০।

২৯। দাস; জ্ঞানেন্দ্রমোহন (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত) —— বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (দ্বিতীয় ভাগ), সাহিত্য সংসদ প্রা লি, ৩২এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা – ৭০০০০৯, পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, অষ্টম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৭।

৩০। দাস; জ্ঞানেন্দ্রমোহন (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত) — বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (প্রথম ভাগ), সাহিত্য সংসদ প্রা লি, ৩২এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা – ৭০০০০৯, পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৯।

৩১। দাস; নির্মল — চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৫, মাঘ ১৪১১।

৩২। দাস; সঞ্জীব — বাস্তববাদের বহুরূপ ও শৈলজানন্দের কথাসাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ২০১১।

৩৩। দাস; সুশান্ত (সম্পাদনা) — তিতাস একটি নদীর নাম : প্রসঙ্গ ও অনুসঙ্গ, পাণ্ডুলিপি, ১এ কলেজ রো, কলকাতা – ৭০০০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৮।

৩৪। দে; আশিস্‌কুমার — উপন্যাসের শৈলী, প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৩।

৩৫। নন্দী; রতনকুমার (সম্পাদনা) — অরণ্যের অধিকার : মানুষের উত্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : গান্ধী জয়ন্তী, ২০০৫, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৯।

৩৬। পাল; রবিন — উপন্যাসের বর্নময় ভুবন, অক্ষর প্রকাশনী, ৩৬ বিডন রো, কলকাতা – ৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১১।

৩৭। বন্দ্যোপাধ্যায়; অসিতকুমার —— বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ : ১৯৯৫, পুনর্মুদ্রণ : ২০০০-২০০১।

৩৮। বন্দ্যোপাধ্যায়; অসিতকুমার —— বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ : ১৯৫৯, ৭ম সংস্করণ : ২০০৮, পুনর্মুদ্রণ : ২০১২-২০১৩।

৩৯। বন্দ্যোপাধ্যায়; অসিতকুমার —— বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ : ১৯৬২, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ (নতুন সংস্করণ) : ২০০৬-২০০৭, পুনর্মুদ্রণ : ২০১২-২০১৩।

৪০। বন্দ্যোপাধ্যায়; অসিতকুমার —— বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ : ১৯৬১, ৩য় সংস্করণ : ১৯৯৩, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৬-২০০৭।

৪১। বন্দ্যোপাধ্যায়; অসিতকুমার —— বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৩, ৩য় সংস্করণ : ১৯৯৩, পুনর্মুদ্রণ : ২০১১-২০১২।

৪২। বন্দ্যোপাধ্যায়; অসিতকুমার —— বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৫ম খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ : ১৯৮৫, ৩য় সংস্করণ : ২০০৯-২০১০।

৪৩। বন্দ্যোপাধ্যায়; অসিতকুমার —– বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৬ষ্ঠ খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ : ১৯৮৯, নতুন সংস্করণ : ২০০২, পুনর্মুদ্রণ : ২০১১–২০১২।

৪৪। বন্দ্যোপাধ্যায়; অসিতকুমার —– বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৭ম খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ : ১৯৯২, নতুন সংস্করণ : ২০১২।

৪৫। বন্দ্যোপাধ্যায়; অসিতকুমার —– বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৮ম খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ : ১৯৯৮, ৩য় সংস্করণ : ২০০৭, পুনর্মুদ্রণ : ২০১২–২০১৩।

৪৬। বন্দ্যোপাধ্যায়; অসিতকুমার —– বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৯ম খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ : ২০০২–২০০৩, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৯।

৪৭। বন্দ্যোপাধ্যায়; অসিতকুমার —– বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১০ম খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ৯ই মে ২০১১, ২৫শে বৈশাখ ১৪১৮, রবীন্দ্র সার্ধ-শতবর্ষ, দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৪২০।

৪৮। বন্দ্যোপাধ্যায়; তারাশঙ্কর —– রচনাবলী (আমার কালের কথা, দশম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮২, নবম মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮।

৪৯। বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীকুমার —– বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, , মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ২৪ শে মাঘ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, সপ্তম সংস্করণ ১৪ই এপ্রিল, ১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ ২০০৪-২০০৫।

৫০। বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীকুমার —– বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (দ্বিতীয় খণ্ড : আধুনিক যুগ), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা - ৭০০০০৭, পঞ্চম সংস্করণ : ফাল্গুন, ১৪১১।

৫১। বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীকুমার —– বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (প্রথম খণ্ড : আদি ও মধ্য যুগ), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা - ৭০০০০৭, পরিবর্ধিত সংস্করণ নব সংস্করণ : ১৯৯৯।

৫২। বন্দ্যোপাধ্যায়; সরোজ —– বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পঞ্চম সংস্করণ : নভেম্বর ২০০৩, কার্তিক ১৪১০।

৫৩। বন্দ্যোপাধ্যায়; সরোজ (সম্পাদনা) —– তারাশংকর অন্বেষা, রমা প্রকাশনী, ৭৯/৪/২ ডি, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৫, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২৮ জানুয়ারি ১৯৮৭।

৫৪। বন্দ্যোপাধ্যায়; সরোজ —– তারাশংকরের ভারতবর্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, বামা পুস্তকালয়, ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : শুভ জন্মাষ্টমী, ১৪০৮।

৫৫। বন্দ্যোপাধ্যায়; হিমবন্ত —— গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬৬/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : নববর্ষ ১৪১২।

৫৬। বসু; তাপস (সম্পাদনা) —— আরণ্যকের অনন্যতা, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৬।

৫৭। বসু; শুদ্ধস্বত্ত্ব —— বাংলা সাহিত্যের নানারূপ, বিশ্বাস বুক স্টল, ৮৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ১লা ভাদ্র ১৩৮৫, ষষ্ঠ মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১০।

৫৮। বিশ্বাস; অচিন্ত্য —— তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি, রত্নাবলী, ৫৫ডি, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ : পৌষ ১৪১২, ডিসেম্বর ২০০৫।

৫৯। বিশ্বাস; অচিন্ত্য —— প্রসঙ্গ : অদ্বৈত মল্লবর্মন ও তিতাস একটি নদীর নাম, রত্নাবলী, ৫৫ডি, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ : পৌষ ১৪১২, ডিসেম্বর ২০০৫।

৬০। বিশ্বাস; অচিন্ত্য —— সমর্থ পঞ্চম : হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, রত্নাবলী, ৫৫ডি, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৪১৫, সেপ্টেম্বর ২০০৮।

৬১। বিশ্বাস; ড. মহীতোষ —— বাংলা উপন্যাস : প্রসঙ্গ আঞ্চলিকতা, জয়দুর্গা লাইব্রেরি ও একবিংশ, ৮এ ও ৫বি কলেজ রো, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, প্রথম একবিংশ সংস্করণ : রথযাত্রা, ১৪০৯।

৬২। ভট্টাচার্য; জগদীশ —— আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় প্রকাশ : মাঘ ১৪১৩, জানুয়ারি ২০০৭।

৬৩। ভট্টাচার্য; গৌরিশঙ্কর —— বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর ব্যাক্তিরূপ, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম চিরায়ত সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৯৩।

৬৪। ভট্টাচার্য; তপোধীর —— উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬৩/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪১২।

৬৫। ভট্টাচার্য; তপোধীর, —— উপন্যাসের সময়, এবং মুশায়েরা, ৩৮/এ/১, নবীন চন্দ্র দাস রোড, কলিকাতা - ৭০০০৯০, প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪০৫, জানুয়ারি ১৯৯৯।

৬৬। ভট্টাচার্য; দেবীপদ —— উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৩, অগ্রহায়ণ ১৪১০।

৬৭। ভট্টাচার্য; বিশ্ববন্ধু —— কথাশিল্পী : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৪।

৬৮। মজুমদার; উজ্জ্বলকুমার —— উপন্যাস পাঠকের ডায়ারি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৯।

৬৯। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার — তারাশংকর : দেশ কাল ও সাহিত্য, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ; চৈত্র ১৩৮৪, প্রথম (পুস্তক বিপনি) সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৮।

৭০। মজুমদার; উজ্জ্বলকুমার (সম্পাদিত) — পঞ্চাশের দশকের কথাকার, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৯৮।

৭১। মজুমদার; উজ্জ্বলকুমার — সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৩, মাঘ : ১৪০৯।

৭২। মজুমদার; সমরেশ — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি, রত্নাবলী, ১১ ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : আশ্বিন ১৪০১ মহালয়া, অক্টোবর ১৯৯৪, তৃতীয় মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪০৪, ডিসেম্বর ১৯৯৭।

৭৩। মণ্ডল; ড. স্বস্তি — সত্যসন্ধানী সতীনাথ ভাদুড়ী জাগরী ও ঢোঁড়াই চরিতমানস, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১লা জানুয়ারি ১৯৮৫, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০১, মাঘ ১৪০৭।

৭৪। মান্না; গুণময় — শিল্পিত বাংলা উপন্যাস, বামা পুস্তকালয়, ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০২।

৭৫। মুখোপাধ্যায়; অরুণকুমার — কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পঞ্চম সংস্করণ : বৈশাখ ১৪১৭, এপ্রিল ২০১০।

৭৬। মুখোপাধ্যায়; অরুণকুমার —— মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৪।

৭৭। মুখোপাধ্যায়; অরুণকুমার —— বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল ষাট বছরের বাংলা উপন্যাস (১৯৪৯-২০০৯), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১১, মাঘ ১৪১৭।

৭৮। মুখোপাধ্যায়; তরুণ (সম্পাদিত) —— আরণ্যাক নানা চোখে, বামা পুস্তকালয়, ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮৮।

৭৯। মুখোপাধ্যায়; বিমলকুমার —— নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী, বামা পুস্তকালয়, ১১/এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০০৩৭, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪০৫।

৮০। মোশেল; বাসুদেব (সম্পাদিত) —— বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য, বুকস্ওয়ে, ৮৬এ, কলেজ স্ট্রিট (ওয়াই, এম.সি.এ বিল্ডিং) কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ২০০৮।

৮১। রায়; অলোক —— উনিশ শতক, প্রমা প্রকাশনী, ৫৭/২ই কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রমা সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০২।

৮২। রায়; অলোক —— তারাশংকর : দেশকাল, নিউলাইট, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৫ জুলাই ১৯৯৮, ৩০ আষাঢ় ১৪০৫।

৮৩। রায়; অলোক —— বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০০, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০০৯।

৮৪। রায়; অলোক (সম্পাদিত) —— সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা – ৭০০০০৬, তৃতীয় সংস্করণ : আগস্ট ২০০২।

৮৫। রায়; গৌরমোহন —— তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা, সাহিত্যশ্রী, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড (দ্বিতল) কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৪, অগ্রহায়ণ ১৪০১।

৮৬। রায়চৌধুরী; গোপিকানাথ —— দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, তৃতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৪১৭, আগস্ট ২০১০।

৮৭। রায়চৌধুরী; গোপিকানাথ —— রবীন্দ্রনাথ বাংলা কথাসাহিত্য : নানা দর্পণে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৪০৩, মে ১৯৯৬।

৮৮। রায়; ড. নীহাররঞ্জন —— বাঙালীর ইতিহাস, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ৮/১ চিন্তামনি দাস লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, তৃতীয় মুদ্রণ : ১৩৫৬।

৮৯। রায়; দেবেশ —— উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০০৩।

৯০। রায়; দেবেশ —— তারাশঙ্কর : নিরন্তর দেশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০০৩, মাঘ ১৪০৯।

৯১। রায়; সত্যেন্দ্রাথ —— বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট ২০০৯, শ্রাবণ ১৪১৬।

৯২। সামন্ত; অরবিন্দ —— সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা ইতিহাসের সাহিত্য, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০২।

৯৩। সামন্ত; ড. প্রভাস চন্দ্র —— নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস, প্রভা প্রকাশনী, স্টল নং - ৪৩, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা - ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ : ৯ই ডিসেম্বর, ২০০৪।

৯৪। সিকদার; অশুকুমার —— আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা - ৭০০০০৬, চতুর্থ সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৪১৫, নভেম্বর ২০০৮।

৯৫। সেন; অঞ্জন ও সিংহ; উদয় নারায়ণ (সম্পাদিত) —— উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : স্বাধীনতা দিবস, ১৫ই আগস্ট ২০১০।

৯৬। সেন, কানাই —— মানিক উপন্যাস : জীবনের জটিলতা, পুঁথি প্রকাশনা, পি ৪০ ব্লক 'বি' বাঙুর অ্যাভেন্যু, কলকাতা - ৭০০০৫৫, প্রথম প্রকাশ : ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫।

৯৭। সেনগুপ্ত; অচিন্ত্যকুমার —— কল্লোলযুগ, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩, দশম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪১৬।

৯৮। সেন; সুকুমার —— বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম আনন্দ সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯১, নবম মুদ্রণ : অক্টোবর ২০০৯।

৯৯। সেন; সুকুমার —— বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম আনন্দ সংস্করণ : ১ বৈশাখ ১৩৯৮, নবম মুদ্রণ : জৈষ্ঠ্য ১৪১৭।

১০০। সেন; সুকুমার —— বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম আনন্দ সংস্করণ : ১ বৈশাখ ১৪০১, সপ্তম মুদ্রণ : কার্তিক ১৪১৬।

১০১। সেন; সুকুমার —— বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম আনন্দ সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৬, ষষ্ঠ মুদ্রণ জুন ২০১০।

১০২। সেন; সুকুমার —— বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম আনন্দ সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৯, পঞ্চম মুদ্রণ : জুন ২০০৯।

১০৩। হাসান; ড. বদরুল —– উনিশ শতক ঃ নবজাগরণ ও বাংলা উপন্যাস, জগৎমাতা পাবলিশার্স, ১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২, ২০০৯।

ইংরেজী গ্রন্থ :

1. Abrams; M. H. & Harpham; Geoffrey Galt. *A Glossary of Literary Terms, 9th ed.* Boston: Wodsworth Cengage Learning, 2009. Print.

2. Allen; W. *The English Novel: A Short Critical History.* Hermondsworth: Penguin Books, 1991. Print.

3. Baldick, C. *The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, 2nd Ed.* Oxford: Oxford University Press, 2001. Print.

4. Basu, B. *An Acre of Green Grass*. Calcutta: Papyrus, 1948. Print.

5. Bentley, P.E. *The English Regional Novel*. London: G. Allen & Unwin Ltd., 1941. Print.

6. Booth, W. *The Rhetoric of Fiction*. Chicago: Chicago University Press, 1961. Print.

7. Cuddon; J. A. and C.E. Preston. *The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*. London: Penguin Books, 1999. Print.

8. Drabble, M. (ed). *The Oxford Companion to English Literature, Sixth Ed.* Oxford: Oxford University Press, 2000. Print.

9. Foote, S. *Regional Fictions*. Madison: University of Wisconsin Press, 2001. Print.

10. Forster, E. M. *Aspects of the Novels*. New York: Harcourt, Brace & Company, 1927. Print.

11. Gray, M. *A Dictionary of Literary Terms*. Beirut: York Press, 1984. Print.

12. Lemon, L. T. *A Glossary for the Study of English*. Delhi: Oxford University Press, 1980. Print.

13. Logan, P., George, O., Hegeman, S. and Kristal, E. *The Encyclopaedia of the Novel*.Chichester, UK: Willey-Blackwell, 2011. Print.

14. Loodge, D. *The Art of Fiction*. New York: Penguin Books, 1992. Print.

15. Lubbock, P. *The Crafts of Fiction*. New York: Create Space Independent Publishing, 2011. Print.

16. Lukacs, G. *The Theory of the Novel*. New York: MIT Press, 1974. Print.

17. Rabbetts, J. *From Hardy to Faulkner: Wessex to Yoknapatawpha*. New York: St. Martin's Press, 1989. Print.

18. Snell, K.D.M (ed): *The Regional Novel in Britain and Ireland, 1800-1990*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Print.

19. Muir, E. *The Structure of the Novels*. London: L. & V. Woolf, 1928. Print.

20. Watt, I. *The Rise of the Novel*. Berkeley: University of California Press, 1957. Print.

পত্রপত্রিকা :

১। অনুষ্টুপ, সম্পাদক – অনিল আচার্য, পি ৫৫, বি. সি. আই. টি. রোড, কলকাতা – ৭০০০১০, পঞ্চত্রিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ২০০১।

২। অন্তঃসার, সম্পাদক – রত্নাংশু বর্গী, সাউথ গড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা – ৭০০০১৩, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৭।

৩। আকাদেমি পত্রিকা, সম্পাদক – বিজিতকুমার দত্ত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০, ত্রয়োদশ সংখ্যা, আষাঢ় ১৪০৮।

৪। উত্তরধ্বনি, সম্পাদক – বীরেন্দ্র চন্দ, উত্তরধ্বনি প্রকাশনী, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, বাংলাদেশ সংখ্যা, শারদ সংখ্যা ১৪০৬।

৫। উত্তরধ্বনি, সম্পাদক – বীরেন্দ্র চন্দ, উত্তরধ্বনি প্রকাশনী, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, শারদ সংখ্যা ২০১২।

৬। এবং এই সময়, সম্পাদক – অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্থক প্রকাশনী, ৪০ মহারাণী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা – ৭০০০৬০, চতুর্বিংশ বর্ষ, ৭৯ তম শরৎ সংখ্যা ১৪১৪।

৭। কঙ্ক, সম্পাদনা – সুভাষচন্দ্র ঘোষ, স্বপন পাণ্ডা, দেবাশিষ রায়, উৎপল সাহা, এসি ১৫৩ সি, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা – ৭০০০৫৯, দেবেশ রায় সম্মাননা সংখ্যা, চতুর্দশ সংখ্যা, আগস্ট ২০১২।

৮। দিবা রাত্রির কাব্য, সম্পাদক – আফিফ ফুয়াদ, ২৯/৩ শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা – ৭০০০১২, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, সপ্তদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০০৯।

৯। দিবা রাত্রির কাব্য, সম্পাদক – আফিফ ফুয়াদ, ২৯/৩ শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা – ৭০০০১২, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, সপ্তদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০০৯।

১০। দিবা রাত্রির কাব্য, সম্পাদক – আফিফ ফুয়াদ, ২৯/৩ শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা – ৭০০০১২, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, দ্বাবিংশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০১৪।

১১। দিবা রাত্রির কাব্য, সম্পাদক – আফিফ ফুয়াদ, ২৯/৩ শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা – ৭০০০১২, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, দ্বাবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা অক্টোবর–ডিসেম্বর ২০১৪।

১২। বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, সম্পাদনা – শেখর সমাদ্দার, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলকাতা – ৭০০০০৬, চতুর্দশ–পঞ্চদশ যুগ্ম সংখ্যা, মার্চ ২০০৬।

১৩। বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, যুগ্ম সম্পাদক – মানস মজুমদার ও বিমল মুখোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা – ৭০০০৭৩, চতুর্দশ সংখ্যা ২০০৫।

ISBN গ্রন্থে
প্রকাশিত প্রবন্ধ



অনুসন্ধান
আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি

সম্পাদনা
গৌতম সরকার
রমাতোষ সরকার
নির্মল দাস

ANUSANDHAN
ADIBASI JIBAN O SANSKRITY

(A Collection of Essays in Bengali & English)

Edited by **Goutam Sarkar, Ramatosh Sarkar & Nirmal Das**

Published by Ashutosh Barman

SANGBEDAN

B.S. Road, Malda - 732101

Price - 200.00

©Author

ISBN-978-81-92804989

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল ২০১৫

প্রকাশক

আশুতোষ বর্মণ

সংবেদন

বি.এস. রোড, মালদা - ৭৩২১০১

চলমান : ৯৪৭৪৩ ২৬৩২৩

গ্রন্থস্বত্ব

সম্পাদক ত্রয়

প্রচ্ছদ

সংবেদন

অক্ষর বিন্যাস

সুমন্ত রায়

মুদ্রণ

গ্রাফিক্স রিপ্রোডাকশন

৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন

কলকাতা - ৭০০ ০০৯

বিনিময়

২০০ টাকা

প্র ব ন্ধ ক্র ম

বাংলা বিভাগ

বঙ্গীয় জনজাতির স্বর্ণযুগ —ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল ১৩
শিকড়ের সন্ধান-পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা : সাঁওতাল জনজাতি—বিপ্লবকুমার বর্মণ ১৯
শোষিত সাঁওতাল জনগোষ্ঠী ঃ প্রসঙ্গ অভিজিৎ সেনের 'রহুচণ্ডালের হাড়'—রমাতোষ সরকার ২৩
দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান ঃ আদিবাসী জনজীবন ও সংস্কৃতির অনবদ্য দলিল — কিঙ্কর মণ্ডল ৩০
লোকায়ত জীবনের অসম্পূর্ণ-পাঠ — গৌতম সরকার ৩৮
রাভা জনজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় — অখিল ঘোষ ৪০
সময়ের পথরেখায় রাজবংশী সম্প্রদায় ও চোরচুন্নী পালা — মনুয়া পাঁজা ৪৬
ওরাওঁ সংস্কৃতির ভাবসংযোগ রীতি — সম্পদ মণ্ডল ৫০
মহাশ্বেতাদেবীর ছোটগল্পে প্রতিফলিত সাঁওতাল জনজাতির সংস্কৃতি — গোপেশ রায় ৫৬
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সাঁওতাল সংস্কৃতি ঃ জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু — আজাদ মণ্ডল ৭০
উত্তর-পূর্ব ভারতের লুপ্তপ্রায় জনজাতি অসুর জনজাতি ঃ একটি সমীক্ষা — অভিজিৎ বর্মণ ৮১
মেচ/বোড়ো সম্প্রদায়ের বিবাহপ্রথা — জ্যোতিকণা বর্মণ ৮৮
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি — সমিত ঘোষ ৯৩
ছৌ সংস্কৃতির পণ্যায়ণ প্রসঙ্গ ঃ মাটি থেকে মানিক্যের অন্বেষা — প্রদীপ ত্রিসপ্ত ৯৮
উত্তরবঙ্গের বোড়ো জনজাতির জীবনশৈলী — মিতা রায় ১০৪
ওরাওঁ জনসমাজের পূজা-পার্বণ — বিপ্লব বর্মণ ১০৯
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতে সাঁওতাল জীবন — তাপস অধিকারী ১১৫
বুদ্ধদেব গুহর 'গামহারডুংরী' উপন্যাসে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ — নির্মল দাস ১২৬

ইংরাজি বিভাগ

Meena and Some Tribal Issues # Shubhendu Shekhar Naskar 133

Tribal Women's Contribution to the Theoretical Fields of Ecofeminism: Remembering Chipko Movement # Tanima Dutta 140

Tribal Quest for Social Identity : Emergence and Growth of the Satyam Shibam Sundram Movement Among the Santals of Malda 1905-30 # Ashim Kumar Sarkar 145

"Darkness, existential crisis and a quest for identity alongwith human rights of the Tribal Community". # Koushik Goswami 163

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী উপন্যাসে আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতে সাঁওতাল জীবন

তাপস অধিকারী

তারাশঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাসটি সম্পর্কে 'সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমার দাস লিখেছেন—'দুই বিবদমান জমিদার বাড়ির কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। নদীর বুকে একটি চরকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের অবসান ঘটল। সামন্ততান্ত্রিক জীবনের কতকগুলি উপাদানের প্রতি তারাশঙ্করের মমতা এবং জমিদার ও শিল্পপতির দ্বন্দ্বে জমিদারের পরাজয়ের বেদনাবোধ উপন্যাসে স্পষ্ট। তবে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে তারাশঙ্কর সচেতন।'[১] তারাশঙ্করের বেশিরভাগ উপন্যাসের মতো 'কালিন্দী' উপন্যাসটির পটভূমিও পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল। রাঢ়বঙ্গের যে অঞ্চলটি এই উপন্যাসে গ্রহণ করা হয়েছে তার নাম হায়হাট। রায়হাট অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে ব্রাহ্মণী নদী, যার স্থানীয় নাম কালিন্দী। তবে এখানকার লোকেরা কালিন্দীকে 'কালী নদী' নামে ডাকে। এই কালী নদীর বুকে সদ্য জেগে ওঠা একটি চরকে কেন্দ্র করে সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ছবি তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে এঁকেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি এখানে প্রাচীনকাল ধরে চলে আসা জমিদার নিয়ন্ত্রিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি রূপকে যেমন উপন্যাসটিতে তুলে এনেছেন, সেইসঙ্গে ঐ ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক পুঁজি নির্ভর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধকেও এখানে দেখিয়েছেন। পাশাপাশি উপন্যাসের শেষে নায়ক অহীন্দ্রের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে দরিদ্র সাধারণ মানুষের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-এর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু রাজনৈতিক কার্যাবলীর মাধ্যমে সমকালীন ইংরেজ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ছবিও এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং উপন্যাসটির অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। তবে যে যাই বলুক, এটা ঠিক যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কালিন্দীর বুকে জেগে ওঠা চরটির প্রেক্ষিতে তাকে কেন্দ্র করে সেখানকার মানুষজনের বিশেষত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবনচর্চার বাস্তবসম্মত বিবরণ তুলে ধরে এই উপন্যাসে একটা আঞ্চলিকতার বাতাবরণ তৈরি করেছেন।

'কালিন্দী' উপন্যাসটির কাহিনি গড়ে উঠেছে কালিন্দী অর্থাৎ কালী নদীর উপর সদ্য জেগে ওঠা একটি চরকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসে কালিন্দী অর্থাৎ কালী নদী যে জায়গাটির উপর দিয়ে বয়ে গেছে তার দু'পাশে রয়েছে দু'টি গ্রাম—রায়হাট ও চক আফজলপুর।

উপন্যাসটিতে মূলত রায়হাট এবং সদ্য জেগে ওঠা চরটিতে এসে বসতি স্থাপন করা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষজনের জীবনচিত্রের কথাই পরিবেশিত হয়েছে। রায়-বংশ এবং চক্রবর্তী বংশ—এই দু'টি বংশ হল ঐ অঞ্চলের জমিদার। এর মধ্যে রায়-বংশ বহু প্রাচীনকাল থেকেই সেই অঞ্চলের জমিদার উপন্যাসে তাদের ১০৫ জন শরিকের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে একটি শরিকের কর্তা হলেন ইন্দ্র রায়, যিনি ঐ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা ধুরন্ধর ও কূটকৌশলী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। ইন্দ্র রায়ের বংশানুক্রমিক প্রতিপক্ষ হল চক্রবর্তী-বংশ। এই চক্রবর্তী-বংশের কর্তা হলেন রামেশ্বর চক্রবর্তী ইনি এককালে ইন্দ্র রায়ের সমকক্ষ হলেও পুরো উপন্যাসে একজন বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ হিসেবে উপস্থাপিত। ইন্দ্র রায় এবং রামেশ্বর চক্রবর্তীর মধ্যে শ্যালক-ভগ্নিপতির সম্পর্ক হলেও রামেশ্বরের বাড়ি থেকে ইন্দ্রের বোনের অন্তর্ধানের পর থেকে সেই সম্পর্কে চিড় ধরে। রামেশ্বর বিকৃত মস্তিষ্ক হওয়ায় এই উপন্যাসে নায়েব যোগেশ মজুমদারের সাহায্যে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুনীতিকে দুই নাবালক পুত্র মহীন্দ্র ও অহীন্দ্রকে নিয়ে চক্রবর্তী পক্ষের জমিদারী সামলাতে দেখা যায়। এর মধ্যে ছোট ছেলেটি অর্থাৎ অহীন্দ্র অত্যন্ত মেধাবী। উপন্যাসে উল্লিখিত চরটি চক আফজলপুরের যে অংশে চক্রবর্তীদের জমিদারি ছিল সেদিকেই জেগে ওঠায় তাতে চক্রবর্তীদের বেশি দাবি গড়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও ইন্দ্র রায় চরটির প্রতি নিজের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য ননী পাল নামে এক ব্যক্তিকে চরের কিছুটা অংশ আইনত দান করেন। জমি পেয়ে ননী পাল চক্রবর্তীদের অপমান করতে গিয়ে ইন্দ্র রায়ের বোন অর্থাৎ মহীন্দ্রের বিমাতা রাধারানি সম্পর্কে কুকথা বলে, যা শুনে বিমাতার সম্মান বাঁচাতে রামেশ্বরের বড় ছেলে মহীন্দ্র তাকে খুন করে এবং বিচারে তার দ্বীপান্তর হয়। এ ঘটনার পর থেকে ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে চক্রবর্তীদের সম্পর্ক অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এতসব ঘটনার মাঝেই কালী নদীর বুকে সদ্য জেগে ওঠা চরটিতে সাঁওতাল প্রজাদের আগমন ঘটে। এদের মোড়ল হল কমল মাঝি। সাঁওতালরা সেখানে এসে চরের জঙ্গল কেটে কিছু চাষোপযোগী জমি তৈরি করে সেখানে নানা ধরনের ফসল, শাক, সবজি চাষাবাদ করে, চরের উপর নিজেদের বসত বাড়ি বানায়। একদিন অহীন্দ্র চর দেখতে গেলে এই সাঁওতালরা তাঁকে তাদের 'রাঙাঠাকুর' মনে করে সম্মান দেয় এব সেই চর বিলিব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করে। সাঁওতালদের এই রাঙাঠাকুর অর্থাৎ সোমেশ্বর চক্রবর্তী হলেন আসলে অহীন্দ্রের ঠাকুরদা, যিনি একসময় ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের সাঁওতালদের হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। যাইহোক অহীন্দ্র নিজেদের জন্য চরের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট অংশটি রেখে বাঁকিটা সাঁওতালদের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করে দেয়, অবশ্য এই বিলি ব্যবস্থায় রংলাল, নবীনের মতো তাদের জমিদারিতে বসবাসকারী মানুষগুলিও কিছু জমি পায়। এরপর সাঁওতালরা কালিন্দী তথা কালী নদীর বুকে জেগে ওঠা ঐ চরটির নতুন নামকরণ

করে 'রাঙাঠাকুরের চর'।

এদিকে তাঁরই বোনের সম্মান রক্ষার্থে রামেশ্বরের ছেলে মহীন্দ্র মানুষ খুন করে সাজা পেয়ে দ্বীপান্তরে গেলে ইন্দ্র রায় হয়ত অনুশোচনায় পড়ে চক্রবর্তীদের প্রতি সমস্ত বৈরিতা ছেড়ে সদ্য জেগে ওঠা 'রাঙাঠাকুরের চর-টির উপর নিজের দাবি ত্যাগ করেন এবং রামেশ্বরের পরিবার যাতে চরটি ভোগ করতে পারে সেজন্য সচেষ্ট হন। এর পেছনে ইন্দ্র রায়ের স্ত্রী হেমাঙ্গিনীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাদের এই সচেষ্টতা মহীন্দ্রের বিচারের সময় থেকেই শুরু হয়। ফলে দীর্ঘদিন পর দু'টি পরিবার কাছাকাছি আসে। এদিকে মহীন্দ্রের মামলার খরচ জোগাতে গিয়ে চক্রবর্তীদের নায়েব যোগেশ মজুমদার কারণে-অকারণে প্রচুর ঋণ করেন, যা পরিশোধ করতে গিয়ে রামেশ্বরের সম্পত্তির সিংহভাগ বিক্রি করতে হয়। এই সম্পত্তি নায়েব যোগেশ মজুমদার বেনামে কিনে ফেলে। ঋণশোধ করার তাগিদে আর্থিক টান পড়ায় কালী নদীর উপর জেগে ওঠা 'রাঙাঠাকুরের চর'টির উপর চক্রবর্তীদের হাত দিতে হয়। অহীন্দ্র বিমল মুখার্জি নামক কলকাতার এক ধনি ব্যবসায়িকে চরটির কিছু অংশ বিলি ব্যবস্থা করে দেয়। বিমলবাবু সেখানে চিনি কারখানা গড়ার তোড়জোড় শুরু করেন। ফলে এই চরটিকে কেন্দ্র করে নানা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হয়। বিমলবাবু ছলে-বলে-কৌশলে সাঁওতালদের বিলি ব্যবস্থা করা জমিগুলিরও দখল নেয়। এতে সাঁওতালরা কৃষিজীবী থেকে কারখানার শ্রমিকে পরিণত হতে থাকেন এবং একসময় সেই চর ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এদিকে সেই চরের স্বত্বকে কেন্দ্র করে জমিদারের সঙ্গে শিল্পপতির আইনি লড়াই শুরু হয়। একদিকে ছিলেন চক্রবর্তীদের পক্ষে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিভূ জমিদার ইন্দ্ররায়, আর অপরক্ষে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি পুঁজিপতি বিমলবাবু। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই মামলার রায়ে শেষ পর্যন্ত ইন্দ্র রায়ের পরাজয় ঘটে। বিমলবাবু জোরকদমে চিনি কারখানার কাজ শুরু করে দেয়। ফলে সে অঞ্চলে রাস্তাঘাট, যানবাহন থেকে শুরু করে আধুনিক সভ্যতার অনেক উপকরণের প্রবেশ ঘটতে শুরু করে। সেই সঙ্গে ঢোকে আধুনিক সভ্যতার ব্যাভিচারগুলিও। এদিকে মামলায় হেরে ইন্দ্র রায় সবকিছু ছেড়ে তার জমিদারি সত্তা ত্যাগ করে কাশীবাসী হবার মনস্থ করে। ইন্দ্র রায়ের রায়হাট ত্যাগ করার বাসনা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অঞ্চলটি থেকে সামন্ত্রতন্ত্র একরকম অবসানের পথে এগিয়ে যায়।

এই উপন্যাসের আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে একদিকে সামন্ত্রতন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিরোধের প্রসঙ্গ থাকলেও অন্যদিকে অহীন্দ্রের কার্যকলাপের মধ্যে সে সময়কার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গও আছে। মহীন্দ্রের দ্বীপান্তর হওয়ার পর ইন্দ্র রায় চক্রবর্তীদের কাছাকাছি আসলে তাদের এই ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তায় পর্যবশিত হয়—ইন্দ্র রায় রামেশ্বরের ছোট মেধাবী তথা উজ্জ্বল ছেলে হিসেবে পরিগণিত হলেও বিয়ের কিছুদিন

আগে থেকেই অহীন্দ্রের মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। হয়ত সেই অঞ্চল ছেড়ে বাইরে গিয়ে পড়াশুনা করার কারণেই জগতের বিচিত্র সব পরিবর্তন তার চোখে ধরা দিতে থাকে। পাশাপাশি তাদের সেই অঞ্চলে বিমলাবাবুর কার্যকলাপ, সাঁওতালদের জীবনধারার বিপর্যয় থেকে শুরু করে গরিব অসহায় মানুষগুলির দুরবস্থা তাকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবাতে শুরু করে। এজন্য সে এক নতুন জীবন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়। তাই ইন্দ্র রায়ের মেয়ে উমা বিয়ের আগে পর্যন্ত অহীন্দ্রকে যেভাবে পেতে চেয়েছিল, বিয়ের পর আর তাকে সেভাবে পায় না। অহীন্দ্র সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সহিংস কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এবং দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করে। উপন্যাসের শেষে সে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরাও পড়ে। অহীন্দ্রের এই গ্রেপ্তারির সংবাদ শোনার পর তার বাবা রামেশ্বর চক্রবর্তীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঠিক হয়ে যায়। তার মুখ থেকেই জানা যায় যে, তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী অর্থাৎ ইন্দ্র রায়ের বোন রাধারানিকে আর তার সন্তানকে সে গলা টিপে মেরে বাড়ির কুয়োর মধ্যে পুঁতে দিয়েছিল। তার বিশ্বাস এতে রাধারানির অভিশাপে যে পাপ তার লেগেছিল, দুইপুত্র—মহীন্দ্র ও অহীন্দ্রের কারাবরণে সেটা কেটে গেছে। উপন্যাসের শেষে কালিন্দীর রূপেও পরিবর্তন ঘটেছে। কালিন্দীর বুকে আগে যেখানে আকাশ, নদীতীরের গাছ-গাছালির ও পাখিদের ছবি ভাসত; আর আজ সেখানে ঐগুলির সঙ্গে উদয় সূর্যের আলোয় আলোকিত কলের চিমনী এবং চিমনীতে ওঠা ধোঁয়ার রাশির ছবি ভাসে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসটির আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটি সম্পর্কে খানিকটা বিরূপ মন্তব্য করতে বলেছেন—'পরবর্তী উপন্যাস 'কালিন্দী' (১৯৪০) অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের'[২] অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উপন্যাসটির হয়তো কিছু দোষ-ত্রুটি আছে, তবে উপন্যাসটিকে একেবারে 'নিম্নস্তরের' বলাটা মনে হয় একটু বাড়াবাড়ি। যাইহোক 'কালিন্দী' উপন্যাসটির বেশ কিছু গুণ আছে, যেগুলি পাঠককে মুগ্ধ করবে। এই গুণগুলির মধ্যে অন্যতম হল উপন্যাসটিতে সাঁওতালদের জীবনচর্চার প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক পটভূমির ব্যবহার। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসের মত 'কালিন্দী' উপন্যাসটিও রাঢ়বঙ্গের একটি বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে রচনা করেছেন। রাঢ়বঙ্গের ব্রাহ্মণী নদীর দুই তীরে রায়হাট এবং চক আফজলপুর নামক দু'টি গ্রামের কথা এই উপন্যাসে আছে। অবশ্য এখানে রায়হাটের জীবনকথাই বর্ণিত হয়েছে। এখানে ব্রাহ্মণী নদী কালিন্দী নামে পরিচিত। তবে স্থানীয় মানুষজন কালিন্দীকে কালী নদী বলেই ডাকে। এই কালী নদীর চক আফজলপুর সীমান্তে একটি চর জেগে ওঠে। উপন্যাসে চরটির বর্ণনায় বলা হয়েছে—'গ্রামের কোলেই কালিন্দী নদীর অগভীর জলস্রোত পার হইয়া খানিকটা বালি ও পলিমাটিতে

মিশানো তৃণহীন স্থান, তারপরেই আরম্ভ হইয়াছে চর। সমগ্র চরটা বেনাঘাস আর কাশের ঘন জঙ্গলে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহারই মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে—অসংখ্য কীট-পতঙ্গ আর সাক্ষাৎ মৃত্যুদণ্ডের মতো ভয়ঙ্কর নানা ধরনের বিষধর সাপ।[৩] উপন্যাসে বর্ণিত চরটির ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি এবং তাকে কেন্দ্র করে মানুষজনের বিশেষ করে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষজনের নানা ক্রিয়াকলাপের বিবরণ আছে। এই চরটি রায়হাটের জমিদারদের মধ্যে একপক্ষ চক্রবর্তীদের সীমানায় ওঠে। চরটির প্রতি রংলাল পাল, নবীন বাগ্‌দীর মতো চক্রবর্তীদের পুরাতন প্রজারা লোভ ও দাবি করে। আবার জেগে ওঠা চরটির খবর পেয়ে সাঁওতালরা সেখানে এসে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষবাসের উপযোগী করে তোলে। চক্রবর্তীদের পক্ষে রামেশ্বর চক্রবর্তীর ছোট ছেলে অহীন্দ্র নিজেদের চাষাবাদের জন্য কিছু অংশ রেখে বাকিটা সাঁওতালদের ও নিজের প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দেয়। সাঁওতাল প্রজারা অহীন্দ্রের পিতামহ সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সোমেশ্বর চক্রবর্তীর নামে এই চরটির নাম দেয় 'রাঙাঠাকুরের চর'। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেউই জমির উপর নিজেদের সত্তা ধরে রাখতে পারে না—কলকাতার ব্যবসায়ী বিমল মুখার্জি সেখানে চিনির কল বসায়। 'কালিন্দী' উপন্যাসটির অল্প কিছু ঘটনা কলকাতা এবং অন্যত্র ঘটলেও বেশিরভাগ ঘটনা এই 'রাঙাঠাকুরের চর', রায়হাট গ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ঘটেছে। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রকৃতি ও মানুষজন বিশেষ করে সাঁওতালদের জীবনচর্যার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

'কালিন্দী' উপন্যাসটিতে দুই জমিদার বংশ—রায়-বংশের ইন্দ্র রায়, হেমাঙ্গিনী, অমল, উমা ও অন্যান্য শরিকের কিছু লোকজন এবং চক্রবর্তী-বংশের রামেশ্বর, সুনীতি, মহীন্দ্র, অহীন্দ্র প্রমুখদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই দুই বংশের মানুষজন অচিন্ত্যবাবু, দোকানদার শ্রীবাস পাল ও তার ছেলে গণেশ প্রমুখদের মতো সুবিধাবাদী ভদ্রশ্রেণির মানুষ, তেমনি আছে রংলাল ননী পালের মতো চাষিরা। এদের পাশাপাশি আছে দুই উপজাতি সম্প্রদায় বাগ্‌দী ও সাঁওতালরা। ঔপন্যাসিক বাগ্‌দীদের জীবন কথা দু-একটি আঁচড়ে শেষ করেছেন। এরা লেঠেল, জমিদারের হয়ে লাঠিয়াল বৃত্তি এদের জীবিকা। তাই জমিদারের প্রয়োজন হলে এরা যখন তখন লাঠি হাতে বেড়িয়ে আসে। এই উপন্যাসে সাঁওতালদের জীবনকথাই মূখ্য। তারাশঙ্করের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে 'কালিন্দী'র বিষয়ে বলতে গিয়ে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাঁওতালদের সম্পর্কে বলেছেন—'বীরভূমের গ্রামীণ অর্থনীতি বাংলার আর পাঁচটা জেলার মতো কৃষি নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও বীরভূমের সাধারণ ভাগচাষিকে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় সাঁওতালদের সঙ্গে—যেটাও এ অঞ্চলেরই নিজস্ব ব্যাপার। অল্প মজুরিতে কঠিন শ্রমের সাহায্যে এরা বীরভূমের কাঁকুরে বিমুখতাকে ব্যর্থ করে দেয়। একদিকে ধ্বংসমুখী সামন্ততন্ত্র এবং অপরদিকে সাঁওতাল কৃষকদের ঘর

তুলতে গিয়ে যাযাবরত্ব ত্যাগের বাসনায় ইতিহাসের একটা পর্যায় স্পষ্ট (কালিন্দী)"[৪] এই উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চলের সাঁওতালদের জীবন ও জীবীকার অনেকটাই বিস্তারিত ছবি আছে। উপন্যাসে বিমলবাবু এবং অচিন্ত্যবাবু বাইরের লোক। বাকিরা প্রায় সবাই ঐ অঞ্চলের লোকজন। এই উপন্যাসে দুই জমিদার বংশের উচ্চবর্ণের মানুষগুলিসহ অন্যান্য সুবিধাভোগী লোকজন এবং বাগ্‌দী ও সাঁওতালরা সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এদের মধ্যে সাঁওতালদের জীবন চিত্রণই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

এই উপন্যাসটিতে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, ভদ্র-অভদ্র নানা ধরনের চরিত্রের পরিচয় থাকলেও একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় 'কালিন্দী'র প্রধান চরিত্র কালী নদীর উপর সদ্য জেগে ওঠা চরটি, সাঁওতালরা যার নাম দেয় 'রাঙাবাবুর চর', যা শুনে অহীন্দ্র নাম দেয় 'রাঙাঠাকুরের চর'। সমালোচকেরা ইন্দ্র রায় এবং অহীন্দ্রের মধ্যে কাকে নায়কের মর্যাদা দেওয়া যায়, তা নিয়ে চুলচেড়া বিশ্লেষণ করলেও সকলের অজান্তে কখন এই চরটি নায়কত্বের দাবি নিয়ে হাজির হয় তা বোঝা যায় না। অধ্যাপক-সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসে চরটির গুরুত্ব বোঝাতে চেয়ে লিখেছেন—'বস্তুত এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দুইটি—এক, মানুষ রামেশ্বর ও দ্বিতীয় জড়প্রকৃতি কালিন্দীর চর।'[৫] 'কালিন্দী' উপন্যাসটি শুরুই হয়েছে ওই চরটির বিবরণ দিয়ে—

'নদী ও-পারে একটা চর দেখা দিয়াছে।'

রায়হাট গ্রামের প্রান্তেই ব্রাহ্মণী নদী—ব্রাহ্মণীর স্থানীয় নাম কালিন্দী, লোকে বলে কালী নদী; এই কালী নদীর ও-পারে চর জাগিয়াছে। এখন যেখানে চর উঠিয়াছে পূর্বে ওইখানেই ছিল কালী নদীর গর্ভভূমি। এখন কালী রায়হাটের একাংশ গ্রাস করিয়া গ্রামের কোলে কোলে বহিয়া চলিয়াছে। গ্রামের লোককে এখন বিশ হাত উঁচু ভাঙন ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে নামিতে হয়।

ওই চরটি লইয়া বিবাদ বাধিয়া উঠিল।...[৬]

আর উপন্যাসটি শেষ হয়েছে এর অন্যতম চরিত্র রামেশ্বরের দৃষ্টিতে চরটির বর্ণনায়—'ওই দূরে—নতুন ওঠা সর্বনাশা চরটার কোল ঘেঁষিয়া শীর্ণা কালিন্দীর বারোমাসে অগভীর অপরিসর জলধারা বহিয়া চলিয়াছে। মন্থর তাহার গতি এখন। কালের ভগ্নী কালিন্দী! কালিন্দীর জলস্রোতের মধ্যে নূতন চরটার ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে।... আগে যেখানে কালিন্দীর জলে শুধু আকাশ ও নদীতীরের গাছ-গাছালি তৃণবনের ছায়া ভাসিত, আকাশে ওড়া বকের সারির ছবি ভাসিত—আজ সেখানে কালিন্দীর সেই স্রোতধারার উদয় সূর্যের আলোয় আলোকিত কলের চিমনী এবং চিমনীতে ওঠা ধোঁয়ার রাশি একটা অনির্দেশ্য শাসনের মতো ভাসিতেছে বলিয়া মনে হইল।'[৭] এই দুই-এর মাঝে উপন্যাসের বিবাদ-বিসম্বাদ, লড়াই-সংঘর্ষ, মামলা-মোকদ্দমা থেকে শুরু প্রায় সমস্ত ঘটনা সংঘটনের

পেছনে এই চরটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। দীর্ঘদিন পর রামেশ্বর চক্রবর্তীর পরিবার এবং ইন্দ্র রায়ের পরিবারের মধ্য সৌহার্দ্য ও ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক তৈরির পিছনেও এই চরটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। চিনির কল স্থাপনের মধ্য দিয়ে সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যে কাজকর্ম শুরু হয়েছে তার পেছনেও আছে এই চরটি। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে প্রাচীন কালের সঙ্গে নবীন কালের বিরোধকে এই চরের প্রেক্ষাপটেই উপস্থাপন করেছেন। এইজন্য সমগ্র উপন্যাসটিতে চরটির অনিবার্য প্রভাবের দিকে নজর দিয়ে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'অবশ্য গ্রামের চাষী প্রজার মধ্যে ইহা, একটা লোলুপতার তুফান বহাইয়াছে, কাহারও কাহারও চক্ষে শ্বাপদ-সুলভ হিংস্র দীপ্তিও জ্বালাইয়াছে কাহাকেও কাহাকেও প্রলুব্ধ করিয়া সর্বনাশের রসাতলে পাঠাইয়াছে। যাযাবর সাঁওতাল-সম্প্রদায় অল্পদিনের জন্য ইহার আতিথেয় বক্ষে নীড় রচনা করিয়া আবার ইহার স্নেহ শীতল, অথচ পিচ্ছিল অঙ্ক হইতে দূরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে—চর ইহাদিগকে মাতার ন্যায় আহ্বান করিয়া বিমাতার ন্যায় বিসর্জন দিয়াছে। কলওয়ালা মিঃ মুখার্জির লৌহ-শাসনে ইহা নিজ বন্য প্রকৃতি হারাইয়া যান্ত্রিক সভ্যতার কবলে আত্মসমর্পণ করায়িছে এবং যন্ত্রোচিত নির্মমতার সহিত পূর্বতন প্রভুর সর্বনাশ সাধনের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং উপন্যাস মধ্যে কালিন্দীর চর যে একটি সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।'[৮] সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'কালিন্দী' উপন্যাসে কালিন্দীর বুকে জেগে ওঠা চরটিই কাহিনিতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিয়েছে। এই 'রাঙাঠাকুরের চর'টির সঙ্গে একাত্ম করে এই উপন্যাসে সাঁওতালদের জীবনচিত্র পরিবেশিত হয়েছে।

এসবের পাশাপাশি 'কালিন্দী' উপন্যাসটিতে তারাশঙ্করের সেই অঞ্চলের মানুষদের বিশেষ করে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবন-জীবীকারও বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটিতে প্রথমদিকে জমিদার নিয়ন্ত্রিত কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বিস্তারিত পরিচয় আছে। অবশ্য পরবর্তীতে বিমলবাবুর প্রবেশের পর চিনির কল স্থাপন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কৃষি সভ্যতা ছেড়ে উপন্যাসটিতে শিল্পসভ্যতার পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সে সময় কৃষকেরা শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে। সে অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনে কালিন্দী অর্থাৎ কালী নদী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই কৃষিজীবী রংলালের মুখে শোনা যায়—'কালী তো আমাদের সাধারণ নদী লয় দাদাবাবু, উনি হলেন সাক্ষাৎ যমের ভগ্নী।'[৯] উপন্যাসে এই কালী নদীর বুকে জেগে ওঠা 'রাঙাঠাকুরের চর'টিকে কেন্দ্র করেই ঐ অঞ্চলের মানুষগুলির জীবিকার বর্ণনা দেওয়া আছে। সাঁওতালরাই প্রথম এই চরটিকে চাষবাসের উপযোগী করে তোলে। সেখানে তারা ধান, গম, ভুট্টা, আখসহ নানা মরশুমি সবজি চাষাবাদ করে। রংলালের দৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক এর বর্ণনায় লিখেছেন—'ইহারই মধ্যে প্রায় সমস্ত জমি সবুজ ফসলে ভরিয়া উঠিয়াছে। চষিরা খুঁড়িয়া নিড়ান দিয়া তাহারা

ভুট্টা, সন, অড়হর বুনিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে; জমির ধারে সারিবন্দী চারা, তাহাতে শিম, বরবটি, খেঁড়ো, কাঁকুড়ের অঙ্কুর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ধানের জমিগুলি চাষ দিয়া একেবারে প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে। বাড়িঘরের চালে নূতন খড় চাপানো হইয়া গিয়াছে, কাঁচা সোনার রঙের নূতন খড়ের বিছানি অপরাহ্নের রৌদ্রে ঝকঝক করিতেছে।'১০ এই সাঁওতালরা বর্ষার সময় মহাজনের কাছে খোরাকি ধান নেয়, তারপর মনের আনন্দে চাষ চষে এবং ফসল উঠলে সুদসহ ধার শোধ দেয়। এরা নিজেদের কাজের ফাঁকে জমিদারের জমিতেও চাষাবাদের কাজে বেগার খাটে। অবশ্য বিমলবাবুর খপ্পরে পরে এদের আর কৃষক থাকা হয় না, কেউ কেউ কলের শ্রমিক হয়ে যায়, বাকিরা সে অঞ্চল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই উপন্যাসে সাঁওতালদের জীবন-জীবীকার সঙ্গে বাসগৃহ, খাদ্যাভাস, খাদ্যতালিকা, পোশাক-পরিচ্ছদের কিছু কিছু বিবরণ আছে। এরা খড়ের চালার ছোট ছোট ঘর-বাড়ি তৈরি করে বসবাস করে। প্রত্যেকের বাড়িতে এক টুকরো উঠোন আছে। তবে সবকিছুই সাঁওতাল রমণীদের লেপা-মোছা ও নানা কর্মকুশলতার কারণে নিকানো-গুছানো ও অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। খাবার-দাবারের ক্ষেত্রে এরা নিজেদের চাষকরা খাদ্যশষ্য ও শাক-সবজিকেই প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়াও মুরগি পোষার কারণে মুরগির মাংসের পাশাপাশি চরটির বনাঞ্চল থেকে ধরা ইঁদুর, খরগোসের মাংসও তারা রান্না করে অথবা পুড়িয়ে খায়। আর উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় তো বটেই অন্যান্য সময়েও দেশি মদ হাঁড়িয়া বা পচানিকে এরা পানীয়ের মধ্যে প্রথমে রাখে। অবশ্য বিমলবাবুর সৌজন্যে বিদেশি মদের সঙ্গেও এদের পরিচয় হয়। এদের পোশাক-পরিচ্ছদের বিস্তারিত বিবরণ তেমন না থাকলেও ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন যে, সাঁওতাল মেয়েরা সাগ-গোজ করতে অত্যন্ত ভালোবাসে। সাজ-গোজের অলংকার হিসেবে তারা স্থানীয় নানা ধরনের রঙ-বেরঙের সুগন্ধি ফুল ব্যবহার করে।

'কালিন্দী' উপন্যাসে উচ্চবর্ণের পাশাপাশি সাঁওতালদের স্থানীয় ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকরুচি, লোককথা প্রভৃতির বিবরণও আছে। উচ্চবর্ণের লোকজনদের ক্ষেত্রে এখানে হিন্দু-সংস্কৃতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অহীন্দ্র-উমার বিয়ে সংক্রান্ত নানা আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার বিশ্বাস, লোক-লৌকিকতায় উচ্চবর্ণের হিন্দু সংস্কৃতির পরিচয় তারাশঙ্কর দিয়েছেন। তবে সাঁওতালদের জীবনচর্যার বর্ণনায় তিনি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এক্ষেত্রে একদিকে তিনি যেমন তাদের মোড়ল কমল মাঝির মুখ দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি সংক্রান্ত তাদের বিশ্বাস তথা পুরকথাকে শুনিয়েছেন, তেমনি দু-একটি অনুষ্ঠান-পর্বের বিবরণও দিয়েছেন। অহীন্দ্রের পড়াশুনার কথা শুনে তার জাত ভাইদের সামনে একবার কমল মাঝি তার কাছে জানতে চায়—'হ্যাঁ বাবু, এই যি পৃথিমীটি, এই যি ধরতিমায়ী—ইকে কে গড়লে? কি লেখা আছে পুঁথিতে তুদের?'[১১] তার এই প্রশ্নের উত্তরে অহীন্দ্র পৃথিবী

সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলে কমল মাঝি তাকে থামিয়ে দেয় এবং বলে—'উঁহু, তুকে এখনও অনেক পড়তে হবে। পিথিবীতে আগে ছিল জল। কিছুই ছিল না, শুধুই ছিল জল। তারপরে হ'ল কি জানিস ? বলি শোন'।[১২] এসব বলে পৃথিবীর উৎপত্তি সংক্রান্ত একটা ভ্রান্ত আজগুবি গল্পের অবতাড়না করে। তবে মাঝির বাচন ভঙ্গিতে এই গল্পটিতে তার তো বটেই সেখানকার সমস্ত সাঁওতালদের আন্তরিক বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই গল্পটিকে ঐ অঞ্চলের সাঁওতালদের পুরাণ কথা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এই উপন্যাসে সাঁওতালদের নিজস্ব উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে 'বাতুলী' পরবের উল্লেখ আছে। এর ব্যাখ্যায় তাদের মোড়ল কমল মাঝি বলেছে—'নাম বটে 'বাতুলী' পরব। আবার 'কদ্‌লেতা' পরবও বুলছে। 'রোওয়া' পরবও বলে। 'বাইন' পরবও বুলছে। যারা যেমন মনে করে, তুলে।'[১৩] শুধু তাই নয়, এই পরব কোথায় কীভাবে পালিত হবে তার বিবরণও এই উপন্যাসে আছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'জাহন সারনে'—আমাদের দেবতার থানে গো পূজো হবে। এডিয়াসিম'—আমাদের মোরগকে বলে 'এডিয়াসিম', ওই মোরগা কাটা হবে, পচুই মদ দিব দেবতাকে, শাক দিব দু-তিন রকম। তারপরে রাঁধা-বাড়া হবে উই দেবতাথানে, লিয়ে খেঁয়েদেয়ে সব নাচগান করব।'[১৪] সাঁওতালরা যে আদতে একটি ফুর্তিবাজ গোষ্ঠী তার পরিচয়ও উপন্যাসটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এজন্য দেখা যায় কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সময় সুযোগ পেলেই আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে, পাচুই মদ খায়, নাচ-গান করে—পুরুষরা মাদল বাজায় আর মেয়েরা নানা সুরে বিভিন্ন ধরনের গান গায়। যেমন উপন্যাসের একটি অংশে অহীন্দ্র সাঁওতালদের জমির বন্দোবস্ত করে দিলে তারা আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠেছে। ঔপন্যাসিক লিখেছেন—'নদীর ধারে আসিয়া মাদলের শব্দে ও সাঁওতাল মেয়েদের গানের সুরে তাহার চিন্তার একটানা ধারাটা ভাঙিয়া গেল। ও-পারের চরে আজ প্রবল সমারোহে উৎস হইয়াছে, আজিকার দিন তাহাদের একটি পরমকাম্য শুভদিন, তাহাদের দেবতাকে তাহারা পূজা দিয়াছে। পাঁচটি লাল রঙের মুরগি, একটি লাল রঙের ছাগল বলি দিয়া নাকি পূজা হইয়াছে, তাহার পর আকণ্ঠ পচুই মদ খাইয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়াছে। অদ্ভুত জাত।'[১৫] 'কালিন্দী' উপন্যাসটিতে সাঁওতালদের এই সমস্ত পরিচয়ের দিকে নজর দিয়েই অধ্যাপক-সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'সাঁওতালগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও সমাজবন্ধনের বর্ণনায় অভিনবত্বের চিত্রসৌন্দর্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তাহাদের উদ্ভট কল্পনা, সরল আমোদ-প্রমোদ ও বিচিত্র সমাজব্যবস্থা লেখকের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দেয়।'[১৬]

'কালিন্দী' উপন্যাসটি তারাশঙ্কর সাধুভাষায় রচনা করেছেন। উপন্যাসে ভদ্র চরিত্রেরা মার্জিত রাঢ়ী ভাষায় অর্থাৎ মান্য চলিত ভাষায় কথা বলেছে। তবে নিম্নতর চরিত্রের সংলাপ রচনায় তারাশঙ্কর রাঢ়ী উপভাষার স্থানীয় আঞ্চলিক রূপকেই গ্রহণ করেছেন।

রংলাল পাল, ননী সাহা, নবীন বাগ্‌দীর মতো স্থানীয় নিম্নবর্ণের এবং নিম্নবৃত্তির মানুষেরা এই ভাষায় কথা বলেছে। যেমন রংলাল বলেছে—'এই তো ক বছর হল গো বাবু মশায়, একটা বাছুর কি রকম ছটকিয়ে গিয়ে পড়েছিল চরের উপর। বাস, আর যায় কোথা, ইয়া এক পাহাড়ে চিতি—ধরলে পিছনের ঠ্যাঙে। আঃ, সে কি বাছুরটার চেঁচানি! বাস, বার কতক চেঁচানির পরই ধরলে পাক দিয়ে জড়িয়ে। দেখতে দেখতে বাছুরটা হয়ে গেল ময়দার নেচির মতো লম্বা। কিন্তু কারু সাহস হল না যে এগিয়ে যাই।'[১৭] সাঁওতাল মানুষগুলির মুখের ভাষায় তারাশঙ্কর যথেষ্ট কৃতিতত্ব দেখিয়েছেন। একদিকে যেমন তিনি তাদের ভাষার কিছু গান এই উপন্যাসে তুলে এনেছেন, তেমনি কথোপকথনে তাদের ভাষার নানা শব্দ ও ব্যবহার করেছেন। এই উপন্যাসে উল্লিখিত সাঁওতালি গানের দৃষ্টান্ত হল—

'অথ জনম্ ধরতি লেন্ডং
অথ জনম্ কু মানোয়া হড়
মান মান কু মানোয়া হড়
ধরতি কু ডাবাও অ-কাদা,
ধরতি সানাম্ কু ডাবাও কিদা।'[১৮]

আর সাঁওতালি ভাষার দৃষ্টান্ত হল—'ই-রে-কম্বড়ো সে-তা হড়িচ্-হড়িচ্! অর্থাৎ ওরে চোর কুকুর, পালা বলছি, পালা বলছি, পালা।'[১৯] অবশ্য বাংলা সংলাপের ক্ষেত্রে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষগুলিও স্থানীয় আঞ্চলিক রাঢ়ী উপভাষায় কথা বলেছে। এই ভাষায় তাঁদের নিজেদের সম্প্রদায়ের ভাষার ছাপ স্পষ্ট পড়েছে। যেমন কমল মাঝি বলেছে—'হুঁ ঠিক সেই পারা, তেমুনি মুখ, তেমুনি আগুনের পারা রঙ, তেমুনি চোখ! হুঁ, ঠিক বেটে, ঠিক বলেছিস তু মোড়ল।'[২০] এই রকমই চূড়া মাঝি বলেছে—'টাকা লইলে কিছু হয় না বাবু, টাকা নাই। খেপে কি করব? আর বাবু খেপে মরেই যদি যাব তো খেপলম কেনে বল? বুদ্ধি করলম ইবার আমরা।'[২১] যুবতি মেয়ে সারী বলেছে—'কেনে ঝগরা করবে না কেনে? চ'লে যাবে না কেনে? তু বাবু, বিচার ক'রে দে! বুড়া-বুড়ীর করণ দেখ্'[২২] এই ভাবে সাঁওতালদের আঞ্চলিক কথ্যরীতির ভাষারীতিকেও তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে তুলে এনেছেন।

এইভাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসটিতে আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতে রাঢ়বঙ্গের বিশিষ্ট উপজাতি সম্প্রদায় সাঁওতালদের জীবনের বিস্তারিত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই উপন্যাসে মূলতঃ রাঢ়বঙ্গের ব্রাহ্মণী অর্থাৎ স্থানীয় কালিন্দী বা 'কালী নদী' সংলগ্ন রায়হাট অঞ্চলের জীবনকথা পরিবেশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে কালিন্দীর উপর জেগে ওঠা 'রাঙাঠাকুরের চর'কে কেন্দ্র করে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবন-জীবীকার খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান প্রভৃতির বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস,

লোকাচার, লোক-বিশ্বাস, লোক-সংস্কৃতি, পুরাণকথা, ভাষারও নানারূপ ধরা পড়েছে। তাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসটি রাঢ়বঙ্গের প্রেক্ষিতে সাঁওতালদের জীবনকথার নামান্তর হয়ে উঠেছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। সংসদ বাংলা সাহিত্য সঙ্গী : সম্পাদন শিশিরকুমার দাস, দ্বিতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১০, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫০।

২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৪-২০০৫, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৫২।

৩। কালিন্দী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুর্দশ মুদ্রণ, পৌষ ১৪১২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৭।

৪। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম সংস্করণ : নভেম্বর ২০০৩, কার্তিক ১৪১০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৪৩।

৫। বঙ্গ সাহিত্য উপন্যাসের ধারা, পৃষ্ঠা-৫৫২।

৬। কালিন্দী, পৃষ্ঠা-৩

৭। তদেব পৃষ্ঠা-২৩৫

৮। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃষ্ঠা-৫৫৩।

৯। কালিন্দী, পৃষ্ঠা-১৮

১০। তদেব পৃষ্ঠা-৮৮

১১। তদেব পৃষ্ঠা-৬৯

১২। তদেব পৃষ্ঠা-৬৯

১৩। তদেব পৃষ্ঠা-১২৫

১৪। তদেব পৃষ্ঠা-১২৫

১৫। তদেব পৃষ্ঠা-৮২

১৬। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃষ্ঠা-৫৫৩।

১৭। কালিন্দী, পৃষ্ঠা-১৭

১৮। তদেব পৃষ্ঠা-৬৯

১৯। তদেব পৃষ্ঠা-১৮৪

২০। তদেব পৃষ্ঠা-২১

২১। তদেব পৃষ্ঠা-৭২

২২। তদেব পৃষ্ঠা-৮৩